বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯১

প্রকাশক
শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী
৫এ, শান্তিনগর বাই লেন,
পোঃ ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া),
জেলা— হুগলী
৭১২২৩২

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
১২৪বি, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

বর্ধমান জেলাবাসী

ও

ইউকো ব্যাঙ্ক-এর সহকর্মিবৃন্দের

প্রতি

শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ

দ্বিতীয় খণ্ডটি উৎসর্গ করা হ'ল।

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

প্রচ্ছদচিত্র :

১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দ) চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়-এর জননী ব্রজকিশোরীদেবী কর্তৃক কারুকার্য খচিত ও পোড়ামাটির অলঙ্করণে অলঙ্কৃত পঁচিশরত্ন বিশিষ্ট 'লালজি'র মন্দিরটি কালনা শহরে রাজবাড়ীর চত্বর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভূমিকা

'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র প্রথম খণ্ড প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং পূর্বপরিকল্পনা মত দ্বিতীয় খণ্ডটি মুদ্রণ যন্ত্রের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করায় যৎসামান্য নিবেদনের সুযোগ এসে গেল। প্রথম খণ্ড প্রকাশনার পর বঙ্গভাষা-ভাষী গুণীজনের নিকট যে উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেছি, তা আমার ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। শুভানুধ্যায়ীদের শুভকামনাকে সম্বল করে সুধীপাঠকবৃন্দের সামনে পূর্বোক্ত খণ্ডটি তুলে ধরতে পারার আনন্দে শ্রমের সকল ক্লান্তির অবসান হলেও পরবর্তী পদক্ষেপে ঘোষিত পরিকল্পনার কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু আলোচনা করার পূর্বে প্রথম খণ্ড সম্পর্কে দু-এক কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমার সহকর্মিবৃন্দের শুভপ্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় গত বছরে ১০ই নভেম্বর 'ইউকো ব্যাঙ্ক'-এর ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখা অফিসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ উদ্বোধন উপলক্ষে বর্ধমানের সুসন্তান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী' বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর সপ্রশংস মন্তব্য হল—"বর্তমানে এদেশে তথ্যনির্ভর ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্ত বিরল। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর বই-এ বর্ধমান জেলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের একটা অভাব পূরণে সমর্থ হবে। যে কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা শ্রীচৌধুরী 'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' রচনা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে এটি বর্ধমান জেলার তরুণ গবেষকদের গবেষণার উপাদান সংগ্রহের সহায়ক হবে।" অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর ভাষণে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'-এর উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করেন—"যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের জন্য আশা করে থাকব। ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকেও এরূপ গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন যথার্থই শ্রীচৌধুরীর অতুলনীয় কীর্তি।"

প্রথম খণ্ডের 'মুখবন্ধ' রচনা করে দিয়ে অশোক মিত্র, আই. সি এস (অবসর-প্রাপ্ত) আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বাণীটি হ'ল—"ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত বই পড়ার পর বুঝতে পারলুম বইটি কত উৎকৃষ্ট হয়েছে। এত বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এবং পুঙ্খানু-পুঙ্খ পরিসংখ্যান ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ আমি অন্য বইতে পাইনি। অপরপক্ষে আপনার ছবিগুলিও অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে বাছাই করা হয়েছে। গঙ্গারিডি সম্বন্ধে আপনার পরিচ্ছেদটি আর একটি উজ্জ্বল রচনা। সব থেকে ভাল লেগেছে ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় মুকুন্দরাম থেকে আপনার উদ্ধৃতিটি। এই এক উদ্ধৃতি যদি আমার ১৯৫১

সালের 'District Census Hand Book : Burdwan'-এ দিতে মনে থাকত তা'হলে আমি ধন্য হতুম।" এযুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সুসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর প্রেরিত আশীর্বাণী হল,—"গত তিনদিনে প্রায় একটানা বইটি পড়েছি এবং আমার কাছে শুধু যে আকর্ষণীয় লেগেছে তাই নয়, বহু অজানা তথ্য আপনার বই থেকে পেয়েছি। যে বিপুল পরিশ্রম করে আহৃত তথ্যকে আপনি সুবিন্যস্তভাবে উপস্থিত করেছেন তা দেখে আমি বিস্মিত। একালে এধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে প্রায় কোন গবেষককেই দেখি না।"

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ এক পত্রযোগে জানিয়েছেন,—"যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর 'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য হতেই লেখকের প্রগাঢ় অধ্যবসায়, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও পরিসংখ্যানাদির সম্যক ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কোন শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়েও লেখক অসামান্য বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নিজ জন্মভূমি সম্পর্কিত সকল কথা বিশদভাবে জানাবার ও জানাইবার যে উদ্যম—তা' যদি সকল জেলার লেখকদের মধ্যে দেখা যেত তা'হলে সেটি আমাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হত। শ্রীচৌধুরীর কৃতকার্যতা ও সাফল্য জ্ঞানীগুণী সকলেই স্বীকার করবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।" উত্তরপাড়া নিবাসী আমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী তারকদাস মিত্র শুভকামনা করে জানিয়েছেন—"বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি" গ্রন্থটি শুধু কোন একটা জেলার ইতিহাস নয়। এটা বাংলার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে গ্রন্থটি জেলা ইতিহাসের অতিরিক্ত কোন সংযোজন নয়; এর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৌধুরীর রচনায় কোন 'খণ্ডদৃষ্টি' নেই, আছে 'অখণ্ডবোধে'র পরিচয়।" উপরি-উক্ত পরমশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ মন্তব্যগুলি আমাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছে। 'বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সুবাদে এবছর ১২ই মে উত্তরপাড়ার 'আনন্দ সাহিত্য গোষ্ঠী'র এক বিশেষ সভায় আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি চিরঋণী।

প্রথম খণ্ডে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'ইতিহাস', 'লেখমালা' ও 'পুরাতত্ত্বে'র আলোকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'বর্ধমান' সহ প্রায় সমগ্র 'রাঢ় অঞ্চলে'র পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বর্ধমানের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে জনজীবনের যোগ-সূত্রকে গ্রথিত করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার ঐকান্তিক প্রয়াস। বর্ধমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের রচনাগুলির কথা ইতি-পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি; তাই এ সম্পর্কে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হলেও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে দু-এক কথা বলার প্রয়োজন আছে। বর্ধমানের রাজস্ব ইতিহাসের তথ্যভিত্তিক উপাদানের আকর গ্রন্থ হল ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Fifth Report from the Select Committee of the

House of Commons on the Affairs of the East India Company' এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅশোক মিত্রের সম্পাদনায় দু'খণ্ডে প্রকাশিত 'West Bengal District Records' (New Series)-এর অন্তর্গত Burdwan District গ্রন্থ। K. A. L. Hill-এর 'Final Report on the Survey and Settlement Operation in the Burdwan District' গ্রন্থটি যে এ জেলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে ও নূতন দিল্লীর মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদির ঝাড়াই বাছাই করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি স্থান পেয়েছে C. R. Wilson ও S. C. Hill-এর সম্পাদিত ও ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত 'India Record Series'-এ এবং আরও পরবর্তীকালে ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'Fort William Correspondence'-এ প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মেলে। Sir Francis Floud-এর নেতৃত্বে গঠিত ও প্রকাশিত 'Report of the Land Revenue Commission, Bengal (1940) নামক ৬ খণ্ডের সুবৃহৎ প্রতিবেদনটি রাজস্ব ইতিহাসের প্রামাণ্য ও তথ্য সম্বলিত কনিষ্ঠতম দলিল। উক্ত প্রতিবেদনে বর্ধমানের সন্তান রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'Indian Land System' নামক একটি মৌলিক রচনা স্থান লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ ছিলেন ফ্লাউড কমিশনের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য।

অধ্যাপক হেনরী ব্লকম্যান, জারেট ও বেভারিজ কর্তৃক আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলে মোঘল আমলে বর্ধমান (সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, মান্দারন ও সাতগাঁও) চাকলাসহ সুবা বাংলার রাজস্ব ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী জানা যায়। তিন খণ্ডে প্রকাশিত Fifth Report গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হলেও এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন W. K. Firminger তাঁর 'Historical Introduction to the Bengal portion of the Fifth Report' (1917) গ্রন্থে। Dr. P. J. Marshall-তাঁর 'East Indian Fortune'-এ অষ্টাদশ শতকের বর্ধমান সম্পর্কিত কিছু তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে সর্বশেষ সংযোজন হ'ল প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ হরশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'Zamindars and Patnidars' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটি। দ্বিতীয় খণ্ডের মূল বিষয়বস্তু হ'ল, বর্ধমানের জনজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা হল প্রথম ও প্রধান উপাদান। অতীতের কথা বাদ দিলেও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে প্রায় ছ'দশক ধরে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য কেবলমাত্র বর্ধমান নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যে ব্যাহত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। অর্থনৈতিক উন্নতির সোপানগুলি সুদৃঢ় হলেই তবে সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

গড়ে উঠে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অবদান ন্যূন নয়। আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে না উঠলে সংস্কৃতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একালের 'জেলা সংজ্ঞা'কে সামনে রেখে কেবলমাত্র ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে নির্দিষ্ট কোন জেলার প্রাচীন ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নয়। বর্ধমানের পৃথক কোন রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয় নাই ; এমনকি রাঢ় অঞ্চলের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। এযাবৎকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রাঢ়ের ইতিহাস আলোচিত হয়ে এসেছে। বৃহত্তর রাঢ়ের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস ছিল না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, বৃহৎ-বঙ্গের আলোচনার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষণাকার্য প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। পৃথক পৃথক অঞ্চলের জনজীবনের ইতিহাস সহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস গবেষণা করে সমগ্র আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশের ইতিহাস রচিত হলে তবেই প্রকৃত ইতিহাস রচনা সার্থক হত। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার কবলে এটা হ'ত এক অখণ্ডবোধের নবমূল্যায়ন। অপরপক্ষে বাঙালী জাতির বহিঃআচ্ছাদনের অখণ্ডতাবোধকে তুলে ধরার চেষ্টায় বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জনজীবনের ধারাকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

এ যাবৎকাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম পর্বের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপাদান বা তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হয় নাই। সেকারণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রাঢ়ের ইতিহাসের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে এবং অংশবিশেষে রাঢ়ের ইতিহাসের মধ্যে বর্ধমানের ইতিহাসের যোগসূত্রগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্ধমানের জনজীবন ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্গী-হাঙ্গামার কোন সামগ্রিক আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; অথচ এ বিষয়ে উপাদানের কোন অভাব ছিল না।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হতে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক চিত্রের পটভূমিকা বহুলাংশে পরিবর্তিত হতে শুরু হয় এবং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে বর্ধমানের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সে সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিল বর্ধমানকে কেন্দ্র করে। অতঃপর বর্ধমান রাজবংশের অন্যতম কীর্তিমান পুরুষ কীর্তিচাঁদের কর্মকুশলতার গুণে এই জমিদার বংশটি এতদঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নবাবী আমলের অন্তিমকাল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুপ্রবেশের সময় বঙ্গদেশের দু-তিন জন জমিদার কোম্পানির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও তাঁরা অকৃতকার্য হন। অতঃপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের জমিদারগণ 'বর্ধমান জমিদারী'কে অনুকরণ করেছিল। সেকারণে বঙ্গদেশের ইতিহাস ও ভূমি-রাজস্ব

নীতির যে অংশ এই জমিদারবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত তার যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তেজচন্দ্রের পর বঙ্গের অন্যান্য ধনী জমিদারগণের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা, পদপ্রাপ্তির মোহ, জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় বসবাসের জন্য এই অংশের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'রাজবংশের ইতিহাস' এক্ষেত্রে অপরিহার্য না হলেও, বর্ধমানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে এই অংশটি আলোচিত না হলে সামগ্রিকভাবে অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে 'অর্থনীতি বিকাশের ধারা' আলোচনা করা হয়েছে। জেলার সামগ্রিক অর্থনীতি যথাস্থানে আলোচিত হয় নাই; কারণ ইতিহাস গ্রন্থে সামগ্রিক অর্থনীতি আলোচনা সম্ভবপরও নয়। 'সংস্কৃতির রূপরেখা' অধ্যায়ে সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও জনজীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা, আর সেই সঙ্গে শিক্ষাসহ লোকসংস্কৃতির কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনপূর্বক জনজীবনের উপর সেগুলির প্রভাব ও তার যোগসূত্রগুলির আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক অধ্যায় রচনা করার সুযোগ থাকলেও বাহুল্যভয়ে বিরত থাকতে হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। মালাধর বসুর কাল হতে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত করে রেখেছে বর্ধমানের কবি ও সাহিত্যিকেরা। বঙ্গসাহিত্যের আসরে বর্ধমানের বিশেষ অবদান হ'ল বৈষ্ণব-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য। এ-দুটি শাখায় বর্ধমানের মনীষীগণের অবদান বঙ্গ-সাহিত্যকে যে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ক্ষেমানন্দ ও ঘনরামের কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ঊনবিংশ শতকে বঙ্গসাহিত্যকে নবরসে সিঞ্চিত করে রেখেছিল 'দাশুরায়' ও 'নীলকণ্ঠ'। সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে 'বর্ধমানের সাহিত্যের অবদান' বিষয়ে পৃথকভাবে একটা বড় মাপের কাজ করা সম্ভব হতে পারে, যার সকল উপাদান বর্ধমানের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই স্বল্প পরিসরের কথা চিন্তা করে এই অধ্যায়ে কবি ও সাহিত্যিকগণের পরিচয় ও তাঁদের সাহিত্য কীর্তির কথা আলোচিত হয়েছে মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশনার সময় যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধবের অনুপ্রেরণা ও সাহায্য লাভ করেছি তাঁদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তারাপদ সাঁতরার উৎসাহ ও পথনির্দেশ ছিল আমার প্রধান পাথেয় স্বরূপ। আমার অগ্রজপ্রতীম উত্তরপাড়াবাসী অধ্যাপক শঙ্কর দত্ত ও অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের প্রয়োজনীয় উপদেশদানের ফলে কয়েকটি অধ্যায়ের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বর্গীয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. মহোদয়ের কন্যা ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পিতার সংগৃহীত বহু আলোকচিত্র প্রকাশ করতে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ করেছেন। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ

জানাই। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রকাশনার জন্য সদাসর্বদা বর্ধমান-বাসীগণের সকল সহযোগিতা ও উৎসাহ লাভ করেছি ; এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শৈলেন্দ্রকুমার সামন্ত, সঞ্জীবকুমার বন্ধু, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, শিবানন্দ পাল, লক্ষ্মী-নারায়ণ রায়, দীপঙ্কর চৌধুরী, সনৎকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার চৌধুরী, রঞ্জিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কুমিরকোলা) প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিগণ। আর সকলের অলক্ষ্যে নিরন্তর সহযোগিতার ডালি নিয়ে আমার পাশে উপস্থিত আছেন উত্তরপাড়াবাসী ভবেশ দত্ত ও অমিয়কুমার ঘোষ। বাণীবন্দনার ক্ষেত্রে আমার অধুনা বাসস্থান উত্তর-পাড়ার বিশেষ ঐতিহ্য আছে। তাই একাজে সদাসর্বদা উৎসাহ লাভ করেছি ডঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, তারকদাস মিত্র, হিরণ্ময় ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী), ইন্দু দাঁ, সুধীন দে পৃথ্বীশ সেন ও আনন্দগোষ্ঠীর সহৃদয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। অমিয় ভট্টাচার্য দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রচ্ছদপট তৈরীকরে দেওয়ায় গ্রন্থের উৎকর্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি হতে প্রেস কপি তৈরী করার কাজে আমার সহকর্মী প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধুবর রাধা-বিনোদ পালের সহায়তা ভুলবার নয়। 'দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্সে'র স্বত্বাধিকারী নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অল্পদিনের মধ্যে গ্রন্থটি মুদ্রণ যন্ত্রের কবল হতে নিষ্কৃতি পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রুফ সংশোধনের কাজ বন্ধুবর অরুণচাঁদ দত্তের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগে একাজ করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। 'পুস্তক বিপণি'র স্বত্বাধিকারী অনুপকুমার মাহিন্দার ও অনুজপ্রতিম ডাঃ দেবাশিস বসুর সহযোগিতার জন্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাপকতা অনেক বেশী ; তাই সাধারণভাবে আলোচনা করেও এর কলেবর প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এ খণ্ডটি বর্ধিত কলেবর হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ) আংশিক অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হওয়ায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের দুশ্চিন্তা হতে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি।

গবেষণাধর্মী কাজের জন্য সর্বাগ্রে সময় ও মনঃসংযোগের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী অতীতের ন্যায় সকল প্রকার সাংসারিক দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়ে আর সেইসঙ্গে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যোগানোর ফলে রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় নাই। নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের কাজে আমার কন্যা কুমারী শুভ্রা চৌধুরী ও পুত্র শ্রীমান জ্যোতির্ময়ের সাহায্য পেয়েছি।

গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'ইউকো ব্যাঙ্ক'-এর সহকর্মিবৃন্দ ও আমার কর্মস্থল ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখার 'ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব'-এর সভ্যবৃন্দের যে ঐকান্তিক সহযোগিতা ও শুভকামনা লাভ করেছি তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে

ছোট করতে চাই না। আজকের দিনে এরূপ সহকর্মী পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা এবং এরজন্য আমি গর্বিত। আর প্রচারের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের সহযোগিতার জন্য ঊর্ধ্বতন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট আমি একান্তই কৃতজ্ঞ।

সময়ের মানদণ্ডে বর্ধমান জেলার সংস্কৃতির উন্মেষ ও তার ব্যাপকতার প্রসারলাভ ঘটেছিল সুদীর্ঘ কালের প্রেক্ষাপটে। তাই বর্ধমানের সংস্কৃতি হল বৈচিত্র্যময় ও সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। ইতিহাস ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি আলোচিত হলেও এখনও বেশকিছু আলোচনা বাকী থেকে গেল। আশা করি তৃতীয় খণ্ডে পাদপূরণ করে প্রয়োজনীয় অভাব দূর করতে সক্ষম হ'ব। 'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র প্রথম খণ্ডটি যেরূপ বঙ্গভাষাভাষী বিদ্বজ্জনের কাছে সমাদৃত হয়েছিল, অনুরূপভাবে যদি এটিও সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তা'হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। বিরাট জেলার রত্ন-ভাণ্ডারে কত না জানা-অজানা তথ্যের সম্পদ স্তূরীভূত হয়ে আছে, তার সামান্য অংশমাত্র স্বীয় শ্রমের বিনিময়ে আহরণ ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করে জন্মভূমির পদে নিবেদন করলাম। আর সেইসঙ্গে বর্ধমানের কবি ও মনীষী 'শ্রীকবিকঙ্কণ'-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই ভাষায় জন্মভূমির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে আমিও সশ্রদ্ধ চিত্তে নিবেদন করি,—

'জে বোল বলাহ তুমি সে বোল বলিব আমি
তুমি করি মোরে উপদেশ।
প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য
করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ॥'

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সুধীন দে, উত্তরপাড়া, চিত্র নং ১ ও ২
মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, বোড়ো বলরাম, চিত্র নং ৫
স্বর্গীয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. কর্তৃক গৃহীত ও তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত চিত্র নং ৬-১১, ১৪, ১৫, ১৮-২৬
তারাপদ সাঁতরা, নবাসন, চিত্র নং ১৬, ১৭ এবং প্রচ্ছদ চিত্র
জৈনভবন, কলিকাতা (সম্পাদক গণেশচন্দ্র লালওয়ানী), চিত্র নং ৩

ABBREVIATIONS

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal	**S.H.A.I.B.**
The History and Culture of the Indian People	**H.C.I.P.**
Journal of the Asiatic Society of Bengal	**J.A.S.B.**
Indian Historical Quarterly	**I.H.Q.**
Indian Antiquary	**Ind. Ant.**
Journal of Bihar and Orissa Research Society	**J.B.O.R.S.**
Epigraphia Indica	**E.I.**
Translation	**Tr.**

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক যুগের সূচনা

ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদসমূহের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, প্রারম্ভিক পর্বে পৌরাণিক বিবরণগুলি সযত্নে উপস্থাপন। করা হয়েছে। এদেশের কোন লিখিত প্রাচীন ইতিহাস না থাকায় উপক্রমিক পর্বের দায়-দায়িত্ব পুরাণকারগণ বহন করে চলেছেন। পুরাণোক্ত বচন, জনশ্রুতি বা প্রবাদ কিন্তু ইতিহাস নয়; অবশ্য যে দেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয় নাই বা আবিষ্কৃত প্রত্নক্ষেত্র সমীক্ষার প্রতিবেদনগুলি সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে জমা পড়ে থাকে, সে দেশের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্ব রচনা করতে হলে পুরাণকারের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নাই। পুরাণ বা প্রবাদ ইতিহাস নহে, কিন্তু ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের সূত্রগুলি নিহিত আছে পুরাণোক্ত বর্ণনা ও প্রবাদের মধ্যে, সে কথা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। মহাভারতে আছে—

'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতাহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদং শক্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥' শান্তিপর্ব ৮৪।১।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এগুলিকে বলেছেন পুরাকাহিনী এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এ জাতীয় কাহিনী হল পুরাণকথা।[১] কিন্তু তাঁরা সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক বিবরণকে বাদ দিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন জনপদ, নদনদী, পাহাড়, নগর, তীর্থস্থান, অরণ্য প্রভৃতি সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ করতে হলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্র, জৈনশাস্ত্র, গ্রীক, চৈনিক ও তিব্বতীয় পর্যটকগণের বিবরণ ব্যতীত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করায় কোন উপায় নাই। একমাত্র সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ব্যতীত প্রাচীন যুগে শিলালিপির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় না। কিন্তু শিলালিপিগুলিতে উল্লিখিত কয়েকটি স্থান ব্যতীত অন্য স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে নীরব। অশোকের পর সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি ও কালিদাসের রঘুবংশে প্রধানতঃ উত্তরাপথের জনপদগুলি সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা যায়। এই সকল কারণেই পৌরাণিক বিবরণের প্রতি কটাক্ষপাত করলেও ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক পর্বে পুরাণ ও পুরাণকারগণ গুরুত্ব পেয়েছেন। তবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ ধরনের উপাদানগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা যে অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পার্জিটার পুরাণ ও সমধর্মী গ্রন্থ হ'তে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে প্রাচীন রাজবংশের তালিকা রচনা করেছেন।

"মহাজন যেন গতস্য পন্থাঃ"—এই আপ্ত মহাজন বাক্যটি স্মরণে রেখে বর্ধমান

জেলার ইতিহাস পৌরাণিক বিবরণ দিয়ে শুরু করে জনপদ পরিচিতি ও প্রাচীন রাজবংশের উপর আলোচনা করা যায়। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় যে, অধিকাংশ পৌরাণিক রাজবংশ নিজেদের ক্ষত্রিয় জাতি ও ইক্ষাকু বাংশোদ্ভব বলে পরিচয় দিয়েছেন। বর্ধমান জনপদ প্রাচীন সুহ্মভুমির অন্তর্গত। পুরাণ ও মহাভারতে সুহ্ম জনপদের উৎপত্তির কাহিনী পাওয়া যায়। অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা, পুত্র ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে অসুররাজ বলির আশ্রয় লাভ করেন এবং বলিরাজের অনুরোধে তাঁর মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন। এই পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পরিচিত এবং তাঁদের অধিকৃত জনপদগুলিও স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অঙ্গের অঙ্গদেশ, বঙ্গের বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র দেশ ও সুহ্মের নামানুসারে সুহ্মদেশ হয়েছিল।[২] এ জাতীয় কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্য সভ্যতার ধারক ও বাহকদের সঙ্গে অসুর জাতির সংমিশ্রণে একটা গোষ্ঠী বা জাতি ও তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই কাহিনী থেকে আরও অনুমান করা যায় যে, মহাভারত রচনার সময়ে এতদঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল।[৩] পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা যা হ'ক না কেন, নিঃসন্দেহে কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি এদেশে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব ভারতের আদিবাসীগণের ভাষাও কালক্রমে লুপ্ত হয়ে মিশ্র ভাষা ও মিশ্র সমাজের সৃষ্টি হলেও আজও সমাজের প্রতি স্তরে সেই প্রাচীন রীতিনীতি উঁকি মারছে। কালের প্রভাবে বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশরূপে স্বীকৃত হয়। যদিও মনুসংহিতার কয়েকটি সংস্করণে একথা স্বীকার করা হয় নাই।[৪] বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অবশ্য মিশ্রবর্ণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[৫]

(১)

মহাভারতে সুহ্ম জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ধমানের কোন পরিচয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ধমান জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। বিশেষ বিশদ বিবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহে নাই। ষোড়শ শতকে রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' ও 'ভারত ব্রহ্মখণ্ড' নামক পৌরাণিক গ্রন্থে বর্ধমান জনপদের বিশেষ বিবরণ আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে পুরাণ এমনকি উপপুরাণ বলা যায় না। তবে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, এরূপ পৌরাণিক কাহিনীসহ 'দেশাবলী বিবৃতি' বর্ণিত থাকায় পুরাণ নামকরণ করা হয়েছে। বিবৃত ঘটনাবলীর কোন উৎকর্ষতা নাই এবং এটির আখ্যানভাগের অধিকাংশ জুড়ে আছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। 'দিগ্বিজয় প্রকাশে, বর্ণিত বর্ধমান জনপদের বিবরণ এরূপ—

"অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হ্যুত্তরে।
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকেশাদ্ধি পূর্বতঃ ॥ ৭৭০

অষ্টযোজনবিস্তৃতো দেশো নদনদীযুতঃ।
রুদ্রযোজনবিমিতো দীর্ঘ্যে চৈব মহীপতে ॥ ৭৭১
সাধারণভূমিকশ্চ বর্দ্ধমানোঽতি সুন্দরঃ।
দামোদরনদী যত্র বহতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২
মুণ্ডেশ্বরী বকুলা চ পূর্ব্বে সরস্বতী বরা।
প্রায়শো বহুলা নদ্যঃ সদা দক্ষিণগা মতাঃ ॥ ৭৭৩
তৃণধান্যাদিভেদানাং সপ্তদশ ভবন্তি চ।
কার্পাসো রক্তশ্বেতশ্চ পাটলশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪
পঞ্চভেদাশ্চেক্ষবশ্চ জায়ন্তে যত্র নিত্যশঃ।
সর্ব্বেষাং বর্দ্ধনান্নিত্যং বর্ধমানমতো বিদুঃ ॥ ৭৭৫
বিষ্ণুপাদাম্বুজাতাচ্চ দামোদরজলাদ্বহিঃ।
বর্দ্ধমানমনুষ্যাংশ্চ গায়ন্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ৭৭৬…
অঘোরভূমিপস্তত্র রাজন্যকুলসম্ভবঃ।
বর্দ্ধমানপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ শাসতি ধর্ম্মবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮
কলেবেদসহস্রাণি গচ্ছন্তিস্ম যদা নৃপ।
বীরসিংহরাজগেহে কৌতুকং জাতমেব হি ॥ ৭৭৯
কাঞ্চিপুরে মহারাজ গুণসিন্ধুর্মহীপতিঃ।
তস্য পুত্রঃ সুন্দরশ্চ বর্দ্ধমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০
বীরসিংহস্য দুহিতা বিদ্যা নাম্নীতি শোভনা।
নানাশাস্ত্রপারগা চ বিনোপনিষদং নৃপ ॥ ৭৮১
ভূমিমার্গে সুন্দরশ্চ গত্বা তত্র বিবাহিতা।
জিত্বা বিদ্যাং বিচারেষু সম্ভোগং কৃতবান্ বরঃ ॥ ৭৮২
বিদ্যাসুন্দরবৃত্তান্তং চৌরপঞ্চাশদাখ্যকে।
গ্রন্থে সমীচীনতয়া বর্ত্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩
অঘোরস্য সুতঃ শ্রীমান্ চন্দ্রাঙ্গদ মহীপতিঃ।
বিবৃতির্যস্য বহুলা গণেশাখ্য পুরাণকে ॥ ৭৮৪
সূর্য্যবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্রো মহীপতিঃ।
কুশবংশপ্রসূতশ্চ বর্দ্ধমানস্য শাসকঃ ॥ ৭৮৫
কুশাদতিথিঃ পুত্রশ্চ সুকন্যায়ামজায়ত।
আঙ্গুরায়াঞ্চ বীর্য্যাচ্চ হ্যতিথিশ্চ মহাবলঃ।
পুণ্ডরীকো হি গ্রহণো সূর্য্যশ্চ নৃপশেখর ॥ ৭৮৬
উলুপ্যাং পুণ্ডরীকস্যাপ্যমোঘরেতসঃ সদা।
ক্ষেমধর্ম্মা মহাযোগী জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭

রতিদাখ্যা ক্ষেমধৰ্ম্মৌ বীৰ্য্যতো হি মনুনের্বরাৎ।
দেবানীকস্য দেবধৰ্ম্মাক্ষজ্ঞেহথ বৰ্দ্ধমানকে ॥ ৭৮৮
দেবানীকস্য বীৰ্য্যাচ্চ ফুল্লায়াঃ সমজায়ত।
পারিজাতোঽতিকুশলো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৭৮৯
ঘট্টশৈলে নৃপোদ্ভূতঃ চকচকীসরিতস্তটে।
পারিজাতাৎ পরো নৈব পুরুষোঽথ মহীপতিঃ ॥ ৭৯০
খঞ্জন্যাং পারিজাতাচ্চ নাতুঙ্গঃ সমজায়ত।
হিন্তালকাননে রাজাভুন্নাতুঙ্গো হি নির্ভয়ঃ ॥ ৭৯১
নাতুঙ্গাৎ মারিষায়াঞ্চ অর্কপুত্রো হি দিক্‌পতিঃ।
দিক্‌পতিং প্রমীলায়াঞ্চ প্রেরয়ামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২
সুদর্শায়ামেকবীৰ্য্যাৎ দ্বৌ পুত্রৌ বালিনাং বরৌ।
বজ্রনাভো রদকালির্বামনশ্ছত্রমস্তকঃ ॥ ৭৯৩।
গোবৰ্দ্ধনাখ্যদেশে চ জীমূতস্য নদীতটে
বজ্রনাভস্য বীৰ্য্যাচ্চ মেনকায়াং মহীপতে।
স্বগণো গণচূড়শ্চ জাতৌ দ্বৌ চাতিশোভনৌ ॥ ৭৯৪
যমকরে নদীপার্শ্বে গণচুড়ো হি লুব্ধকঃ।
বসতিং কৃতবান্ তেন পাটলিগ্রামসন্নিধৌ ॥ ৭৯৫
মোদমত্যাঞ্চ স্বগণবীৰ্য্যাচ্চৈব মহীপতে।
বিভুতিশ্চ সুভুতিশ্চ রামভুতিরজায়ত ॥ ৭৯৬
রামভুতিঃ কীকটস্য রাজা পর্বতবেষ্টিতে।
দেশে জঙ্গলসম্ভূতে নীচজাতি প্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭
পালাসনগরে রাজা রামভুতিরভুৎ পুরা।
কিরণো ভূমিকা যত্র প্রাপ্নোতি চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৭৯৮
বিভুতিঃ শূদ্রতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ।·······৭৯৯
কেরলে শতশৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্ স চ।
রাজ্যং শূদ্রভূমিকায়াং শ্রুতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮০০
দ্বিজকন্যা তুঙ্গলেখাগর্ভে পুষ্পাঙ্কুরো মহান্।
ততঃ কোমলপ্রকৃতির্হটাশ্বশ্চ ঋষিব্রতঃ ॥ ৮০১
অগস্ত্যস্য বরেণৈব একাম্রে বিপিনে স চ।
রাজাভুৎ চোৎকলস্যান্তে জগন্নাথস্য সন্নিধৌ ॥ ৮০২
গণ্ডক্যা জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাখ্যো হি সুন্দরঃ।
পুষ্পাঙ্কুরস্য বীৰ্য্যাচ্চ চন্দনোপবনে তদা ॥ ৮০৩
অঘোরসংজ্ঞকস্তস্য চন্দনস্যানুজোঽভবৎ।
চন্দনকাননে রাজাসীত্তুলাখ্যে বিষয়ে ভিদি ॥ ৮০৪

দেশিকায়ামঘোরাচ্চ করণোঽতুলবিক্রমঃ।
বর্দ্ধমানং পরিত্যজ্য গতো গ্রামং কলাপকম্॥ ৮০৫
পুষ্করাননক্ষত্রিয়শ্চ স্বরাজ্যে সিক্তবান্ নৃপ।
সংক্ষেপাৎ বর্দ্ধমানস্য ভূপালবর্ণনং কৃতম্॥ ৮০৬
সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্তমঃ।
বর্দ্ধমানস্তস্য ভূপ পুরাণে বিবৃতা প্রথা॥ ৮০৭
পুষ্করাননবংশীয়ঃ রাজনো বর্দ্ধমানকে।
রাজা নিরন্তরং শ্রীমান্ মঙ্গলাদেবীপূজনাৎ॥" ৮০৮
(দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলবিবরণ)[১]

অনুবাদ—'অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমে এবং দারিকেশির পূর্ব্বে একটি অতি সুন্দর সাধারণভোগ্য ভূভাগ আছে। রাজন্! এই ভূভাগের নাম বর্দ্ধমান। এই বর্দ্ধমান দেশে নানা নদ নদ। প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য একাদশ যোজন এবং প্রস্থ অষ্ট যোজন। এই দেশের মধ্যভাগ দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে সকল নদী আছে, তম্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুলা ও সরস্বতা এই তিনটিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহুতর নদী প্রবাহিত। তৃঃধান্যাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধান্য এদেশে উৎপন্ন হয়। রক্ত, শ্বেত ও পাটলবর্ণ কার্পাস এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের এখানে বার মাস চাষ হইয়া থাকে। ফল কথা, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বর্দ্ধন অর্থাৎ উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বর্দ্ধমান। দামোদর জল বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সম্ভূত। সুতরাং দামোদর নদীর উভয় পার্শ্বব্যাপী বর্দ্ধমানের অধিবাসী মনুষ্যদিগকে বিভিন্ন দেশবাসীর লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে।

অঘোর নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্মানুসারে বর্দ্ধমানবাসী প্রজাপুঞ্জকে শাসন করিতেন। হে রাজন্! কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, এই বংশীয় রাজা বীরসিংহের গৃহে একটা বড় কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কাঞ্চিপুরে গুণসিন্ধু নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুন্দর। সুন্দর একসময়ে বর্দ্ধমানে আগমন করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের বিদ্যানাম্নী এক পরমাসুন্দরী দুহিতা ছিল। বিদ্যা উপনিষৎশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুন্দর ভূ-বিবর দিয়া গিয়া রাত্রিকালে বিদ্যাকে বিবাহ করেন। বিদ্যা শাস্ত্রবিচারে সুন্দরের কাছে পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। হে নৃপবর! এই বিদ্যাসুন্দরের বৃত্তান্ত চৌরপঞ্চাশৎ গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজা অঘোরের পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রাঙ্গদ। ইনিও রাজা ছিলেন। গণেশ পুরাণে এই রাজার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি কুশের বংশে উৎপন্ন। এই কান্তিচন্দ্র এক সময় বর্দ্ধমান শাসন করেন।

কুশ হইতে সুকন্যার গর্ভে অতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। অতিথি হইতে আঙ্গুরার গর্ভে মহাবল পুণ্ডরীকের জন্ম হয়। অমোঘবীর্য্য পুণ্ডরীক হইতে উলুপীর গর্ভে ক্ষেমধর্ম্মা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেমধর্ম্মা যোগীপুরুষ ছিলেন। ইঁহাদ্বারা কুল পবিত্র হইয়াছিল। ইনি এক মুনির নিকট বরলাভ করেন। এই বরপ্রভাবে তৎপত্নী রতিদার গর্ভে দেবধর্ম নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবধর্ম হইতে দেবানীক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের সকলেরই জন্মভূমি বর্দ্ধমান।

দেবানীকের ঔরসে ফুল্লার গর্ভে পারিজাত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইনি রাজকার্য্যে বিচক্ষণ এবং যুদ্ধবিদ্যায় পরম পটু ছিলেন। ইনি ঘট্টশৈলস্থ চক্চকী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত হইতে পুরুষকার তৎপর শ্রেষ্ঠ রাজা আর কেহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খঞ্জনীর গর্ভে নাতুঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। নির্ভীকচিত্ত নাতুঙ্গ হিন্তাল-কাননে বাস করিতেন। নাতুঙ্গ হইতে মারিষার গর্ভে অর্কপুত্র এবং অর্কপুত্র হইতে প্রমীলার গর্ভে দিক্পতি উৎপন্ন হন্। দিক্-পতি হইতে সুদর্শার গর্ভে দুই বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, রয়াকলি, বামন ও ছলমস্তক নামে চারিপুত্র জন্মে। গোবর্দ্ধনদেশে জীমূত নদীর তটে বজ্রনাভের মেনকানাম্নী পত্নীর গর্ভে স্বগণ ও গণচূড় নামে দুই পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়। গণচূড় পাটলি গ্রামের নিকট যমকর নদীর পার্শ্বে বাসস্থাপন করেন। ইনি অতি লুব্ধস্বভাব ছিলেন। স্বগণের ঔরসে মোদামতীর গর্ভে বিভূতি, সুভূতি ও রামভূতি নামে তিন পুত্র জন্মে।. রামভূতি কীকটদেশে রাজপাট স্থাপন করেন। ঐ দেশ তখন পর্বত-পরিবেষ্টিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বহুসংখ্যক নীচজাতীয় প্রজা তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। সুভূতি পলাসনগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজত্ব স্থান চন্দ্রসূর্য-কিরণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বিভূতি অতি বলবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই কেরল ও শতশৃঙ্গ প্রদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যে বহুতর শূদ্রজাতীয় প্রজা বাস করিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে দ্বিজকন্যা তুঙ্গলেখার গর্ভে পুষ্পাঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পাঙ্কুরের পুত্র হটাশ্ব। ইনি বড় কোমল প্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহার তপোনুষ্ঠান ছিল। অগস্ত্য ইহাকে বর দেন। সেই বরপ্রভাবে ইনি উৎকলের অন্তসীমায় জগন্নাথক্ষেত্রের অদূরে একামুকাননের রাজা হন। গণ্ডকী নাম্নী পত্নীর গর্ভে চন্দনবনে, চন্দন নামে ইহার এক সুন্দর পুত্র জন্মে। চন্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম অঘোর। ইনি তুলাদেশের চন্দনকাননে রাজ্য করেন। অঘোর হইতে তৎপত্নী দেশিকার গর্ভে করণ জন্মগ্রহণ করেন। করণ অসাধারণ বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া কলাপক গ্রামে গমন করেন। পুষ্করানন নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হন। সংক্ষেপে বর্দ্ধমানাধিপতি ভূপালদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। অন্যান্য সাধারণ দেশের মধ্যে

বর্দ্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। এখানকার ভূপালদিগের বিবরণ-পুরাণে বর্ণিত আছে। পুষ্করাননের বংশধর ভূপালগণই পরে মঙ্গলাদেবীর অর্চ্চনার ফলে বর্দ্ধমানে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন।' (দিগ্বিজয় প্রকাশ)

ষোড়শ শতকে রচিত ভারত ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-সহ বর্ধমানের যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি গ্রহণ অপেক্ষা বর্জন করাই শ্রেয়। যেহেতু বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে, অতএব এ কাহিনীর আদি উৎসের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। ভারত ব্রহ্মখণ্ডে বর্ধমানের বিবরণ এরূপ—

"বিংশতিযোজিনানাঞ্চ বর্দ্ধমানস্য মণ্ডলম্।
লোকাস্তত্র ভবিষ্যন্তি ভাগ্যবন্তো যুগার্দ্ধকে ॥ ২
চত্বার্য্যব্দসহস্রাণি চত্বার্য্যব্দশতানি চ।
কলের্যদাগমিষ্যন্তি বর্দ্ধমানে তদা দ্বিজাঃ ॥ ১৫
দামোদরসমীপে চ নগরান্তরতো নৃপ।
ক্ষত্রিয়গোত্রমধ্যে চ হেমসিংহো ভবিষ্যতি ॥ ১৬
হেমসিংহ-নৃপস্যাপি সম্পত্তিরচলা দ্বিজাঃ।
প্রতাপবান্ ধার্মিকশ্চ নির্ভয়ো রণকর্কশঃ ॥ ২৪
সর্বলক্ষণসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ।
কুলদীপো বীরসিংহো পুত্রোঽস্য ভবিষ্যতি ॥ ২৫
বীরসিংহসমো রাজা ন ভাবী বর্দ্ধমানকে।
নিজবাহুবলেনৈব বহুদেশান্ জয়িষ্যতি ॥ ২৬
তাম্রলিপ্তং কর্ণদুর্গং বরদাভূমিকং তথা।
সুহ্মদেশং বীরদেশং নিজায়ত্তং করিষ্যতি ॥ ২৭
বীরসিংহস্য নৃপতেঃ ধর্মপত্ন্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
জজ্ঞিরে চ বেদ পুত্রান্ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২৮
কন্যৈকা সুন্দরী বিদ্যা জজ্ঞে গুণবতী মুদা।
কাঞ্চিপুরস্য নৃপতিঃ গুণসিন্ধুর্নৃপোত্তমঃ ॥ ২৯
যুগসায়ং তস্য পুত্রঃ সুন্দরো হি ভবিষ্যতি।
কালীভক্তঃ পণ্ডিতো হি সর্ব্ববিদ্যাসু পারাগঃ ॥ ৩০
বিদ্যাপণঞ্চ বিদ্যায়াঃ করিষ্যতি মহৎখলু।
মা জেতুং যেন বিদ্যাভিঃ স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৩২
ভট্টদূতেন সন্দেশপত্রং নীত্বা নৃপাজ্ঞয়া।
নানাদেশং জ্ঞাপনার্থং রাজ্ঞো দূতো গমিষ্যতি ॥ ৩৩
বিদ্যাং জেতুং গমিষ্যন্তি বহবো নৃপবালকাঃ।
পরাভূতাঃ পলায়ন্তে দেশান্তু বর্দ্ধমানকাৎ ॥ ৪৩

কাঞ্চিদেশে মহারাজো গুণসিন্ধুঃ প্রতাপবান্ ।
তস্য পুত্রো সুন্দরশ্চ শ্রুত্বা দূতমুখাৎ গুণম্ ॥ ৪৪
অশ্বেনৈব দ্রুতং দেশাৎ বর্দ্ধমানং গমিষ্যতি ।
দামোদরতটোপ্রান্তে মালাকারস্য বৈ গৃহে ॥ ৪৫
বসতিসুন্দরঃ শ্রীমান্ বিদ্যাপ্রাপ্তিনিমিত্তকম্ ।
মালাকারস্য গৃহিণীং বিধায় কুট্টিনীং মুদা ।
বিদ্যাঞ্চ গর্ত্তমার্গেণ হরিষ্যতি তপোবলাৎ ॥ ৪৬
কালদেব্যাঃ প্রসাদেন ন মরিষ্যতি ভূমিপাৎ ।
কলেঃ সায়স্ত্বিদং চিত্রং বিদ্যাসুন্দরয়োর্দ্বিজাঃ ॥ ৪৭
গাস্যন্তি লোকাঃ চারিত্র্যং গৌড়াদৌ মুনিসত্তমাঃ ।" (ভারত ব্রহ্মখণ্ড ৬ অং)

ভাবানুবাদ ঃ 'বর্ধমান মণ্ডলের বিস্তার ২০ যোজন। এখানকার চারি বর্ণের লোকই কৃষিকর্মরত। কলির ৪৪০০ বর্ষ গত হইলে (অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬ শত বর্ষ পূর্বে) দামোদরের সমীপে হেমসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবেন, তাঁহার সাত মহাল বাড়ী। এই হেমসিংহের পুত্র বীরসিংহ। ইঁনি নিজ বাহুবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুর্গ, বরদাভূমি, সুহ্মদেশ ও বীরদেশ নিজায়ত্ত করিবেন। এই বীরসিংহের চারি পুত্র ও বিদ্যা নামে এক কন্যা হইবে। কন্যা পণ করিবে যে, যে তাহাকে বিদ্যায় হারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। এ সংবাদ কাঞ্চিপুরে পেঁাছিলে কাঞ্চিপুরপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর বর্ধমানে আসিবেন। তিনি দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে আশ্রয় লইবেন। কুট্টিনী মালিনীর সাহায্যে তপোবলে এক সুড়ঙ্গ করিয়া বিদ্যাকে হরণ করিবেন। কেবল কালীদেবীর প্রসাদে সুন্দর রক্ষা পাইবেন। গৌড়াদির লোকেরা সেই বিদ্যাসুন্দর চরিত্র গান করিবে।'[৭]

পূর্বোক্ত পৌরাণিক বিবরণের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অন্যান্য রাজবংশীয় উপাখ্যানের ন্যায় এই বংশের নৃপতিগণ সূর্য বংশোদ্ভুত বলে কথিত। কলির ৪৪০০ বছর অতীত হ'লে অর্থাৎ ১০ম শতাব্দীতে বীরসিংহের আবির্ভাবকাল বলা হয়েছে। এর স্বপক্ষেও কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগে চৌরপঞ্চাশৎ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রচিত হয় এবং ঐ গ্রন্থটি অবলম্বন করে ভারত ব্রহ্মখণ্ড ও দিগ্বিজয় প্রকাশের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে উগ্র ক্ষোভ ও নদীয়ারাজের মনোরঞ্জন বিদ্বেষ চরিতার্থ করার বাসনা ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচাঁদের হস্তে কবির পিতা ও ভ্রাতৃগণসহ স্বয়ং কবি নিগৃহীত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কৃত্তিচাঁদের পুত্রবধূ (সম্ভবতঃ লক্ষ্মী কুমারী) ও দেওয়ান রামচন্দ্র নাগের হস্তে মূলাজোড় গ্রামে পুনরায় তিনি নিগৃহীত হয়েছিলেন। নদীয়ারাজ্যের দেওয়ান বর্ধমান রাজ্যের দেওয়ান কর্তৃক মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে অপমানিত হওয়ার কাহিনী জানা যায়।[৮] এই সকল কারণে বর্ধমান

রাজবংশকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্ত বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়েছিল এবং একসময়ে 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থটি বর্ধমান রাজ্যে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।[৯] তবে এ কাহিনীর সত্যতা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

দিগ্বিজয় প্রকাশের কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও পুরাণ বর্ণিত ভৌগোলিক বিবরণের যথেষ্ট মূল্য আছে। দেশনাম প্রসঙ্গে আছে—"সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্তমঃ" অর্থাৎ অন্যান্য সাধারণ দেশের মধ্যে বর্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। ধনে জনে পরিপূর্ণতার জন্য জনপদের নাম বর্ধমান একথা সর্বজন স্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থে কাঞ্চিপুরের উল্লেখ আছে। বীরভূম জেলার বোলপুরের ৬ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে বেঙ্গুটিয়া মৌজায় অবস্থিত বর্তমান কঙ্কালীতলা।[১০] শিবচরিত ও অন্নদামঙ্গলে কাঞ্চিদেশ / কাঞ্চির উল্লেখ আছে। কলাপক গ্রামের অস্তিত্ব অজ্ঞাত হলেও পুষ্করানন নামক নৃপতি তথায় রাজত্ব করতেন। পুষ্করাননের নামানুসারে রাজধানী 'পুষ্করনা' নামটি সম্ভবতঃ পরিচিত ছিল এবং ৪র্থ শতকে শুশুনিয়া গিরিলিপিতে পুষ্করনার অধিপতি চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ আছে।[১১] অনেকে মনে করেন যে দুর্গাপুর হতে ৩ কিঃমিঃ দূরে বাকুড়া জেলাস্থ বড়জোড়া থানায় অবস্থিত বর্তমান পাখন্না গ্রামটি (জে এল নং ৫৭ ও ৫৮) অতীতের পুষ্করনা।"[১২]

(২)

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে সিংহলে রচিত "মহাবংশ" নামক পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ় অঞ্চলে সিংহবংশ রাজত্ব বিস্তার করেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল সিংহবাহু। কলিঙ্গ রাজকন্যার গর্ভজাত রাঢ়েশ্বরের দুহিতা সুসীমা একদা রাঢ়ের নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে মগধ যাত্রার সময় এক সিংহের কবলে পতিত হন এবং সুসীমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সিংহ তাকে বিবাহ করে। কালক্রমে ঐ দম্পতির একটি পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে।[১৩] পুত্রটির হাত ও পা ছিল সিংহের ন্যায়। সুসীমা পুত্রের নাম রাখেন সিহবাহু বা সিংহবাহু (যাঁর নামে সিংহল দেশের নামকরণ করা হয়েছে) এবং কন্যাটি সিংহসিবালী নামে পরিচিত ছিল। সিহবাহু মাতার নির্দেশে ১৬ বছর বয়সে স্বীয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। বয়ক্রমকালে সিংহবাহু একদিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার পিতা ও মাতার আকৃতিতে সাদৃশ্য না থাকার কি কারণ এবং তারা সিংহ-গুহায় বন্দী হয়ে আছে কেন। তখন পুত্র কর্তৃক পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়ে সুসীমা সকল কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হন। একদা সিংহবাহু কোনক্রমে সিংহের গুহা হ'তে নির্গত হয়ে স্বীয় পিতা পশুরাজকে হত্যা করে লাল (লাঢ় > রাঢ়) দেশ অধিকার করেন। অতঃপর মাতার নির্দেশে সিংহবাহু সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জয় করে সিহপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।[১৪] সিহবাহু বা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল সুমিও বা সুমিত্র। বিজয়সিংহ পিতার ন্যায় বলশালী

ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বিনীত হওয়ার জন্য স্ত্রী পুত্র ও সাত শত অনুচরসহ পিতৃরাজ্য হ'তে বিতাড়িত হন এবং তিনটি অর্ণবপোত, স্ত্রীপুত্র ও অনুচরবৃন্দসহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে যাত্রা করে তাম্রপর্ণী দ্বীপে অবতীর্ণ হন। ঐ স্থানে বসবাসের কিছুকাল পরে সমগ্র দ্বীপটিকে জয় করে, পিতা সিংহবাহুর নামানুসারে দ্বীপটির নাম রাখেন সিংহল।[১৫] বিজয় যে দিন লঙ্কায় উপনীত হন, সেই দিন কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।[১৬]

সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র রাঢ়দেশের অধিপতি হয়ে সিংহপুর হতে রাজত্ব পরিচালনা করতেন।[১৭] মহাবংশ বর্ণিত রাঢ় জনপদের উল্লেখ পরবর্তীকালেও পাওয়া যায়। কিন্তু সিংহবাহুর রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল? ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এটি হুগলী জেলাস্থ বর্তমান সিঙ্গুর।[১৮] ডঃ মজুমদার বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত হাণ্টারের[১৯] বিবরণের উপর আস্থা স্থাপন করে উক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বর্ধমান জেলার সেরগড় পরগণায় (রানিগঞ্জ অঞ্চল) সিংহারণ নামে একটি নদী আছে; এই নদীর তীরে সিংহপুর নামক প্রাচীন রাজধানীটি ছিল এবং এখানে সিংহবাহু রাজত্ব করতেন। কালক্রমে এই নগর ধ্বংস হলেও স্থানটি সিংহারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হয়। সিংহারণ্য হতে বর্তমান সিংহরণ বা সিঙ্গরাণ নদীর নামকরণ হয়েছে।[২০] মহাবংশের বিবরণ অনুসারে সিংহপুরের অবস্থিতি রাঢ়ের পার্বত্যময় অঞ্চলে হওয়াই সম্ভবপর। অতীতে বর্ধমান, বীরভুম ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্ন-আধিকারিক কর্তৃক শুশুনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে হস্তী, অশ্ব, মহিষ, গবাদি পশু, হরিণ, সিংহ, হায়না, প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে।[২১] ১৭শ-১৮শ শতকেও এতদঞ্চলের গভীর অরণ্যে হিংস্র জীবজন্তু ও হস্তীকুল নির্ভয়ে বিচরণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিপুরুষ সিংহ হতে সিংহবাহু এবং এই সিংহবাহুর রাজধানী গভীর অরণ্যের মধ্যে হওয়াই সঙ্গত। এছাড়া বর্ধমানের পশ্চিমে সিংহভূমি -> সিংভুম জনপদ বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। মহাবংশে উল্লেখিত কলিঙ্গ হতে মগধ যাওয়ার পথে অরণ্যটি এতদঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং সিংহভুম ও সিঙ্গারণ নামগুলি যে সিংহ সম্পর্কিত তা সহজেই অনুমান করা চলে। ডঃ মজুমদার পরিবেশ সম্পর্কে বিচার না করে ডঃ হাণ্টারের বিবরণের উপর নির্ভর করায় এরূপ বিভ্রান্তি হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সিংহবাহু তাঁর পিতা সিংহকে নিহত করে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে উত্তর কলিঙ্গ রাজ্য স্থাপন করেন, যার রাজধানী ছিল সিংহপুর। তিনিও অনুমান করেছেন যে উত্তর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম। কিন্তু উভয় প্রথিতযশা পণ্ডিত সিহপুর ও সিঙ্গুরকে এক ও অভিন্ন ধরে ক্ষান্ত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহাবংশ রচনার সময়ে সরস্বতী ও গঙ্গার প্রবল জলরাশি বাহিত খাতের মধ্যবর্তী অংশ কি রাঢ় অঞ্চলভুক্ত হতে পারে? অপরদিকে আচারঙ্গ সূত্র হতে রাঢ়

জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় যে, ২৪তম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর, দুর্গম, বিপদ-সঙ্কুল, বালুকা ও লোষ্ট্রাদি পূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন।

৫ম-৬ষ্ঠ শতকে রচিত কালিদাসের রঘুবংশে ও দ্বাদশ শতকে ধোয়ীর 'পবন দূতে', এতদঞ্চল সুহ্মদেশ নামে পরিচিত ছিল। বৃহদর্থে সুহ্ম ও রাঢ় এক ও অভিন্ন হলেও মহাবংশে উল্লেখিত রাঢ় জনপদের ভৌগোলিক ইঙ্গিত কিন্তু সিঙ্গুরের প্রতিকূলে। সিংহ অধ্যুষিত অরণ্য, সিংহের গুহা, কলিঙ্গ-রাঢ়-মগধ যাত্রার পথ প্রভৃতি হতে অনুমান করা যেতে পারে যে, সিংহবাহুর রাজধানী ছিল বর্ধমানের পশ্চিম, মানভুম বা সাঁওতাল পরগণার কোন একটি স্থানে। তাছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল যে রাঢ় জনপদের অন্তর্গত ছিল তার প্রমাণ একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি রচনার পূর্বে পাওয়া যায় না।

'সিংহ' সম্ভবতঃ পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে কোন আদিম অধিবাসী গোষ্ঠীর টোটেম ছিল এবং ঐ আদিম গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের কলিঙ্গরাজ দুহিতাকে বলপূর্বক গ্রহণ করে। এ কাজের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সিংহবাহু কর্তৃক তাঁর পিতা নিহত হন, যিনি মাতৃকুল অপেক্ষা হীন ছিলেন। এরূপ কার্যের সমর্থন মহাভারতে দুর্যোধন কর্তৃক গান্ধাররাজ সুবলের নিধনকাহিনী হতে পাওয়া যায়। মহাবংশে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নিহিত থাকলে এর সময় ছিল খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। কারণ বিজয়সিংহ যে দিন লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন ঐদিন ভগবান বুদ্ধ কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ ঐ ঘটনা ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব ৫৪৪ অব্দে।[২২]

(৩)

মহাবংশে উল্লেখিত কাহিনী ব্যতীত জাতক কাহিনী অবলম্বনে অপর এক প্রাচীন তথ্যে রাঢ় তথা বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। উক্ত জাতক কাহিনী 'বেস্সন্তর' জাতক (নং ৫৪৭) নামে প্রসিদ্ধ। বেস্সন্তর জাতকে বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে শিবিরাজ্যের জেতুত্তর নগরে শিবিরাজ রাজত্ব করতেন। তিনি সঞ্জয় কুমার নামক পুত্র এবং প্রত্যয় নামে সর্বসুলক্ষণযুক্ত শ্বেতহস্তী দৈবযোগে লাভ করেন। সঞ্জয় কুমারের বিশ্বম্ভর নামে সতত দানক্রিয়াশীল পুত্র জন্মে। একদা কলিঙ্গরাজ্যে দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে কলিঙ্গরাজ্যের প্রজাবৃন্দ রাজার অনুমতি নিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণসহ শিবিরাজ্যে উপনীত হয়ে রাজপুত্র বিশ্বম্ভরের নিকট সর্বমঙ্গলপ্রদ শ্বেতহস্তীটি যাচঞা করেন। রাজপুত্র মঙ্গললক্ষণযুক্ত শ্বেতহস্তীটি কলিঙ্গের প্রজাগণকে দান করায় শিবিরাজ্যের রাজধানী জেতুত্তর নগরে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। প্রজাবর্গের বৈরীভাব উপশমের নিমিত্ত শিবিরাজ সঞ্জয় কুমার, রাজপুত্র বিশ্বম্ভরকে বঙ্কগিরিতে নির্বাসন দিতে বাধ্য হন। জেতুত্তর নগরে নাগরিকবৃন্দের মধ্যে উগ্র রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ আছে। শিবিরাজ্য

ও জেতুত্তর নগরের অবস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মত পার্থক্য আছে। তবে জাতক বর্ণিত শিবিরাজ্যের অবস্থিতি ছিল কলিঙ্গরাজ্যের সন্নিকটে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত।

ডঃ বিমলাচরণ লাহার মতে চেতরাষ্ট্র হ'তে জেতুত্তর নগরীর দূরত্ব ছিল ৩০ যোজন।[২৩] চেত বা চেদী রাষ্ট্রের অবস্থিতি ছিল বর্তমান বুন্দেলখণ্ডে এবং এই স্থান হতে শিবিরাজ্যের দূরত্ব ৫০ যোজন অপেক্ষা অধিক। ঋগ্বেদে (৭। ১৮। ৭) আছে সিন্ধু ও অসিক্নি (চন্দ্রভাগা) নদীর মধ্যবর্তী স্থানে শিবি জনপদ।[২৪] স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে শিবি জনপদের রাজধানী জেতুত্তরের অবস্থিতি বর্তমান চিতোর হতে ১১ মাইল উত্তরে নাগোর বা নাগরীতে।[২৫] মহাভারতে শিবিরাজ (বন ১৩০ অঃ) উশীনরের রাজ্য ছিল সুবাস্তু নদীর তীরে।[২৬] বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যে শিবি বা শিবিকা জনপদে চোল রাজারা রাজত্ব করতেন।[২৭] লাহোর অঞ্চলে বসবাসকারী শিবিগোষ্ঠী কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে চেত বা চেদীরা বুন্দেলখণ্ডে আদি বসবাস করলেও কালক্রমে তারাও অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করেন। কলিঙ্গ-রাজ খারবেল ছিলেন চেদ। বংশোদ্ভূত 'ঐল ক্ষত্রিয়'।[২৮] চেদীরা মধ্যভারতের কোশাম্বী অঞ্চলকে ঘিরে প্রথমে বসবাস করেলও পরবর্তীকালে বৈশালী ও সর্বশেষে কলিঙ্গ-রাজ্যে (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ ও উড়িষ্যার অধিকাংশ) প্রভাব বিস্তার করে।

শিবি ও চেত বা চেদী জনপদ কলিঙ্গরাজ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বেসান্তর জাতকের ৩২৯ নং গাথায় বিশেষ কয়েকটি বৃক্ষের উল্লেখ আছে, যথা অশ্বকর্ণ ধব, শাল, খদির, পলাশ প্রভৃতি। ধব গাছকে উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে ধও গাছ বলে।[২৯] আলোচ্য বৃক্ষরাজি রাজস্থানে বা পাঞ্জাবে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় প্রচুর জন্মে।

শিবিগোষ্ঠীও প্রথমে সিন্ধু-চন্দ্রভাগা-সুবাস্তু নদী অববাহিকায় বসতি স্থাপন করলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থান ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলেও শিবিদের বসবাসের ইঙ্গিত মেলে বৈদিক সাহিত্যে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, শিবি উশীনর কুরু-পাঞ্চল অঞ্চলে রাজত্ব করত, যা মধ্যদেশ হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩০] পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৭। ১২। ৬) আছে—'বাহ্লিক হতে শুনকর্ণের উৎপত্তি' এবং বৌধায়নের মতে 'বাহ্লিক, শিবি হতে জাত'।[৩১] খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত চেদী গোষ্ঠী যেরূপে পূর্ব ভারতের কলিঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়েছিল, অনুরূপভাবে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, শিবি গোষ্ঠীর একটি শাখাও পূর্ব ভারতে চলে এসেছিল।

টলেমীর মানচিত্রে সিব্রিয়াম (Sibrium) বা শিবিপুরী নামক স্থানের উল্লেখ

আছে[৩২] এবং ঐ স্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ও বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ডঃ অতুল সুরের মতে—"বেস্সন্তর জাতকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধযুগে শিবি ও চেত নামক দুটি জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। "বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে শিবিরাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্ধমান মঙ্গলকোটের নিকটে ও টলেমী—উল্লেখিত সিব্রিয়াম বা শিবপুরী)" এবং এর দক্ষিণে ছিল চেতরাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেত নগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চেতুয়া পরগণা বলে অনুমান করা যেতে পারে)। এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ বিষয়ে বেস্সন্তর জাতকের পথ নির্দেশ খুব স্পষ্ট, শিবিরাজ্য পেরিয়ে চেতরাজ্য এবং চেতরাজ্যের সীমায় কলিঙ্গরাজ্য। সুতরাং ক্যানিংহামের উল্লেখিত শিবি জনপদ ও আলবেরুনী বর্ণিত জেতুত্তর বা যত্তরো নগরী ব্যতীত ভারতবর্ষে উক্ত স্থাননামে উল্লেখিত আরও জনপদ ছিল। ডঃ বিমলাচরণ লাহা, জেতুত্তর ও চেদী জনপদের ভৌগোলিক দূরত্ব নির্দেশ করেছেন; কিন্তু তাঁর আলোচনায় কলিঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও পথ নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কলিঙ্গ জনপদের অবস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া জাতক বর্ণিত কাহিনীর সময় হতে আলবেরুনীর সময়ের দূরত্বও অত্যধিক এবং পূর্বভারতের ভৌগোলিক ধারণা সম্পর্কে আলবেরুনীর জ্ঞানও সীমিত।

আলোচ্য জাতক কাহিনীতে শিবিরাজ্যের প্রজাবর্গের স্পষ্ট উল্লেখ কয়েকস্থানে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে—

'উগগা চ রাজপুত্তা চ বেসিয়ানা চ ব্রাহ্মণা
হত্যারোহা অনিক কট্টা রথিকা পট্টি কারিকা
কেবলো চাপি নিগমো শিবয়ো চ পি সমাগতা।'[৩৩]

বঙ্গানুবাদ— 'উগ্র রাজপুত্র—বৈশ্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
বোধগণ যত—গজমাদি দেহরক্ষী—
রথি-পদাতিক—সর্ব্ব জনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।'[৩৪]

বৈশ্য ও ব্রাহ্মণগণের বনবাস বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করলেও বর্ধমান জেলা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান বাসস্থান ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ৫৬খানি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গাঁঞীর মধ্যে ২৪টি জিলা বর্ধমান জেলায় ছিল।[৩৫] কিন্তু উগ্‌গ্‌ বা উগ্র শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টিকাকার উল্লেখ করেছেন—'উগ্‌গতা পঞ্ঞ ঞাতা'। কাওয়েল-এর মতে উগ্‌গ শব্দটি উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সমার্থক। কাওয়েলের ব্যাখ্যায়[৩৬] পাওয়া যায়—'**Ugga a mixed caste, by a kshatriya father from a Sudra mother. The Scholiast however, explains the word by uggata pannata as though from uggacchati.**'

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বাসস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে সারা ভারতের মধ্যে এই জাতির প্রধান বাসস্থান বর্ধমান জেলায়। অবশ্য বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলাতেও এদের বসবাস আছে। কিন্তু বর্ধমান জেলায় অপরাপর যে কোন জাতি অপেক্ষা উগ্রক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য আছে এবং সমগ্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এই জেলায় শতকরা ৭৭ জন বসবাস করে, প্রকারান্তরে এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা কৃষ্টি কেবলমাত্র এই জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ ও মগধকে সনাক্ত করা গেলেও চের জাতির সন্ধানের জন্য পণ্ডিতেরা দক্ষিণ ভারতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বিহারের পালামৌ জেলায় আজও 'চেরো' নামক এক উপজাতি গোষ্ঠী তাদের পৃথক সত্তা নিয়ে টিকে আছে। অনুরূপভাবে উগ্‌গ রাজপুত্রগণ যাঁরা শিবিরাজ্যের শাসনকার্যে প্রধান অংশভোগী ছিলেন, তাঁদেরই উত্তরপুরুষ উগ্রক্ষত্রিয় নামে এই জেলায় আজও প্রভাবশালী গোষ্ঠী রূপে খ্যাত।

শিবিরাজ ও ধর্মরাজ প্রসঙ্গে ডাঃ অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর মতে[৩৭]—"স্বীয় অসামান্য আধ্যাত্মিক দানের জন্য শিবিরাজা সম্ভবতঃ ধর্মরাজা নামে খ্যাত হয়েছিলেন। গৌতমবুদ্ধ শিবিরাজাকে বোধিসত্ত্বরূপে (বেসসন্তর) আত্মস্যাৎ করে সেই সূত্রে তদীয় লোকপ্রিয় ধর্মরাজ নামও পেয়ে থাকবেন।" তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—"এরূপ অনুমাণের কারণ এই যে, শিবিরাজ্যের রাঢ়ভূমি ব্যতীত ধর্মরাজ পূজা এত ব্যাপক প্রচলন বৌদ্ধ জগতের ও আমাদের দেশে আর কোথায় আছে বলে জানা যায় না।" ডাঃ চৌধুরী বেস্‌সন্তর জাতক বর্ণিত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য দীর্ঘকাল পদব্রজে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা পরিভ্রমণ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবে মন্তব্য করেছেন যে বর্তমান মঙ্গলকোটই (২৩° ৩৬′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭° ৫৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) জাতক বর্ণিত প্রাচীন জেতুত্তর নগরী।[৩৮] জনপদ কল্যাণী সূত্রে শ্বেতক ও দেশক নামক নগরদ্বয়ের উল্লেখ আছে। তবে কি মঙ্গলকোটের শ্বেতরাজার কাহিনীর মূলে শ্বেতক নগরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল? ডঃ সুর ও ডাঃ চৌধুরী জাতক অবলম্বনে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, ঐ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে, অন্যথায় ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি থেকে যাবে।

(৪)

ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভিক পর্বে বর্ধমান জনপদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐ যুগে রাঢ় বা সুহ্মের ইতিহাসও অস্পষ্ট। কিন্তু রাঢ়ের মধ্যে—ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্বে বর্ধমানের ইতিহাসের উপাদান রাঢ়ের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে। তাছাড়া এই জনপদের বিস্তৃতি সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদিও অনুপস্থিত। তবে অনুমান করতে বাধা নাই যে, বর্ধমানের ইতিহাসই রাঢ়ের আংশিক ইতিহাসের উপাদান।

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় বর্ধমান মহাবীর ও বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের

নিমিত্ত রাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন। সংযুক্ত নিকায় নামক পালিগ্রন্থে উল্লেখিত ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গ-রাঢ়-সুহ্ম জনপদের নাম নাই। কিন্তু অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থে বর্ণিত 'বনস' জনপদকে বঙ্গ অনুমান করা হয়েছে। জৈন ভগবতী সূত্রে বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্মোত্তর জনপদের উল্লেখ আছে। আচারাঙ্গ সূত্রে (১।৮।৩) পাওয়া কম যায়, সুহ্মদেশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে মগধরাজ বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু সমগ্র উত্তরাপথ জয় করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গের প্রাচীন অংশ রাঢ়অঞ্চল যে মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে অঙ্গ-রাজ্য মহাপ্রতাপশালী মগধরাজ্যের অধীনস্থ হওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাঢ় অঞ্চল স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে নাই। সম্ভবতঃ রাঢ়অঞ্চল পূর্বেই মগধের অধীনে ছিল এবং সেই কারণে বিজয় অভিযানে রাঢ়ের উল্লেখ নাই এবং পার্শ্ববর্তী দেশকে স্বীয় অধীনস্থ না করে বিম্বিসার যে সুদূর পঞ্চনদ অভিযানে অগ্রসর হন নাই এ কথা অনুমান করা সঙ্গত কারণ আছে।

শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা কালাশোক কাকবর্ণ বা কাল অবর্ণকে হত্যা করে খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে মহাপদ্মনন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাপদ্মনন্দ সম্পর্কে পুরাণ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও গ্রীক বিবরণীতে বিশেষ মতপার্থক্য আছে। কার্টিয়াসের (Curtius) মতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ) মগধের সিংহাসনের যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি নন্দ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র এবং তাঁর অধীনস্থ রাজ্য ছিল প্রাসই ও গঙ্গারিডি। নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা জাতিতে নাপিত এবং রাজমহিষীর (শিশুনাগ রাজার মহিষী) অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে[৩৯] বর্ণিত আছে—"শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নগরের উপকণ্ঠেই তরবারির আঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হয়ে নিহত হন।" বিষ্ণু-পুরাণে (৪।২৪।৪) পাওয়া যায় যে, শিশুনাগ বংশীয় শেষ রাজার মহানন্দীর শূদ্রা গর্ভজাত অতিলোভী পুত্র মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ প্রাপ্ত হবে।[৪০] পুরাণ বর্ণিত মহাপদ্ম ও মহাবোধিবংশে উল্লেখিত উগ্রসেন একই ব্যক্তি। মুদ্রারাক্ষসের (৪র্থ অঙ্ক) মতে তিনি উচ্চবংশ সম্ভূত।

কার্টিয়াসের বিবরণে জনা যায় যে মগধের (আলেকজাণ্ডারের সময়) 'বর্তমান রাজা' Agrammes. তিনি প্রাসই ও গঙ্গারিডি জনপদের অধীশ্বর। ঐ বিবরণীতে সৈন্যবল সম্বন্ধে বর্ণিত[৪১] আছে—"তাঁর সৈন্য বাহিনীতে ২0000 অশ্বারোহী, ২,00,000 পদাতিক, ২,000 চার ঘোড়া বাহিত রথ এবং এই সৈন্যবাহিনীকে অজেয় করেছিল ৩,000 রণহস্তী।" উগ্রসেন বা মহাপদ্মনন্দ বিহার রাজ্যের গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চল হতে ভাগীরথীর পশ্চিমভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। মহাপদ্মনন্দের বাসভূমি সম্পর্কে ডঃ ডি. সি. সরকার মন্তব্য[৪২] করেছেন—"বিদেশীয় বিবরণ থেকে সন্দেহ জন্মে যে মহানন্দ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অধিবাসী।" তাহলে সঙ্গত

কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, মগধ ও অঙ্গ জনপদের সংগে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে যুক্ত নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, মহাপদ্মের সময় গঙ্গারাষ্ট্র সম্ভবতঃ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল।[৪৩]

নন্দবংশ প্রায় ১০০ বছর রাজত্ব করার পর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরেই এই বংশের শেষরাজা ধননন্দকে হত্যা করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিপুল ধনসম্পদসহ মগধের সিংহাসন লাভ করেন এবং মন্ত্রী কৌটিল্যের সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ—৪।২৪।৭)। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাথিগুম্ফা লিপিতে জানা যায় যে, নন্দরাজ কলিঙ্গ জয় করেন অর্থাৎ মগধের অধীশ্বর, অঙ্গ, রাঢ় জয় করে তৎপরে কলিঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। চন্দ্রগুপ্তকে পূর্বাঞ্চল জয়ের জন্য বিজয়াভিযান করতে হয় নাই, তিনি নন্দরাজ কর্তৃক অধিকৃত জনপদ সহজেই লাভ করেছিলেন।[৪৪] মঙ্গলকোট ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে মৌর্যযুগের বিবিধ প্রত্নবস্তুসহ পাঞ্চমার্ক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাস্থানগড়লিপি ও মেগাস্থিনিসের বিবরণ হতে মোটামুটিভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে উত্তরবঙ্গ রাঢ় ও মগধ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৫]

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার ও বিন্দুসারের পুত্র অশোক মগধের সিংহাসন লাভ করেন। পিতামহের ন্যায় অশোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। অশোকের কোন শিলালিপি বা সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্যে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলকে মগধ সাম্রাজ্যভুক্তির জন্য কোন সামরিক অভিযানের বিবরণ অনুপস্থিত থাকায় মনে করা যেতে পারে যে, অশোককে রাঢ়অঞ্চল জয় করতে হয় নাই; ইতিমধ্যেই এতদঞ্চল মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনীতে কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত জনপদে অশোকরাজা কর্তৃক নির্মিত বহু স্তূপ ও বিহারের উল্লেখ আছে।[৪৬]

কলিঙ্গ অভিযানের সময় রাঢ়ের পথেই মগধ সৈন্য তোসলী (ভুবনেশ্বর হতে ১১ কিঃমিঃ দক্ষিণে বর্তমান ধৌলী) অধিকার করে কলিঙ্গ রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ঐ সময়ে এক সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ও দেড় লক্ষ যুদ্ধবন্দীর গমনাগমনের নিমিত্ত সুপ্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন ছিল। পাটলিপুত্র হ'তে সোজা দক্ষিণমুখী পার্বত্য অঞ্চল ও মহাকান্তার অতিক্রম করে ঐ বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীর পাটলিপুত্র যাওয়া সহজ ছিল না। সম্ভবতঃ এই পথটি কটক হতে খিচিং এবং তারপর রাইরঙ্গপুর ও বাহালদা পেরিয়ে সুবর্ণরেখা উপত্যকায় পেঁছে কোন স্থানে তাম্রলিপ্ত-পাটলিপুত্রের পথের সঙ্গে মিলিত হত। ফা হিয়ানের[৪৭] বিবরণ হতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র হতে চম্পা এবং তারপর গঙ্গার দক্ষিণ তীরের সন্নিকটবর্তী সড়ক পথ ধরে অর্থাৎ রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরে পেঁছান যেত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পাটলিপুত্র হতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে এক সপ্তাহে বোধিবৃক্ষ তাম্রলিপ্ত বন্দরে পেঁছায় সিংহল-

দ্বীপে প্রেরণের উদ্দেশ্যে।[৪৮] উপরোক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, সমগ্র রাঢ় জনপদ অশোকের অধিকারভুক্ত ছিল।

মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যার পর তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ পাটলিপুত্র অধিকার করে শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯] পুষ্যমিত্র অথবা অগ্নিমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রাঢ় অঞ্চল জয় করেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবির চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের সভ্যতা খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতকে বহিঃআক্রমণের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। সম্ভবতঃ বহিঃশত্রু রূপে মগধরাজকেই চিহ্নিত করা যায়। হয়ত, অগ্নিমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বাধা দিয়েছিল। কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী শুঙ্গ-রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায়, এই সভ্যতাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবির ৩০ কিঃ মিঃ পূর্বে মঙ্গলকোটে শুঙ্গ ও কুষাণ আমলের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫০] খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেল রাঢ় জনপদকে স্বীয় অধীনে রেখে মগধের শুঙ্গ শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে খারবেল ছিলেন পূর্বভারতের অধিপতি।[৫১]

শুঙ্গবংশের পর কাণ্ববংশ মগধে রাজত্ব করেন; কিন্তু এই বংশের রাজাদের সঙ্গে রাঢ় জনপদ সম্পর্কিত কোন ঐতিহাসিক বিবরণ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একেবারেই অনুপস্থিত। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে চীনীয় তুর্কীস্থান হতে বিতাড়িত হয়ে কুষাণগণ আফগানিস্থান (গান্ধার) ও কাশ্মীর অধিকার করে পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। সম্ভবতঃ কণিষ্কের সময়ে পাটলিপুত্র কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাঢ় অঞ্চল সহ বাংলাদেশের বহুস্থানে কুষাণযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে বাংলাদেশে কুষাণ অধিকার প্রসারিত হয়েছিল এবং কুষাণ রীতিতে নির্মিত বহুমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫২] অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের রচিত **Periplus Maris Erythraei** নামক গ্রন্থে কলটিস (**caltis**) নামক স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে।[৫৩] বিদেশী বণিকগণ যে স্বর্ণমুদ্রা দেখেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে কুষাণ, মুদ্রা, কারণ উত্তর ভারতে ঐ সময়ে কণিষ্কের রাজত্বকাল।

(৫)

খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতকে গুপ্তবংশীয় রাজারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের উদ্ভব স্থান নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এই বংশের শ্রীগুপ্ত, প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়ে কালক্রমে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। ডঃ ডি. সি. গাঙ্গুলীর মতে গুপ্ত রাজাদের আদিবাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা, মগধে নহে।[৫৪] চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের বিবরণ হতে জানা যায় যে, তিনি মহারাজা শ্রীগুপ্ত কর্তৃক চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য নির্মিত

বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছেন।[৫৫] নালন্দা হতে ৪০ যোজন পূর্বে মি-লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-লো বা মৃগস্থাপন বিহারের (মতান্তরে মৃগ শিখাবন) অবস্থিতি ছিল।

অষ্টম-নবম শতকে রচিত মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, লোক নামক নৃপতি পরম সৌন্দর্যময় বর্ধমান নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বংশ গৌড় রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়েছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প হতে আরও জানা যায়—

"আদ্যম্ নৃপবরম বক্ষ্যে গৌড়ানাম বংশজ ভুবি
জাতাসৌ নগরম্ রম্যে বর্দ্ধমানে যশস্বিনঃ
লোকাখ্য নাম সৌরাজা ভবতি গৌড় বর্দ্ধন।
মধ্যকালে সমাস্বাসা মধ্যমা মধ্য ধর্ম্মিনঃ
অন্তমেব যুগে যুগে নৃপেন্দ্র শ্রীণু তত্ত্বতঃ
সমুদ্রাখ্য নৃপশ্চৈব বিক্রম-শ্চৈব কৃত্তিতঃ
মহেন্দ্র নৃপবরম্ মুখ্য-সকারাখ্যো মতঃ পরৎ।" (শ্লোক ৬৩৬—৪২)

ডঃ কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলীর মতে সমুদ্রাক্ষ্য=সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম=বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, মহেন্দ্র=কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য ও সকরাখ্য=স্কন্দগুপ্ত ধরা যেতে পারে। কে পি জয়সওয়ালও এই মতের সমর্থক।[৫৬] শশাঙ্ক (সোমাখ্য), রাজ্যবর্দ্ধন (রকারাক্ষ্য) ও হর্ষবর্ধনের (হকারাখ্য) উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৫৭] তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, গুপ্তরাজাদের প্রথম পর্বের উৎপত্তি স্থল বর্দ্ধমানে এবং রাঢ় ও উত্তরবঙ্গ তাঁদের রাজ্যভুক্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাটলিপুত্র হতে এক বৃহত্তর ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত তথ্য না মানলেও, কোন নূতন পথ নির্দেশ করতে পারেন নাই। বিষয়টি সমালোচিত হয়েছে মাত্র।[৫৮]

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাঢ়-বঙ্গ অধিকারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দিল্লীতে কুতুবমিনারের অনতিদূরে মেহরুলি লৌহস্তম্ভে খোদিতলিপি হতে জানা যায় যে, রাজা চন্দ্র, বঙ্গরাজ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৫৯] লৌহস্তম্ভে উল্লেখিত চন্দ্র যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হয়, তাহলে অনুমান করা যায় যে, সেই সময় বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। কারণ সমুদ্রগুপ্তকে এই দেশ জয় করতে হয়েছিল।[৬০] ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে বিদ্রোহ দমনের জন্যে সমুদ্রগুপ্তের এই অভিযান ছিল।[৬১] হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লেখিত আছে যে দিগ্বিজয়কালে তিনি চন্দ্রবর্মা নামক এক নৃপতিকে পরাস্ত করেন। আবার পরের শ্লোকে আছে—সমতট, ডবাক ও কামরূপ ছিল বিজিত সীমান্ত-রাজ্য।[৬২] অতএব রাঢ় অঞ্চল পূর্বেই বিজিত হয়েছিল, একথা অনুমান করা যেতে পারে।

বাঁকুড়া শহর হতে ১৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও রানিগঞ্জ হতে ২৫ কিলো-

মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে শুশুনিয়া নামক পাহাড়ের গহ্বরে পুষ্করণাধিপতি মহারাজ চন্দ্রবর্মার শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। জনশ্রুতি যে, এই স্থানে বিরূপাক্ষ ঋষির আশ্রম ছিল। পাহাড়ে প্রাচীন গুহা ও যমধারা নামক প্রস্রবণের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং বৈশাখ মাসে বারুনী উৎসবের সময় প্রস্রবনে স্নানের নিমিত্ত জনসমাবেশ হয়। খোদিতলিপি আজও দেখা যায়, তবে ভক্তির আতিশয্যে সিন্দুর লিপ্ত হয়ে যা অবস্থা হয়েছে, তাতে খুবই কষ্ট স্বীকার করে লিপিটি পাঠ করা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু লিপিটি পাঠোদ্ধার করে, প্রকাশ করেন। যথা—

'চক্র স্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতি সৃষ্টঃ
পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মনঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মনঃ কৃতি।'

অনুবাদ ঃ চক্রস্বামীর দাসগণের প্রধান কর্তৃক উৎসৃষ্ট হল। পুষ্করণের অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মার (সিদ্ধবর্মা ?) পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মার অনুষ্ঠান।[৬৩]

লিপিটি গুপ্তযুগের সমকালীন বা তৎপূর্বের, এই লিপির সঙ্গে মেহরৌলী লিপির সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ আছে। গিরিলিপিতে উল্লেখিত পুষ্করণাকে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার বর্তমান পোখন্নার সঙ্গে এক ও অভিন্ন মনে করা হয়। পোখন্নার অবস্থিতি হল দুর্গাপুর হতে ১০ কিলো মিটার দূরে দামোদরের দক্ষিণ তীরে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমুদ্রগুপ্তের রাঢ় বিজয়ের পূর্বে প্রায় সমগ্র রাঢ় জনপদ চন্দ্রবর্মার অধীনস্থ ছিল। ষষ্ঠ শতকে সমাচারদেবের ঘুঘরহাটী শাসনে চন্দ্রবর্মকোট (কোটালিপাড়া, জেলা ফরিদপুর) নামক দুর্গের উল্লেখ আছে।[৬৪] মনে হয় পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার রাজত্ব পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চল হতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর নামানুসারে উক্ত স্থানের নামকরণ করা হয়েছিল।[৬৫] কারণ ঐ সময়ে বা তৎপূর্বে চন্দ্রবর্মা নামে অপর কোন নৃপতির সন্ধান জানা যায় না। আবার অনেকে পুষ্করণাকে রাজস্থানের পুষ্করের সমার্থ করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে উক্ত মত গৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ বর্ধমান জেলাস্থ সমুদ্রগড় ও সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন ;[৬৬] কিন্তু কেবলমাত্র নামের মিল নিয়ে ইতিহাসচর্চা করা অবাস্তব। অপরপক্ষে মঙ্গলকোট উৎখননের সময় গুপ্তযুগের যে স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার প্রকৃত কাল নির্ধারণ করতে পারলে রাঢ় অঞ্চলে গুপ্ত আধিপত্যের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভবপর।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের সময়ে রাঢ় অভিযানের কোন বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি সমদ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যই শাসন করেছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে (১২৪ গুপ্তাব্দ = ৪৪৪ খ্রীস্টাব্দ) দামোদরপুর তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির[৬৭] উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ বর্ধমানভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে বিভক্ত ছিল। কুমারগুপ্তের আমলে কোন তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উল্লেখের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়

যে, গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলটি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। বৈন্যগুপ্তের আমলের তাম্রশাসন হতে এই অনুমানের সমর্থন মিলছে। কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত, পুরুগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, বৈন্যগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজাগণ উভয়ভুক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে এ বিষয়ে কিছু সমর্থন মিলছে। বৈণ্যগুপ্তের বঙ্গদেশের রাজ্যসীমা পশ্চিমে বর্ধমান হতে পূর্বে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৬৮] কিন্তু অল্পকালের মধ্যে গৌড়-বঙ্গের স্থানীয় শাসকেরা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে গুপ্ত সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পৃথক স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ইতিহাসে প্রমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রাথমিক উপাদান হল মুদ্রা ও শাসনলিপি। বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলে গুপ্তযুগের কোন শাসনলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর না হলেও রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত মুদ্রা হতে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, গুপ্ত আধিপত্য এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল।[৬৯] গুপ্তযুগে মুদ্রামান ছিল সোনার এবং এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা উৎপাদনের জন্য সমসাময়িক এক কবি রূপকার্থে স্বর্ণবৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭০] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালায় রক্ষিত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাটি বর্ধমান জেলার মশাগ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে।[৭১] হুগলীর নিকটে, বর্ধমান জেলার চকদীঘি ও বহরমপুর গ্রামে (থানা কাটোয়া) সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। জানা যায় চকদীঘিতে প্রাপ্ত ১১৭ গ্রেণ ওজনের মুদ্রাটি লর্ড কারমাইকেলের তত্ত্বাবধানে ছিল।[৭২] এছাড়া মাধবপুর (হুগলী জেলা) কালিঘাট, তমলুক ও মহানাদে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৭৩] ময়ূর ও দেবীমূর্তি খোদিত প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রাটি বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত হয়।[৭৪] হুগলী জেলার হামান গ্রামে (থানা দাদপুর, চুঁচুড়া হতে ২০ কিলোমিটার) প্রাপ্ত ১১টি মুদ্রার মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায়—'দেব শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত' এর পরিবর্তে ধুতি, পোষাক ও ধনুকসহ 'চন্দ্র' নামাঙ্কিত খোদিতলিপি আছে এবং ঐ মুদ্রার বিপরীত দিকে পদ্মাসনে লক্ষ্মী ও 'শ্রীবিক্রম' শব্দ খোদিত।[৭৫] এছাড়া প্রথম কুমারগুপ্ত (অর্জিতমহেন্দ্রঃ), নরসিংহগুপ্ত বা প্রথম বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও সমাচারদেবের মুদ্রা হাসান গ্রামে পাওয়া গেছে। বেলরুই গ্রামে (জেলা বর্ধমান) বলরাম রায় কর্তৃক সংগৃহীত মিনান্দরের মুদ্রা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।[৭৬] এই সংগ্রহের মধ্যে আলেকজাণ্ডার, স্কন্দগুপ্ত, ২য় কুমার গুপ্তের মুদ্রাগুলিও উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকোটে তক্ষশীলার ধাঁচে নির্মিত তিন শ্রেণীর তাম্রমুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়।[৭৭] সম্ভবতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এ সকল মুদ্রার প্রচলন ছিল।

রাঢ়-বঙ্গে আবিষ্কৃত গুপ্ত-মুদ্রা, রঘুবংশ, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিও শাসনলিপিগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে, রাঢ় জনপদ দীর্ঘকাল গুপ্ত রাজাদের অধীনস্থ ছিল এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে গোপচন্দ্র রাঢ় জনপদে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

পাদটীকা ঃ

১। *The Bharat War and Puranic Geneologies*—Ed. D. C. Sircar. p. 9.

২। মহাভারত—আদিপর্ব ১০৩ / ৫১-৫৩।

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম প্রথিতা ভুবি ॥
অঙ্গস্যাঙ্গোঽভবদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।
কলিঙ্গ বিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ ॥
পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রাঃ প্রখ্যাতাঃ সুহ্মাঃ সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ।
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতঃ পরমর্ষিজঃ ॥

৩। *History of Ancient Bengal*—Dr. R. C. Majumder, p. 29.

৪। অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥
কিন্তু জুলিয়াস জলি, রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ ও অধ্যাপক জি, বুলারের সম্পাদিত মনুসংহিতায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। সে কারণে অনুমান করা যায় যে, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। মেধাতিথি ভাষ্যেও এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

৫। *History of Dharmasastra*—P. V. Kane, Vol. I, p-21.

৬। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭-২৯।

৭। ঐ পৃঃ ৬২৭-২৯।

৮। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক (পুস্তক বিপণি সংস্করণ), পৃঃ ১৮।

৯। *The Travel of a Hindoo-Bholanath Chunder*, Vol. I, p. 158.

১০। বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি—দেবকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ২০।

১১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, পৃঃ ২৭০।

১২। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৫।

১৩। *Mahavamsa*—Wilhelm Geiger (Eng. Tr.), p. 51.

১৪। *Ibid.* p. 53.

১৫। *Ibid.* p. 53.

১৬। *Ibid.* p. 54.
The prince named Vijaya, the Valient, landed in Lanka, in the region called Tambapanni on the day that the Tathagata

lay down between the two twin like sala—trees to pass into Nibbana.

১৭। *Ibid.* p. 62.

১৮। *History of Bengal*, Vol. I, Ed. R. C. Majumdar, p. 39 ; *History of Ancient Bengal*, p. 31.

১৯। *Statistical Account of Bengal*, Vol. III, W. W. Hunter, p. 307.

২০। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩২২ সাল, পৃ: ৩-১১।

২১। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা—পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃ: ৫২।

২২। *History of Bengal*, Vol. I, p. 39.

২৩। *Historical Geography of Ancient India*—B. C. Law, p. 55.

২৪। *Vedic Index*, Vol. I, p. 47 ; Vol. II, p. 382.

২৫। *Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. VI, p. 196.

২৬। *Ancient Indian Historical Tradition*—F. E. Pargiter, p. 264.

২৭। *Indological Studies*—B. C. Law, Vol. I, p. 20-22.

২৮। *History of Orissa*—R. D. Banerjee, Vol. I, p. 72 ; *Political History of Ancient India*—H. C. Roychaudhury, p. 370.

২৯। জাতক—ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৭৫।

৩০। *Vedic Index—Macdonell & Keith.* Vol. I, p. 103.

৩১। *Pancha Vimsa Brahmana*—W. Cland, p. 468 ; *Vedic Index*, Vol. II, p. 67.

৩২। *The Classical Accounts of India*, See Plate No.—3.

৩৩। *The Jatak*—V. Fousball, Vol. VI, p. 492.

৩৪। জাতক—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৪৩।

৩৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃ: ১১৯-১৫।

৩৬। *The Jatak*—E. B. Cowell, Vol. VI, p. 254.

৩৭। রাঢ়ভূমির সংস্কৃতি—অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, পৃ: ৩১।

৩৮। *Sibi King Vessantara his country & cultural Heritage*—Dr. A. K. Chaudhuri, p. 38-41 & Plate No. 4.

৩৯। হর্ষচরিত—৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

৪০। *Political History of Ancient India*—p. 204.

৪১। *The Classical Accounts of India*—R. C. Majumdar, p. 128.

৪২। পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত—ড: দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃ: ৭৪।

৪৩। বঙ্গদেশের ইতিহাস—ড: সুশীল মণ্ডল—পৃ: ৩২।

৪৪। ঐ পৃ: ৩২।

৪৫। *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, P. 83.
৪৬। *On Yuan Chwang's Travells in India*—Thomas Watters, Vol. II p. 190-1.
৪৭। *Buddhist Records of the Western World*—S. Beal, p. CXXI.
৪৮। *Mahavamsa*—p. 128.
৪৯। *Early History of India*—V. Smith, p. 187.
৫০। *Terracotta Art of Bengal*—Dr. S. S. Biswas, p. 28.
৫১। *Early History of India*, p. 196.
৫২। পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত—পৃঃ ৯৪।
৫৩। *The Classical Accounts of India*—p. 308.
৫৪। *IHQ*, Vol. XIV, p. 535. 'Thus the early home of the Imperial Guptas is to be located in Murshidabad, Bengal and not in Magadh.'
৫৫। *Buddhist Record of the Western World*—p. X.
৫৬। *Howrah in perspective*—Dr. K. K. Ganguly, p. 13-14.
৫৭। *Ibid*, p. 14.
৫৮। *History of Ancient Bengal*, p. 37-38.
৫৯। *Select Inscriptions*—Dr. D. C. Sircar, Vol. I, p. 283.
৬০। *Ibid*—p. 262-64
৬১। *Early History of India*, p. 275.
৬২। সমুদ্রগুপ্তের শাসনাবলী—পৃঃ ৫; Select Inscriptions, p. 262.
৬৩। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, পৃঃ ২৬৮-৭০। নগেন্দ্রনাথ বসু 'সিদ্ধবর্ম্মা' উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে, Vol. XIII, p. 133 উল্লেখ আছে—'সিংহবর্ম্মনঃ'।
৬৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XVIII, p. 79.
৬৫। *History of Bengal*, Vol. I, p. 48.
৬৬। পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬১।
৬৭। *Epigraphia Indica*, Vol. XV, p. 115.
৬৮। বঙ্গদেশের ইতিহাস—পৃঃ ৩৬।
৬৯। *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*—Dr. B. C. Sen, p. 212.
৭০। ভারতের মুদ্রা—পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত, পৃঃ ৫৯।
৭১। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম, খণ্ড, পৃঃ ৩৮।
৭২। *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, p. 213.

১৩। *Ibid*, p. 214-15.

১৪। *Descriptive List of sculpture and coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*, Calcutta, p. 21.

১৫। *Annual Conference, Numismatic Society of India, Souvenir* (Burdwan), 1978, p 26-28.

১৬। *Ibid*—p. 22.

১৭। *Ibid*—p. 33.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ

(রাঢ় ঃ গৌড় ঃ বর্ধমান)

১

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন পৃথক সত্তা ছিল না। ষোড়শ মহাজনপদের উদ্ভব কাল হতে পঞ্চম শতক পর্যন্ত এমন কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্দ্বারা বাঙালীর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, এই সময়ে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, মগধের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বর্ধমান, সমতট, ডবাক, পৌণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি জনপদের পরিচয় প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যে পাওয়া গেলেও, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত বা সংগৃহীত হয় নাই। ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গুপ্তসাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তির শিথিলতার সুযোগে সম্ভবতঃ সামন্ত রাজন্যগণ কার্যতঃ স্বাধীনভাবে গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়ে শাসনকার্যে পরিচালনা করতেন। এই সময়ে প্রাপ্ত শিলালিপি বা তাম্রশাসনে গুপ্তরাজাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই। সে কারণে বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ষষ্ঠ শতকেই দেখা গিয়েছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। তবে মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বর্ণিত গুপ্তরাজবংশের আদিবাসস্থান বর্ধমান জনপদে ছিল, একথা স্বীকৃত হলে বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তার কাঠামো পরিবর্তিত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে স্বাধীন বঙ্গ-রাঢ় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায়। তম্মধ্যে গোপচন্দ্র ছিলেন রাঢ় ও সমতটের অধিপতি। বালেশ্বর জেলার জয়রামপুর তাম্রশাসন (১ম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত), বর্ধমান জেলার মল্লসারুল তাম্রশাসন (৩য় রাজ্যাঙ্কে) ও ফরিদপুর তাম্রশাসন (১৮শ রাজ্যাঙ্কে) হতে জানা যায় যে, ফরিদপুর হতে বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ় অঞ্চল গোপচন্দ্রের অধীনস্থ ছিল এবং তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ন।[১] এই বিশাল রাজ্য গোপচন্দ্র কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগে একজন সামন্ত রাজা নিযুক্ত করেছিলেন। মল্লসারুল তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, বর্ধমানভুক্তির শাসনকর্তা মহারাজ বিজয়সেন এবং গোপচন্দ্র স্বয়ং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[২]

তাম্রশাসনখানি বর্ধমান শহরের প্রায় ৩০ কিঃমিঃ পশ্চিমে গলসি থানার মল্লসারুল গ্রামে একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই তাম্রশাসনখানি হল বর্ধমানভুক্তি তথা বর্ধমান জেলা বিষয়ে প্রাচীনতম ও মূল্যবান প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল। তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু হল, মহারাজ বিজয়সেন

বর্ধমানভুক্তি অন্তর্গত বককত্তক-বীথির অধিকারণের নিকট বৎসস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত বেত্রগর্ত্তা গ্রামে ৮ কুল্যবাপ ভূমি ক্রয়েচ্ছুক হয়ে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের ধর্মষড় ভগ (এক-ষষ্ঠাংশ) প্রাপ্তির জন্য দান করেন। এই শাসনখানি হতে প্রমাণিত হয় যে, গুপ্ত-শাসনাধিকার শেষ হলেও ঐ সময়ে বর্ধমানভুক্তিতে অরাজকতার সৃষ্টি হয় নাই এবং জয়রামপুর শাসনও প্রমাণ করে যে, মেদিনীপুর জেলা ও ওড়িশার উত্তরভাগ গোপচন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু বিজয়সেন সামন্ত রাজারূপে বর্ধমানভুক্তি শাসন করলেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করার অধিকার ছিল।[৩]

তাম্রশাসনখানি সাধারণ ভূমিদান দলিল হলেও খোদিত লিপিতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত আছে। যথা—

১। মহারাজা বিজয়সেন বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বককত্তক বীথির অধীনস্থ বেত্রগর্ত্তা গ্রামের মহত্তরগণের নিকট হতে ক্রয় করে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে ভূমি দান করেন। মহারাজা বিজয়সেন সামন্ত রাজা হলেও তাঁর ভূমি ক্রয় ও বিক্রয় / দান করার অধিকার ছিল। রাজা ভূমির উপর ধার্য রাজস্বের মালিক; কিন্তু ভূমি হতে স্বীয় প্রতাপের বলে মহত্তরগণকে অধিকার-চ্যুত করার ক্ষমতা ছিল না। যাগযজ্ঞে পারদর্শী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বসবাস এ অঞ্চলে অন্ততঃপক্ষে ষষ্ঠ শতকেই শুরু হয়েছিল।

২। ধর্মষড়ভাগ-এর অর্থ হল ১/৬ অংশ পুণ্য অর্জন করা। ভূমি দান ক্রিয়া হেতু রাজা গোপচন্দ্র ঐ ভূমির উপর রাজস্ব আদায় পাবেন না এবং অনাদায়ী ভূমি রাজস্বের পরিবর্তে এক-ষষ্ঠাংশের পুণ্যার্জ্জন লাভ হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ষষ্ঠ শতকে বা তার আগে ভূমি রাজস্ব ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ।

৩। ঐতিহাসিক-ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্রে তাম্রশাসনখানি যথেষ্ট মূল্যবান। তাম্রশাসনে উল্লেখিত গ্রামগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে। ডঃ সুকুমার সেন গ্রামগুলির প্রাচীন নামের সঙ্গে বর্তমান নামের তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রাম পরিচিতির বাধা দূর করেছেন।[৭] যথা—

গোধগ্রাম	গোহগ্রাম,	আধুনিক গোগাঁ বা গোহগ্রাম।
বককত্তক	বককত্তঅ,	আধুনিক বাকতা।
কোড্ডবীর	কোড্ডইব,	আধুনিক কোড্ডে।
অধকরক	অদ্ধঅরঅ,	আধুনিক আদরা।
কপিস্থ বাটক	কইত্থআতঅ,	আধুনিক কইতাড়া।
খণ্ডজোটিকা	খাণ্ডজোডিঅ,	আধুনিক খাঁড়জুলি।
মধুবাটক	মহুআড়অ,	আধুনিক মওড়া।
শাল্মলিবাটক	সিম্মালআডঅ,	আধুনিক সিমলাড়া বা সিমলুড়।
বিন্ধ্যপুর	বিঞ্ঝউর,	আধুনিক বিজুর।

ডঃ সেন আরও মন্তব্য করেছেন যে, প্রদত্ত ভূমি মাপজোকের পর চৌহদ্দি বা সীমানা ঠিক করে দেওয়া হত কীলক (pillar) প্রতিষ্ঠা করে। বৎসস্বামীকে যে ভূমি দান করা হয়েছিল তার কীলকে পদ্মবীজের মালা চিহ্নিত। ননীগোপাল মজুমদারের মতে প্রাচীন আম্রগর্ত্তিকার নাম মল্লসারুলের দক্ষিণে অবস্থিত আমড়োলা গ্রাম ও শাল্মলীবাটক বর্তমানে সারুল বা মল্লসারুল নামে পরিচিত।

৪। তাম্রশাসনে উল্লেখিত রাজকর্মচারিবৃন্দের তালিকাটি প্রমাণ করে যে, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন পদাধিকারী রাজকর্মচারীরা যে যে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, প্রদত্ত রাজপদের বিবরণ হতে তা জানা যায়। রাজস্ব, শাসনব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য, জনকল্যাণমূলক ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য উচ্চ হতে উচ্চতর রাজকর্মচারী নিয়োগের প্রথা সম্ভবতঃ মৌর্য যুগে উদ্ভাবিত হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন পদাধিকারী রাজকর্মচারী নিয়োগের উল্লেখ আছে। শাসনোক্ত পদাধিকারীর সামাজিক ও রাজকীয় দায়দায়িত্ব নিম্নে প্রদত্ত হল।[৫] যথা—

অগ্রহারিক—রাজপ্রদত্ত ভূমি (অগ্রহার) যিনি ভোগ করেন, সেই সকল ভূমির তত্ত্বাবধায়ক। অগ্রহারিণ অর্থে ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণগণ, যাঁরা রাজপ্রদত্ত ভূমি ভোগ করতেন।

ঔদ্রঙ্গিক—স্থায়ী প্রজার নিকট রাজস্ব আদায়ের অধীক্ষক। বিনয়চন্দ্র সেনের মতে ইনি নগর শাসক।

ঔর্ণস্থানিক—রেশম ও পশমজাত দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক। এই অঞ্চলে রেশম উৎপাদনের প্রাচীনত্ব ও উৎপন্ন দ্রব্য হতে রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

আবসথিক—রাজকীয় আবাসগৃহ, মন্দির, ছাত্রাবাস ও ব্রাহ্মণ গৃহাদির তত্ত্বাবধায়ক।

পট্টালক—সম্ভবতঃ গ্রাম বা বীথির Notary.

চৌরোদ্ধরনিক—শান্তিশৃঙ্খলার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

দেবদ্রোণী-সম্বন্ধ—দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন পবিত্র সরোবরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

হিরণ্যসামুদায়িক—নগদ রাজস্ব আদায়কারী। সুকুমার সেনের মতে নদীতীরে সোনা সংগ্রহের উপর রাজস্ব আদায়কারী। বিনয়চন্দ্র সেনের মতে রাজস্ব নগদ অথবা উৎপন্ন দ্রব্যে দেওয়ার রীতি ছিল।

কাত্তাকৃতিক—উৎপন্ন দ্রব্যের রাজস্ব আদায়ের আধিকারিক।[৬]

কুমারামাত্য—মন্ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যাঁরা সরাসরি রাজার অধীনস্থ ছিলেন।

উপরিক—প্রাদেশিক শাসনকর্তা; এটি একটি উচ্চতম রাজপদ।

বিষয়পতি—জেলা অধিকর্তা।

বাহনায়ক—পরিবহন অধিকর্তা বা বণিক-সার্থবাহের প্রধান।

আবসথিক—সম্ভবতঃ গ্রামস্থ ব্রাহ্মণবাসিন্দাগণের প্রধান।
ভোগপতিক—দলিল সম্পাদনকারী আধিকারিক।
তদ্যায়ুক্তক—সম্ভবতঃ বীথির অধিকর্তা।[৭]

মল্লসারুল তাম্রশাসনোক্ত আধিকারিকগণের কার্যের দায়-দায়িত্ব অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। এরূপ কার্যপদ্ধতি হঠাৎ প্রচলিত হয় নাই। সুচিন্তিতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ একটা সুষ্ঠ ধারা বলবৎ না থাকলে হঠাৎ গোপচন্দ্রের আমলে এরূপ রাজ্যশাসন পদ্ধতি প্রচলিত হতে পারে না। গুপ্তযুগ বা তৎপূর্বেই এই ধারার প্রচলন ছিল।

৫। ষষ্ঠ শতকে রাজ্য শাসনের জন্য বৃহত্তম জনপদটি ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। ঐ সময়ে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বর্তমানকালে বিভাগের সমতুল্য। ষষ্ঠ শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রচিত / খোদিত তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির বিস্তৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার অবস্থিত ছিল উত্তরে ভাগীরথীর প্রবাহ পথ ও আদিগঙ্গার প্রবাহ পথের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ বীরভুম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার আদিগঙ্গার খাতের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ। আবার বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর ভুক্তির পরিচয়ও জানা যায়। তবে আলোচ্য তাম্রশাসনে ভুক্তির অধীনস্থ বিষয় ও বিষয়ের অধীনস্থ বীথি ও বীথির অধীনস্থ গ্রামের পরিচয় পেতে কোন অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাসন-কার্যের এই ক্রমবিভাগ কৌটিল্যের যুগ থেকে ষষ্ঠ শতক হয়ে বর্তমানকালে পেঁছিছে।

৬। মল্লসারুল তাম্রশাসনের উপরিভাগে খোদিত শীলমোহর হতে বর্ধমানভুক্তির উপাস্য এক প্রধান দেবতা ও প্রচলিত ধর্মমতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শীলমোহরের নীচে খোদিত আছে—

'মহারাজ—বিজয়সেনস্য ॥
ওঁ স্বস্তি।
জয়তি শ্রীলোকনাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃত-কর্ম্মফল-হেতুঃ।
সত্য-তপো-ময়-মূর্ত্তিল্লোক-দ্বয়-সাধনো ধর্ম্মঃ ॥'

প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে এর ইংরাজী অনুবাদ করেন—"The record opens with an eulogy on the God Loknatha of Dharma and or the Saints (Santah) i e. the Buddhist Sangha" অর্থাৎ ভগবান লোকনাথ (বুদ্ধদেব), ধর্ম ও সাধুজনের গুণানুকীর্ত্তন করে লিপিখানি রচিত হল। স্বর্গীয় মজুমদার শ্রীলোকনাথ অর্থে বুদ্ধদেব ধরে শাসনখানিতে বৌদ্ধ-ধর্মের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বি. সি. চাব্বার[৮] মতে সমগ্র শাসনখানিতে একমাত্র লোকনাথ শব্দ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম বা সঙ্ঘ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নাই। ভুমিদান করার প্রস্তাবের মূল কথা হল পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য এবং যিনি দান গ্রহণ করছেন, বৎসস্বামী কৌণ্ডীণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং এক্ষেত্রে ধর্মালোচনায় পাওয়া

যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণের কথা। শীলমোহরে চক্র বা সূর্যরশ্মি খোদিত হলেই যে বৌদ্ধ ধর্মের ইঙ্গিত থাকবে, এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি নেই। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বৌদ্ধ দেবদেবীর ছাপ এবং এহেন নিদর্শনের উদাহরণও প্রচুর। শ্রীচাম্বা আরও বলেছেন যে, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র এভাবে খোদিত হতে পারে এবং হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুকে 'লোকনাথ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে—"লোকবন্ধুর্লোকনাথো মাধবো ভক্ত বৎসলঃ"। শীলমোহরে খোদিত দ্বিভুজপুরুষটিকে অতি শক্তিশালী সুদর্শনচক্রধারী চক্রপুরুষের মূর্ত্তি হিসাবে সহজেই অনুমান করা যায়। আরও তিনশ বছর পূর্বে রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে শুশুনিয়া গিরিলিপিতে বিষ্ণুচক্র-সহ চক্রস্বামী বা বিষ্ণু উপাসনার বিষয় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শীলমোহরে উৎকীর্ণ মূর্তিটি ধর্মরাজ সূর্য দেবতার।[৯] সূর্য ধর্মরাজ হতে পারেন, কিন্তু লোকনাথের উল্লেখের জন্য সূর্যমূর্তি কল্পনায় কিছু বাধা বা অসঙ্গতি থাকছে। সমগ্র বিষয়টি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে উল্লেখিত এবং গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর-যুগে বিষ্ণুর প্রাধান্য অধিক হওয়ায় তাম্রশাসনের ধর্মীয় দিকটা হিন্দুধর্মের অনুকূলেই রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

৭। মল্লসারুল তামশাসনে তিনটি সংস্কৃত শব্দ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যথা—অগ্রহার, অগ্রহারিক ও অগ্রাহারীণ। লোকেশ্বর বসু মন্তব্য[১০] করেছেন যে, প্রাক-মোঘল যুগে রাজা বা সম্রাট অগ্রহারভূমি দান করতেন। অর্থাৎ দান গ্রহণে অগ্রহারিক বা অগ্রহারী নিযুক্ত হতেন এবং বীথির অন্তর্ভুক্ত অগ্রহার ভূমির প্রধান পরিচালক হলেন অগ্রহারীণ। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—"মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের নৃতাত্ত্বিক নাম উগ্রক্ষত্রিয় পরে বৃত্তিনাম পায় আগ্রহরিক, তা থেকে দেশজ উচ্চারণে অপভ্রংশিত হয়ে আগ্রহারী ও পরে আগরি থেকে আগুরি। ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণে আছে উগ্রক্ষেত্রী। যাঁরা সম্রাট বা রাজার কাছ থেকে অগ্রহার ভূমি লাভ করতেন তাঁদের বলা হত অগ্রহারীণ। আগ্রহরী বৃত্তিনাম থেকে আগুরি"। এ বিষয়ে সঞ্জীবকুমার বন্ধু[১১], উপরোক্ত মতের সমর্থনে ব্যাখ্যা করেছেন—"...এবং এইরূপে আগ্রহারী উগ্রক্ষত্রিয়গণের নিকট বিশেষ ঐতিহ্যবাহী হয়ে উঠায় প্রাচীন উগ্রক্ষত্রিয়গণ আগ্রহারী পেয়ে আগরী আখ্যায় আখ্যাত হয়ে আসছেন।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির পর্যালোচনা করতে হলে সর্বপ্রথমেই 'অগ্রাহার' শব্দের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। মনিয়ার উইলিয়ামের মতে—"**An agrahara is an endowment of land or villages by a Raja to a Brahmin or a Kshatriya for his meritorious actions.**"

অর্থাৎ প্রশংসার্হ বা মহৎ কার্যের জন্য ভূমি বা গ্রামদানকে অগ্রহার বলা হয়। অগ্রহারিক বা আগ্রহারিণ শব্দের অর্থ হল—**the owner of an agrahara ; sometimes probably, the superintendent or agraharas ; same as Agraharin** এবং অগ্রহারিণ বা অগ্রহারীন শব্দ হতে জানা যায় যে, এটি **the holder**

of an argahara, headman or owner of an agrahara village—অর্থে প্রযুক্ত। Agraharina—mahattara শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—headman among the Agraharins, i. e. owners of an agrahara (rent-free village in the possession of Brahmanas) হিসাবে।[১২]

এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতে [১৩]—"কয়েকটি উপাধি বা পদবী থেকে তখনকার ভদ্রলোকের কাজের বা জীবিকার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'অগ্রহারীণ' যিনি রাজপ্রদত্ত ভূমি (অগ্রার) ভোগ করতেন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, অব্রাহ্মণও আছেন।" ডঃ সেন অন্যত্র উল্লেখ করেছেন : Aguri—A caste in Bengal. Td. agraharika ('a collector of Landlord's share of produce'), (An Etymological Dictionary of Bengali—Sukumar Sen)

গোপচন্দ্রের পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেবের এগরা তাম্রশাসনে উল্লেখিত নাগসেন—প্রত্যগ্রহারীয়, তরঞোদর্ভাগ্রহারী লোড্ডাবাগ্রহারীয় প্রভৃতি লক্ষণীয়।[১৪] অগ্রহারের ব্যবস্থা ও জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল, তা ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হতে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫]

উগ্রক্ষত্রিয় জাতি আগুরী হতে পারে এবং অনেকে অনুমান করে থাকেন যে, বর্ধমান রাজবংশ এতদঞ্চলের বসবাসের পর আগুরী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, এ ধারণাও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে আগুরী জাতির কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু "হিন্দু রাজত্বকালে উগ্রক্ষত্রিয়গণ বহু অঞ্চলের অগ্রহার লাভ করেছিলেন বলে 'আগ্রহারী' তাঁদের সাধারণ আখ্যা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়ে তা হয়েছিল 'আগরী'—এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যায় না এবং এটি ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যাও নয়। উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও পূর্বে অসম হতে গুজরাট পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে যে কয়েক সহস্র শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে অগ্রহার শব্দের প্রচুর উল্লেখ আছে। অগ্রহার শব্দ হতে আগুরী শব্দজাত হলে, এই জাতির পরিচয় কেবলমাত্র বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকত না। অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ২।১ টি উদাহরণ মিলত। 'কাপিস্থবাটকাগ্রহারীণ-মহত্তর-ধনস্বামি' ও 'কোড্ডবীরাগ্রহারীণ-ভট্টবামনস্বামী', ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তা'হলে অগ্রাহার বা অগ্রাহারীণ কিরূপে আগুরী জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। লোকেশ্বর বসু উগ্রক্ষত্রিয় জাতি-নামকে নৃতাত্ত্বিক নামরূপে উল্লেখ করলেও এটিকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যায় না ; কারণ উগ্রক্ষত্রিয় শব্দের কোন নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয় না—সঙ্কর জাতির তালিকাভুক্ত নাম মাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অগ্রহার বা অগ্রাহার। কোন জাতি-নাম নয়, বৃত্তিনাম মাত্র এবং বৃত্তিনামকে যদি জাতি-নাম পর্যায়ভুক্ত করা হয় তা'হলে অগ্রহারী বা অগ্রহারভোগী ব্রাহ্মণগণও আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি হওয়া উচিত ছিল। বাস্তবকে কিন্তু এই বৃত্তিনামকে জাতি-নাম হিসাবে অতীতে গণ্য করা হয় নাই।

(২)

গোপচন্দ্র ও বিজয়সেনের পর পরবর্তী সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে রাঢ় অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের শেষে শশাঙ্ক নামক এক নরপতি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ পরবর্তী গুপ্তরাজারা শাসন করতেন, যা গৌড় নামে পরিচিত ছিল।[১৬] গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এমনকি বানভট্টের হর্ষচরিতে[১৭] গৌড়ভুজঙ্গ বা গৌড়াধিপ নামে উল্লেখ করা হলেও, শশাঙ্ক নামটি এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। রোহটাসগড় দুর্গের শিলালেখতে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য"[১৮] খোদিতলিপি হতে জানা যায় যে, মহাসামন্ত শশাঙ্ক একজন স্থানীয় শাসক হিসাবে দক্ষিণ বিহার শাসন করতেন। ফ্লিট-এর মতে 'মহাসামন্ত', মহারাজ[১৯] শব্দের সমার্থক। হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায় রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক[২০] (শি-শাঙ্গ-কিয়া)। হর্ষচরিতের একটি পুঁথিতে[২১] 'নরেন্দ্রগুপ্ত' নামটি পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় শশাঙ্কের ৩৪ ও ৩৫ রাজ্যাঙ্কের দু'খানি তাম্রশাসন ও ঐ জেলার এগরা নামক স্থানে তারিখবিহীন একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এই তাম্রশাসনে পরিষ্কার উল্লেখ[২২] আছে—"পৃথিব্যাং পরমদৈবত শ্রীপরমভট্টারক শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ-পরমমাহেশ্বর শ্রীশশাঙ্কদেব রাজ্যং প্রশাসতি স্ম"। তারিখবিহীন এই তাম্রশাসনখানি পূর্ববর্তী রাজা গোপচন্দ্রের মল্লসারুল শাসনের অনুরূপ। কলিঙ্গের শৈলোদ্ভব বংশীয় মহাসামন্ত মাধবরাজের ৩০০ গৌড়াব্দে (৬১৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্পাদিত তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে—'মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরার অধিপতি' অর্থাৎ এসময়ে শশাঙ্ক আর মহাসামন্ত নন, তাঁর অধীনস্থ মাধবরাজ মহাসামন্ত উপাধিতে ভূষিত।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ না জানা গেলেও তাঁর রাজ্য ও বংশপরিচয় হতে অনুমিত হয় যে, তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।[২৩] আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে দক্ষিণ বিহার ও পরে সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জনপদ তাঁর রাজ্যভুক্তির মধ্যে ছিল। এছাড়া উত্তরবঙ্গ, মগধ, ওড়িশাও শশাঙ্কের অধীনস্থ ছিল।[২৪] তবে হর্ষবর্ধনের অভ্যুদয় ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার অধীনতামূলক মিত্রতার জন্য মগধ ও উত্তরবঙ্গের উপর শশাঙ্কের আধিপত্য অধিক দিন স্থায়ী ছিল না। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ ; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, প্রথমাবস্থা হতেই দক্ষিণ বিহার, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভুম অঞ্চল ছিল তাঁর স্থায়ী রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ; অপর অঞ্চলসমূহ ছিল বিজিত রাজ্য।

শশাঙ্কের ৮ম রাজ্যাঙ্কে প্রাপ্ত মেদিনীপুর তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে যে, তাঁর অধীনস্থ সামন্ত মহারাজ শ্রীসোমদত্ত দণ্ডভুক্তি সহ উৎকলদেশ শাসন করতেন এবং

১৯শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত অপর এক তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার শুভক্বীতি দণ্ডভুক্তির শাসক ছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৫] বালেশ্বর জেলার সোরো গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন দু'টি তাঁর পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হয়েছিল এরূপ অনুমান করা হয়।[২৬] কিন্তু গঞ্জাম শাসনে জানা যায় ৬১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক সলিমা নদীর তীরে কোঙ্গদ পর্যন্ত (গঞ্জাম) জয় করেছিলেন।[২৭]

বাণভট্টের রচনায় যেরূপ প্রশস্তি করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে শশাঙ্কের জীবিতাবস্থায় হর্ষবর্ধন সমগ্র গৌড়রাজ্য জয় করতে সক্ষম হন নাই। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করার পর হর্ষবর্ধন পশ্চিম ও মধ্য ভারত অভিযান করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ ৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে মগধ পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর বিবরণীতে জানা যায় যে, অতি সাম্প্রতিককালে শশাঙ্ক রাজার মৃত্যু হয়েছে।[২৮] শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মগধ, কর্ণসুবর্ণ-তাম্রলিপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ) জয় করে ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ জয় করেন[২৯] এবং এই সময়ে এক জঙ্গলে শিবির স্থাপনের সময় হিউয়েন সাঙ-এর কামরূপে অবস্থিতি বিষয়ে ভাস্করবর্মার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভের পূর্বে দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধন নিহত হন অর্থাৎ ৬০৬ খ্রীস্টাব্দের আগেই শশাঙ্কের কাণ্যকুব্জ অভিযান সমাপ্ত হয় এবং তার পূর্বেই অন্ততঃপক্ষে দক্ষিণ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল অধিকারভুক্ত না হলে শশাঙ্কের পক্ষে কাণ্যকুব্জ অভিযান সম্ভবপর ছিল না। যদি এই সময়ে তাঁর ১৯শ রাজ্যাঙ্কে তাম্রশাসনখানি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে অনুমান করা যায় যে, ৫৮০ খ্রীস্টাব্দ হতে ৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় হয়েছিল।

বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়েছিল ৫৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে এবং তৎপূর্বেই শশাঙ্ক ভাগীরথীর তীরে সমগ্র রাঢ় দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেছেন যে, কর্ণসুবর্ণে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গদেশে নূতন বর্ষ গণনা শুরু হয়েছিল।[৩০] কিন্তু বঙ্গাব্দের প্রচলিত ব্যবহার বা অপর কোন নির্দশন পাওয়া যায় না, যদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, শশাঙ্ক অথবা ঐ সময়ে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়েছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিব্বতরাজ স্রাঙ্গ-শান ৫৯৩—৯৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব ভারত অভিযানে এসেছিলেন এবং তাঁর দেশজয়কে স্মরণীয় করার মানসে 'সন' নামক নূতন বর্ষগণনা শুরু হয়। কিন্তু তিব্বতরাজ কর্তৃক শশাঙ্কের রাঢ় (রাজধানী কর্ণসুবর্ণ) অধিকারের প্রমাণ নাই। কোন বিদেশী আক্রমণকারীর সমর অভিযানকে স্মরণীয় করে রাখতে পরাজিত জাতি তাদের বর্ষগণনা আরম্ভ করবে, এটি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যাও নহে। তা'হলে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যেও 'সন' প্রচলিত হওয়া উচিৎ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে।[৩১] প্রাচীন শিলালেখ | তাম্রশাসন, মন্দিরলিপি বা পুঁথিতে বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

এক সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিরাট অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেও বাণভট্ট অথবা



হিউয়েন সাঙের ন্যায় অনুগ্রহপ্রার্থীর আচারে গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহপ্রার্থীদ্বয় তাঁর চরিত্রে দুটি কালিমা লেপন করে গিয়েছেন, যথা—(১) বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধনকে হত্যা ও (২) বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন ও বোধিবৃক্ষ ছেদন। হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক-রূপে বর্ণিত করা হলেও হর্ষবর্ধনের মধুবন লিপিতে[৩২] আছে—'প্রজাগণের প্রিয়কার্য করে সত্যরক্ষার নিমিত্ত শত্রুভবনে তিনি (রাজ্যবর্ধন) প্রাণত্যাগ করেছিলেন'। হিওয়েন সাঙ নিজেই সত্যের অপলাপ করেছেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী নৃপতি হলে প্রথমেই কর্ণস্বর্ণের বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করতেন। কিন্তু শশাঙ্ক যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে যুগের শৈব ও বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী নৃপতিগণ বৌদ্ধ-দেবতা এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণকে রীতিমত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন।[৩৩]

আনুমানিক ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী কোন এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন।[৩৪] কয়েক বৎসর পরে হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে (৬২৮ খ্রীস্টাব্দ) উল্লেখিত 'বর্ধমানকোট' নামক জয়স্কন্ধাবারকে অনেকে পশ্চিমবঙ্গের 'বর্ধমান' বলে অনুমান করেন (দ্রষ্টব্য: বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০ ও ১১৫)। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে গৌড় ও রাঢ় ভাস্করবর্মার অধীনস্থ ছিল এবং পরবর্তীকালে জয়নাগ নামক এক নৃপতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তারিখবিহীন বাপ্পাঘোষবাটক তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে যে, জয়নাগের সামন্ত রাজা নারায়ণ ভট্ট ঔদুম্বরিক বিষয়টি মহাপ্রতিহার সূর্যসেন নামক অধঃস্তন কর্মচারীকে শাসনের ভার দেন। অজয়নদের উত্তরতীর হতে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ পর্যন্ত ঔদুম্বরিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উক্ত তাম্রশাসনে অন্যান্য স্থাননামসহ কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ আছে।[৩৫] শশাঙ্কের পরবর্তীকালে কর্ণসুবর্ণসহ রাঢ়ের অধিকাংশ অঞ্চল জয়নাগের অধীনে ছিল। একটি প্রাচীন মুদ্রায় 'জয়' নামক নৃপতির উল্লেখ আছে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে[৩৬] আছে—

'নাগরাজ সমাহ্বয়ো গৌড়-রাজা ভবিষ্যতি।
অন্তে তস্য নৃপে তিষ্ঠম্ জয়াদ্যাবর্ণতাদ্বিশৌ॥'

(৩)

শশাঙ্কের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ১৬ বৎসর ব্যাপি (৬২৯-৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ) বৌদ্ধতীর্থগুলি দর্শন করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রামাণ্য দলিল রেখে গিয়েছেন। হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণকালে স্থানেশ্বর ও কাণ্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাঢ়-বঙ্গ ভ্রমণকাল ছিল ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর পূর্বভারত সম্পর্কিত বিবরণে জানা যায় তিনি হিরণ্যপর্বতদেশ (মুঙ্গের) পার

হয়ে চম্পা (ভাগলপুর) হ'তে ৪০০ লি দূরে কজঙ্গল বা কাকজোল[৩৭] এবং এই স্থান হতে ৬০০ লি দূরে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে পৌঁছেছিলেন। পৌণ্ড্রবর্ধন হতে ৯০০ লি পূর্বে কামরূপ এবং তথা হতে ১৩০০ লি দূরে সমতট। সমতট হতে ৯০০ লি দূরে তাম্রলিপ্ত এবং আরও উত্তরে ৯০০ লি দূরে কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত এবং এখান হতে ৭০০ লি দক্ষিণে ওড্র দেশে যাওয়া যায়।[৩৮]

হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণে তাম্রলিপ্ত হতে কর্ণসুবর্ণ ও কর্ণসুবর্ণ হতে 'উ-চ' (U-CHA) বা ওড্র জনপদ ভ্রমণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা বর্তমানকালের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকে বোঝায়। কর্ণসুবর্ণ জনপদের পরিসীমা ৪৪৫০ লি ও এর রাজধানীর বিস্তৃতি ছিল ২০ লি। দেশটি ছিল ঘন জনবসতিপূর্ণ ও অধিবাসীরা ছিল ধনবান। সমগ্র অঞ্চলটি সমতল, কৃষিবহুল ও আর্দ্র জলবায়ুপূর্ণ হওয়ায় অধিবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকার্য এবং এই অঞ্চলটি ছিল প্রচুর ফুল ও ফলে পূর্ণ। অধিবাসীগণের চরিত্র ছিল সুন্দর ও তারা শিক্ষানুরাগী। এই বিবরণ হতে আরও জানা যায় যে, বুদ্ধদেব এই স্থানে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত এসেছিলেন এবং অশোকরাজা এতদঞ্চলে স্তূপও নির্মাণ করেছিলেন।[৩৯] অবশ্য এ বিষয়ে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভগবান বুদ্ধের প্রায় এক হাজার বছর পরে হিউয়েন সাঙ এদেশে পদার্পণ করেন। ঐ বিবরণে আরও জানা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় ধর্মের লোক বসবাস করত এবং শ্রমণদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মহাযান সম্প্রদায়ের। এ রাজ্যে ১০টি বৌদ্ধ বিহার, ২০০০ জন বৌদ্ধভিক্ষু ও ৫০টি দেবমন্দিরের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়।[৪০]

হিউয়েন সাঙ বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অবস্থান ও বিস্তৃতি সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। পর্যটকের বিবরণীতে আছে এ রাজ্যের পরিসীমা ৪৪৫০ লি বা ৭৪৮ মাইল। প্রদত্ত তথ্য হতে অনুমান করা যায় উত্তরে গঙ্গার দক্ষিণ তীর হতে দামোদর নদের প্রবাহপথ (বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকার খাত ধরে) পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। কর্ণসুবর্ণ নগরের অবস্থিতি সম্পর্কে ওয়াডেল মন্তব্য করেছেন যে এটি বর্তমান বর্ধমান শহর ; কিন্তু বেভারিজের মতে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি। বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উৎখননের ফলে সকল সন্দেহের অবসান ঘটেছে। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরের অবস্থিতি হল মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি রেলস্টেশনের নিকট যদুপুর গ্রামের উত্তর-পশ্চিমস্থ রাজবাড়ীডাঙ্গা নামক স্থানে। এই স্থানেই হিউয়েন সাঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্ধমান জেলার উত্তর সীমা হতে যদুপুরে শশাঙ্কের রাজধানীর দূরত্ব মাত্র ১৪ কিলোমিটার।[৪১]

পরিব্রাজকের বিবরণ হতে জানা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল দামোদর নদের উত্তর তীর পর্যন্ত এবং দামোদর নদের দক্ষিণ তীর হতে সমুদ্রকুল পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। অবশ্য রাজ্যশাসনের নিমিত্ত কর্ণসুবর্ণ ও

তাম্রলিপ্ত জনপদের উল্লেখ ঐ যুগের কোন লিপি বা তাম্রশাসনে নাই। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে 'বর্ধমানভুক্তি' ও শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসনে 'দণ্ডভুক্তি' জনপদের উল্লেখ আছে।

কর্ণসুবর্ণ জনপদের বিস্তৃতি প্রসঙ্গে ফার্গুসনের অভিমত হল—[৪২] 'The kingdom of Karna Souvarna, I take it comprehended, the northern part of Burdwan, the whole of Birbhum and the province of Murshidabad, including all those parts of the district of Krishnaghur and Jessore which were then sufficiently raised above the water of the Ganges to be habitable'.

এই মতে বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের উত্তরাংশ কর্ণসুবর্ণ রাজ্য এবং দক্ষিণাংশে ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্য। স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে[৪৩] তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল—'The district probably comprised the small but fertile tract of country lying to the westward of the Hooghly river from Burdwan and Kalna on the north to the bank of the Kosai river on the south.'

হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে, তাম্রলিপ্ত হতে কর্ণসুবর্ণের দূরত্ব ১১৭ মাইল এবং সম্ভবতঃ তিনি মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়ে বর্ধমান শহরে (?) দামোদব অতিক্রম করে মঙ্গলকোট অথবা কাটোয়ায় অজয়নদ পার হয়ে কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ একই পথে বর্ধমান জেলার সীমান্ত হতে তোষলী যাবার পথ ধরে ওড্র দেশে পৌঁছেছিলেন এবং কাঁসাই নদীর দক্ষিণ হতে উত্তর কলিঙ্গদেশের সীমানা শুরু হয়েছিল। কারণ কর্ণসুবর্ণ হতে ওড্র জনপদের দূরত্ব ছিল ১১৭ মাইল। অজয়নদ পার হওয়াকালীন মঙ্গলকোটের পশ্চিমে কোন অঞ্চল দিয়ে পারাপার করেন নাই, কারণ ঐ অঞ্চল গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন ও হিংস্র বন্যজীবজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল।

হিউয়েন সাঙ প্রধানতঃ রাজধানী বা নগরের নামানুসারে জনপদের নামকরণ করেছেন, অন্যথায় এই জনপদ বৃহদর্থে গৌড়রাজ্য এবং শাসনকার্যে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল, শশাঙ্কের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাম্রশাসনে এর উল্লেখ আছে। বরাহ-মিহিরও অনুরূপভাবে স্থানে স্থানে নগরের নামানুসারে জনপদের পরিচিতি উল্লেখ করেছেন।

(৪)

শশাঙ্ক, মানব ও জয়নাগের রাজত্বকালের পর গৌড়রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এই সময়ে প্রায় শতবর্ষব্যাপী গৌড়রাজ্যের কোন ঘটনা জানা যায় না। গ্রাম-চরিতে এই সময়কে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে। অষ্টম শতকে চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে

কান্তিদেব নামক এক বৌদ্ধ নৃপতির উল্লেখ আছে। তাম্রশাসনে খোদিত আছে পরমেশ্বর—মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলমণ্ডলের অধীশ্বর ছিলেন। চট্টগ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির (স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বড় আখড়া নামে পরিচিত) গাত্র হতে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক জে. এন. সিকদার তাম্রশাসনখানি আবিষ্কার করেন। উক্ত তাম্রশাসনে পাওয়া যায়—'ওঁ স্বস্তি। শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ বর্দ্ধমানপুর-বাসকাৎ'[৪৪]...অর্থাৎ বর্ধমানপুরের জয়স্কন্ধাবার (শিবির বা স্থানীয় রাজধানী) হতে এই শাসনখানি প্রচারিত হয়েছিল। লিপির শেষাংশে উল্লেখ আছে কান্তিদেব হরিকেলমণ্ডলে বাজত্ব করতেন।

হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে উল্লেখ আছে 'রাঢ়া' ও 'হরিকেল' পৃথক জনপদ।[৪৫] ডাঃ দীনেশ সরকারের মতে এই রাজ্যের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে।[৪৬] দ্বাদশ শতকে রচিত হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি গ্রন্থে আছে—বঙ্গ ও হরিকেল এক এবং সমার্থক (চম্পাস্তু অঙ্গা বঙ্গাস্তু হরিকেলয়া[৪৭])। ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডলেব মতে হরিকেল রাজ্যের [৪৮] প্রধান নগরীর নাম ছিল 'বর্ধমানপুর'। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ বর্তমান মেমারী থানার বড়োয়া-হরকলা গ্রাম হতে কান্তিদেব রাঢ়-বঙ্গ শাসন করতেন। কান্তিদেব ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ, বড়োয়া-হরকলার সন্নিহিত বোহার গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান এবং ঐ সময়ে এই অঞ্চলে কয়েকজন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত মন্তব্যে কোন প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ না থাকায় তাঁর বড়োয়া-হরকলা তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গ্রামে কোন প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন নাই বা পূর্বেও আবিষ্কৃত হয় নাই। হরকলার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ও আধুনিক গ্রামকে হরিকেলমণ্ডলরূপে অনুমান করার যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা মেলে না। সপ্তম শতকে ইৎসিঙের বিবরণে (Memories of Eminent Priests who visited India) জানা যায় যে, হরিকেল শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে মহাবোধি যাওয়ার পথে নালন্দা হতে ৬ যোজন দূরে হরিকেলে (অ-লি-কি-লো বা ও-লি-কি-লো) ইৎসিঙের সঙ্গে উ-হিঙ্গের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।[৪৯] এ বিবরণ হতে জানা যায় যে, মগধ—চম্পা ও হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি ছিল পাশাপাশি অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল ঐ সময়ে হরিকেল নামে অভিহিত হত। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমার্থক রাজ্য হিসাবে প্রথমে হরিকেল রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল এবং পরবর্তীকালে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গকে হরিকেলমণ্ডল নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

লেঃ কর্নেল আর. সি. মজুমদার এই তাম্রশাসনখানি এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকাতে প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বর্ধমানপুর নামক নগর হতে এই শাসনখানি প্রচারিত হয়েছিল এবং অবিভক্ত বাংলাদেশে 'বর্দ্ধমানপুর' নামক দ্বিতীয় নগরের অস্তিত্ব না

থাকায় বর্তমান 'বর্ধমান' শহরেই কান্তিদেবের শাসনোল্লিখিত জয়স্কন্ধাবার ছিল। বর্ধমান নগরের নাম হ'তে 'বর্ধমানভুক্তির' নামকরণ করা হয়েছিল।[৫০] মঞ্জুশ্রী-মূল-কল্পে আছে—"জাতাসৌ নগরম্ রম্যে বর্ধমানে যশস্বিনঃ" এবং এই বর্ধমান নগরীর অবস্থিতি ছিল গৌড়রাজ্যে। তাহলে সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায় যে, মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প বর্ণিত গৌড়রাজ্যের 'বর্ধমাননগর' নামে অপর কোন নগরের অস্তিত্ব না থাকায় চট্টগ্রাম-তাম্রশাসনোক্ত 'বর্ধমানপুর' ও বর্তমান 'বর্ধমান শহর' এক ও অভিন্ন। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারও বর্ধমান ও বর্ধমানপুরকে সমার্থক বলে সমর্থন করেছেন এবং কান্তিদেবের রাজত্ব দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেও বিস্তৃত ছিল।[৫১]

সম্ভবতঃ কান্তিদেব, ধর্মপাল ও দেবপালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ পালযুগে এরূপ কোন স্বাধীন নৃপতির নাম পাওয়া যায় না। কান্তিদেব, ধর্মপালের পূর্বেই রাঢ়-বঙ্গ জনপদের অধীশ্বর ছিলেন এবং বর্ধমানপুর তাঁর রাজত্বের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নগর ছিল, যা তিনি অধিকারের দ্বারা লাভ করেছিলেন। তাম্রশাসনে 'জয়স্কন্ধাবারাৎ বর্ধমানপুর বাসকাৎ' উল্লেখই এর প্রধান প্রমাণ।

(৫)

জয়নাগের পর শশাঙ্কের গৌড়রাজ্যের উপর চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মিলিত আক্রমণে গৌড়রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে গেলেও গৌড়ের উপর কনৌজ বা কামরূপের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে শৈলবংশীয় নৃপতি (২য় জয়বর্ধনের জ্যেষ্ঠ পিতামহ), পৌণ্ড্ররাজকে নিহত করে পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করেন।[৫২] ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে (৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে) নেপালের পশুপতিনাথ মন্দির তোরণপার্শ্বে কামরূপ-রাজ জয়দেবের খোদিত লিপিতে আছে যে, হর্ষদেব কর্তৃক গৌড়দেশ অধিকৃত হয়েছিল।[৫৩] কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার সভাকবি বাকপতিরাজ রচিত 'গউডবহো' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বর্ণিত আছে যে, যশোবর্মা গৌড়রাজকে নিহত করে গৌড়রাজ্য অধিকার পূর্বক সমুদ্রতীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।[৫৪] এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, যশোবর্মা সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জয় করেছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক যশোবর্মা পরাজিত হন। ললিতাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় গৌড়রাজ কাশ্মীরের ত্রিগামী নামক স্থানে নিহত হওয়ায় (রাজ ঃ ৪ / ৩২৩) গৌড়ের প্রভুভক্ত সেনাগণ রামস্বামীর মূর্তি ধ্বংস করে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন[৫৫] (রাজ ঃ ৪ / ৩২৪) এবং কাশ্মীরে গৌড়বীরসৈন্যগণের যশে পরিপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঐ সময়ে গৌড় শহর এবং গৌড়রাজ্যের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে।

অষ্টম শতকের শেষ ভাগে অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায়ের হাত হতে পরিত্রাণের মানসে 'প্রকৃতিপুঞ্জ' (প্রজাগণ) গোপাল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিতে গৌড়রাজপদে বরণ

করেন।[৫৬] মাৎস্যন্যায়ের প্রসঙ্গ লামা তারনাথ উল্লেখ করলেও ধর্মপালের খলিমপুর লিপিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৫৭]

'মাৎস্য-ন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতিশ-শিরসাং চুড়ামনি স্তত্ স্ততঃ।'

সম্ভবতঃ গোপাল প্রথমাবস্থায় শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণেই রাজধানী স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে মগধ ও উত্তরবঙ্গ তাঁর বিজিত রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, গোপাল প্রথমাবস্থায় গৌড়>রাঢ়>সুহ্ম>বর্ধমান-ভুক্তির অধিপতি ছিলেন। রামচরিতে (১।১৭ শ্লোক) পালরাজাগণ ক্ষাত্রিযত্বের দাবী করলেও আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে (শ্লোক-৮৮৩) আছে—

"ততঃ পরেন ভুপাল গোপাল দাস-জীবিনঃ
ভবিস্যতি ন সন্দেহো দ্যিজাতি-কৃপণাজনা।"

গৌড় রাজ্যের অরাজকতা প্রসঙ্গে লামা তারানাথের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ওড়িশা, বঙ্গ ও প্রাচ্যদেশের অপর পাঁচটি জনপদের বিভিন্ন অংশে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ আপন আপন প্রাধান্য স্থাপন করেন। তারানাথ আরও বলেছেন যে, গৌড়রাজ-মহিষী বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করে প্রত্যহ রাত্রে তাদের হত্যা করত। অবশেষে গোপালকে মনোনীত করার পর, তিনি (গোপাল) আজীবন গৌড়ের রাজপদে আসীন ছিলেন।[৫৮] দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে আছে যে গোপাল আসমুদ্র ধরণীমণ্ডল অধিকার করেছিলেন[৫৯] অর্থাৎ রাঢ়=সুহ্মদেশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল ৭৭০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও পিতার ন্যায় ধর্মপালের প্রথম পরিচয় ছিল গৌড়রাজ। 'সয়ম্ভুপুরাণে' ধর্মপালকে 'গৌড়বাজ' আখ্যায় ভুষিত করা হয়েছে।[৬০] প্রতিহার নৃপতি বৎসরাজ কর্তৃক ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকে গৌড় অভিযানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই সময়ে গৌড় ও বঙ্গ পৃথক জনপদ ছিল।[৬১] তাহলে দেখা যায় যে, ধর্মপালের প্রকৃত পরিচয় ছিল গৌড়রাজ অর্থাৎ তাঁর অভ্যুদয় হয়েছিল বর্ধমানভুক্তিতে। রাঢ় অঞ্চলে ত্রৈকুটক বিহারে ধর্মপালের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হরিভদ্র 'অভিসঙ্গালঙ্কার' রচনা করেন।[৬২] ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এক প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে, বর্ধমান জেলার ভরতপুরে আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তিসহ স্তুপটি অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল।[৬৩] তুলাক্ষেত্র-বর্ধমান-স্তুপটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল। তাহলে অনুমান করা যায় যে, ত্রৈকুটবিহার ও তুলাক্ষেত্র বর্ধমানস্তুপ রাঢ়েই নির্মিত হয়েছিল এবং যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং ধর্মপাল। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে খোদিত আছে (শ্লোক-৭) যে, দিগ্বিজয়কালে ধর্মপাল্ কেদার, গোকর্ণ ও গঙ্গাসাগর তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন।

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল ও ধর্মপালের পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা অভিমত প্রচলিত থাকলেও সম্প্রতিকালে

আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালদেবের 'জগজীবনপুর'-তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে ধর্মপালের পুত্র ত্রিভুনপাল ও দেবপাল।[৬৪] দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে খোদিত আছে যে, তিনি সমুদ্র পর্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করার পর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন না থাকায় মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হতে মুক্তিদান করায় তারা স্বাধীনভাবে অরণ্যে আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে বন্ধুগণকে পুনবায় দর্শন করেছিল।[৬৫] সমুদ্র পর্যন্ত জয়ের অর্থ হল দক্ষিণ রাঢ়ের প্রত্যন্ত দেশে সমুদ্রকূল পর্যন্ত তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। ঘনরামের 'শ্রীধর্মমঙ্গলে'ও এর সমর্থন মেলে।

পালরাজাদের ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপানি ও কেদারমিশ্রের হাতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত হওয়ায় পালরাজশক্তির দুর্দিন শুরু হয়। দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল (সম্ভবতঃ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) ও নারায়ণপাল (শূবপালের পুত্র) দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন: প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রচলিত পালবাজাদের বংশতালিকা[৬৬] ও জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত বংশতালিকায় যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। উক্ত তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে বপ্যট-এর পুত্র গোপাল ও তৎপুত্র ধর্মপাল। ধর্মপালের পুত্র ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল এবং দেবপালের তিন পুত্র যথা রাজ্যপাল, মহেন্দ্রপাল ও শূরপাল। জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন[৬৭] হতে জানা যায় যে, ৪র্থ পালবাজা মহেন্দ্রপাল এবং তারপর মহেন্দ্রানুজ প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল অন্ততঃপক্ষে ১২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে ইতিহাসে অপর এক মহেন্দ্রপালের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি রাষ্ট্রকূট-রাজ ভোজের পুত্র।[৬৮] আলোচ্য তাম্রশাসনখানি পালবংশের বংশতালিকা পুনর্গঠন করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নারায়ণপালের সময়ে (৮৫৪-৯০৮ খ্রীস্টাব্দ) রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ পালশক্তিকে পরাজিত করেন এবং সেই সুযোগে ওড়িশার শূল্কিবংশীয় রাজা রণস্তম্ভ রাঢ়ের একটা বিরাট অঞ্চল অধিকারে সমর্থ হয়েছিলেন।[৬৯] নারায়ণপালের পর রাজ্যপাল (৯০৮-৯৪০ খ্রীস্টাব্দ) ও তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৯৬০ খ্রীস্টাব্দ) ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের (৯৬০-৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ) সময়ে বহিঃশত্রুর কোন আক্রমণ ঘটে নাই। প্রথম মহীপালদেবের সময়ে চান্দেলরাজ যশোবর্মন ও তাঁর পুত্র ধঙ্গের আক্রমণের ফলে পালসাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ায় রাঢ় ও বঙ্গদেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। ১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০১-২ খ্রীস্টাব্দ) খোদিত প্রশস্তিলিপিতে জানা যায় চন্দেল-রাজ ধঙ্গদেব রাঢ় অধিকার করেন।[৭০] প্রথম মহীপালদেবের বানগড় তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে যে, তিনি শত্রুদের পরাস্ত করে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন অর্থাৎ রাঢ় ও অঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৭১] খাজুরাহো লিপি ১০০১-২ খ্রীস্টাব্দে খোদিত হলেও বানগড় লিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, ধঙ্গের রাঢ় আক্রমণ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে ঘটেছিল অথবা এই সময়ে কাম্বোজ-গণ কর্তৃক রাঢ় ও বরেন্দ্র অধিকৃত হয়েছিল। মহীপাল কর্তৃক (বানগড় লিপি

অনুসারে) বরেন্দ্রভূমি পুনরাধিকার দাবী করা হলেও তিনি রাঢ় অধিকার করতে সক্ষম হন নাই। কারণ পরবর্তী কাম্বোজরাজ নয়াপালের 'ইর্দা-তাম্রশাসন' হতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে (নয়াপালের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে) বর্ধমানভুক্তি পালরাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল না।[৭২] ইর্দালিপি হতে জানা যায় যে, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানভুক্তি নয়াপালের শাসনাধীন ছিল এবং দণ্ডভুক্তিমণ্ডল ছিল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। এ বিষয়ে ননীগোপাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন[৭৩]—"As regards the localities mentioned in the copper plate some remarks are necessary. Vardhamana Bhukti, comprising the major portion of Burdwan Division of Bengal is already known from inscriptions. But the information, that it had a mandala called Dandabhukti is now furnished by the Irda Copper Plate for the first time."

তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—"In the village of Brihat chhattibanna adjoining to Kanti Sammasha and Badakhanda within the Dand-bhukti mandala belonging to the Vardhamana Bhukti."

ইর্দালিপি হতে প্রমাণিত হয়ে যে, বর্ধমান জেলার নয়াপালের অধিকারভুক্ত ছিল। তবে কাম্বোজগণ সমগ্র বর্ধমানভুক্তি অধিকার করতে সক্ষম হন নাই, কারণ এই সময় দক্ষিণ-রাঢ়ে রণশূর নামে এক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ের দামোদর উপত্যকা অঞ্চল চোল অধিকারভুক্ত হলেও উত্তর রাঢ় মহীপালের অধিকার চ্যুতি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহীপালের পর নয়াপালের (১০২৭-৪৩ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে সম্পাদিত শিলালেখ হতে সুহ্মাধিপতির সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা জানা যায়। বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রামের শাহজপুরস্থিত মখদুম শাহ-জালালের ভগ্নপ্রায় দরগা হতে প্রাপ্ত শিলালেখ সুহ্মতে দেশ বা রাঢ়ের জিহ্ম অর্থাৎ ত্রুর নরপতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রাঢ়াধিপতি পালরাজার সামন্ত হয়েও চেদীরাজ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করে উত্তররাঢ় অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন। এরপর লিপিটি পাঠ করা যায় নাই। তবে ডঃ সরকার অনুমান করেছেন যে, সম্ভবতঃ নয়াপাল কর্ণ ও রাঢ়রাজের শাস্তি বিধান করেছিলেন। কারণ পরে শ্লোকে আছে—'চেদি-নৃপতেঃ কর্নস্য হত্বা ভটান্' অর্থাৎ চেদিরাজ কর্ণের সেনাদল ধ্বংস করেন।[৭৪] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় চেদীরাজ ও নয়াপালের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলেও সন্ধিচুক্তি বেশীদিন কার্যকরী হয় নাই।[৭৫] নয়পালের পর দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সমগ্র রাঢ় তাঁর শাসনাধীন ছিল এবং কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের সময়ে রাঢ়ে পালশাসন শিথিল হয়ে যায়।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে কৈবর্ত্তনায়ক দিব্য দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর শূরপাল ও রামপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার

করেন। উভয় ভ্রাতৃদ্বয় কারাগার হতে পলায়ন করে মগধে পালরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর শূরপাল দেহত্যাগ করেন এবং রামপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। রামপালের মাতুল অঙ্গাধিপতি মহন এবং মহনের ভ্রাতুষ্পুত্র রাষ্ট্রকূটরাজ শিবরাজ বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের জন্য তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত 'রামচরিত' কাব্যে বর্ণিত আছে যে, মহন ও শিবরাজ ব্যতীত অন্যান্য সামন্ত রাজন্যবৃন্দ ভীমের বিরুদ্ধে (দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের হস্তে নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছিল), রামপাল চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে অগ্রসর হয়েছিলেন। রামচরিতেও এর টীকায় সমর্থন আছে—

"বন্দ্যগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ।
স মহাবলৈরুপেতো জেতুং জগতীচলম্ভুষ্ণুঃ॥"

'কান্যকুব্জরাজবাজিনীগণ্ঠনভুজঙ্গো ভীমযশোঽভিধানো মগধাধিপতিঃ পীঠীপতিঃ, গুণ ইতি নানারত্নকূটকুট্টিম-বিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তী বীরগুণো নাম, সিংহ ইতি দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রভাবাকর-কমলযুগল-তুলিতোৎকলেশকর্ণকেশরী-সরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবো জয়সিংহঃ, বিক্রম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবাল-বালবলভীতরঙ্গ-বহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ, শূর ইতি অপরমন্দার-মধুসূদনঃ সমস্তাটবিকা সামন্ত-চক্রচূড়ামণিলক্ষ্মীশূরঃ, কুজবটীয-প্রতিভটকরিকূটকষণকেশরী শূরপালশ্চ। শিখর ইতি সমরপরিসরবিসরদরিরাজ-রাজি-গণ্ডগন্ধগহনদাবানলঃ তৈলকম্পীয়-কল্পতরু-রুদ্রশিখরঃ। ভাস্কর ইতি খরতরবাললীলারিতৃণবৈরিবাহিনী-রুধিরপ্রবাহবিহিতা-পরলোহিতার্ণববলয়িতোচ্ছালভূপালো ময়গলসিংহঃ প্রতাপ ইতি প্রতাপসিংহঃ প্রতিপক্ষ-কক্ষোণিভৃদক্ষৌহিণীদারুণদ্রবণভ্রূণবিভ্রংসভীষণপ্রয়াণ-ঢক্কারবো ঢেক্করীয়রাজঃ এভির্মহা-বলৈরুপেতো রামপালঃ।

"প্রাপ্তপ্রবর্দ্ধিতার্জ্জুনবিজয়োঽথিতবর্দ্ধনঃ সোমমুখশ্চ।
অনুগতমাতুলসূনু-প্রবলভুজালম্বনো রামঃ।" (রামচরিত ২ পরি°)

'প্রাপ্তো মিলিতঃ প্রবর্দ্ধিতো দেশকোষাদি-প্রসাদেন স্ফীতীকৃতঃ অর্জ্জুন ইতি কয়ঙ্গলীয়-মণ্ডলাধিপতিঃ নরসিংহার্জ্জুনঃ সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুনশ্চ বিজয় ইতি নিদ্রাবলীয়বিজয়রাজো যেন। বর্দ্ধন ইতি কৌশাম্বীপতির্গো(ত্র)-প্রবর্দ্ধনঃ বর্দ্ধনঃ, সোম ইতি পদুবম্বাপ্রতিবদ্ধমণ্ডলাপ্রতিবল্লভঃ সোমঃ, তন্মুখা অপরে চ সামন্তাঃ তৈঃ সহিতোঽনুগতানাং মাতুলপুত্রাণাং রাষ্ট্রকূটানাং বক্ষ্যমাণানাং ভুজাবলম্বং যস্য' (রামচরিত টীকা)।

রামচরিতের টীকায় সামন্ত রাজন্যবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ, অপরমন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর, তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখর, ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসিংহ, পীঠির অধিপতি ভীমযশ, কোট্টবীর রাজা বীরগুণ, দেবগ্রামের অধিপতি বিক্রমরাজ, কুজবটীর অধিপতি শূরপাল, উচ্ছলের রাজা ময়গল, নিদ্রাবলের রাজা বিজয়রাজ, কজঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামের রাজা

চণ্ডার্জ্জুন এই অভিযানে রামপালকে সহায়তা করেছিলেন।[৭৬] মনে হয় সামন্ত-রাজন্যবৃন্দ উত্তর রাঢ়ের কোন এক স্থানে সমবেত হওয়ার পর এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এবং রাজন্যবৃন্দের অধিকাংশই রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে অথবা নামমাত্র কর প্রদানপূর্বক আঞ্চলিক শাসনকরূপে স্ব স্ব অঞ্চল শাসন করতেন। শিবরাজের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিশাল সৈন্যবাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে নিহত করায় রামপাল বরেন্দ্রভুমি অধিকাব করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রামচরিতের টীকায় উল্লেখিত সামন্ত রাজন্যবৃন্দের অধিকাংশই রাঢ়ে রাজত্ব করতেন এবং পৃথকভাবে তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক—ভুগোলেব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাতে সন্দেহ নাই।

১। দণ্ডভুমির রাজা জয়সিংহ—নয়াপালের ইর্দালিপিতে আছে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি মণ্ডল অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই বা কংশাবতী নদীর দক্ষিণ তীর হতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। সম্ভবতঃ জয়সিংহ ছিলেন কাম্বোজ কুলোদ্ভব নৃপতি।

২। অপরমন্দারমধুসুদন শূরপাল লক্ষ্মীশূর—হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল নিয়ে আর্টবিক প্রদেশ গঠিত ছিল। আরামবাগ হতে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিতরগড় বা গড় মান্দারণে শূররাজাদের রাজধানী ছিল বলে অনুমান করা হয়।

৩। তৈলকম্পের রাজা রুদ্রশিখর—শিখরভুম রাজ্যের নৃপতি রুদ্রশিখরের রাজধানী পুরুলিয়া জেলার তেলকুপীর প্রাচীন নাম ছিল তৈলকম্প। পরবর্তীকালে এই রাজ্য পঞ্চকোট নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্লকম্যানের মতে[৭৭] সরকার মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত শেরগড় পরগণা এক সময়ে শিখরভুম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ রানিগঞ্জ অঞ্চল হতে পুরুলিয়া জেলা পর্যন্ত শিখরভুম রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল।

৪। ঢেক্করীর রাজা প্রতাপসিংহ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে[৭৮] রাজা প্রতাপ সিংহের রাজধানী ঢেক্করগড়ের অবস্থিতি হল অজয়নদের দক্ষিণ তীরে আউসগ্রাম থানার গৌরাঙ্গপুরে (২৩° ৩৮′ উঃ অঃ এবং ৮৭° ৩৪′ পূঃদ্রাঃ)। ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ঢেক্করীর উল্লেখ আছে। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, কেন্দুলী হতে ৬ মাইল দক্ষিণে আউশগ্রাম থানার প্রতাপপুর হল প্রাচীন ঢেক্করী।[৭৯]

৫। উচ্ছালরাজ ময়গলসিংহ—নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে শিউড়ী হতে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বর্তমান মহলপুর বা মোলপুরের প্রাচীন নাম ছিল ময়গলপুর এবং এতদঞ্চল জৈন-উঝিয়াল পরগণা নামে পরিচিত, যা প্রাচীন উচ্ছাল নামটির স্মৃতি বহন করছে।[৮০] কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁর মতে আইন-ই-আকবরী বর্ণিত এই নামে ১১টি পরগণার অস্তিত্ব বঙ্গদেশে আছে।[৮১] কিন্তু অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন যে, রায়না থানার উচালন গ্রামকে ঘিরে প্রাচীন উচ্ছাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

উচালনের নিকটে মইগ্রামে, ময়রাজার ঢিবি বা পোতা, যা স্থানীয়ভাবে রাজার পোতা নামে খ্যাত এবং উচালন গ্রামে দেবী উচ্চৈশ্বরী হলেন পূজিতা গ্রাম দেবী। এসকল প্রাচীন নিদর্শনাবলী হতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ময়গলসিংহের রাজত্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।[৮২]

৬। নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ—নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানা হতে ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং বোয়ালিয়ার ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে নিদ্রালী গ্রাম এবং তিনি অনুমান করেছেন যে, বিজয়রাজ ও বিজয়সেন অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর এই অভিমত পরস্পরবিরোধী ; কারণ বিজয়সেন ও রামপাল সমসাময়িক হলেও একই অঞ্চলের উপব প্রভুত্ব করেন নাই এবং বিজয়সেনের অভ্যুদয় ঘটেছিল রাঢ়ে। তাছাড়া ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার করলে দেখা যায় যে, দিব্য বা ভীমের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের কোন সামন্ত রাজাব পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করা সম্ভবপর নয়। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল অনুমান কবেন যে, দামোদর-মুণ্ডেশ্বরীর উপত্যকায় নিদ্রাবল রাজ্য অবস্থিত ছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনাবলী দেখে আচার্য সুনীতিকুমার বিজয়গঞ্জ-নলে গ্রামকে প্রাচীন বলে সনাক্ত করেছেন।[৮৩] কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে একই অঞ্চলে সমসাময়িক উচ্ছাল ও নিদ্রাবলী নামক রাজ্যদ্বয় কিভাবে গড়ে উঠা সম্ভবপর হতে পারে ?

৭। সঙ্কটগ্রামের রাজা চণ্ডাজুর্ন—সরকার সাতগাঁও-এর অন্তর্ভুক্ত সকোটা পরগণার[৮৪] প্রাচীন নাম সঙ্কট গ্রাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৮। কোট্রবীর রাজা বীরগুণ—ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে মহাল কোটদেশ বিষ্ণুপুরের পূর্বে অবস্থিত ছিল। তাহলে বাকুড়া জেলার কোতলপুর থানা ও বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানা নিয়ে এ রাজ্য গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আইন-ই-আকবরীতে কটক সরকারের অন্তর্গত কোটদেশ পরগণার উল্লেখ আছে।[৮৫]

৯। কজঙ্গলের রাজা নরসিংহাজ্জুর্ন—রাজমহলের দক্ষিণে বীরভুম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত ছিল।

১০। কুজবটির রাজা শূরপাল—সম্ভবতঃ সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত ছিল।

১১। পীঠি—বিহারের গয়া জেলায়।

১২। দেবগ্রাম—দেবগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে, তবে নদীয়া জেলায় অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

(৬)

পালযুগে রাঢ়-বরেন্দ্র জনপদ পালরাজাদের অধিকারভুক্ত হলেও রাঢ়অঞ্চলে অর্ধস্বাধীন বা অধীনতামূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ কিছু সামন্ত রাজন্যবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেবপালের পরবর্তী সময়ে কাম্বোজ ও শূরবংশীয় রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে অথবা সামান্যতম কর প্রদানপূর্বক রাজ্যশাসন করতেন।

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার রাণীসঙ্কৈল থানার অধীনস্থ রামগঞ্জ নামক গ্রামে রাঢ়েশ্বর ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাম্রশাসনখানি 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩২০ সাল) অক্ষয়কুমার মৈত্র ও বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মুখপাত্রে ননীগোপাল মজুমদাব কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় রাঢ়ের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ইতিহাসের আংশিক অধ্যায় উন্মোচিত হয়। রামগঞ্জ তাম্রশাসনে কোন সাল তারিখ উৎকীর্ণ নাই; কেবলমাত্র খোদিতলিপি হতে জানা যায় যে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর-ঘোষের ৩৫তম রাজ্যাঙ্কে মার্গশীর্ষমাসের প্রথম তারিখে তাম্রশাসনখানি সম্পাদিত হয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শাসনখানির লিপি সেনআমলের পূর্ববর্তী।[৮৬] ননীগোপাল মজুমদারের মতে রামগঞ্জলিপির সঙ্গে প্রথম মহীপালেব বানগড়লিপির সাদৃশ আছে।[৮৭] মহামাণ্ডলিক উপাধিযুক্ত শাসকের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আভিধানিক অর্থে 'মণ্ডল' শব্দের অর্থ—'স্যাম্মণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশ অর্থাৎ দ্বাদশটী সামন্তরাজের উপর যিনি প্রভুত্ব করেন, তিনিই মাণ্ডলিক এবং মাণ্ডলিকের বা মাণ্ডলিকগণের উপর যিনি কর্তৃত্ব করেন তিনি 'মহামাণ্ডলিক'। রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় মহাবাজাধিবাজ পরমভট্টারকের পবেই মহামাণ্ডলিকের স্থান।[৮৮] পালযুগের তাম্রশাসনগুলিতে দেখা গেছে একমাত্র ঈশ্বব-ঘোষ ব্যতীত এই উপাধি অন্য কোন সামন্তরাজার উপর অর্পিত হয় নাই। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আছে[৮৯]—"ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপতি বলবর্ম্মন"।

রামচরিতের টীকায় পাওয়া যায় স্থানীয় শাসকগণ রাজা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন অর্থাৎ রামপালের সময়ে (১০৭৭-১২২০) স্থানীয় শাসকবৃন্দ মাণ্ডলিক বা মহামাণ্ডলিক নন। সেকারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, ঈশ্বরঘোষ একাদশ শতকের পূর্ববর্তী কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

খজুরবাহক মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণলিপি হতে অনুমান করা যায় যে, রাঢ়েশ্বর, ধঙ্গের হস্তে বন্দী বা নিহত হয়েছিলেন এবং এই রাঢ়েশ্বর যে ঈশ্বরঘোষ নন এ বিষয়ে নিশ্চিত মন্তব্য করা যায়, কারণ তিনি ৩৫ বছরের অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন। রামচরিতে বর্ণিত আছে যে, ঢেক্করীরাজ প্রতাপ সিংহ অর্থাৎ ধঙ্গের রাঢ় অভিযানের ফলস্বরূপ সম্ভবতঃ ঈশ্বরঘোষের বংশ লুপ্ত হয়ে যায় এবং সিংহবংশ ঐ রাজ্য অধিকার করে। তাহলে ঈশ্বরঘোষ ধঙ্গের পূর্ববর্তী সময়ে রাজত্ব করেছিলেন।

রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গলে' ঢেকুররাজ ইছাইঘোষের উল্লেখ পাওয়া গেলেও ঐ সময়ে গৌড়েশ্বরের কোন পরিচয় জানা যায় না। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত আছে ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর। কোন নামোল্লেখ না থাকায় দেবপালকে গৌড়েশ্বর হিসাবে ধরা হয়; আবার অনেকে অনুমান করেন যে, ত্রিভুবনপাল ছিলেন গৌড়ের-রাজা। কিন্তু জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন হতে জানা যে, দেবপাল ছিলেন পালবংশের তৃতীয় নৃপতি। সাম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত আদি ঢেকুরপালার পুঁথিতে গৌড়েশ্বরের নাম জানা যায়[৯০]—

'তোমার উপরে সাজ্যা আল্য দেবপাল।
বিপাক হইল বড় বাড়িল জঞ্জাল ॥'

উক্ত পুঁথিতে আরও বর্ণিত আছে—

'তব পিতা ধর্ম্মপাল প্রবল প্রতাপে।
রাজা সব ছিল বশ অরিবর্গ কাঁপে ॥'

শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'ধর্মমঙ্গল' আবিষ্কৃত হওয়ায় 'ধর্মপালের বেটা'—এই রহস্যের ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান কিঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে গৌড়েশ্বরেব আত্মীয় কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন বর্ধমান জয় করে উত্তরে ঢেকুর অঞ্চলে ইছাইঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে স্যার ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে গৌড়েশ্বর হলেন দেবপাল।[৯১]

অনেকে অনুমান করেন যে, ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ পালযুগের শেষ পর্বে বর্তমান ছিলেন। আবাব অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। বিনয় ঘোষের মতে[৯২] ইছাইঘোষ বা ঈশ্বরঘোষ ছিলেন হরিশচন্দ্রের সমসাময়িক এবং এই অঞ্চল পালযুগে 'গোপভূম' নামে খ্যাত ছিল। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখা যায় বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন ইছাইঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন এবং ঐ মতে চিত্রসেন ও লাউসেন অভিন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের একই ভুল হাণ্টার ও পিটারসন করে গেছেন।[৯৩] তাঁরা একেবারেই ভুলে গেছেন যে, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল রচনার সময়ে (১৭১১ খ্রীস্টাব্দে) কীর্ত্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন কয়েক বছরের বালক মাত্র এবং রূপরামের সময়ে (ইনি সুলতান স্তজার সমসাময়িক) চিত্রসেনেরর আদিপুরুষগণ বর্ধমানে আগমন করেন নাই।

উপরোক্ত অনুমান বা সম্ভাবনার উত্তরে বলা যায় যে রামগঞ্জ তাম্রশাসনে উল্লেখিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের পরিচয় পালযুগের শেষ পর্বে কোন নৃপতির তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত রাজকর্মচারীগণের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় বিজিত হয়েছিল এবং সেই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ের শাসনকর্তা বা অধিপতি ছিলেন রণশুর। আলোচ্য সময়ে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ জীবিত থাকলে অন্যান্যদের ন্যায় তিরুমলয় গিরিলিপিতে তাঁর নাম নিশ্চয় খোদিত থাকার সম্ভাবনা ছিল। শিখরভুমের রাজা হরিশ্চন্দ্র ইছাইঘোষের প্রায় ৫০০ বছরের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হযেছিলেন তার প্রমাণ মেলে পঞ্চদশ শতকে বরাকরের মন্দিরলিপিতে। বরাকরেব মন্দিরগুলি (৪র্থ টি বাদে) ১৩৮৩ শকাব্দে (১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে) হরিশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[৯৪] ইছাইঘোষ যে, রামপালের সমসাময়িক নন একথা পূর্বে বলা হয়েছে। একাদশ শতকে রাঢ়ে লক্ষ্মীশুর, রুদ্রশিখর, প্রতাপসিংহ, ময়গলসিংহ, বিজয়রাজ, জয়সিংহ, চণ্ডার্জুন, বীরগুণ,

নরসিংহার্জুন প্রভৃতি সাধারণ রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একজন মহামাণ্ডলিকের স্থান নাই। সেকারণে বলা যায় যে, কৈবর্ত্তবিদ্রোহের সময় তিনি বা তাঁর কোন বংশধর জীবিত ছিলেন না।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ঢেক্‌করী বা ঢেকুরের অবস্থিতি ছিল গোয়ালপাড়া অথবা কামরূপে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতে 'ঢেক্‌করী' বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। তাম্রশাসনখানির প্রথম ছত্রে খোদিত আছে—"বভুব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা"। পণ্ডিত বচ্ছ ঝা, অক্ষয়কুমার মৈত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসুর পাঠে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ননীগোপাল মজুমদার ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের পাঠে পার্থক্য সূচিত হলেও তিনি অক্ষয়কুমারের পাঠকে অস্বীকার করেন নাই। Corpus of Bengal Inscriptions[৯৫] গ্রন্থে এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ হল নিম্নরূপ—'From the ruler of Radha was born the illustrious Dhurtaghosa, as terrible as the hot-rayed sun an banner to the family of kings; by the edge of his sharp sword he extinguished completely the pride of his host of enemies.'

তাহলে শাসনোক্ত রাজার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন রাঢ়ের অধিপতি এবং রাঢ়াধিপ ঈশ্বরঘোষের পক্ষে বরেন্দ্র ও কোচদেশ অতিক্রম করে কামরূপে গিয়ে তাম্রশাসন প্রদান করা ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যাও নহে। কারণ নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে পশ্চিমরাঢ়ের অজয়নদের তীরে ঢেকুর (প্রাচীন নাম ঢেক্‌করী) হতেই ধূর্ত্তঘোষ প্রভৃতি আসামে আগমন করেন এবং ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত জটোদা নদীর তীরে ঢেক্‌করী হতে তাম্র-শাসনখানি সম্পাদিত হয়। ব্যাপারটা তিনি বেশ জটিল করে ফেলেছেন। কেবলমাত্র কালিকাপুরাণ হতে জটোদা নদীর উদ্ধৃতি দিয়ে স্থানটি কামরূপে সনাক্ত করা যায় না। ননীগোপালের পাঠে আছে—'জটোদায়াং', যা অক্ষয়কুমারের মতে গঙ্গার নামান্তর।[৯৬] রামচরিতের প্রতাপসিংহ ঢেকুরীরাজ এবং মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষও ঢেক্‌করী হতে তাম্রশাসনখানি সম্পাদিত করেন। উভয় ঢেক্‌করী এক ও অভিন্ন। এতদ-অঞ্চলে কোন পুণ্য কার্য করার পূর্বে গঙ্গাস্নানের বিধি বা প্রথা আজও আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তাঁর 'কায়স্থ'-তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে এরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

রামগঞ্জ তাম্রশাসনে খোদিত আছে যে, ঘোষ বংশোদ্ভূত ধূর্ত্তঘোষের পুত্র বালঘোষ ছিলেন যুদ্ধ ব্যবসায়ী এবং তিনি অনেক যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করেছিলেন। বাল-ঘোষের পুত্র ধবলঘোষের খ্যাতি সূর্যকিরণের ন্যায় বিকশিত হত। সীতা ও পদ্মা স্বরূপা তাঁর পত্নী সম্ভাবার গর্ভে ঈশ্বরঘোষ নামক পরাক্রমশালী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। ঈশ্বরঘোষ মহারাজাধিরাজ সার্বভৌম নরপতি ছিলেন না এবং সম্ভবতঃ দেবপালের অধীনস্থ মহামাণ্ডলিক ছিলেন। তাম্রশাসনে ঈশ্বরঘোষের পিতার নাম ধবলঘোষ; কিন্তু ধর্মমঙ্গলে আছে—'সোমঘোষের বেটা'। তিনি অন্ততঃপক্ষে ৩৫

বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেছিলেন, তার প্রমাণ শাসনলিপিতে পাওয়া যায়। মনে হয় যে তিনি দেবপালের বশ্যতা স্বীকার না করায় ময়নাগড়ের সামন্তরাজ কর্ণ-সেনের পুত্র লাউসেন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে লাউসেন প্রথমে পরাজিত হলেও শেষ পর্যাযে ইছাইঘোষ নিহত হন। অবশ্য এ কাহিনীর মূলে কতটা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তা নির্ণয করার কোন উপায় নেই।

রাজধানী বা প্রধান শাসন-কার্যালয ঢেক্করী হতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ভার্গব গোত্রীয নিম্বোক শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে দিগ্ঘা মোদিকা গ্রাম দান করেন। উক্ত শাসনে বাজন, রাজ্ঞী, রাজন্যক, মানক, রাজপুত্র, কুমারামাত্য, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, মহা-সেনাপতি, মহাপাদমূলিক, মহাভোগপতি, মহাতন্ত্রাধিকৃত, মহাব্যূহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, মহাকসযস্থ, মহাবলাকোষ্ঠিক, দণ্ডপাণিক কোপাপতি, হট্টপতি, ভুক্তিপতি, বিষযপতি, ঔথিতাসনিক, মহাবলাধিকরণিক, মহাসামন্ত, মহাকট্টুক ঠক্কুর আঙ্গিকরণিক, অন্তঃপ্রতিহাব, দণ্ডপাল, খণ্ডপাল, দুঃসাধ্যসাধনিক, চৌবোদ্ধরণিক, উপরিক, তদানি-যুক্তক, আভ্যন্তরিক, বানাগারিক, খড়্গগ্রাহ, শিরোরক্ষিত, বৃদ্ধধানুষ, দূতগমাগমিক, লেখক, দূতপৈষনিক, পানীয়গারিক, দূতপ্রেষনিক, সান্তরিক, কর্মকর, গৌনামিক, শৌনাবিক প্রভৃতি রাজপুরুষেব পবিচয পাওয়া যায। বাংলাদেশে এরূপ অসংখ্য রাজপুরুষের পরিচয়সহ সম্পাদিত তাম্রশাসন বিরল। এতদ্ব্যতীত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গরু, মহিষ, ছাগ, ভেড়া, খচ্চব প্রভৃতি জীবজন্তু তদারকের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। নৌবাহিনার পরিচালনাব জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্তির উল্লেখ আছে।

প্রবাদ বা জনশ্রুতিতে ইছাইঘোষ বা ঈশ্বব ঘোষেব জাতি বা গোষ্ঠী নির্ণয় করাব বহু অসুবিধা দেখা যায। আসল বস্তুলুপ্ত হওযায় উপক্রম হয়েছে। তিনি জাতিতে কাযস্থ বা সদগোপ ছিলেন না। ধর্মমঙ্গলেব 'ইছাই গোয়ালা,' তাম্রশাসনে পরিষ্কাবভাবে স্বীয বংশপরিচয প্রসঙ্গে 'ঘোষ কুলোদ্ভব' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইছাইঘোষ সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধর্মমঙ্গল ও স্থানীয জনশ্রুতিতে এ সম্পর্কে কিছু পথনির্দেশের ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলি ইতিহাস না হলেও ইতিহাসের ইঙ্গিতের পরিচয়কে বহন করছে। অবশ্য এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান বা গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ইছাইঘোষের রাজধানী বা গড় ছিল বনজঙ্গলে ঘেরা। অজয়নদের দক্ষিণ তীরে আউশগ্রাম থানার রুক্ষ মাটির দেশে গভীর জঙ্গলে গৌরাঙ্গপুর, গড়কিল্লা, খেড়োবাড়ী অঞ্চলের মধ্যে তাঁর রাজধানী ঢেকুরগড় বা ত্রিষষ্ঠী গড়ের অবস্থিতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। তিনি শক্তিদেবীর উপাসক ছিলেন এবং এই অঞ্চলে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে শ্যামরূপার গড় নামে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে, পরবর্তীকালে দেবী শ্যামারূপাকে কল্যাণেশ্বরীতে স্থাপিত করা হলে তিনি কল্যাণেশ্বরী নামে খ্যাত হন। গৌরাঙ্গপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঢোকারু বা

ঢোকরাদের (লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাতাগণ) বসবাসের নজীর পাওয়া যায়।[৯৭] তবে কি ঢোকরাগণই ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত লোহাটার উত্তরপুরুষ ?

মহিমারঞ্জন চক্রবর্তীর মতে কোটালপুকুর, চৌকিগড়ে, লোহাটারপুরী, গড়গোপালপুর প্রভৃতি স্থান ছিল সেনানিবাস ; যেগুলি অতীতের নামের সাক্ষর আজও বহন করছে। ত্রিষষ্ঠীগড়ের পূর্বভাগে কোটালপুকুর, দক্ষিণে চৌকিগড়ে ও লোহাটাপুরী, পশ্চিমে গড়গোপালপুর ও খরুড়ার সেনানিবাস মূল-গড়ের সীমান্তগুলিকে রক্ষা করত।[৯৮]

তাম্রশাসনে দানকৃত গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, পিপোল্লমণ্ডলান্তঃ—পাতী গাল্লিটিপ্যাক্ বিষয় সম্ভোগ দিগ্ঘা সোদিকা গ্রামখানি নিম্বোক শর্ম্মাকে দান করা হয়েছিল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে রাঢ়াপুরী (সম্ভবতঃ বর্তমান আড়া) হতে ৮৷১০ ক্রোশ দূরে দিঘা ও সোয়ারা নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম আছে এবং স্বল্প ব্যবধানে গোলিষ্ঠা নামেও একটি গ্রাম আছে। গুসকরার উত্তরে দীঘা ও সোয়ারা গ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার গলিষ্ঠা বা গতিষ্ঠা গ্রাম সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। শাসন বর্ণিত পিপোল্লমণ্ডল একটি অপরিচিত নাম। গ্রামগুলি অত্রস্থানে অবস্থিত হলে কাঁকসা, আউশগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশ নিয়ে পিপোল্লমণ্ডল নামক জেলা / জনপদটি গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[৯৯]

আউশগ্রাম থানার গৌরাঙ্গপুরের জঙ্গলের মধ্যে ইঁটের নির্মিত রেখদেউলটি ইছাই ঘোষের দেউল নামে বিখ্যাত। ইছাই ঘোষের নামটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য সম্ভবতঃ গোপভূমের সদগোপ রাজারা পরবর্তীকালে এই দেউল নির্মাণ করেছিলেন। তবে দেউলটি পঞ্চদশ শতকের পূর্বে নির্মিত হয় নাই, বলা চলে।[১০০]

(৭)

পালযুগে রাঢ়ের দক্ষিণঅঞ্চলে শূররাজাদের রাজত্ব বিষয়ে কিছু বিবরণ জানা যায়। শূরবংশীয় রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন আদিশূর। কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত করে আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে।[১০১] রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার মতে[১০২]—

'আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান পঞ্চ পঞ্চগোত্র সমুদ্ভবান ৷৷'

কুলপঞ্জিকা ভিন্ন আদিশূরের পরিচিতির অপর কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। আবার অনেকে গৌড়রাজ জয়ন্ত ও আদিশূরকে অভিন্ন মনে করেন এবং তিনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সমসাময়িক।[১০৩]

রাঢ়ীয় কুল মঞ্জরীতে শূর বংশের পরিচয় পাওয়া যায়—

আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবণ্যশূরঃ।
ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণাশূরঃ ৷৷'

একমাত্র রণশূর ব্যতীত অন্যান্য শূরবংশীয় নৃপতিগণ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সমর্থিত হন নাই।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন যে, আদিশূরের অনুরূপ এক কাহিনীতে তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপনের কাহিনী সম্ভবতঃ পাল-সেন যুগে বাংলায় উপনিবিষ্ট দক্ষিণ ভারতীয়েরা এদেশে আমদানি করেছিলেন।[১০৭] আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত আছে যে, শূরবংশীয় আদিশূরের একাদশ বংশধরগণ ৭১৪ বছর রাজত্ব করেন। অনুরূপভাবে পাল ও সেন বংশীয় নৃপতিগণের যে তালিকা পাওয়া যায় সেগুলি ইতিহাসসম্মত নয়। তাছাড়া বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস সম্পর্কে আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন যে, ৬১১ জন নৃপতি ৪৫৪৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৩২০৪ অব্দে বাংলার রাজন্য ইতিহাস শুরু হয়েছিল।[১০৫] এ উক্তিও ইতিহাসের স্ববিরোধী মন্তব্য। কেবলমাত্র কুলপঞ্জিকাতে উল্লেখিত ৫৬ খানি রাঢ়ীয় গ্রাম পাঁচটি গোত্রের ব্রাহ্মণগণকে দান করার প্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে আদিশূরের ঐতিহাসিকতাকে স্বীকার করা যায় না।

আদিশূরের বহুপূর্বে মল্লসারুল তাম্রশাসনে বেদজ্ঞ কৌণ্ডিন্য শাখার ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসনে ভরদ্বাজ গোত্রীয়, জয়নাগ ও শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসনে কাশ্যপ গোত্রীয় ও ভাস্কর বর্মার নিধনপুর শাসনে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস, শাণ্ডিল্য ও সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৬] ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ভার্গবগোত্রীয় নির্বোক শর্মা ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ।[১০৭] খোদিত তাম্রশাসন হতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হতে রাঢ়ে ব্রাহ্মণ বসতি শুরু হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ বসতির সঙ্গে আদিশূরের সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজত্বে রাঢ়-বরেন্দ্রে বর্ণ-বিভাগ একাকার হয়েছিল এবং নূতন করে সমাজ বিন্যাসের চেষ্টার সময়ে রাঢ়-বরেন্দ্রে গাঁঞীর উদ্ভবের সময়ে আদিশূর নামক এক কল্পিত রাজাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু রাঢ়ের শূররাজবংশে যে বিবরণ রচনা করেন তাতে জানা যায় যে, জয়ন্ত বা আদিশূরের পুত্র গৌড় ত্যাগ করে রাঢ়ের সাতশইকায় রাজধানী স্থাপনপূর্বক নিরাপদে রাজত্ব করেন। ভু-শূরের রাজধানীর নাম ছিল শূরনগর, যা বর্তমান মন্তেশ্বর থানার 'শূরো' নামক একটি সাধারণ গ্রামে পর্যবসিত হয়েছে। ভু-শূরের সময়ে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী নামে ব্রাহ্মণ সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়েছিল। ভু-শূরের পুত্র ক্ষিতিশূরের আমলে দেবপাল উত্তর রাঢ়দেশ অধিকার করেন এবং শূর বংশীয় রাজারা দক্ষিণ রাঢ়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই সময়ে ক্ষিতিশূরের পুত্র অবনীশূর ছিলেন শূরবংশের রাজা। বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড়ের পালনৃপতিগণ বারবার পর্যুদস্ত হলে অবনীশূরের পুত্র আদিত্যশূর উত্তর রাঢ় অধিকার করে সিংহেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করেন।[১০৮] শূর নৃপতিগণের ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত

হলে সিয়ান শিলালেখতে কুরমতি সুহ্মাধিপতি হলেন আদিত্যশূর, যিনি চেদীরাজ কর্ণকে পালরাজ্য আক্রমণে সহায়তা করেছিলেন।

আদিত্যশূরের পর ধরাশূর ও তৎপুত্র অনুশূর রাঢ়ে রাজত্ব করেন এবং অনুশূর দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত অপারমান্দারে রাজধানী স্থাপন করেন। অনুশূরের পর যামিনীশূর (আইন-যামিনীভান) রাঢ়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা রাঢ় আক্রমণ করে রানীকে বন্দিনী করে চন্দেল্ল কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[১০৯] যামিনীশূরের পর রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলায় লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের নৃপতি রণশূরের নাম পাওয়া যায়। রণশূরের পর বরেন্দ্রশূর, তৎপুত্র প্রদ্যুম্নশূর তৎপুত্র লক্ষ্মীশূর রাঢ়ে রাজত্ব করেন[১১০] এবং লক্ষ্মীশূরই সম্ভবতঃ শূর-বংশের শেষ নৃপতি যার পরিচিতি রামচরিতের টীকায় 'অপারমন্দার মধুসূদন' রূপে উল্লেখিত। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ভু-শূরের আমল হতে আদিত্যশূরের আমল পর্যন্ত শূররাজারা বর্ধমান জেলার শূরনগর বা শূরো হতে রাজ্য পরিচালনা করতেন।

রামচরিতের টীকায় উল্লেখিত লক্ষ্মীশূর বর্তমান গড়মন্দারণকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ রাঢ় অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত অটবী প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রচোলের সমসাময়িক রণশূর ও রামপালের সমসাময়িক লক্ষ্মীশূরের আত্মীয়তা সূত্রের বিষয় জানা যায় না এবং উভয়ের রাজত্বকালের ব্যবধান ছিল প্রায় ৫০ বছর। সম্ভবতঃ রণশূর ও লক্ষ্মীশূর একই বংশোদ্ভূত ছিলেন। বিজয়সেনের 'ব্যারাকপুর তাম্রশাসন' ও বল্লালসেনের 'সীতাহাটি-নৈহাটী তাম্রশাসনে' উল্লেখিত আছে যে, বিজয়সেন শূররাজ-বংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।[১১১] কিন্তু শূররাজকন্যা ব্যতীত বিলাস দেবীর পিতৃ পরিচয় জানা যায় না। তবে লক্ষ্মীশূর ও বিজয় সেন সমসাময়িক স্থানীয় শাসক ছিলেন এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। লক্ষ্মীশূরের সময়ে উৎকল-রাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক শূররাজ্য আক্রান্ত হয়েছিল এবং রাঢ়ে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। দামোদরের তীর হতে ভাগীরথীর পশ্চিম-অঞ্চল পর্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্যের অধীনস্থ হয়েছিল।[১১২] এই সময়ে রাঢ়ের পশ্চিমভাগ বিজয়সেনের শাসনাধীন ছিল। মনে হয় কলিঙ্গ সৈন্যের পুনরাক্রমণের ভয়ে শূররাজ লক্ষ্মীশূর স্বীয় কন্যার সঙ্গে বিজয়সেনের বিবাহ দিয়েছিলেন। চোড়গঙ্গ কর্তৃক রাঢ় আক্রমণ ১১১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল।

অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে শূররাজাদের রাজধানী শূর-নগরের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে অতীতের শূরনগর বর্তমান মন্তেশ্বর থানার অধীনস্থ শূরো বা শূউরো নামে পরিচিত। শূরনগরের নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে এই স্থানে কোন শূররাজার রাজধানী ছিল। স্থানীয় প্রবাদে শূর রাজধানীর নামের সঙ্গে আদিশূরের নাম জড়িয়ে আছে। নিকটবর্তী স্থানের অট্টালিকা ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান শতকের প্রথমভাগেও বিদ্যমান ছিল। শূউরোর

সন্নিকটে সোনাডাঙ্গারগড়টিও বেশ প্রাচীন। এই অঞ্চলের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু হল রাইগ্রামের একটি উচ্চ ঢিবিতে আবিষ্কৃত আদিবরাহদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি এবং ঐ মূর্ত্তিটি রাইগ্রামেই রক্ষিত ছিল। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীশ্রী ববাহ গোপালদেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ১৫।১৬ ফুট উচ্চ ভূখন্ডে উপর বিদ্যমান ছিল, যার নিদর্শনস্বরূপ ইষ্টক স্তূপ ও চারিটি বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভের অংশ দেখা যায়। প্রস্তবস্তম্ভের মধ্যে দুটির উচ্চতা ছিল ৮½ ফুট ও বেড় ৬ ফুট এবং অপর দুটির উচ্চতা ৫ ফুট ও বেড় ৬ ফুট। ঐ গ্রামের মুসলমান অধিবাসীগণের মতে এটি আওউল রাজাব গোপাল মন্দির। আউল অর্থে আদি বা প্রথম ধরে আদিশূরের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয়। উক্ত ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে অবস্থিত মসজিদটি সম্রাট আকববের আমলে নির্মিত বলে দাবী করা হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে আদি ববাহদেবের মন্দির ধ্বংস করে ঐ মন্দিরের উপাদান দিয়েই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[১৩] বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Eastern Indian School of Mediaval Scripture (plate XLV b) গ্রন্থেও অত্রস্থানে প্রাপ্ত আদি বরাহদেবের আলোক-চিত্র আছে। এছাডা খড়ি নদীব সন্নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামকে শূররাজাদের অধিকার-ভুক্ত বলে অনুমান করা হয। এব মধ্যে ভাতুরিয়া, চক্‌বামুনগাড়িয়া, সোনাডাঙ্গা গোকর্ণ, গোহালবাটী প্রভৃতি গ্রামগুলিকে প্রাচীন বলে দাবী করা হলেও[১৪] এ বিষয়ে সংশয়াতীতভাবে কোন ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুপস্থিত।

(৮)

উপর্যুপরি বহিঃশত্রুব আক্রমণ ও সর্বশেষে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের ফলে বামপালের বাজত্বেব শেষ ভাগে পালশক্তিব কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাঢ় অঞ্চলের শাসকবর্গ নামে মাত্র তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেও কার্যতঃ তাঁবা স্বাধীন ছিলেন। কলিঙ্গবাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেবের কেন্দুপাটনা তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, অনন্তবর্মা গঙ্গাতীরবর্তী ভুভাগে কর সংগ্রহ করেছিলেন।[১১৫] অনন্তবর্মা উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করেন এবং তাঁর সহায়তায় বিজয়সেন রাঢ় জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১৬] সুকুমার সেনের মতে[১১৭]—"বাংলার সেনরাজাদের আদিনিবাস ছিল অজয়-দামোদর উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমের মধ্যভাগে, যা সেনভুম নামে পরিচিত ছিল।" এস. এন. রাজগুরুর মতে সামন্তসেন, অনন্তবর্মা অথবা তাঁর শ্বশুর বীরচোড়ের (বেঙ্গীর শাসক) সহায়তায় রাঢ়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।[১১৮] সিয়ানলিপিতে রাঢ়রাজের সহায়তায় কর্ণদেব কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য আক্রমণের বিষয় জানা যায়।[১১৯] সম্ভবতঃ সেনবংশের আদি পুরুষ সামন্তসেন, গাঙ্গেয়দেব অথবা কর্ণদেবের রাঢ়-গৌড় অভিযানের সময় অন্যান্য কর্ণাটকী সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এসেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাসে মনস্থ করে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।[১২০] অন্য মতে চালুক্যরাজ

বিক্রমাদিত্যের 'আচ' নামক এক সামন্ত বঙ্গ-কলিঙ্গে প্রভুত্ব স্থাপনের সময় সেনবংশের পূর্বপুরুষ এই অভিযানে অংশগ্রহণকালীন রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন।[১২১] অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, বীরসেন যে এ বংশের আদি পুরুষ তার পরিচয় দেওপাড়া লিপিতে উল্লেখ আছে।[১২২]

নৈহাটী তাম্রশাসন প্রসঙ্গে ননীগোপাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন—[১২৩]

"......the Senas originally came from Karnnata in the Deccain And this record difinitely states that the immediate predecessors of Samantasena, who are described as *rajputras* or princes, settled in Radha, i. e. roughly the Burdwan Division. It is just passible that these fortune—seekers from the south poured into Bengal at a time when the imperial power of the Palas was getting weaker and weaker."

ডঃ সুশীলা মণ্ডলেব মতে রাঢ়দেশ যে সময়ে কর্ণাটবাজের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময়ে চন্দ্রবংশীয় কোন সেনপরিবার এতদঅঞ্চলে বসবাস স্থাপন কবেন।[১২৪] সম্ভবতঃ সামন্তসেন বাল্যে ও যৌবনে বাঢ়দেশে ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গঙ্গাতীরে বসবাস করেন।

বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপিতে খোদিত আছে[১২৫]—"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলোশিরদাম সামন্তসেনঃ।" লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে যে, সেনবাজারা ছিলেন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।[১২৬] প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে এরূপ ঐতিহাসিক নজির আছে যে, ব্রাহ্মণগণ রাজ্যশাসন বা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতেন।[১২৭]

বল্লালসেনের নৈহাটী-তাম্রশাসনে আছে—"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা-নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ" ও "আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ মনোরাজ্যসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা—শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ" অর্থাৎ "সেই সমৃদ্ধশালী বংশে (চন্দ্রবংশে) রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা সদাচারচর্য্যার খ্যাতি ও গৌরব দ্বারা রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করেছিলেন। সেই রাজপুত্রগণের বংশধর শত্রুসেনা সাগরের প্রলয়-তপন, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্ক স্বরূপ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত সুহৃদ্গণের মনোরাজ্যে হিমাচলের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠ, সত্যশীল ও অকপট করুণাধার সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।"[১২৮] সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের পরিচয় শিলালেখ, তাম্রশাসন ও দানসাগরে (শ্লোক ৩) উল্লেখিত হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা বা রাজ্যশাসন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। রাঢ়ে সেনবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়সেন এবং তাঁর পিতা হেমন্তসেন সম্ভবতঃ উত্তর রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার

করেন, যে সময়ে শূর রাজগণ দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করতেন।[১২৯] বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে সেনভূম পরগণার অস্তিত্ব 'সেন' আধিপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেন অধিকার হতে যে, সেনভূম পরগণার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে।

একাদশ শতকে প্রতাপ সিংহ আউসগ্রাম মঙ্গলকোট (ঢেক্করীরাজ) অঞ্চলে এবং সামন্তসেন গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল অধিকার পূর্বক জেলার উত্তর-পূর্বভাগে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমভাগও তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। সম্ভবতঃ শূররাজাদের রাজধানী শূরনগর তাঁরা অধিকার করার ফলেই শূরবংশীয় নৃপতি রাঢ় হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

রামচরিতের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, একাদশ শতকে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে শিখরভুমের রাজা রুদ্রশিখর, হুগলী-বর্ধমান সীমান্ত অঞ্চলে লক্ষ্মীশূর, দক্ষিণ রাঢ়ের দক্ষিণতম অংশে জয়সিংহ এবং অজয় নদের উত্তরাংশে অন্যান্য সমস্ত শাসকগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময়ে হেমন্তসেন বা বিজয়সেনের রাঢ় অধিকারভুক্ত অঞ্চল ছিল জেলার মধ্য ও উত্তর-পূর্বভাগ; কারণ অন্যান্য অঞ্চলের শাসকদের পরিচয় হতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় সেন অনুপ্রবেশ সম্ভবপর ছিল না। আবার ডঃ সুশীলা মণ্ডল মন্তব্য করেছেন যে, বিজয়সেনের প্রভাব দেখে শ্যামলবর্মা রাঢ় পরিত্যাগ করে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহন করেন।[১৩০] তাহলে সংহত কারণেই অনুমান করা যায় যে, শ্যামল বর্মা বর্ধমানের পূর্বাংশের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ বর্ধমান-হুগলী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে [৩] 'মহারাজাধিরাজ শ্রীহেমন্তসেন' রূপে উল্লেখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে রামপালের সময়ে তিনি রাঢ়ের কোন ক্ষুদ্র অংশের শাসক ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। হেমন্তসেন রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ রাঢ়ে উপস্থিত হয়ে এর কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তার পূর্বক বসবাস করতেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।[১৩২] হেমন্তসেনের পর তাঁর পুত্র বিজয়সেন রাঢ়ের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। ১১২০ খ্রীস্টাব্দে রামপালের মৃত্যুর পর উৎকলরাজ অনন্তবর্মা—চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ বিজয় সেন রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। চোড়গঙ্গের সাহায্যে বিজয়সেন উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করেন। চোড়গঙ্গের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে রামপালের পুত্র কুমারপালকে গৌড়ের সিংহাসন হতে বিতাড়ন পূর্বক রাঢ়-গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর হয়েছিলেন।[১৩৩] তাঁর দেওপাড়া-শিলালিপিতে কবি উমাপতিধরের রচিত প্রশস্তিলিপিতে আছে—'গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃতকামরূপভুপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।' অধ্যাপক কিলহর্ণের মতে বিজয়সেন একাদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৩৪] কিন্তু রামপালের জীবিত অবস্থায় বিজয়সেন গৌড়েশ্বর হতে সক্ষম হন নাই।

আনুমাণিক ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয়সেন রাঢ়ের অধিপতি হন এবং ১১২০ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করে সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করেন। হলায়ুধ মিশ্রের রচিত শেখ শুভোদয় নামক গ্রন্থে (১১শ অধ্যায়) বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির কাহিনী বর্ণিত আছে।[১৩৫] ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বল্লালসেন গৌড়ের সিংহাসনে আবোহণ করেন।

বিজয়সেন ও শূররাজকন্যা বিলাসদেবীর পুত্র বল্লালসেন প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশেব উপর প্রভুত্ব বিস্তাব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেনবাজাদের প্রশস্তিলিপি ও তাম্রশাসনে 'রাঢ়ের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে কাটোয়ার ৬ কিলোমিটাব উত্তবে ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত সাতাহাটী নৈহাটী গ্রামে বল্লালসেনের একাদশ বাজ্যাঙ্কে ১৬ই বৈশাখ তাবিখে সম্পাদিত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁর বাঢ় আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিযেছে। এই সময়ে সমগ্র বর্ধমান জেলা যে সেন-শাসনাধীনে ছিল তারও প্রমাণ মিলছে উক্ত তাম্রশাসন হতে। নৈহাটী তাম্রশাসনে খোদিত আছে—'যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যঃপাতিনুত্তব রাঢ়ামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ বীথ্যাং খণ্ডয়িল্লা-শাসনোত্তবস্থিত· ·।[১৩৬]

শাসনখানি হল ভূমিদানের দলিল। তাঁব মাতা বিলাসদেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে হেমাশ্ব-মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্ধমানভুক্তিব অন্তঃপাতী উত্তব রাঢমণ্ডলে বল্লিহিট্ঠ গ্রামের বরাহদেব শর্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র লক্ষ্মীধব দেবশর্মাব পুত্র ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্যপ্রবর ও সামবেদীয কৌথুম শাখার চরণানুষ্ঠায়ী শ্রীবাসুদেব শর্মাকে ৭ ভূ-পাটক ৭ দ্রোণ ১ অধিক ৩৪ উনমানস ও ৩ বসক পরিমিত ভূমি দান করেন। দানকৃত-ভূমির মধ্যে বাসগৃহ, জলসেচের খাল ও পতিত (বাগান) জমি ছিল এবং উক্ত ভূমিব বাৎসরিক আয ছিল ৫০০ কপদ্রক পুরাণ, সে বিষয়ও শাসনে বর্ণিত আছে। বল্লিহিট্ঠ গ্রামখানি বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ বর্তমানে বালুটিয়া নামে পরিচিত। শ্রীবর্ধমানভুক্তির মধ্যে উত্তব রাঢ়-মণ্ডলের স্বল্পবীথিতে খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তরে নাড়ীচা শাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটিয়া নদীর অম্বয়িল্লা শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিমে কুড়ম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণে, কুড়ম্বমার পশ্চিম সীমালির দক্ষিণে আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিম গতিপথ পর্যন্ত স্বরকোণা-গড্ডিয়া পর্যন্ত চিহ্নিত উত্তর অলি পর্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ নাড্ডিনা শাসনের পূর্ব, জলসোথী শাসনের পূর্বস্থ গোপথার্ধের পূর্ব, মোলাড়ন্দী শাসনের পূর্বস্থিত সিঙ্গটিয়া পর্যন্ত গোপথার্ধের পূর্ব এই চতুঃসীমার অবস্থিত বাল্লাহিট্ঠ বা বালুটিয়া গ্রাম।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত সিঙ্গটিয়া নদী বর্তমানকালে ক্ষীণ জলধারায় আজও বীরভূম জেলার পূর্বাংশ ও কেতুগ্রাম থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই কাঁদড় খালটির পোষাকী নাম ছিল জেয়োতরী। বীরভূম জেলার সিয়ানগ্রাম হতে নদীটি উৎপন্ন

হয়েছে। সিয়ান ও জ্জেয়োতরী এই দুটি নামের সমবায়ে সিঙ্গটিয়া শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ আছে বলে অনেকে অনুমান করেন।[১৩৭] তাম্রশাসনে বর্ণিত গ্রামগুলি কেতু-গ্রাম থানার গঙ্গাটিকুরী গ্রামেব সন্নিকটবর্তী। মুর্শিদাবাদ জেলাব জলসোথী ভিন্ন অনান্য গ্রামগুলি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। খাণ্ডয়িল্লা গ্রামটি সম্ভবতঃ খাঁড়ুলিয়া, এবং মোলাড়ন্দীকে বর্তমানের 'মুরন্দী' অনুমান করা হয়। অম্বয়িল্লাগ্রাম একালের অম্বলগ্রাম। শাসন বর্ণিত গো-পথটি প্রায হাজার বছবের প্রাচীন এবং এর নিদর্শন বহু পূর্বেই লুপ্ত হযে গেছে।

তাম্রশাসন খানি সম্পাদিত হয়েছিল—"সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবারাৎ।" এই উক্তিতে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে বিক্রমপুর ছিল বল্লালের রাজধানী তথা বসবাসের স্থান। কিন্তু তাম্রশাসনে পরিষ্কারভাবে জয়স্কন্ধাবার বলা হয়েছে, রাজধানী নহে। নৈহাটী তাম্রশাসনেই খোদিত আছে যে, সেন বংশের রাজপুত্রগণ অতুল প্রভাব দ্বারা রাঢ়দেশকে ভূষিত করেছেন। প্রথম হতে পূর্ববঙ্গ তাঁদের অধিকারভুক্ত হলে রাঢ়ের সঙ্গে বঙ্গদেশের উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল। অন্ততঃ বল্লালসেনের একাদশ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমপুর ছিল জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী ছিল না এবং ঐ সময়ে বল্লালের রাজধানী রমাবতী নগরী বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী-কালে তিনি সুপ্রসিদ্ধ গৌড়নগর নির্মাণ করেন এবং প্রিয়পুত্রের নামানুসারে বল্লালসেন রাজধানীর নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী।[১৩৮] বল্লালসেন স্বীয়রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী ও মিথিলা এই পাচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন।[১৩৯] নবদ্বীপের অনতিদূরে বল্লালদিঘীতে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী হতে অনুমান করা হয যে, পরবর্তীকালে সেনরাজারা এই স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী বা উপ-রাজধানী অথবা গঙ্গাবাস নির্মাণ করেছিলেন এবং অত্রস্থানেই রাজপ্রাসাদে সহসা বখতিয়ার খলজী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার দিযে সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক রামপালের ন্যায় তথায় দেহত্যাগ করেন।[১৪০]

১১৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রায ৬০ বছর বয়সে বল্লালসেন ও রামদেবীর পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজ্যভার গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের আমলে সমগ্র রাঢ় জনপদ তাঁর শাসনাধীন ছিল। লক্ষ্মণসেনের আমলে সম্পাদিত আটখানি তাম্রশাসনের মধ্যে দুখানি তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে যে, 'বর্ধমানভুক্তি' ও 'কঙ্কগ্রামভুক্তি' তাঁর শাসনধীন ছিল।[১৪১] বল্লালসেনের আমলে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অধানস্থ ছিল। কিন্তু তাঁর পুত্রের সময়ে দক্ষিণ রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উত্তর রাঢ় কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

লক্ষ্মণসেনের ২য় রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত তাম্রশাসনখানি দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার গোবিন্দপুরগ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে আছে—'শ্রীবর্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতি পশ্চিম খাটিকায়াং বেতড্ড চতুরকে পূর্বে জাহ্নবী সীমাঃ'। শাসনোক্ত জনপদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জাহ্নবী, ভাগিরথী, গঙ্গা যে

ভুখণ্ডের পূর্বসীমা রচনা করেছে তা বর্ধমানভুক্তির এবং তার পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ড চতুরক।[১৪২] হাওড়া শহরের দক্ষিণে বর্তমান বেতড়কে 'বেতড্ড চতুরক' বলে অনুমান করা হয়। বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে এই স্থানের খ্যাতি ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কালিদাস দত্তের মতে একাদশ / দ্বাদশ শতকে জাহ্নবী বা ভাগিরথীর প্রবাহ পথ ছিল আদিগঙ্গার খাতে এবং প্রবাহপথের পশ্চিমভাগ বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল।[১৪৩]

বীরভুম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার মোর হতে ৬ কিলোমিটার দূরে শক্তিপুরে লক্ষ্মণ সেনের ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত তাম্রশাসনে খোদিত আছে[১৪৪] "কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তপাতি দক্ষিণ বীথ্যাস্তুত্তরবাঢ়াযং কুমারপুর চতুরকে ...।" সর্বপ্রথম লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কঙ্কগ্রামভুক্তির বিস্তৃতি নিয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হতে বল্লাল সেনের শাসনকাল পর্যন্ত কোন তাম্রশাসনে আলোচ্য ভুক্তির উল্লেখ অনুপস্থিত। কেবলমাত্র লক্ষ্মণ সেনের ২৩ বছর রাজত্বকালের মধ্যে একবার মাত্র এই নূতন ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সুষ্ঠু শাসন কার্যের জন্য বর্ধমানভুক্তির একাংশ অর্থাৎ উত্তররাঢ় দক্ষিণবীথি হিসাবে কঙ্কগ্রামভুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র উত্তররাঢ যে কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ বল্লালসেনের সাতাহাটি তাম্রশাসনে উত্তররাঢ়ের দক্ষিণ-অঞ্চল বর্ধমানভুক্তির অধীনস্থ ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার অনুমান করেছেন যে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বীরভুম জেলা গেজেটিয়ারে এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।[১৪৫]

ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমারেখা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। সাধারণ স্বীকৃত মত হল অজয়নদের গতিপথ উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমারেখা নির্ধারিত করেছে। কিন্তু অন্যমতে খড়ি বা খড়্গেশ্বরী নদীর প্রবাহপথের দ্বারা উভয় রাঢ়ের সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে।[১৪৬] তবে উভয় তাম্রশাসন হতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র রাঢ়অঞ্চল লক্ষ্মণসেনের অধিকারভুক্ত ছিল।

সেখ শুভোদয় গ্রন্থে (পৃঃ ১৩১) উল্লেখিত সাহজালালের পুরো নাম সেখ জালালুদ্দীন মকদুমশাহ তাব্রেজী এবং তিনি ছিলেন শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির সতীর্থ। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ ও ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে এসেছিলেন এবং পরমধার্মিক লোক মনে করে লক্ষ্মণসেন তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করতেন। মকদুমশাহ প্রচুর অর্থসহ এদেশে এসে রাজানুকূল্যে উক্ত অর্থের দ্বারা বর্ধমান জেলায় বাইশ হাজারী নামে এক বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন।[১৩৭] কিন্তু বাইশ হাজারী জমিদারী বর্ধমানে কোন অংশে ছিল তার পরিচয় অজ্ঞাত।

শেখ শুভোদয় গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার যে চিত্র পাওয়া যায় তা কোন আদর্শ নৃপতির কাম্য হতে পারে না। যৌবনে পিতামহের ন্যায় লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গ, কামরূপ ও মগধ জয় করেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব পূর্ব, পশ্চিম, উত্তরবঙ্গ ব্যতীত মগধের

পূর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৪৮] কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে রাজ্যশাসন বিষয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। সম্ভবত পীর বা সূফীগণ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের দ্বারা দিল্লীর সুলতান বাংলা জয়ের ইচ্ছাকে ফলবতী করেন। তাই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর দিল্লীতে দাসবংশ প্রতিষ্ঠিত হলে ১০ বছরের মধ্যে মগধ ও বঙ্গদেশ প্রায় বিনা বাধায় বিজিত হয়। বখতিয়ার খলজি মগধ, অঙ্গ ও রাঢ় জয় করে লক্ষ্মণসেনকে এতদঅঞ্চল হতে বিতাড়িত করেন এবং তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। পরবৎসর সমগ্র বরেন্দ্রভূমি মুসলমানদের অধীনে আসে এবং কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটেছিল। বখতিয়ার যেভাবে মগধ ও বঙ্গদেশ জয় করেছিল তাতে অনুমান করা যায় যে, এ দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি ছিল অন্তঃসারশূন্য। অন্যথায় কোন বিদেশীর পক্ষে এত অল্পসময়ে এই বিশাল অঞ্চল অধিকার করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

পাদটীকা :

১। পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত—দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃ: ১০৮ ; *Select Inscriptions*—D. C. Sircar, Vol. I, p. 357.

২। *Epigraphia Indica*, Vol. XXIII, p. 159-61.

৩। *History of Ancient Bengal*—Dr. R. C Majumder, p. 303.

৪। বর্ধমান সম্মিলনী, ১৯৭৪, পৃ: ১৭-১৮।

৫। *History of Ancient Bengal*—p. 323 , *Some Hist. Aspects of the Ins. of Bengal*—B Sen, p. 490-98. বর্ধমান সম্মিলনী, ১৯৭৪, পৃ: ১৭।

৬। *Ibid*, p. 498—'The mention of Karttakritika and the Aurnasthanika will show, if our interpretations of these two derivations are correct, that the provincial government exercised some sort of control over the industrial life of the People.'

৭। *Indian Epigraphical Glossary*—D. C. Sircar, p. 42 & p. 332
আয়ুক্তক = often the Governor of a district or sub division.
তদ্যায়ুক্তক = an officer who was a sub ordinate to the Ayuktaka

৮। *Epigraphia Indica*, Vol. XXX, p. 162-63.

৯। বঙ্গভূমিকা—সুকুমার সেন, পৃ: ৫৮।

১০। আমাদের পদবীর ইতিহাস—লোকেশ্বর বসু, পৃ: ২৩।

১১। উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি—সঞ্জীব বন্ধু, পৃ: ৩৫।

১২। *Indian Epigraphical Glossary*. p 10-11.

১৩। বর্ধমান সম্মিলনী, ১৯৭৪, পৃ: ১৭।

১৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৮৭ বর্ষ, পৃ: ২।

১৫। *Indian Epigraphy*—D C. Sircar, p. 104.
'In the southern part of India, the word agrahara was more popular in the sense of a rent-free village in the possession of Brahmanas.

১৬। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃ: ২।

১৭। হর্ষচরিত (নবপত্র সংস্করণ) ৬ষ্ঠ উচ্ছাস।

১৮। *Fleet's corpus Inscriptionum Indicorum*, Vol. 3, p. 284.
Tr. "of the illustrious Mahasamanta Sasankadeva".

১৯। *Ibid*, P. 284, 'Mahasamanta, literally a great chief of a

district is a technical official title which as noted above seems to denote the same rank as Maharaja.'

২০। *Buddhist Record of the Western Worlds*—Vol. I, S. Beal, p. 210.

২১। বঙ্গভূমিকা—পৃ: ৭৪ ; বাঙ্গলার ইতিহাস—১ম খণ্ড, পৃ: ৮০।

২২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, পৃ: ২।

২৩। বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২।

২৪। *History of Orissa*—R. D Banerjee, Vol. I, p. 127.

'The city was situated on the Western Bank of Bhagirathi in Northern Rarh and certain ruins associated with the name of Sasanka in the Midnapur District tend to show that Sasank's dominions extended from the Northern part of Murshidabad District to that of Balasore.

২৫। J. *A. S. B*, 1945, p. 3.

২৬। পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত—পৃ: ১১৭।

২৭। *Epigraphia Indica*, Vol. VI, p. 146. 'om Hail ! while the Gupta year three hundred was current which Maharajadhiraja, the glorious Sasankaraja, was ruling—from the victorious Kongoda near the bank of the Salima.'

২৮। *Buddhist Record of the Western world*, Vol.—2, p. 121-22.

২৯। *History and Culture of the Indian People*—(The classical Age) Vol.—III, p. 106-7.

৩০। দেশ—বৈশাখ, ১৩৭৯ সাল, পৃ: ১১৩৬।

৩১। ঐ, পৃ: ১১৩৭।

৩২। *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 72.

৩৩। গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ১৪।

৩৪। *History of Bengal* Vol. I, p. 79.

৩৫। *Epigraphia Indica*, Vol. VIII, p. 50 & 62.

৩৬। *History of Bengal*, Vol. I, p. 79.

৩৭। *Cunningham's Ancient Geography of India*—Ed. S. N. Majumder Sastri, p. 548.

৩৮। *On Yuan Chwang's Travels in India*—Thomas Watters, Vol. 2, p. 178-93.

৩৯। *Ibid*, Vol. 2, p. 191.

৪০। *Ibid*, Vol. 2, p. 191.

৪১। *Archaeological Discoveries from Murshidabad*—S. R Das, p. 24.

৪২। *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. 2, p. 193.

৪৩। *Cunningham's Ancient Geography of India*—p. 578.

৪৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXVI, p. 317.

৪৫। Studies in Ind. Antiquities—H. C. Roychaudhury, p. 268.

৪৬। পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত—পৃঃ ৬৪।

৪৭। *Epigraphia Indica*, Vol. XXVI, p. 315.

৪৮। শারদীয়া বিজয়তোরণ, ১৯৮১, পৃঃ ৫১।

৪৯। *Buddhist Monuments*—Devala Mitra, p. 237.

৫০। *Epigraphia Indica*—Vol. XXVI, p. 318.

'The only other clue in this respect is furnished by the mention of Vardhamanpura as the city from which the plate was issued. Vardhamana is the name of a will-known city in West Bengal which gave the name *Vardhamana-bhukti* to a territoriial division in Ancient Bengal. As no other city of this name is known in ancient or modern Bengal, the Vardhamana-pura of our plate should be identified with the city of Burdwan, if there is no insuperable objection against it.

৫১। *History of Ancient Bengal*—p. 130.

৫২। *Epigraphia Indica*, Vol. IX, p. 44

৫৩। বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯, *Indian Antiquary*, Vol. 9. p. 178 & p. 181.

৫৪। *History of Bengal*, Vol. I p. 82 & p. 94-95.

৫৫। *Kalhan's Rajatarangini*—M. A. Stein, Vol. I, p. 152.

৫৬। *Indian Antiquary*, Vol. 4, p. 365-66.

৫৭। গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্র, পৃঃ ১২।

৫৮। *Taranath's History of Buddhism in India*, p. 258.

৫৯। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৫।

৬০। বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৪০।

৬১। *History of Ancient Bengal*—p. 175.

৬২। *Buddhist Monuments*, p. 237.

৬৩। Indian Archaeology—A. *Review*, 1971-72, p. 50,
৬৪। উদয়ন পত্রিকা, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ সাল, পৃঃ ৩।
৬৫। গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৩৫।
৬৬। *History of Ancient Bengal*, p. 161.
৬৭। উদয়ন পত্রিকা, পৃঃ ৩।
৬৮। *History of Ancient Bengal*. p. 122.
৬৯। *Ibid*, p. 121.
৭০। *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 138.
৭১। গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৯৫।
৭২। *Some Hist. Aspects of the Ins. of Bengal*, p. 375.
৭৩। *Epigraphia Indica*, Vol. XXII, p. 152.
৭৪। *Ibid*, Vol. XXXIX, p. 45.
৭৫। *History of Bengal*, Vol. I, p. 145.
৭৬। R*amcharit of Sandhyakarnandi*, p. 36.
৭৭। *Contributions to the Geo. & Hist. of Bengal*, p. 16.
৭৮। *Ramcharit of Sandhyakarnandi*, p. XXVIII.
৭৯। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড), পৃঃ ১৯৯।
৮০। ঐ পৃঃ ১৯৯।
৮১। বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬।
৮২। শারদীয়া বিজয়তোরণ ১৯৮১ সাল, পৃঃ ৫৩।
৮৩। ঐ পৃঃ ৫৩।
৮৪। *Ain-i-Akbari*, Vol. 2, p. 154.
৮৫। *Ibid*, p. 157.
৮৬। বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।
৮৭। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 149.
৮৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।
৮৯। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 151.
৯০। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯২ সাল, পৃঃ ৮১।
৯১। বৃহৎবঙ্গ (১ম খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৮৬।
৯২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-২৯।
৯৩। *Bengal Dist. Gazetters, Burdwan*, 1910, p. 194 ; *The Annals of Rural Bengal*—W. W. Hunter, p.
৯৪। *J. A. S. B.* 1936, p. 24.
৯৫। *Ibid*, p. 365.

৯৬। সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২০ সাল, বৈশাখ সংখ্যা, পৃঃ ৩৯।
৯৭। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫।
৯৮। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২১ সাল, পৃঃ ৮১।
৯৯। গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২।
১০০। *History of Bengal*, Vol. I, p. 501.
১০১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ১০৬।
১০২। গৌড়রাজমালা—পৃঃ ৬৮।
১০৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পৃঃ ৯৮ ৯৯ , *Rajtarangini*—chap. IV, No. 357 ; *Early History of India*—p. 344.
১০৪। *Studies in the Societies of Ancient and mdiaeval India*—D. C. Sircar, Vol. I, p. 28.
১০৫। *Ain-i-Akbari*, Vol. 2, p. 158-9.
১০৬। *Brahmanic Settlements in Different Sub divisions of Anicent Bengal*—Puspa Neyogi, p. 67-72.
১০৭। *Corpus of Bengal Inscriptions*—Mukherji & Maity, p. 363.
১০৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড), পৃঃ ১২১-২৫।
১০৯। *H. C. I. P.* (*The Age of Imperial Kanauj*) Vol. IV, p. 86 ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪১।
১১০। ঐ, পৃঃ ১৪১-৪৫।
১১১। *Inscriptions of Bengal*—N. G. Majumdar, Vol. III, p. 62 & p. 73.
১১২। *S. H. A. I. B.*--p. 440 & p. 467.
১১৩। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৯ সাল, পৃঃ ৬১-৬৪।
১১৪। আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিশিষ্ট—পৃঃ ৬৫-৬৭।
১১৫। *Inscriptions of Orissa*, Vol. V, p. 295.
১১৬। *History of Ancient Bengal*, p. 224.
১১৭। বঙ্গভূমিকা, পৃঃ ১২৫।
১১৮। *History of Gangas*, Vol. 2, 30.
১১৯। *Epigraphia Indica*, Vol. XXXIX, p. 52.
১২০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড,) পৃঃ ২৯৯।
১২১। *History of Ancient Bengal*, p. 224.
১২২। *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 317.
১২৩। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 70.
১২৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস—ডঃ সুশীলা মণ্ডল, পৃঃ ৫৭।

১২৫। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 46.

১২৬। *Ibid* p. 111.

১২৭। *Ancient Indians Historical Taditions*—E. F. Pargiter, p. 17 & p. 245 ; *Studies in the Societies of Ancient & Med. India*, p. 61.

১২৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পৃঃ ২৯৮।

১২৯। *S. H.* A. *I B.*—p. 460, see note.

১৩০। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৬০।

১৩১। *Epigraphia Indica*, Vol. XV, p. 285.

১৩২। *The Palas of Bengal*—R D. Banerjee, p. 103.

১৩৩। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২-৪৩।

১৩৪। *Epigraphia Indica*, Vol. I, p. 309.

১৩৫। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮-৫৯।

১৩৬ *Epigraphia Indica*. Vol. VIX. p. 156 63.

১৩৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, পৃঃ ২৩৩।

১৩৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পৃঃ ৩২৪।

১৩৯। *History of Bengal*, Vol. I, p. 217.

১৪০। *History of Ancient Bengal*, p. 230.

১৪১। *S. H. A. I. B.*—p. 475.

১৪২। *Inscriptions of Bengal*, Vol. 3, p. 92 98.

১৪৩। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪১ সাল পৃঃ ২১-২২।

১৪৪। *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, p. 218.

১৪৫। *History of Bengal*, Vol. I, p 28., Dist. Gazetteer of Birbhum, p. 84.

১৪৬। *History of Ancient Bengal*, p. 14, see note.

১৪৭। গৌড় কাহিনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১।

১৪৮। *The Palas of Bengal*, p. 107.

পরিশিষ্ট

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

[প্রশস্তি-পাঠ]

শ্রীপরাক্রমমল্লস্য।

নি

ওঁ * স্বস্তি ॥

১। বভুব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা।
তি [গন্নাংশ,-চণ্ডো নৃপবংশ] কেতুঃ।
২। শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারা-
নির্দ্ধা [পিতারিব্রজ-গর্ব্ব-] লেশঃ ॥ (১)
৩। আসীত্ততোপি সমর ব্যবসায়সার-
বি [স্ফূর্জ্জিতাসি-কুলি-] শ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ।
৪। শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [লাব্জজাত-মার্ত্ত-]
৫। ণ্ড-মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ (২)
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ [ইতি প্রচ-] ণ্ড-
৬। দণ্ডঃ সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তি [মিরৈক-] দিবাকরেণ
৭। বজ্রায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ (৩)
ভবানীবাপরা মর্ত্ত্যা সাতে [ব চ পতি-] ব্রতা।
৮। সদ্ভাবা নাম তস্যাভুদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥ (৪)
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ [সপ্তাংশু-] ধামা জয়-
৯। ত্যেকো দুর্দ্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ।
যস্য প্রোজ্জ্বিত-শৌর্য্যনির্জ্জিত-রিপোঃ [প্রৌ-] ঢ়-প্রতাপশ্রুতে-

---

* ওঁকার-বিজ্ঞাপক চিহ্নমাত্রই উৎকীর্ণ আছে।

(১—২) ইন্দ্রবজ্রা। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে "পৃথিব্যাম্" স্থলে "পৃথিব্যাং" উৎকীর্ণ আছে। "জাত" শব্দটি সমূহার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

** অক্ষয়কুমার মৈত্র কর্তৃক সাহিত্য পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল) প্রকাশিত পাদটীকাসহ পাঠক্রম।

(৩) বসন্ততিলক। বাচ্চা ঝা "দণ্ড"কে "চণ্ড" বলিয়া এবং "যোধ"কে "যৌধ" বলিয়া পাঠ করিয়া গিয়াছেন।

(৪) অনুষ্টুভ।

১০। রাস্য স্বাম্পজল-প্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ (৫)
স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ
১১। শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মণ্ডলান্তঃপাতি (৭)
গাল্লিটিপ্যাক বিষয়-সম্ভোগ-দিগ্‌ঘা সোদি
১২। কা গ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ। রাজণ্যক। বাজ্জী। রাণক।
বাজপুত্র-কুমারামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্র-
১৩। হিক মহাপ্রতীহার-মহাকবণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাধিকৃত-
মহা আক্ষপটলিক- (৮) মহাসর্ব্বাধিকৃত-
১৪। মহাসেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহাভোগপতি-
মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাবূহপতি মহাদণ্ডনায-
১৫। ক মহাকাযস্থ-মহাবলাকোণ্ঠিক (৯)-মহাবলাধিকরণিক-
মহাসামন্ত মহাঠক্কুব-(১০)-আঙ্গিকর-
১৬। ণিক-দাণ্ডপাণিক-(১১)-কোট্টপতি-হট্টপতি-
ভুক্তিপতি-বিষয়পতি-ঐশ্ধিতাসনিক- (১২)-অন্তঃ-প্রতীহার-দ [ণ্ড]
১৭। পাল-খণ্ডপাল-দুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরনিক
উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্যন্তরিক-বাসাগা- (১৩)
১৮। রিক-খড়্গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুষ্ক-একসরক-
খোলদূত-গমাগমিক-লেখ ০০০০০০ (১৪)
১৯। ষণিক-পানীয়াগারিক-শান্তিককর্ম্মকর-গৌল্মিক-গৌল্কি-
হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-গো-

৫। শার্দ্দুল-বিক্রীডিত।

৬। ২১ পংক্তিতে [মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি] ক্রিয়াপদ উল্লিখিত আছে।

৭। মণ্ডলের নাম বাচ্চা ঝা কতৃক উদ্ধৃত হইবার সময়ে পকার যকার রূপে, এবং "সোদিকা" শব্দ "সাটিকা" রূপে পঠিত হইয়াছিল।

৮। 'মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে।

৯। এরূপ রাজপাদোপজীবীর নাম পালরাজগণের তাম্রশাসনে অপরিচিত।

১০। বাচ্চা ঝা ঠকার পাঠ করিতে পারেন নাই।

১১। "দাণ্ডপাশিক" শব্দের স্থলে "দাণ্ডপাণিক আছে।

১২। বাচ্চা ঝা "ঔদ্ধিতাসনিক" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন ৩০ পংক্তিতে দুইবার ঔকার যেভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার সহিত এই শব্দের ঔকারের আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

১৩। "বাসাগারিক শব্দ" পালরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৪। এই স্থানের কয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২০। মহিষ্যব্দাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদোপজীবি-
নোঽন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্ স [কর-]

২১। ণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং (১৫) মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ
বিদিতমস্তু ভবতাং গ্রামো-

২২। য়ং চতুঃসীমাপর্য্যন্তঃ স্বসম্ভোগসমেতঃ সজলস্থলঃ
সোদ্দেশঃ সগর্ত্তোষরঃ সাম্র [মধু-]

২৩। কঃ সগোকুলঃ স [শাদ্ব] ল

২৪। বিটপলতান্বিতঃ সহট্ট-প-

২৫। ট্টঃ

২৬। সমস্তক্ষিতি-

২৭। ঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ আচটভটপ্রবেশঃ
অকিঞ্চিৎকরপ্রগ্রা-

২৮। [হ্য আচন্দ্রার্কতারকাক্ষিতি-সমকালং যাবৎ।
......বিন (নি) র্গতায়

২৯। ভট্ট। শ্রীবাসুদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিব্বোকশর্ম্মণে
ভার্গবসগোত্রায়

৩০। য-] মদগ্নি ঔর্ব্ব্য-আপ্নুবান্-প্রবরায় আপ্নুবান্-
ঔর্ব্ব্য-যামদগ্ন-চ্যবন-ভা.........

৩১। যজুর্ব্বেদা আধ্যায়িনে (১৬) মার্গসংক্রান্তৌ
জটোদায়াং (জটোদরায়াং ?) স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্র-

৩২। পূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে

৩৩। [তাম্র-] শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতঃ প্রতিপালনে
মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে ম-

৩৪। [হা-নর] কপতন-ভয়াৎ সর্ব্বৈরেব দানমিদনুমন্তব্যং
প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধে-

১৫। বাচ্চা বা "সচরণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ২০ পংক্তি স অক্ষরের পর ক-অক্ষরের কিয়দংশমাত্র বর্ত্তমান আছে, ২১ পংক্তির প্রথমেই মূর্দ্ধণ্য ণকার; ব্রাহ্মণ-শব্দের সহিত সমাস-নিবদ্ধ এই শব্দটি "সকরণ" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে "ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বক" আছে; পরবর্ত্তী পাল-নরপালগণের শাসনে তাহা নাই। "সকরণব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে "করণ" ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

১৬। "যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনে" পাঠ করিতে হইবে।

৩৫। [য়ী] ভুয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুসং (শং) সি-
৩৬। নঃ শ্লোকাঃ।
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভুমি স্তস্য তস্য তদা ফলং [॥]
৩৭। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
৩৮। সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং [।]
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং।
৩৯। ষষ্টিং (১৭) বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ [।]
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং বসেৎ [॥]
৪০। গা-মেকাং সুবর্ণমেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং [।]
হরন্নরক মায়াতি যাবদাহূতি-সংপ্লবং [॥] (১৮)
৪১। অন্যদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির।
মহামহীভুজাং শ্রেষ্ঠ দা চ্ছ্রেয়োঽনুপালনং ॥
৪২। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেদ্বসুন্ধরাং (১৯)।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
৪৩। বাপীকূপ-সহস্রেণ অশ্বমেধ-শতেন চ।
গবাং কোটি প্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ণ শুধ্যতি ॥
৪৪। সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্র (ন্দ্রা) ন।
ভুয়োভুয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ [।]
সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতু নৃপানাং
৪৫। কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥
ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়
৪৬। মনুচি [ন্ত্য ম] নুষ্য-জীবিতঞ্চ।
সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ॥
৪৭। ই-[তি] সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে [১]

১৭। এই একটিমাত্র স্থলে অনুস্বার-চিহ্ন প্রচলিত বাঙ্গালা চিহ্নের ন্যায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে; অন্যান্য স্থলে মাত্রার উপরে বিন্দু ক্ষোদিত আছে।

১৮। এই শ্লোক ধর্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রথম মহীপালদেবের [বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে "স্বর্ণমেকঞ্চ" এবং "ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং" পাঠ উদ্ধৃত আছে।

১৯। "যো হরেত বসুন্ধরাং" এই পাঠ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে বর্ধমান

(১)

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্-দিন মহম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজী বিহারের মধ্যাঞ্চল অধিকার পূর্বক বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করে পর বৎসর অর্থাৎ ১২০১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশ জয়ের মানসে একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদীয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ গুপ্তচরের মুখে নদীয়া নগরীতে লক্ষ্মণসেনের অবস্থিতির বিষয় অবগত হয়ে বখতিয়ার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) পরিবর্তে নদীয়া আক্রমণ করেন। মীনহাজ-উদ্দিনের তককাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ারের বিহার জয়ের বিবরণ ও তাঁর শৌর্যবীর্যের খ্যাতি লক্ষ্মণসেনের নিকট পৌঁছেছিল।[১] মীনহাজের বিবরণে সত্যতা থাকলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষপর্বে তাঁর কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। শেখ শুভোদয় গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার হতাশাব্যাঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, বিহারের সন্নিকটবর্তী রাঢ়ের শাসনকর্তা বিশ্বরূপ অথবা কেশবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের পর লক্ষ্মণসেনকে বন্দী করতে মনস্থ করে অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করা হয়েছিল।[২] কিন্তু উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে এমন কোন প্রমাণ মেলে না যে, তাঁর পুত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা যায়।

বখতিয়ার 'নওদীয়াহ্' শহরের দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে অষ্টাদশ-জনের অধিক সৈন্য ছিল না এবং অবশিষ্ট সৈন্য তাঁকে অনুসরণ করে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হয়েছিল। বিহার জয়ের পর কোন্ জনপদ অতিক্রম করে বা অপর কোন ভূখন্ড অধিকারের পর মুসলমান সৈন্যের আগমন ঘটেছিল তার কোন প্রামাণিক বিবরণ নাই। তবে মধ্যাহ্নভোজনের সময় নগর আক্রমণের উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ার নদীয়া জয়ের পূর্বরাত্রে নদীয়া হতে আনুমানিক ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষা করেন।[৩] বখতিয়ার তেলিয়াগাড়ির পথ অতিক্রম করেন নাই। বিক্রমশীলা হতে সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে বীরভুম জেলা অতিক্রম করে মঙ্গলকোটের নিকট অজয়নদ পার হয়ে রাত্রে ঐ অঞ্চলের কোন স্থানে অবস্থান করেন। গুপ্তচর ও পথনির্দেশকের নিকট তিনি পথের নির্দেশ ও রাজার অবস্থানের সমূহ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। পরদিন অশ্ববিক্রেতারূপে দ্রুতবেগে মধ্যাহ্নভোজনের সময় নদীয়া নগরের দ্বারে উপস্থিত হন। পশ্চাৎবর্তী বাহিনীকে যথেষ্ট সাবধান করার উদ্দেশ্যেই অষ্টাদশ অশ্বারোহী অগ্রভাগে অগ্রসর হয়েছিল।

অপরিচিত ও অজ্ঞাত জনপদে বিপরীত আক্রমণের আশঙ্কায় ও সমগ্র বাহিনী যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তার জন্যই আঠারজন সৈন্য ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করার জন্য এগিয়েছিল এবং সেটাট পরবর্তীকালে আঠারজন মুসলমান সৈন্যের দ্বারা বঙ্গ-জয়ের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে নদীয়া নগরী ছিল গঙ্গা বা ভাগীরথীর পূর্বতীরে এবং নদী পার হয়েই শহরের অবস্থিতি ছিল। নৌকাবিহীন অশ্বারোহীসৈন্য প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কায় সম্ভবতঃ নদীয়া নগরীর বিপরীত তীরে নদী পার হয় নাই এবং এক হাজার বছর পূর্বে কাটোয়া হতে নবদ্বীপ পর্যন্ত ভূখন্ডটি ছিল নদী ও জলা সমন্বিত স্থান, যা অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে অসুবিধাজনক পথ। মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেবের মতে শান্তিপুরে 'বখতিয়ার ঘাট' বা বক্তারঘাটটি বখতিয়ার খলজির নামে নামকরণ করা হয়েছিল।[৪] কুমুদনাথ মল্লিকের মতে বখতিয়ার শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা পার হয়েছিলেন।[৫] বর্তমান নবদ্বীপ শহরের পূর্বভাগে বামুনপাড়ায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষটিকে সেনরাজাদের গঙ্গাবাস বা উপ-রাজধানীরূপে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে সৈন্যদলটি মঙ্গলকোট হতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অগ্রসর হয়ে অম্বিকা-কালনার নিকটে ভাগীরথী অতিক্রম করে এবং সেখান থেকে অতি সহজেই উত্তরমুখে নদীয়া নগরী আক্রমণ করতে সক্ষম হয়।

মীনহাজের বিবরণে জানা যায়, লক্ষ্মণসেনের মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রাসাদ ও নগরের মধ্যে আর্তনাদ শুরু হয় এবং প্রকৃত অবস্থা জানার পূর্বেই বখতিয়ার প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের লোকেদের তববারীর আঘাতে ধরাশায়ী করে। লক্ষ্মণসেন নগ্নপদে প্রাসাদ হতে পলায়ন করেন। তাঁর সমুদয় ধনরত্ন, নারী, দাসদাসী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অসংখ্য হাতী মুসলমান সৈন্যের অধিকারে চলে যায়। সমুদয় সৈন্য এসে ঐ স্থানে উপস্থিত হলে তিনি সমস্ত নগর অধিকার করে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন।[৬] মীনহাজের বিবরণই প্রমাণ করে যে, অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক নদীয়া অধিকারের যুক্তি কত অসার। বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ছদ্মবেশে নগরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সুযোগ উপস্থিত হলে অবশিষ্ট সৈন্যদলকে নগরে প্রবেশের সঙ্কেত দিয়েছিলেন। কারণ ঐ সময়ে রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র যে অতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নদীয়া জয়ের পর বখতিয়ার লক্ষ্মৌতি বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। নদীয়া নগরী ধ্বংস হলেও রাঢ় অঞ্চল ঐ সময়ে তাঁর অধিকারভুক্ত হয় নাই। কারণ এ ঘটনার প্রায় সাত মাস পরে রাঢ় অঞ্চল অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যসহ তিনি মোহাম্মদ সিরাণকে প্রেরণ করেন।[৭] রাঢ় ও বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] কিন্তু সিরাণ অজয়নদের উত্তর ও ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের ভূভাগ মাত্র অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯] ইতিমধ্যে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে দেবকোটে

প্রত্যাবর্তনের পর আলিমর্দান নামক এক আমিরের ছুরিকাঘাতে বখতিয়ার নিহত হন।[১০] তাঁর মৃত্যুর পর সিরাণের রাঢ় অভিযান ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ রাঢ় অঞ্চলের অধিকার নিয়ে গৌড়ের মুসলমান রাজশক্তি ও ওড়িশার হিন্দু-রাজাদের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল।[১১]

মহম্মদ সিরাণ (১২০৬-১০ খ্রীস্টাব্দ) ও আলিমর্দান বা সুলতান আলাউদ্দিন (১২১০-১২ খ্রীস্টাব্দ) লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে রাঢ়ের অধিকাংশ অঞ্চল স্বাধীন অথবা ওড়িশার অধীনস্থ ছিল। অত্যাচারী আলিমর্দান আমীরগণ কর্তৃক নিহত হলে, দলনেতা গিয়াসউদ্দিন ই-ওয়াজ খলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১২] আলিমর্দানের সময়ে রাঢ়ের উত্তর অঞ্চল অধিকারভুক্ত হয়েছিল।[১৩]

মীনহাজের বিবরণ হতে জানা যায় গিয়াসউদ্দিন (১২১৩-২৭ খ্রীস্টাব্দ) একজন কল্যাণকামী, সুবিচারক ও বহু সদগুণে ভূষিত শাসক ছিলেন।[১৪] তাঁর সময়ে সমগ্র উত্তর রাঢ় সর্বপ্রথম মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।[১৫] এই সময়ে লক্ষ্মণাবতী হতে পশ্চিম রাঢ়দেশের লখনোরের (রাজনগর) দ্বারদেশ পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে সমগ্র রাঢ় অধিকৃত হলে তিনি বর্ধমান হতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত অপর একটি রাজপথ নির্মাণ করেন।[১৬] কিন্তু এই বিবরণে একটা সন্দেহ থেকে যায় যে, গিয়াস-উদ্দিনের সমসাময়িক ছিলেন গঙ্গাবংশীয় উৎকলরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব এবং তাঁর আমলে মুসলমান সৈন্য রাজনগর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না।

ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশের সীমা ছিল নেড়াদেউল পর্যন্ত, যার অবস্থিতি ছিল চন্দ্রকোনার দক্ষিণে কোঙাই নদীর অপরপারে। গিয়াসউদ্দিনের সময়ে গঙ্গারাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের সেনাপতি বিষ্ণু, রাঢ় অঞ্চল জয় করায় লখনোর বা রাজনগরের পতন ঘটে। এই সময়ে গৌড়ের শাসকগণ রাজনগর পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য সীমা বলে দাবী করতেন এবং রাঢ়ের অবশিষ্টাংশ ছিল অরাজকতাপূর্ণ। বিষ্ণু বাহুবলে সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় অধিকার করায় মুসলমানদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়।

মুসলমান সৈন্য জেহাদ ঘোষণা করে বিপুল বিক্রমে রাজনগর পুনরাধিকার করে। গঙ্গাসৈন্য পশ্চাৎঅপসারণ করে দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হলে দামোদরের তীর পর্যন্ত গৌড়ের অধীনস্থ হয়েছিল।[১৭] গিয়াসউদ্দিন সমগ্র উত্তর রাঢ়, বরবকাবাদ, শরিফাবাদ ও সুলেমানাবাদ অধিকার করেন।[১৮] ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মানচিত্রে বর্ধমানের অধিকাংশ অঞ্চলকে সুলেমানাবাদ (১২১৩-২৭) বলে দেখান হয়েছে।[১৯]

গিয়াসউদ্দিন দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করায় ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরউদ্দিন লক্ষ্মৌতি অধিকার করেন এবং সমুদয় আমীর ও সেনাপতিসহ তিনি যুদ্ধে বন্দী হন। নাসিরউদ্দিন (১২২৭-২৮) মাত্র দেড় বছর বঙ্গদেশ শাসন করে ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর ইখতিয়ারউদ্দিন, আলাউদ্দিন জানী ও সৈফুদ্দিন মোট পাঁচ বছর গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন এবং অবশেষে ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে

সুলতানা রিজিয়া কর্তৃক ইজ্জুদ্দিন তোঘ্রল তোগান খাঁকে (১২৩৬-৪৫) লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করা হয়।

মীনহাজের বিবরণে পাওয়া যায়, তোঘ্রলের শাসনকালে জাজনগরের রাজা হিজরী ৬৪১ সনে (১২৪৩ খ্রীস্টাব্দ) লক্ষনৌতি রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব রাঢ়ের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রভুত্ব করেন এবং সম্ভবতঃ ওড়িশার আধিপত্য মেনে নিয়ে বহু অর্ধস্বাধীন নরপতি তাঁর অধীনস্থ ছিল। মীনহাজের বর্ণনায় জানা যায় যে, কাতাসীন-দুর্গ জাজনগরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল[২০]। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে কাটাসীন দুর্গের অবস্থিতি ছিল সোনামুখী হতে ৮ কিলোমিটার ও দামোদরের তীর হতে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে।[২১] তবকাত-ই-নাসিরীতে উল্লিখিত আছে যে, এই ধর্মযুদ্ধে প্রথমে মুসলমান সৈন্য জয়লাভ করলেও, পরপর দু'বার তারা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চল ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হয়। পর বৎসর হিজরী ৬৪২ সনে (১২৪৪ খ্রীস্টাব্দ) গঙ্গাসৈন্য কর্তৃক গৌড় অধিকৃত হলে দিল্লী হতে একদল সৈন্য গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং এই সংবাদে উৎকল সৈন্য অজয়নদ অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছিল[২২]। প্রত্যাবর্তনের সময় ওড়িশার সৈন্যদল কর্তৃক রাজনগর লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ জানা যায়[২৩]। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গঙ্গা-সৈন্য পুনরায় রাঢ়ের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করতে সমর্থ হয়। ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে তুঘ্রিল অযোধ্যায় পরলোকগমন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মীনহাজ-ই-সিরাজ, তুঘ্রলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

রাঢ় অভিযানের সময় তুঘ্রলের সৈন্যবাহিনী গিয়াসউদ্দিনের নির্মিত প্রশস্ত রাজপথ অনুসরণ করে রাজনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বীরভুম ও বর্ধমান পুনরাধিকারের পর দামোদরনদ অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে তাদের অধিকার স্থাপন করলেও, এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে লখনোর হতে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল ধরে কাটাসিন অভিযান পরিচালিত হয়েছিল[২৪] অর্থাৎ রাজপথটি লখনোর মঙ্গলকোট-দিগনগরের পর দাউদপুরে দামোদর অতিক্রম করে কাটাসিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

তুঘ্রলের মৃত্যুর পর মুগীস-উদ্দিন য়ুজবক্ (১২৫২-৫৭), বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। রাঢ় অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কলিঙ্গরাজ প্রথম নরসিংহদেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বেই ওড়িশার সৈন্যবাহিনী হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার পূর্বক উমরদাম বা আরমুদনে (গড়মান্দারণ) অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করে লক্ষ্মণা-বতী আক্রমণ করেন। আক্রমণের প্রাথমিক পর্বে নরসিংহদেবের জামাতা সাবনতর এই ঘাঁটির সেনাপতি ছিলেন। য়ুজবক্ তিনবার যুদ্ধের মধ্যে দু'বার পরাজিত হয়েও হতোদ্যম হন নাই এবং শেষবারে অতি দ্রুতগতিতে সৈন্য পরিচালনা করে গড়-

মান্দারণ আক্রমণ করায় কলিঙ্গ সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন[২৫]। এইভাবে দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় গৌড়ের অধীনস্থ হয়েছিল। সর্বপ্রথম সমগ্র রাঢ় অঞ্চল অধিকারের কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার ছিলেন য়ুজবক্। ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে কামরূপ অভিযানের সময় যুদ্ধে আহত ও বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১২৫৭-৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকজন শাসকের আমলে রাঢ় অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই বা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে মুঘিসউদ্দিন তুঘ্রল (১২৬৮-৮১) বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর এদেশ শাসন করার পর তিনি দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করায় বলবান স্বয়ং তুঘ্রলকে শাস্তি দিতে আসায় তুঘ্রল রাঢ় অঞ্চলে পলায়ন করেন। এই সময়ে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল, বীরভুম, বর্ধমান, বাঁকুড়া তুঘ্রলের অধীনস্থ ছিল[২৬] এবং তিনি জাজনগর অধিকার করে প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করেন। পরবর্তীকালে জাজনগরে বলবনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন[২৭]। বলবন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিনকে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বলবনের মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দিন স্বীয় পুত্র কৈকোবাদের আনুকূল্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং গৌড়ের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নাসিরউদ্দিনের সময়ে বঙ্গদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা, লক্ষ্মণাবতী (উত্তরাঞ্চল), সুবর্ণগ্রাম (পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল) ও সপ্তগ্রাম (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) এবং প্রত্যেকটি বিভাগে একটি ইক্তা বা শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। অজয়নদের দক্ষিণ ও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম অঞ্চল ছিল সপ্তগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু ঐ সময়ে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার নাম জানা যায় নাই। হিজরী ৬৮৯ সনে (১২৯০ খ্রীস্টাব্দ) কৈকোবাদকে হত্যা করে জালালুদ্দিন ফিরোজশাহ দিল্লী অধিকার করলেও তিনি নাসিরুদ্দিনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন নাই। ১২৯১ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান, বীরভুম, বাকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর) নাসিরউদ্দিনের অধীনস্থ ছিল[২৮]।

১২৯১ খ্রীস্টাব্দে নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান রুকুনুদ্দিন কৈকায়ুসের (১২৯১-১৩৯১) রাজত্বকালে উত্তর রাঢ় লক্ষ্মণাবতীর অধীনে এবং দক্ষিণ রাঢ় সপ্তগ্রামের অধীনস্থ ছিল।[২৯] কৈকায়ুসের সময়ে বঙ্গদেশ চার ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) বিহার, (২) সপ্তগ্রাম, (৩) দেবকোট ও (৪) বাঙ বা বঙ্গ এবং এর মধ্যস্থলে রাজধানী লক্ষ্মৌতি বা লক্ষ্মণাবতী। সম্ভবতঃ নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর সপ্তগ্রামের কোন ভুস্বামী স্বাধীনতা ঘোষণা করায় উলুগ্-ই আজম জাফর খাঁ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। ভাগীরথী-সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে ত্রিবেণীতে একটি প্রস্তর নির্মিত দেবমন্দির ছিল; উক্ত দেবমন্দির ধ্বংস করে তথায় জাফর খাঁর সমাধিগৃহ নির্মাণ করা হয়। সমাধিস্থলের সন্নিকটে বহু দেবমন্দির ও বৌদ্ধ বিহারের

ধ্বংসাবশেষের উপাদানে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। জাফর খাঁ নিকটবর্তী অঞ্চলের ভুদেব নামক কোন হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন[৩০] এবং জাফর খাঁর পুত্র উগওয়ান খান (উলুঘ খান) উক্ত হিন্দু নরপতিকে ধর্মান্তরিত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্যতা থাকলে ভুদেবের রাজ্য বর্ধমান-হুগলী সীমান্তের কোন অঞ্চলে ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

গৌড়ের সুলতানদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক হতে মুসলমান পীর ও ফকিরের দল এদেশে আসতে শুরু করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ। পীর, ফকির ও উলেমারা হিন্দু-রাজা বা জমিদারের এলাকায় বসবাসকালীন সময়ে করত এবং কৌশলে উক্ত রাজা বা জমিদারের সঙ্গে ধর্ম প্রচারের অজুহাতে বিবাদের সূত্রপাত ঘটিয়ে গৌড়ের সুলতানের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করত। বঙ্গদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রারম্ভিক পর্বে এরূপ কাহিনীর কথা জানা যায়। এর মধ্যে সকল ক্ষেত্রে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে সেগুলি আবিষ্কারের কোন সূত্র লাভের সম্ভাবনার আশা ক্ষীণ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৌড়ের সুলতান সসৈন্যে ধর্মপ্রচারে অংশগ্রহণ করত তার বহু নজীর পাওয়া যায়। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া, মহানাদ, সপ্তগ্রাম, গড়মান্দারণ, বর্ধমান জেলার পাটুলী, কালনা, মঙ্গলকোট, চুরুলিয়া, ডিসেরগড়, আউসগ্রাম, সুয়াতা ও বীরভুম জেলার রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুরা যে রাজত্ব করত, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও আংশিক বিবরণ পাওয়া যায় লোকপ্রবাদে ও গাথাকাব্যে। ছোট ছোট জমিদারগণ প্রবল প্রতিপক্ষ গৌড়ের সুলতানের সৈন্যবাহিনী ও জেহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নাই। হিন্দু জমিদারগণ ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল অথবা তাঁদের হত্যা করে ঐ জায়গায় আয়মাদারগণকে স্থলাভিষিক্ত করা হত এবং পরবর্তীকালে আয়মাদারগণই ছোট ছোট জমিদারে পরিগণিত হয়। ফকিরউদ্দিনের শাসনকালে ফকির ও উলেমাগণ বিনাশুল্কে নৌভ্রমণ সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও বিনামূল্যে পেত এবং কোন নগরে উপস্থিত হলে অর্ধদীনার উপহারসহ তাঁদের অভ্যর্থনা করার প্রথা ছিল[৩১]। ফলে ফকির ও উলেমার সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে কালনার বদরশাহ ও মজলিসশাহের কবরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ফুল, ফল, শিরণি প্রভৃতি অর্ঘসহ খেলনা ঘোড়া প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করা হত। তিনি আরও মনে করেন যে, এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন প্রথমে হিন্দু ছিলেন; সেটা স্থানীয় ছড়াতে উল্লেখ আছে। মঙ্গলকোটের মসজিদের ভিত্তি হিন্দু মন্দিরের অনুরূপ অষ্টকোণ বিশিষ্ট[৩২]। জোগ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির ভিত্তিও অষ্টকোণ বিশিষ্ট হিন্দু মন্দিরের ন্যায়। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের সময় প্রায়ই একজোড়া সংবাদশাহী কপোত-কপোতীর সাক্ষাৎ মেলে এবং এসকল কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করা না গেলেও এগুলির দ্বারা হিন্দু রাজাদের বীরত্ব কাহিনী প্রচার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পরিশেষে বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

জাফর খাঁ কোন্ হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে সপ্তগ্রাম অধিকার করেছিলেন সে কাহিনী অজ্ঞাত। তবে কবি কৃষ্ণরাম দাসের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে সপ্তগ্রামে শত্রুজিত রাজার উল্লেখ আছে এবং মহারাণীর সঙ্গে কথোপকথনরতা নালাবতার সঙ্গে বর্ধমানের একটা সম্পর্কে কথা জানা যায়—[৩৩]

'বর্দ্ধমানে (বাস) করি সদা কুতুহল।।
গঙ্গায় করিতে স্নান আইলেম চলি ॥'

অনেকে অনুমান করেন যে, জাফর খাঁ ও শত্রুজিত সমসাময়িক ছিলেন।

(২)

শমস্-উদ্দিন ফিরোজশাহের রাজত্বকালে (১৩০১-২২) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শাসন-কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রামে এবং এই অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ইজউদ্দিন ইয়াহিয়ার হস্তে ন্যস্ত ছিল। সুলতান ফিরোজশাহ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া (ছোট) অধিকার করে ফকিরউদ্দিনের রাজস্ব-ব্যবস্থা রদ করেন। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য লখনোর (রাজনগর) পরিত্যক্ত হওয়ায় পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব বর্ধিত হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরশাহ (১৩২৫-২৮) ও নাসিরউদ্দিন ইব্রাহিমশাহের রাজত্বকালে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় না। ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে বহরম খানের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের ইতিহাসের পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়। সুলতান মহম্মদ-বিন তুঘলকের (১৩২৪-৫১) রাজ্যশাসন বিষয়ে অস্থিরতার জন্য অধিকাংশ সময় তিনি দিল্লীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই সুযোগে বাংলার স্বাধীন সুলতানরূপে ইলিয়াসশাহী বংশের উদ্ভব হয়। এই বংশে ফকিরউদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৩৯) ও ইক্তিয়ার-উদ্দিন গাজীশাহের (১৩৪৯-৫২) রাজত্বকাল বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও শামস-উদ্দিন-ইলিয়াসশাহের (১৩৫২-৫৭) নাম বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ইলিয়াসশাহ ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ও সপ্তগ্রামের টাঁকশালে তাঁর নামে মুদ্রা নির্মিত হয়।

ইলিয়াসশাহের পর তাঁর পুত্র সিকন্দরশাহের রাজত্বকালে (১৩৫৭-৮৯) রাঢ় অঞ্চল গৌড়ের শাসনাধীন ছিল। সপ্তগ্রাম ও শহর-ই-নৌ (ত্রিবেণীর উত্তরে বর্তমান নয়সরাই)-এ তাঁর নামে রজত-মুদ্রা নির্মিত হত। হিজরা ৭৭৭ সনে (১৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ) হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর নিকটে মোল্লাসিমলা গ্রামে তাঁর সময়ে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং উক্ত মসজিদের শিলালিপি হতে জানা যায়[৩৪]। সিকন্দারশাহ হিজলী আক্রমণ করে ঐ স্থানের হিন্দুরাজা হরিদাসের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিকন্দারশাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ (১৩৮৯-১৪০৯) পিতাকে বধ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে অন্ধ করে সিংহাসন অধিকার করেন[৩৫]। অতঃপর সৈফুদ্দিন হামজাশাহ (১৪০৯-১০) ও তাঁর পুত্র

দ্বিতীয় শমস্-উদ্দিনের সময়ে দীর্ঘ সতের বৎসরে রাঢ়ের কোন ইতিহাস জানা যায় না। শমস-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু পুত্র শাহাবুদ্দিন বায়াজিদশাহকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মন্ত্রী গণেশ প্রভুত্ব করতেন এবং হিজরী ৮১৭ বা ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে বায়াজিদকে অপসারণের পর গণেশ সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিকন্দরশাহের আমলে মুকুটরায় নামক এক হিন্দুরাজা রাঢ়ের পূর্বাঞ্চল শাসন করতেন। মুকুটরায়ের রাজ্য বর্তমান পাবনা, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, খুলনা হতে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে এই ভুখণ্ডের রাজধনী ছিল বর্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরবাদ পরগণার পুবধুলা বা পূর্বস্থলীতে। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুকুটরায়ের রাজত্বকাল এবং তিনি দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহের নিকট পাঞ্জা লাভ করে দক্ষিণ অঞ্চলের এক বিশাল ভুখণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন[৩৬]। মুকুটরায় ফিরোজশাহ তুঘলকের সমসাময়িক হলেও সিকন্দরশাহ বা তাঁর পরবর্তীকালের সুলতানের আমলে কোন হিন্দু জমিদারের পক্ষে এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারী লাভের ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই বৈদিক ব্রাহ্মণ জমিদার নবদ্বীপের সন্নিকটে সমুদ্রগড়ের সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নায়ক। 'সমুদ্রগড়'কে অনেকে সমুদ্রসেন বা সমুদ্রগুপ্তের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তবে একথা সত্য যে বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্বাংশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বসবাস করতেন এবং তাঁদের বসবাসের স্থান হিসাবে ভুখণ্ডটি 'সাতসৈকা পরগণা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সতীচন্দ্র মিত্র[৩৭] চারজন মুকুটরায়ের উল্লেখ করেছেন, যথা—(১) রায় মুকুট—ইনি অমরকোষের টীকাকার (২) ঝিনাইদহের রাজা মুকুট রায়, (৩) নদীয়া জেলার জমিদার (রাজবালা উপন্যাসে উল্লিখিত) ও (৪) লাউজানির (যশোহর জেলা) মুকুটরায়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কপোত-কপোতীর গল্পের ন্যায় প্রচলিত ধারাকেই আশ্রয় করে কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। তবে একথাও স্বীকার করতে বাধা নাই যে, অনেক লোকপ্রবাদের মধ্যেও প্রকৃত ইতিহাসের কাহিনী তথ্য বা সূত্র নিহিত থাকে। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে সমুদ্রগড়ের জমিদার বংশকে উচ্চ বংশোদ্ভুত বলা হয়েছে ; এই উক্তির পিছনে নদীয়ার রাজাদের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং নদীয়ার রাজাকে বিপদমুক্ত করতে গিয়ে তিনি ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন।

গণেশ, যদু বা জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে (১৪৩৪-৪২) তাঁরা গৌড়ের সিংহাসন ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিশেষ বিব্রত ছিলেন ; সে কারণে রাঢ় অঞ্চলের ঘটনাবলীতে সমসাময়িক-কালে রচিত ইতিহাসের সাক্ষ্য নীরব। যদুর পুত্র শমস্-উদ্দিন আহম্মদশাহ (১৪৪২ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পকালের মধ্যে নিহত হলে ইলিয়াসশাহী বংশের পুনরুত্থান হয়। শমস্-উদ্দিন ইলিয়াসশাহের পৌত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪৪২-৫৯) সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩৮] এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের

শাসনকর্তা ছিলেন তরিবিয়ৎ খাঁ এবং অতঃপর নাসিরউদ্দিনের পুত্র রুকুন-উদ্দিন বারবকশাহ (১৪৫৯-৭৪) এই অঞ্চল শাসনের অধিকার লাভ করেন। ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। কপিলেন্দ্রদেবের সমসাময়িক ছিলেন নাসিরউদ্দিন[৩৯] এবং ঐ শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চল নাসিরউদ্দিনের অধিকারচ্যুত হয়ে সাময়িকভাবে ওড়িশার অধীনস্থ হয়েছিল।

বারবকশাহের আমলে সপ্তগ্রামে পার্শ্বনাথমূর্তির পৃষ্ঠদেশে খোদিতলিপি হতে জানা যায় সেনাপতি ইকবার খাঁ ছিলেন উজির ও রাজপ্রাসাদের রক্ষক এবং লাওবলা ও সাজলা মঙ্খবাদ অঞ্চলও তাঁর অধীনস্থ ছিল। সাজলা মঙ্খবাদ অঞ্চলের বিস্তৃতি ছিল সরস্বতী নদীর পশ্চিমতীব হতে দামোদরনদের তীর পর্যন্ত। ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে অকটোবর তারিখে প্রতিষ্ঠিত ছোট পাণ্ডুয়ার ছোট দরগার শিলালিপি পরীক্ষা করে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেন যে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ তাঁর অধীনস্থ ছিল[৪০]।

বারবকশাহ বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তাঁর সময়ে বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ করে গৌড়েশ্বরের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'খান' উপাধি হতে অনুমিত হয় যে, মালাধর প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি গৌড়েশ্বরের সভাসদও ছিলেন। মালাধর গৌড়েশ্বরের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয' গ্রন্থ রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তিকাল হল—

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥'

অর্থাৎ ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে রুকুনুদ্দিন বারবকশাহের আমলে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয' রচনা আরম্ভ হয় ও ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহের আমলে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল এবং মালাধরও এই সময়ে গৌড়ে বসবাস করতেন বলে অনুমান করা যায়।

বারবকশাহের পর শমসুউদ্দিন ইউসুফশাহ (১৪৭৪-৮১) ও দ্বিতীয় সিকন্দর-শাহের (তিনদিন মাত্র) রাজত্বকালে রাঢ়ের ইতিহাসের কোন সূত্র জানা যায় না। পরবর্তী সুলতান জালালউদ্দিন ফতেশাহের (১৪৮১-৮৭) আমলে তাঁর উজীর ও সেনাপতি উলুঘ মজলিস নূর ছিলেন আরসা ও সাজলা মঙ্খবাদ অঞ্চলের উপ-শাসন-কর্তা এবং সিমলাবাদ শহর হতে এই অঞ্চলটি শাসিত হত। হিজরী ৮৯২ সনে (১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ) লিপিটি সপ্তগ্রামে খোদিত হয়[৪১]। মহম্মদ হবিবুল্লাহা-এর মতে সিমলাবাদের অবস্থিতি হল বর্ধমান শহর হতে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের তীরে বর্তমান সেলিমাবাদ। ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে হিন্দু আমলে এই স্থানটি সেমিলকপুর নামে পরিচিত ছিল। ফতেশাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও

বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর রাজ্য সীমা ছিল শ্রীহট্ট হতে দামোদরনদের তীর পর্যন্ত[৪২]।

বারবকশাহের আমলে ইসমাইল গাজী নামক এক ধর্মযোদ্ধার কাহিনী নিয়ে ইতিহাস আশ্রিত কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারী ও হুগলী জেলার মান্দারণে তাঁর সমাধিক্ষেত্র হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র বলে গণ্য হয়। মান্দারণের রাজা গজপতি বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গজপতি পিতল দিয়ে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। ইসমাইল গাজী ১২০ জন জ্ঞানীগুণি লোককে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছেন শুনে রানী এই যুদ্ধ করতে রাজাকে নিষেধ করেন। রানীর নিষেধ সত্ত্বেও গজপতি, ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হন এবং গড়মান্দারণ পর্যন্ত বারবকশাহের অধীনস্থ হয়। কিন্তু সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে ইসমাইলের মাথা কাটা যায়। শোনা যায় তাঁর দেহ মান্দারণে ও মাথা কাঁটাদুয়ারীতে সমাহিত করা হয়েছিল।[৪৩]

জালালউদ্দিন ফতেশাহকে নিহত করে তাঁর হাবসী ক্রীতদাস বরবগ সুলতান শাহজাদা নাম গ্রহণ পূর্বক গৌড় অধিকার করেন, কিন্তু কযেক মাসের মধ্যেই জালাল-উদ্দিনের বিশেষ অনুগত মালিক আন্দিল বরবগকে নিহত করে সৈফুদ্দিন ফিরোজ-শাহ (১৪৮৭-৯০ খ্রীস্টাব্দ) নামধারণ পূর্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চার বছর রাজত্ব করার পর গুপ্তঘাতকের হস্তে সৈফুদ্দিন নিহত হন[৪৪]। তাঁর সময়ে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ অন্ততঃপক্ষে গৌড়েব অধীনস্থ ছিল; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কালনা শহরে প্রাপ্ত একটি মসজিদের শিলালিপিতে[৪৫]।

সৈফুদ্দিনের পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দ) মাত্র এক বছর রাজত্ব করেন[৪৬]। নাসিরউদ্দিন স্বয়ং বর্ধমান জেলায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন অথবা সৈফুদ্দিনের অধিকারভুক্ত এলাকা তাঁর হস্তগত হয়। বর্ধমান জেলার কালনা শহরে নাসিরউদ্দিনের সময়ে হিজরী ৮৯৫ সনে (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং ঐ স্থানে প্রাপ্ত মসজিদের শিলালিপিতে সুলতানের নাম খোদিত আছে: 'অস্-সুলতান ইবন্ অস্-সুলতান নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবু (ল) (মুজাহিদ) মাহ্মুদশাহ বাদশাহী গাজী[৪৭]। ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপিখানি হতে অনুমিত হয় যে, মসজিদটির নির্মাণকার্য সৈফুদ্দিনের সময়ে আরম্ভ এবং নাসিরউদ্দিনের আমলে সমাপ্ত হয়েছিল। কারণ কয়েক মাসের মধ্যে এরূপ মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভবপর নহে। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, গৌড়ের সুলতানের আধিপত্য বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। গোলাম হোসেন সলিম অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, নাসিরউদ্দিনে রাজত্ব একটা বিরাট অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল[৪৮]।

গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দনুজমর্দনদেব নামক একজন হিন্দুরাজা পাণ্ডুয়া হতে মুসলমান সেনাপতিকে বিতাড়িত করে দক্ষিণ ও

পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এই দনুজমর্দনদেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নামাঙ্কিত রজত-মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল মুদ্রার নির্মাণ-কাল ১৪১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দে এবং সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, আর্যাবর্তে কোন হিন্দু রাজা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে"।[৪৯]

দনুজমর্দনদেবের সময় বর্ধমান জেলা যে তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল তাব একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপ-সনাতনের পিতামহ পদ্মনাভের পিতা রূপেশ্বর কর্ণাটক দেশ হতে ভ্রাতৃবিরোধের ফলে 'পৌরস্যদেশে' রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন[৫০] জালালউদ্দিনের সঙ্গে দনুজমর্দনদেবের যুদ্ধের সময়ে পদ্মলাভ স্বীয় পবিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে রেখে গঙ্গাতীবে শেষ জীবনযাপন করার মানসে ১৪১৭ শকাব্দে দনুজমর্দনদেবের সাহায্যে তাঁর রাজ্য মধ্যে গঙ্গাতীরে নবহট্ট বা নৈহাটীতে (কাটোয়ার উত্তরে) আসেন[৫১]। প্রাচীনকাল হতে নৈহাটী একটা প্রসিদ্ধ স্থানরূপে উল্লিখিত ছিল। রূপ-সনাতন গোস্বামীব পিতা কুমারদেব পরম আচারনিষ্ঠ ছিলেন। নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব শুরু (মতান্তরে জ্ঞাতি বিরোধ) হলে ইনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বসবাসের নিমিত্ত চলে যান। বর্ধমান জেলা যে দনুজমর্দনদেবেব রাজ্যভুক্ত ছিল, তার অপর একটি প্রমাণ দ্বারা উপরোক্ত মতটিকে সমর্থন করে। ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত লঘু বৈষ্ণবতোষণীর শেষে তাঁর বংশ পরিচয পাওযা যায—

"বিহায় গুনি শেখবঃ শিখরভুমি বাস স্পৃহাং
স্ফুবৎ সুরতরঙ্গিনী তট নিবাস পর্যুৎসুব্যঃ।
ততোদনুজমর্দনাক্ষিতিপপুজ্য পাদঃ এসা—
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মলাভঃ কৃতী ॥"

অনুবাদ—"রাজা দনুজমর্দন নিত্য যাঁর পাদপূজা করিতেন, সেই গুণিশ্রেষ্ঠ কৃতি পদ্মণাভ শিখরভুমিবাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বসবাস করিতে উৎসুক হইয়া নবহট্টকে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন"[৫২]। নবহট্টক গ্রামটি কাটোয়ার উত্তরে কেতুগ্রামখানার অধীনে বর্তমানে 'নৈহাটী' নামে পরিচিত। রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে শিখরভুম রাজ্যের অবস্থিতি বলতে সেরগড় পরগণা বা রানিগঞ্জ অঞ্চলকে বোঝায়[৫৩]। অবশ্য মোগল আমলের পূর্বে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্চকোট ও মানভুমের পূর্বাংশ নিযে শিখরভুম রাজ্য গঠিত ছিল। রূপ-সনাতন ও শ্রীজীবের বংশপরিচয় সম্পর্কে একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়[৫৪]—'স চ পদ্মনাভ গঙ্গাতীর বাস লুব্ধ শিখরদেশং পরিত্যজ্য কুমারহট্ট নামা গ্রামে বাসংকোর'। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী বা নবহট্টের অবস্থান বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় ছিল বলে মন্তব্য করেছেন।[৫৫]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, শ্রীজীব গোস্বামীর লঘু বৈষ্ণবতোষণীতে 'নবহট্ট' এবং

সুকুমার সেন কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথিতে 'কুমারহট্ট' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। পদ্মনাভ কোন্ স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন তার সঠিক স্থান নির্ণয় প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, পদ্মনাভের বংশধর ও পাণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীজীব গোস্বামীর বিবরণই সঠিক। বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অধীনস্থ নৈহাটী একটি অর্বাচীন স্থান। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত কোন মঙ্গলকাব্যে এবং এমনকি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রচিত কোন গ্রন্থে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটীর কোন উল্লেখ নাই। অপরপক্ষে কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ নৈহাটীর উল্লেখ বিপ্রদাস ও মুকুন্দরাম উভয়ের বিবরণেই পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নৈহাটীকে একটি সুপরিচিত স্থান বলে উল্লেখ করলেও কোন্ সময়ে এই স্থানটির বিশেষ পরিচিতি লাভ ঘটেছিল তার কোন উল্লেখ করেন নাই। বৈষ্ণবতোষণীতে উল্লিখিত নবহট্ট এবং কেতুগ্রাম থানার নৈহাটী এক ও অভিন্ন।

(৩)

ত্রয়োদশ হতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যে কয়েকজন গৌড়ের সুলতানের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেনশাহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। সমসাময়িককালে রচিত সাহিত্য ও মসজিদলিপি ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের নাম জড়িত থাকায় বঙ্গদেশের আপামর জনসাধারণ হোসেনশাহের নামের সঙ্গে পরিচিত। গৌড় হতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথটি সাধারণের কাছে 'বাদশাহী সড়ক' নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথটি যিনিই নির্মাণ করুন না কেন, এটি নির্মাণের ক্ষেত্রে হোসেনশাহের নাম ও খ্যাতি জড়িত। এই বংশের আরও চারজন শাসকের পরিচয় জানা গেলেও হোসেনশাহের ন্যায় তাঁদের খ্যাতি ছিল না।

নাসিরউদ্দিনের পরবর্তী সুলতান শমস্-উদ্দিন মজঃফরশাহ ছিলেন অত্যাচারী ও নৃশংস এবং তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উচ্চপদস্থ আমীরগণ সৈয়াদ হোসেনশাহের নেতৃত্বে যুদ্ধ ঘোষণা করে মজঃফরশাহকে পরাজিত ও নিহত করেন[৫৬]। অপর এক বিবরণে জানা যায় যে, রাত্রিকালে তেরজন সৈন্যসহ প্রাসাদে প্রবেশ পূর্বক সৈয়দ হোসেনশাহ কর্তৃক নিহত হন এবং পরদিন প্রাতে সুলতান আলা-উদ্-দিন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন।[৫৭]

বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও সমসাময়িককালে নির্মিত মসজিদগাত্রে প্রতিষ্ঠিত শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, হোসেনশাহের দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্য বিস্তৃতি ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার ছত্রভোগ, হুগলী জেলার গড়মান্দারণ ও মেদিনীপুর জেলার নেড়াদেউলের উত্তরাংশ পর্যন্ত। নেড়াদেউল ঐ সময়ে ওড়িশার অধীনস্থ ছিল[৫৮]। গড়মান্দারণ, মঙ্গলকোট ও কালনায় প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল বলে অনুমান করা যায় এবং নবদ্বীপে একটি কাজির বিচারালয় ছিল। গড়মান্দারণে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, তিনি নিজেকে খলিফাতুল্লাহ বলেও উল্লেখ করেছেন। শিলালিপি হতে 'এটাই প্রমাণিত হয়

যে, এই সময়ে গড়মান্দারণ তাঁর অধিকৃত এলাকাভুক্ত ছিল। সম্প্রতিকালে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অধীনস্থ সুয়াতাগ্রামের এক প্রাচীন মাজার হতে তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে এবং ঐ শিলালিপিতে হোসেনশাহের মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়[৫৯]। তবে মসজিদটির ধ্বংসাবশেষের কোন চিহ্ন বা তার কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও সুয়াতা ও ভালিক গ্রামের মধ্যবর্তী স্থলে 'মসিদডাঙ্গা' নামে একটি স্থান আছে এবং উক্ত প্রান্তরে দু'টি স্তম্ভ প্রথিত অবস্থায় (পূর্বে তিনটি ছিল, একটি স্থানীয় জনসাধারণ ঐস্থান হতে সরিয়ে নিয়ে যায়) আছে, যার আকৃতি নূতনহাটের (মঙ্গলকোট) মসজিদের অনুরূপ। মনে হয় মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে শিলালিপি তিনটি পীর বহমনশাহের মাজারে রক্ষিত বা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঐ শিলালিপি হতে জানা যায় যে, কামতা বিজয়ের অল্পকাল পরেই তিনি সুয়াতায় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, কারণ কামতা বিজয়ের কথা শিলালিপিতে খোদিত আছে। তিনখানি শিলালিপির মধ্যে দু'খানি সম্পাদনের তারিখ হিজরী ৯০২ সন (১৪৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে) খোদিত আছে এবং তৃতীয়টি হিজরী ৯০৮ সনে (১৫০২ খ্রীস্টাব্দে) খোদিত হয়েছিল।[৬০]

নূতনহাট বাসস্ট্যান্ড-এর সন্নিকটে হোসেনশাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ধ্বংসোন্মুখ মসজিদের শিলালিপি মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি-গৃহে রক্ষিত ছিল এবং পরে এটি ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেব কর্তৃক এটির পাঠোদ্ধারকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। উক্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, হিজরী ৯১৬ সনে (১৫১০ খ্রীস্টাব্দে) সৈয়দ আসরফের পুত্র হোসেনশাহ ছিলেন ঐ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা এবং মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থিত জলপানের নিমিত্ত বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কথা উক্ত শিলালিপিতে উল্লেখ আছে।[৬১] কেতুগ্রাম থানায় বাদশাহী সড়কের ধারে রাইখান ও কুলুট গ্রামে হোসেনশাহের আমলে দু'টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। হোসেনশাহের আমলে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্মিত মসজিদ ও সেগুলিতে খোদিতলিপি হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে বর্ধমান জেলা তাঁর অধীনস্থ ছিল।

সমসাময়িক ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, দামোদরের দক্ষিণ তীর হতে মেদিনীপুর জেলার মধ্যাংশ পর্যন্ত তাঁর অধীনস্থ ছিল। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে ওড়িশা জয়ের মানসে রাঢ় অঞ্চল অতিক্রম করার সময় বহু দেবমন্দির ধ্বংস করে বিনা বাধায় পুরীতে প্রবেশ পূর্বক জগন্নাথ মন্দির অপবিত্র করেছিলেন। পুরী আক্রমণের সংবাদ পেয়ে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেব দক্ষিণদেশ হতে সত্বর প্রত্যাবর্তনের ফলে হোসেনশাহের সৈন্যদল পশ্চাৎ অপসারণ করে গড়মান্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক মাস অবরোধের পর উৎকল সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় গড়মান্দারণ হস্তচ্যুত হয় এবং সাময়িক সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে কাঁপসা বা কাঁসাই

নদীর উত্তরতীর পর্যন্ত গৌড়ের সুলতানের ও কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীর হতে অবশিষ্ট অংশ ওড়িশার অধীনস্থ হয়।[৬২] গড়মান্দারণ ছিল সীমান্তবর্তী দুর্গ এবং এই দুর্গের অধিকর্তা ছিলেন ইসমাইল গাজী। সম্ভবতঃ এই স্থান হতে বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলী, বাঁকুড়া ও উত্তর মেদিনীপুর অঞ্চল শাসিত হত।

হোসেনশাহের আমলে বঙ্গদেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তিনি নির্বিচারে হাবসীদের নির্বাসিত ও হত্যা করে তৎপরিবর্তে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানগণকে উচ্চরাজপদে নিয়োগ করেন[৬৩]। বাংলার ইতিহাসে সুদীর্ঘকালব্যাপী হাবসী খোজাগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতির নিয়ামক হয়ে উঠেছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাসাদ-বিদ্রোহগুলি এদের দ্বারাই সংঘটিত হত। হাবসীদের বিতাড়ন ও ও তাঁর সুদীর্ঘকাল ধরে রাজত্বের ফলস্বরূপ বঙ্গদেশের রাজনীতি ও শাসক নির্বাচন প্রাসাদ-বিদ্রোহের কুফল হতে রক্ষা পেয়েছিল। উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মকে তিনি প্রাধান্য দেন নাই। বহু বিশিষ্ট হিন্দু উচ্চরাজপদে নিযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে পুরন্দর খাঁ, মুকুন্দ সরকার, সনাতন, রূপ প্রমুখ হিন্দু কর্মচারীর নাম উল্লেখ করা যায়। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খাঁ হোসেনশাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ছুটি খাঁর অধীনস্থ ও তাঁর নাম অনুসারে ছুটিপুর পরগণার সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য এর কোন লিখিত প্রমাণ নেই। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে মান্দারণ শিলালিপিতে তিনি নিজেকে খলিফাতুল্লাহ্ বলে ঘোষণা করেন[৬৪]।

হোসেনশাহের রাজ্যশাসন ও তাঁর হিন্দুপ্রীতি সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরে তাঁকে আদর্শ শাসকরূপে প্রচার করা হলেও অনেকে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের উক্তি অনুসারে এই হিন্দুপ্রীতিকে রাজনৈতিক কৌশল বলে আখ্যা দিয়েছেন; কেবলমাত্র প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় নবযুগের সূচনা হয়। বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারে আতঙ্কিত হয়ে নবদ্বীপের মুসলমান বিচারক চাঁদ কাজীর অত্যাচারে হিন্দুদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। শ্রীচৈতন্যের গৌড়নগরীতে প্রবেশের ইচ্ছা থাকলেও হোসেনশাহের ভয়ে রূপ ও সনাতন তাঁকে রামকেলী হতে প্রত্যাবর্তন করতে অনুরোধ করেন। ওড়িশার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময়ে তাঁর মন্ত্রী রূপ-সনাতন হোসেনশাহের সঙ্গী হতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তাঁরা জানতেন যে, তাঁদেরই সম্মুখে সুলতানের আদেশে পথিপার্শ্বের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা হবে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আছে—

'কে হুসেন শাহ সর্ব উড়িষ্যার দেশে
দেব মূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ।' অন্তখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

তাঁর আমলে কাজী ও মোল্লাদের অত্যাচারের বহু উল্লেখ আছে এবং হিন্দুদের বিগ্রহ ও মন্দির ধংস করা মুসলমানদের কাছে অতি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত[৬৫]। অবশ্য মন্দির ধ্বংসের অন্য একটি প্রধান কারণ ছিল। প্রায় প্রতিটি

বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরে বহুকাল ধরে ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল এবং উক্ত সঞ্চিত ধনরত্নের প্রতি সুলতানদের লোভ ছিল। সুতরাং হোসেনশাহের ওড়িশা অভিযানের পশ্চাতে ছিল মুসলমান রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপ্রচারের স্পৃহা ও হিন্দু মন্দির ধ্বংসের উন্মাদনা।[৬৬] তবে এর জন্য গোঁড়া হিন্দু ধর্মের লোকেরাও কম দায়ী নন। ধর্ম ও বর্ণাশ্রমের নামে সমাজে বাধানিষেধের প্রবর্তন ও নিম্নবর্ণের লোকেদের উপর সামাজিক অত্যাচারের ফলে ব্যাপকহারে নিম্নবর্ণের লোকেরা ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হত।

অন্যান্যদের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও হোসেনশাহ, তাঁর পালক সুবুদ্ধিরায় ও ছত্রভোগ অঞ্চলের শাসনকর্তা রামচন্দ্র খানের উপর লঘু পাপে যে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন তা হিন্দুদের উপর অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবার সমসাময়িককালে রচিত কয়েকটি কাব্য গ্রন্থে উদারতার জন্য হোসেনশাহের প্রশংসাও করা হয়েছে এবং একথাও সত্য যে ঐ সময়ে অন্যান্য সুলতানগণের তুলনায় তাঁর চরিত্র নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল এবং প্রায় তিন দশক ধরে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক দৃশ্যাবলীতে স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

হোসেনশাহের সময়ে বর্ধমানের সঙ্গে গৌড়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। গৌড় হতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভুম জেলার মধ্য দিয়ে কেতুগ্রাম থানা অতিক্রম করে মঙ্গলকোটে অজয় ও বর্ধমানে দামোদর পার হয়ে গড়মান্দারণ পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রসারিত ছিল। জনশ্রুতি যে এই রাস্তাটি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা 'বাদশাহী রোড' বা 'হোসেনশাহী সড়ক' নামে পরিচিত। কুলিনগ্রাম নিবাসী পুরন্দর খাঁ ছিলেন সুলতানের সভাসদ, শ্রীখণ্ড নিবাসী মুকুন্দ সরকার (নরহরির অগ্রজ) ছিলেন প্রধান চিকিৎসক ও দামোদর কবিরাজও চিকিৎসাকর্মে গৌড়েই নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া সনাতনের শ্যালক উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন। আবার তাঁর আমলে মঙ্গলকোটের সন্নিকটে চন্দ্রসেন রাজার নির্মিত মন্দির ধ্বংস করে ঐ মন্দিরের উপকরণ দিয়ে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তা মসজিদ-গাত্রে গ্রথিত সংস্কৃত অক্ষরে খোদিতলিপি হতে প্রমাণিত হয়।

১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে হোসেনশাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিন আবুল মুজফর নসরৎশাহ (১৫১৯-৩২) গৌড়ের সুলতান হন এবং তাঁর সময়ে বর্ধমান জেলার অধিকাংশ গৌড়ের অধীনস্থ ছিল। হিজরী ৯৩০ সনে (১৫২৩ খ্রীস্টাব্দ) নসরৎশাহের রাজত্বকালে, খান মিয়া মুয়জ্জম মোরাদ হায়দর খানের পুত্র মিঞা মোয়াজ্জেম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ মিয়া মোয়াজ্জেম মঙ্গলকোট অঞ্চলের উপ-শাসনকর্তা অথবা জায়গীরদার ছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের শিলালিপি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত ছিল।[৬৭] নসরৎশাহের আমলে রাঢ় অঞ্চলে কোন বিশৃঙ্খলার ঘটনা জানা যায় না।

১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে নসরৎশাহের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল বদর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ বছরেই নসরৎশাহের অনুগত মখদুমের সহায়তায় তাঁর পুত্র

আলাউদ্দিন মুজফফর ফিরোজের (১৫৩২-৩৩) স্বল্পকালীন রাজত্বের কোন ঘটনা জানা না গেলেও কালনা শহরে প্রাপ্ত একটি মসজিদের শিলালিপি হতে এই সুলতানের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে হিজরী ৯৩৩ সনে (২৭শে মার্চ, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) উলুঘ মসনদ খান মালিক নামক একজন উজির ও সেনাপতি কালনা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সুলতান আলাউদ্দিন মজফফর-শাহের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৮] উলুঘ মসনদ খান ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী এবং তিনি কালনায় শাসনকার্যালয় স্থাপন পূর্বক এই অঞ্চল শাসন করতেন। স্টুয়ার্টের মতে মুজফরশাহ তিন মাস রাজত্ব করেন।[৬৯] কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, তিনি তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। মজফফর-শাহকে হত্যা করে হোসেনশাহের অপর এক পুত্র গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) নামধারণ পূর্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সাসারামের আফগান শাসনকর্তা শেরখাঁ কর্তৃক গৌড় অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হলে তিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে প্রথমবাব সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করলেও দ্বিতীয়বারের আক্রমণের সময় দক্ষিণবঙ্গে পলায়ন করেন। এইভাবে হোসেনশাহী বংশের পতন ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলেব অবসান হয়।

(৪)

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাববেব বিজয় লাভের পর বিহার ও বঙ্গদেশেব বাজনৈতিক অস্থিবতাব সৃষ্টি হয। এই সুযোগে বিহারের সাসারাম অঞ্চলের আফগান জায়গীরদার শেবখাঁব গৌড় অভিযানেব সংবাদ পেযে গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ-শাহ তেলিয়াগাড়ির গিরিবর্তে বিপুলসৈন্য সমাবেশ কবেন। উপাযন্তর না দেখে শের-খাঁ কৌশলে তাঁব পুত্র জালাল খাঁর অধীনে ঐ স্থানে অল্প সংখ্যক সৈন্য রেখে অধিকাংশ সৈন্যসহ গোপনে ঝাড়খণ্ডের পথে অগ্রসর হন। তিনি সম্ভবতঃ মানভূম, বর্ধমান ও বীরভূম অতিক্রম করে গৌড়ের উপকণ্ঠে উপস্থিত হযেছিলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন। এই সময়ে বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে চুরুলিয়া দুর্গের পতন হয়[৭০] এবং অনুমান করা যায় যে, তাঁর নামানুসারে উক্ত অঞ্চল পরগণা সেরগড় নামে খ্যাত হয়।

গৌড় পতনের পর উপায়ন্তর না দেখে গিয়াসউদ্দিন তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শেরখাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনে স্বসৈন্যে গৌড় অভিযানে অগ্রসর হওয়ায় পূর্বোক্ত পথে শেরখাঁ দক্ষিণ বিহারে পলায়ন করেন। কিন্তু চৌসা (১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ) ও বিলগ্রামের (১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ) যুদ্ধে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং প্রায় বিনা বাধায় শেরখাঁ সমগ্র উত্তরভারত অধিকার করে শেরশাহ নামধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা খিজির খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় শেরশাহ

কঠোরহস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। একজন শাসকের অধীনে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসনের অধিকার প্রদান না করে কয়েকটি ভাগে এই দেশকে বিভাগ করে তাঁর অনুগতদের মধ্যে শাসনভার অর্পণ করে কাজী-কাজীলাৎ নামক এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।[৭১] সম্ভবতঃ এই সময়ে সুলেমান কররানী বর্ধমান ও হুগলী অঞ্চলের শাসনকর্তা ও জায়গীরদার ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সুলেমানাবাদের সদর কার্যালয় সুলেমানাবাদের উল্লেখ আছে।[৭২] অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে সুলেমানশাহের নামানুসারে এই বিভাগের নামকরণ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সম্রাটপুত্র শাহজাদা সেলিমের নামে সেলিমাবাদে রূপান্তরিত হয়।[৭৩] বর্ধমান শহর হতে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান সেলিমাবাদ গ্রামটি ঐ সময়ে উল্লেখযোগ্য শাসনকেন্দ্ররূপে গণ্য হত। বর্ধমান শেরশাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ধমান শহরের পুরাতনচক এলাকায় কাল-মসজিদের শিলালিপিতে। এই মসজিদের শিলালিপিতে খোদিত আছে—[৭৪]

'লা এলাহা ইল্‌লাল্‌লাহ, মোহাম্মদ রাসুলুল্‌লো আল হামদো লিল্‌লাহে রাববুল আলামীন ওয়াল আফিয়াতুল মুত্তাকিন ওয়াস সালামে আলা সৈয়দুল মুরসালিন ও আলায়হে ও আসহাবে আজ মাইন।

আফরিন সদ্‌ আফরিন বর শেরশাহ
শোদ ব আহাদ মসজিদ ও মিমবর আলা
হাম মোজাহিদেম মোজাদদাদ দর পনাহ
কারদ বার হক্‌ ব তায়েত সিজদা গাহ
মোমিনো বাহরে খোদায়ে জুল জালাল
কর নামাজে পানজ গানা কুন বখাহ।
গুফত হাতিফ বহরে নামাজ তারিখ শুকনুন
মিমবর অর মেহরাব অর মসজিদ মরহবা। হিজরী ৯৫০।

উক্ত ফারসি কবিতার মর্মকথা হল শত প্রশংসাধন্য শেরশাহ যিনি এটি প্রার্থনার জন্য তৈরা করালেন। উক্ত মর্যাদাসম্পন্ন শাসকের আমলে তৈরী এই মসজিদে ধর্মযোদ্ধা এবং ধর্মসংস্কারক সকলেই পরমপ্রভুর উদ্দেশ্যে মাথা নত করতে পারেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের ন্যায় আপনারাও আল্লার উদ্দেশে নামাজে রত হন। এই মসজিদ স্থাপনের তারিখ মেম্বর মসজিদ মেহরাব শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ৯৫০ হিজরী।'

একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, শেরশাহ সপ্তগ্রাম-বর্ধমান-সাসারাম হয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন, যেটি বর্তমানে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর কাল (১৫৩৯-৪৪) রাজত্ব করেন এবং এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন বছর স্বায় প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত যুদ্ধবিগ্রহে সময় কেটেছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ২২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করা প্রযুক্তিবিদ্যার

বিচারে সম্ভবপর নয়। বহু প্রাচীনকাল হতে বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র উত্তরাপথের যোগাযোগ ছিল এবং সেই প্রাচীন পথেই আবহমানকাল ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে আসছে। সম্ভবতঃ শেরশাহ প্রাচীন পথঘাটের উন্নতি ঘটিয়ে ও সংযোগসাধন করে রাস্তার ধারে সরাইখানা ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। অন্ততঃপক্ষে সপ্তগ্রাম হতে বর্ধমানের শেষপর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে শেরশাহের কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু একথা জানা যায় যে, শেরশাহ সোনারগাঁও হতে রাজমহল পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন।[৭৫]

শেরশাহের পর কয়েকজন শাসক স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন। কিন্তু ঐ সময়ে বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের কোন বিবরণ জানা যায় নাই। সুলতান গিয়াস-উদ্দিন বাহাদুরশাহের শাসনকালে (১৫৫৪-৬০) কালনায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৭৬] উক্ত মসজিদের শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয় যে, এই অঞ্চল তাঁর অধীনস্থ ছিল এবং তিনি সুরজগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। কালনা শহরে একটি দুর্গের অস্তিত্ব বর্তমান শতকের মধ্যভাগেও বিদ্যমান ছিল। অনেকের মতে এটি আকবরের আমলে নির্মিত হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিনের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন জালালশাহ (১৫৬০-৬৩) বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন।

জালালশাহের পর সুলেমান কররানী (১৫৬৪-৭২) গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সুলেমান কররানী, আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে গৌড়ের জলবায়ু ও পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সাময়িক-ভাবে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। উৎকলরাজ মুকুন্দদেব দক্ষিণ রাঢ় অভিযান করে প্রায় সমগ্র বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর অধিকারভুক্ত করেন। সুলেমান কররানী ও তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় স্বসৈন্যে দক্ষিণ রাঢ় পুনরাধিকার করে ওড়িশা আক্রমণ করেন এবং এই যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হন। কালাপাহাড় হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ধ্বংসের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু যে সকল কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করেছিল তার অধিকাংশের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা সম্ভবপর নয়। কালাপাহাড়ের পরবর্তী আমলে নির্মিত বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসের জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, অঙ্গহীন দেবমূর্তি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং পঙ্কোদ্ধারের সময় আবিষ্কৃত মূর্তি-গুলিকে কালাপাহাড়ের কীর্তি বলে প্রচার করা হয়। তবে একথা সত্য যে, বাদশাহী সড়কের উভয় পার্শ্বের গ্রামগুলির মন্দির ও বিগ্রহ কালাপাহাড়ের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। সুলেমান কররানী ও কালাপাহাড় ওড়িশায় ধ্বংসকার্য শুরু করলে সম্রাট আকবরের হস্তক্ষেপের ফলে বহু বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায় এবং বাধ্য হয়ে সুলেমান কররানী ওড়িশা ধ্বংস হতে বিরত হন।

(৫)

গিয়াসউদ্দিন জালালশাহের শাসনকালে ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে বহরাম সক্কা নামক এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান দরবেশ বর্ধমান শহরে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন সূত্র হতে তাঁর জীবনী, সেবাকার্য, দেওয়ানা রচনা ও বর্ধমান শহরে বসবাসের ঘটনা জানা যায়।

মধ্যযুগের প্রথম পর্ব হতে সামরিক শক্তির সহায়তায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় রাজা বা জমিদারের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযানকে ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হত। যুদ্ধ ব্যবসায়ী গাজীগণ ইসলাম-ধর্মের ছত্রছায়ায় মুসলমান সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল। হিন্দু মন্দির-সমূহ ধ্বংস করে, উক্ত ধ্বংসাবশেষ হ'তে উপাদান সংগ্রহ করে মন্দির প্রাঙ্গণে দরগা, মাজার, মসজিদ প্রভৃতি গড়ে উঠায় উক্ত স্থানগুলি হিন্দুদের নিকটও আকর্ষণীয় ছিল। সেকারণে আজও বাংলাদেশে বহু পীর বা গাজীর মেলায় হিন্দুরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সমবেত হন।

কিন্তু পীর ও সুফীগণ ধর্ম প্রচারের নামে বহু জনহিতকর কাজে নিজেদের লিপ্ত করেছিলেন তার প্রমাণের অভাব নাই। সাময়িকভাবে হয়ত তাঁরা রাজনৈতিক আবর্তে জড়িত হলেও মানবকল্যাণ ব্রত ছিল তাঁদের মুখ্য আদর্শ। ষোড়শ শতকে এরূপ এক ধর্মপ্রাণ পীরের জীবন কাহিনী সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং দুইখানি শিলালিপিতে খোদিত আছে। পরহিতব্রতে ব্রতী আজীবন মশক বহনকারী এই মহাপুরুষ প্রথম জীবনে 'শাহওয়ার্দি বীয়াৎ' এবং পরবর্তীকালে 'হজরৎ পীর বহরাম সক্কা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। 'সক্কা' শব্দের অর্থ জলদানকারী। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বায়াজিদ বিয়াদ-এর আত্মজীবনী, আবুল ফজল আলমীর আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী, বহরামের স্বরচিত দেওয়ানা এবং বর্ধমান শহরে প্রাপ্ত দুটি শিলালিপি হতে এই ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। তম্মধ্যে বায়াজিদের আত্মজীবনী ও শিলালিপি দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৭৭]

বিয়াৎ বংশোদ্ভূত দুই বালক তুরস্কের তাব্রিজ শহরে বাল্যকাল অতিবাহিত করে ভাগ্যান্বেষণে কাবুলে এসে মোঘল সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন। যৌবনে শাহওয়ার্দি প্রসিদ্ধ যোদ্ধারূপে খ্যাতি অর্জন করে বাবরের দ্বিতীয় পুত্র কামরাণের অধীনে ঘোরবন্দ, জোহাক ও বামিয়ানের শাসনভার লাভ করেন। এই সময়ে ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের পথে কাবুলে এসে উপস্থিত হন এবং শাহওয়ার্দি, বায়াজিদ ও বাপুসবেগ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিশু আকবরের আইন-বন্দী বা খাতনা উৎসব উপলক্ষে কান্দাহার শহরে ৪০ দিন-ব্যাপী বিশেষ সমারোহ অনুষ্ঠানে আল্লার মহিমা সূচক ধর্মীয় সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে, শাহওয়ার্দির মনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সৈনিকের বৃত্তি পরিত্যাগ করে ধর্মচর্চা ও মানব হিতৈষী কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত

ছিল, উষর দেশের পিপাসার্তগণকে জল দান করে তৃষ্ণা নিবারণ করা, আর অবসর সময়ে শাহওয়ার্দি দিওয়ানা রচনা করে শিষ্য ও গুণীজনকে শুনিয়ে নদীর জলে বিসর্জন দিতেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে কয়েকটি বায়াজিদের আত্মজীবনীতে উল্লেখ কবা আছে এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত কয়েকটি দিওয়ানা এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাজকার্য পবিত্যাগ করাব পব শাহওয়ার্দি, বহরাম সক্কা নামে পরিচিত হন। তুরস্ক ও পাবস্যের বহু স্থানে জলদান ব্রত পালন করে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক দিনের জন্যও মশকটি কাঁধ হতে না নামানোর ফলে কাঁধে বিষাক্ত ক্ষতেব সৃষ্টি হয়েছিল। গুরু শেখ জামি মহম্মদ খাবুসানী নিশাপুরীর আদেশে কিছুকাল মশকটি স্কন্ধচ্যুত করতে বাধ্য হন এবং আরোগ্য লাভের পব গুরুর আদেশে দিল্লীতে আসেন। উভয় ভ্রাতা ছিলেন মোঘল সেনাপতি মুনিম খাঁব প্রিয়পাত্র এবং সেকারণে দিল্লীতে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রের 'হুজরা শরীফে' (সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির নিকটস্থ) আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বায়াজিদ ছিলেন সম্রাটের রন্ধনশালার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রামাণিক জীবন-চবিতের অভাবে বহরাম সক্কার ধর্মমত নির্ণয় করা যায় না, তবে তাঁর কার্যকলাপে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সুফী মতাবলম্বী। দিল্লী হ'তে আগ্রায় এসে আগ্রা দুর্গের সম্মুখভাগে একটি নিম গাছের নিচে তাঁর জলসত্র ছিল। সাধারণ নাগরিক, উচ্চপদস্থ আমীর-উমরাহ, এমন কি তাঁর গুণগ্রাহী স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্যন্ত এই জলসত্রে জলপান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। সম্রাট জলপান করাব সময়ে বহরামের দিওয়ানা শুনে আনন্দিত ও মুগ্ধ হতেন।

দীর্ঘকাল আগ্রায় অবস্থানের পর সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে নানা স্থানে ভ্রমণ করে সুবাবাংলার অন্তর্গত সরকার শরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্দওয়ান (বর্তমান বর্ধমান) শহরে আসেন। শোনা যায় আবুল ফজলের সুনজরে না থাকায় তাঁর আগ্রা ত্যাগের প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে পুরাতন চক এলাকায় (রাজবাড়ী হতে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে) যোগী জয়পালের আস্তানা ছিল এবং উক্ত স্থানটি যোগী জয়পালের বাগান নামে পরিচিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহাপুরুষদ্বয় উভয়ে উভয়ের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হন এবং বহরাম সক্কার প্রার্থনানুসারে জয়পাল তাঁর বাগানে বহরামকে স্থান দান করেন। প্রবাদ যে জয়পাল ইসলাম ধর্মে অনুরাগী হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি দীন মহম্মদ নামে পরিচিত হন। পীর বহরামেব সমাধিক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যোগী জয়পালের সমাধি আছে এবং ঐ স্থানে স্থানীয় জনসাধারণ কৈ ও ল্যাঠাজাতীয় মাছ এখনও পেরেকে গেঁথে মানসিক প্রদান করেন। এ জাতীয় মানসিক বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকতে পারে।

বর্ধমান শহরে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে বহরাম সক্কা ইহলোক ত্যাগ করেন। বিশাল সমাধিক্ষেত্রের উত্তরভাগে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর সমাধি কক্ষটি অবস্থিত।

সম্মুখভাগে একটা দালান এবং দালানের পশ্চাতে গর্ভগৃহ মধ্যে কবরটি বর্তমান। কক্ষটি একটি গম্বুজ ও চারটি মিনার দ্বারা শোভিত। আজও প্রতি বৎসর চান্দ্র মাসের ২২ হতে ২৪ রজব পর্যন্ত হজরৎ পীর বহরাম সক্কার উরস মোবারক উৎসব উপলক্ষে নানা স্থান হ'তে বহু ভক্তজন সমবেত হন।

বহরাম সক্কার দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর উক্ত সমাধিস্থলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন এবং ব্যয়ভার বহনের নিমিত্ত পুরাতনচক, ফকিরপুর ও মীর্জাপুর মৌজা দান করেন। পরবর্তীকালে মৌজা তিনটির বিনিময়ে ৪১ টাকা ২ আনা ৪ পাই বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্নকীর্তিটি আইনানুসারে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। সমাধিক্ষেত্রের উত্তর ভাগে বিশাল জলাশয়, পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে আছে বহু পীর, ফকির ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি। মূল সৌধের পশ্চিমে একটি উন্মুক্ত দালানে মেহের-উন-নিসার প্রথম স্বামী বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগান ও সমসাময়িক বাংলার সুবাদার কুতুবউদ্দিনের সমাধি বর্তমান। প্রবেশ পথের বাম দিকে আছে একটি সুরঙ্গ, যা নিয়ে সাধারণের কৌতুহলের সীমা নাই। নিকটে আছে যোগী জয়পালের সাধন ভজনের স্থান—সেটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পীর বহরামের সমাধিকক্ষের প্রবেশ পথের উপর ২½ ফুট × ১½ ফুট পরিমিত কাল পাথরে আরবী ও পার্সী ভাষায় রচিত খোদিতলিপি দুটি অধ্যাপক হেনরী ব্লকম্যান ও মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়ালী সাহেবের মতে হিঃ ৯৭০ = ১৫৬২-৬৩ খৃস্টাব্দে বহরাম পরলোকগমন করেন। কিন্তু মাতোয়ালীর মত গ্রহণ করে অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেছেন যে হিঃ ৯৮২ = ১৫৭৪ খৃস্টাব্দ হওয়াই সমীচীন। ১৫৭৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে বর্ধমান মোঘলদের অধীনস্থ ছিল না। অনুমান করা যায় যে হিঃ ৯৭০ অব্দে বহরামের মৃত্যু হয় এবং হিঃ ৯৮২ অব্দে বর্ধমান শহর মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল কর্তৃক অধিকৃত হলে আকবরের আদেশে হজরৎ পীর বহরাম সক্কার সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। সমাধিসৌধে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পাওয়া যায়—'তারিখে অসালা হজরত হাজী হরমিনাস শারিফায়েন বেহারমে হাক্ক কদসাল্লে সাররাহু' অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ বহরাম সক্কা হিঃ ৯৭০ অব্দে আল্লার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, যার অর্থ হল—তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করে আল্লার রাজ্যে বিরাজমান।

'ইয়া আল্লাহো ইয়া ফ্যতা হো
ইয়া আল্লাহো ইয়া ফ্যতা হো ইয়া আল্লা হো
লা ইলাহা ইললাল লাহো
মহম্মদুর রসুলুল্লা—হক্‌কন্
জাহে দুরবেশ আলমে গুস্তাহ ব্যহার অম্
কেহ্ দর্ ইরকান্ দিলেহ্ উব্‌দ্ দরিয়া
জ আলম রয্‌ত ডররাহে্ সর আনডিপ্।

খুদ্ আজ্ মুলক ফনাহ্ বহ্রাম দানা
হিসাবে সালে ফোৎ আঃ ইয়াগানা
জা হক করদিম্ চুন্ ফৎআহি তমন্না
নিদা অমদ্ কেহ্ তারিখে ওফাতস
বুদ্ দরবেশ মা বহরাম সক্কা'।

মোলবী ওয়ালি সাহেবকৃত ইংরাজী পদ্যানুবাদ

O Allah,O Fattah (Opener). O Allah, O Fattah, O Allah.

There is no God but Allah. Muhammad is the Vicegerent of Allah.

In truth Verily Bahram was the Saint of the world (i. e. the Saint of world-wide renown)

Whose heart, in the true knowledge, was like the Ocean.
He went away from the world, on his way to Ceylon.
Bahram, the wise, quitted this transitory realm.
When the calculation of the year of that unique one's death.
I desired from God, O Fat-hi,
A voice said that the date of his death
Is our Darvish Bahram Saqqa (970 H. = 1562-63 A. D.)

অধ্যাপক ব্লকম্যানের অনুবাদে পাওয়া যায়—

A voice came from heaven, announcing that
The chronogram of his death lies in the words—
(our Darvish is Bahram Saqqa) H. 982 or 1574

হিজরী ১০১৫ অব্দে খোদিত অপর একখানি শিলালিপি সমাধি গৃহের দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত আছে। হিজরী ১০১৫ (১৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দ) অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দ্বিতীয় শিলালিপিটি খোদিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শিলালিপিখানি ওয়ালি সাহেবের পাঠোদ্ধার এরূপ—

'বিসমিল্লা অর রহমান অর রহিম
(ব-মজমুন আয় আয়ে করিমা ওহ্ আদল মালা
আলা হুব্বা জভিল কুরবা ওয়ল ইয়াতামা ওয়ল
মশাকিনে ভবনিশ সবিলে বয়স সাহ্ এলিনা ওয়হ্
ফির রেকাবা)—বতসদ্দুকে ফরকে মোবারক
বন্দে গানে হজরতে শাহেনশাহিয়ে কাড়িয়া ফকীর
উরা জহ্তে মদদেমাআসে ফোকরহ্ ওয়হ্ মশাকিনে
মজারপুর আনোয়ার পীর বহ্রাম ব মুজিব্

নভিশতায়ে আল্‌হাদা মোকরবর নমুদা সুদ ওয়হ্‌
মোতাবল্লীয়ে শেখ বখ্‌তিয়ার বাশদ্‌—
কুনীনদায়ে ইন্‌ পরিয়া বলগত্‌ খোদা ওয়হ্‌ নফরীন
রসুল গিরেফতার বাশদ্‌ ॥

অনুঃ আল্লা যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। তাঁর পবিত্র বাণীতে আছে যে. যিনি তাঁর ধনসম্পত্তি অনাথ, পান্থ ও দরিদ্রজনের মধ্যে বিতরণ করেন তাঁব উপর আল্লার করুণা বর্ষিত হউক এবং মহামহিম সম্রাটের [নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর] প্রধান দাসের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ফকিরপুর গ্রামটি দরিদ্র ও অভাবীজনের জন্য মাদদ-ই-মাস হিসাবে পৃথক রাখা হ'ল। পীর বহ্‌রামের জ্যোতির্ময় সমাধির জন্য মাজারপুর ও আনোয়ারপুর গ্রাম দুটি বিশেষ অনুমত্যানুসারে দান করা হল এবং শেখ বখ্‌তিয়ারকে উক্তস্থলের (সমাধিসহ সমাধি ভবনের) মুতাওয়ালী (মাতোয়ালা) নিযুক্ত করা হল। যে ব্যক্তি উক্ত কার্যের (দান কার্যের) পরিবর্তন সাধন করবেন, তার উপর আল্লার অভিশাপ ও দেবদূতের ভর্ৎসনা বর্ষিত হোক। তারিখ ১০১৬ হিজরী (১৬০৬-৭ খ্রীস্টাব্দ)।

লিপিতে আছে 'বন্দে গানে হজরত শাহেন শাহিয়ে' অর্থাৎ মহামহিমান্বিত শাহেন-শাহের গৌরব বর্ধিত হউক। কিন্তু সম্রাটের নাম উল্লেখ না থাকলেও সমাধি লিপির খোদিত তারিখটি হল হিজরী ১০১৫ অব্দ অর্থাৎ ১৬০৬-৭ খ্রীস্টাব্দ। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে সম্রাট আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেলিম ঐ বৎসর ৩রা নভেম্বর নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় শিলালিপিখানি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খোদিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গরীব দুঃখীদের ভরণ-পোষণের জন্য ফকিরপুর মৌজা এবং পীর বহ্‌রাম সক্কার সমাধিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মীর্জাপুর (মজারপুর) ও আনোয়ারপুর মৌজা দান করার বিষয় আলোচ্য শিলা-লিপিতে খোদিত আছে। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মৌলবী ওয়ালি সাহেব সমগ্র লিপিখানির অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম হতে সামস্‌-উদ-দীন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত **Inscriptions of Bengal, Vol IV (page 269-270)**-এ শিলালিপিখানি প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, শিলালিপিটির অনুবাদ ওয়ালি সাহেব যে অবস্থায় প্রকাশ করেছিলেন মিঃ আহমেদ হুবহু নকল করতে গিয়ে একই ভুল করলেন। মূল শিলালিপির সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। যে অংশটি বাদ পড়েছে তার অনুবাদ হওয়া উচিত '...... **and alloted Mirzapur and Anwarpur for the maintenance of the illuminated tomb of Pir Baharam.'** সমাধি গৃহটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

মাতোয়ালি নিযুক্তির খবরাখবরও পাওয়া যায়। শিলালিপি অনুযায়ী ঐ সময়ে শেখ বক্তিয়ার ছিলেন প্রথম মাতোয়ালি। বর্তমান মাতোয়ালিরা তাঁর বংশধর বলে দাবী করেন। ওয়ালি সাহেব ও মিঃ আহমেদ ফকিরপুর মৌজাকে নির্দেশ করতে পারেন নাই। ফকিরপুর (মৌজা নং ২৫) গ্রামখানি পূর্বে বর্ধমানের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর আনোয়ারপুর হল বর্তমান বেড় বা খাজাআনোয়ার বেড়। মজারপুরকে মীর্জাপুর উল্লেখ করা হয়েছে—কিন্তু তা মীরছোবা (মৌজা নং ৩৩) হওয়া উচিত। কারণ উক্ত অঞ্চল ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে মীর্জাপুর নামক গ্রামখানি বায়ন— মীর্জাপুর নামে পরিচিত, যা বর্ধমান শহর হতে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তেব সময় মৌজা তিনটি মাতোয়ালীদের অধিকাবচ্যুত হয় এবং বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে ইংবাজদের এক চুক্তিতে মৌজা তিনটি তাঁর জমিদারীভুক্ত করার পরিবর্তে মাতোয়ালীকে মাসে ৪১-২ ৪ পাই হারে মাসিক নগদ বন্দোবস্তের দ্বারা সমাধিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চলত। বর্ধমান রাজবাড়ী হতে পীর বহরামের সমাধির জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু অনুদানের খবর জানা যায়। বাংলা ১১৮০ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে) মহারাণী বিষণকুমারীর ব্যয়নির্বাহের তালিকায পীর বহরামের সমাধির জন্য ১৫২ টাকা ৪ আনা দানের ব্যবস্থার কথা জানা যায়। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের ৪৪০নং আদেশ বলে উক্ত সমাধিগৃহটি সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত করা হয় এবং ১৯১৭ সালের প্রকাশিত এক সরকারী নথিপত্রে জানা যায় ২৫ টাকা ব্যয়ে পীর বহরামের সমাধিগৃহটিকে সংস্কার করা হয়েছিল।

১৯২৭-২৯ খ্রীস্টাব্দে ডাইরেক্টর জেনারেল (আর্কিয়লজি বিভাগ)-এর রিপোর্টে জানা যায় সমাধি গৃহটির গঠনসৌষ্ঠব যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। পুরাতন কাঠের কড়ি-বরগাগুলি নষ্ট হওয়ায় কাঠের পরিবর্তে ৫৫০ টাকা ব্যয়ে লোহার জয়েন্ট বসিয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র চত্বরটিতে অব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। পীর বহরাম, কুতুবউদ্দিন কোকা ও শের আফগানের সমাধি ছাড়াও বর্ধমানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধুসন্তের সমাধি ঐ প্রাঙ্গণে আছে, সেগুলির আশু সংস্কারের প্রয়োজন।

(৬)

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে সুলেমান কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ কররানী গৌড়ের সিংহাসন লাভ করে মোঘল সম্রাট আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা নির্মাণ করান। এই বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মোঘল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।

দাউদ খাঁ তেলিয়াগাড়ির যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ধনরত্ন ও রাজকোষের একটা বিরাট অংশ প্রতাপাদিত্যের পিতা ও তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা শ্রীহরির তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করে নিজে বর্ধমানে সৈন্যবাহিনীসহ এসে উপস্থিত হন। দাউদ খাঁর বর্ধমানে আগমনের কারণ হিসাবে অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকোট, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম ও গড়মান্দারণের ঘাঁটিগুলিকে শক্ত করে মোঘল সৈন্যদের বাধা প্রদান এবং তাঁর অধীনস্থ ওড়িশার পাঠান শাসক খানজাহানের কাছ হতে দ্রুত সহায়তা লাভ করে সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা। কিন্তু আকবরনামায় পাওয়া যায় যে, দাউদ খাঁ প্রথমে কালাপাহাড়, সুলেমান ও বাবু মঙ্কলী প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দসহ ঘোড়াঘাটে পলায়ন করে এবং সেখানে মোঘল বাহিনী তাঁর পশ্চাৎধাবন করায় সপ্তগ্রাম হয়ে বর্ধমানে চলে আসেন।[৭৮]

রাজা টোডরমল্ল স্বসৈন্যে বর্ধমানের পথে অগ্রসর হয়ে মহম্মদ কুলি খাঁ বারলাসকে সপ্তগ্রাম অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন এবং সপ্তগ্রামের ঘাঁটি হতে দাউদ খার সকল প্রকার সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। দাউদের আত্মীয়স্বজনকে বর্ধমানে বন্দী করা হয় এবং তিনি গড়মান্দারণে পলায়ন করেন। বর্ধমানে অবস্থানরত সময়ে দাউদ খাঁর অনুগত জুনাইদ কররানী ঝাড়খণ্ডের পথে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাজা টোডরমল্ল কিয়া খাঁও নজর বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে জুনাইদ কররানী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং বিজয়ী মোঘলবাহিনী বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করে।[৭৯] বিদ্রোহী দল পুনরায় সপ্তগ্রাম অধিকার করায় মহম্মদ কুলি খাঁ বারলাস ঐ স্থানে উপস্থিত হলে তারা গড়মান্দারণে পলায়ন করে। কিন্তু অপর একদল সৈন্যের পশ্চাৎধাবন কবার সময় বারলাস, মণ্ডলঘাটে (আকবরনামা-মণ্ডলপুর) মৃত্যুপথে পতিত হন। ব্লকম্যানের মতে বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল।[৮০]

টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমনে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে অর্থ ও সৈন্যের জন্য মুনিম খাঁকে অনুরোধ করায় মুনিম খাঁ, লস্কর খাঁর মারফৎ অর্থ প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং স্বসৈন্যে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। এই সময়ে একদল মোঘল সৈন্যাধ্যক্ষ টোডরমল্লের কাজে সর্ববিষয়ে বাধা সৃষ্টি করায় টোডরমল্লের অকৃতকার্য হওয়ার প্রধান কারণ ছিল। মোঘল শিবিরের অবস্থা অবগত হয়ে ওড়িশার শাসনকর্তা খানজাহান লোদীর সহায়তায় দাউদ বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুনিম খাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তিনি পুনরায় পলায়ন করেন। মোঘল বাহিনী বর্ধমান ত্যাগ করে গড়মান্দারণের পথে অগ্রসর হয়ে চিতুয়ায় শিবির স্থাপন করে।[৮১]

এই সময়ে দাউদ খাঁ রানীকসারী গ্রামে শিবির স্থাপন পূর্বক তাঁর ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্র করার চেষ্টায় ছিলেন এবং হুগলী জেলার ধরপুর গ্রামে সুদৃঢ় মৃত্তিকা প্রাকার নির্মাণ পূর্বক মোঘল সৈন্যদলকে বাধা দেবার চেষ্টায় ছিলেন। মুনিম খাঁর ভয়ে

ভীত হয়ে দাউদ খাঁ হরিপুরে শিবির স্থাপন পূর্বক পুনরায় ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে একত্র করেন এবং চিতুয়া হতে তুকারই পর্যন্ত সমস্ত পথঘাট এরূপভাবে নষ্ট করা হয়েছিল যাতে মোঘল বাহিনী বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। পথঘাটের অবস্থা দেখে অনেক মোঘল সেনাপতি অগ্রসর হতেও অনিচ্ছুক ছিল।[৮২] কিন্তু মুনিম খাঁ ও টোডরমল্লের চেষ্টার মোঘল সৈন্য আরও দক্ষিণে অগ্রসর হযে দাঁতন রেল স্টেশনের ১৪ কিলোমিটার পূর্বে তুকা-কসবায শিবির স্থাপন করে। এই সময়ে দাউদ খাঁও তুর্কা কসবা হতে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ও দাঁতন হতে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে গড়হরিপুরের শিবিরে অবস্থানরত ছিলেন।[৮৩]

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ৩রা মার্চ, পাঠান সৈন্য গড়হরিপুর হতে মোঘলদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ ও লোক ক্ষয় হয়। শৌর্য ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও অপরাহ্নে দাউদ খাঁর সেনাপতি গুজর খাঁ নিহত হওয়ায পাঠান সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং দাউদ খা ওড়িশায় পলায়ন করেন। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র দেখে মনে হয়েছিল, 'the plain became a tulip garden from the blood of the slain.' পরদিন প্রাতঃকালে মুনিম খাঁর আদেশে সমস্ত যুদ্ধ বন্দীকে হত্যা করে তাদের মাথাগুলিকে তুর্ক-কসবাব মাঠে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। স্বয়ং আবুল ফজল এরূপ নৃশংস কর্মের উল্লেখ করেছেন তাঁর রচিত আকবরনামায়[৮৪]—'Their souls and bodies were separated and eight sky-high minarets were made of their brainless heads, as a warning to spectators.' এইভাবে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের অবসান ও মোঘল যুগের প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা হয়েছিল এবং এই প্রস্তুতি পর্বে বর্ধমান ছিল নীরব সাক্ষী। মুনিম খাঁ ও টোডরমল্ল ওড়িশা আক্রমণ করায় উপায়ন্তর না দেখে দাউদ খাঁ আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন এবং ওড়িশার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন।

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে অতি বৃদ্ধ বয়সে মুনিম খাঁর মৃত্যু হলে হোসেন কুলীবেগ খান জাহানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান হয় এবং এবারেও রাজা টোডরমল্ল সুবাদারের সহকারীরূপে ছিলেন। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করে ওড়িশা ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে তাণ্ডায় উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে দাউদ খাঁকে পরাজিত ও বন্দী অবস্থায় তাণ্ডাতে নিয়ে আনা হয় এবং তাঁর শেষ পরিণতি হল[৮৫]—'The body of the treaty-breaker was affixed to a gibbet at Tanda, which is the capital of that country.' খান জাহানের নির্দেশে দাউদ খাঁর পরিবারবর্গকে সপ্তগ্রামে গিয়ে হত্যা করা হয় ও সপ্তগ্রামের কোষাগারও লুণ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ দাউদ খাঁর মাতা নওলাখা বেগম ব্যতীত এই বংশের অপর কেহই পরিত্রাণ পান নাই।[৮৬]

১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খান-ই-জাহানের মৃত্যুর পর মুজফ্ফর খান সুবাদারীর পদলাভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর খান-ই-আজম বা আজীমখান কোকা

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর ওড়িশার পাঠান শাসক কতলু খাঁ শক্তি সঞ্চয় করে সুলেমান কররানীর অনুগতদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে কতলু খাঁ মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী অধিকার পূর্বক দামোদর অতিক্রম করে বর্ধমান শহরে এসে উপস্থিত হন। বর্ধমান শহরে অবস্থানরত সময়ে বর্ধমানের পশ্চিমঅঞ্চল জয় করেন। কতলু খাঁকে বাধাদানের জন্য সেরপুর (বগুড়া) ও তাণ্ডা হতে দু'দল মোঘল সৈন্য বর্ধমানে এসে উপস্থিত হলে কতলু খাঁ আরও দক্ষিণে সরে যান। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষে মোঘল বাহিনী দামোদরনদ অতিক্রম করে পাঠান বাহিনীকে আক্রমন করে এবং ১৫ই জুলাই-এর যুদ্ধে আফগান সেনাপতি বাহাদুর কুরুহ মোঘল বাহিনীর কাছে শোচনীযভাবে পরাজিত হয়ে ওড়িশায় পলায়ন করলেও মোঘলবাহিনী তাঁর পশ্চাৎ ধাবনে নিরুৎসাহ বোধ করে। সৈন্য ও রসদ সংগ্রহের জন্য সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় কতলু খাঁ মোঘলদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে এবং সন্ধিশর্ত নিয়ে কালক্ষেপ করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সময়ে অজম খানের পরিবর্তে শাহবাজ খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। সুযোগ বুঝে পাঠান সৈন্য দামোদরনদ অতিক্রম করে ভাণ্ডার পথে অগ্রসর হয এবং ওড়িশা হতে নূতন নূতন সৈন্যদল এসে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় লুণ্ঠনকার্য শুরু করে।

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই মে শাহবাজ খাঁর নেতৃত্বে মোঘলবাহিনী তাণ্ডা হতে পাঠানদের বিতাড়ন করায় তারা অজয়ের তীরে মঙ্গলকোটে এসে উপস্থিত হয়। শালে উজির খাঁর নেতৃত্বে মোঘলেরা পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং মঙ্গলকোটের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাণ্ডা হতে আরও মোঘল সৈন্য এসে পড়ায় মঙ্গলকোট মোঘলদের হস্তগত হয়।[৮৭] খাজা সুলেমান ও নাজির দৌলতের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলকোটে দুটি মৃত্তিকার দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। মঙ্গলকোটের যুদ্ধে কতলু খাঁ পরাস্ত হয়ে ওড়িশার পলায়ন করেন এবং রণক্লান্ত মোঘলবাহিনী পশ্চাৎধাবন করে বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু উজির খাঁ হেরেবির নেতৃত্বে নূতন মোঘল সৈন্য এসে পড়ায় পাঠান সৈন্যদলকে তুকারই পর্যন্ত বিতাড়িত করা হয় এবং উপায়ন্তর না দেখে কতুল খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৬০টি হাতী ও বহু অর্থসহ সন্ধি প্রস্তাবের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। সন্ধিপত্র আগ্রায় পৌঁছলে আকবরের মনে সন্দেহ জন্মে ও উৎকোচ গ্রহণের দায়ে শাহবাজকে আগ্রায় তিন বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট উজীর খাঁর মৃত্যু হলে রাজা মানসিংহ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে সম্রাটের নির্দেশে তিনি ভাগলপুর হতে ঝাড়খণ্ডের পথে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন এবং পাহাড় খাঁ, বাবু-ই-মঙ্কানী ও রায় পিণ্ডরদাসকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্মিলিত মোঘলবাহিনী মানসিংহের অধীনে বর্ষাকালে সেলিমাবাদ ও জাহানাবাদে (আরামবাগ) শিবির স্থাপন করে এবং

এবং তাঁর পুত্র জগৎসিংহের নেতৃত্বে একদল মোগল সৈন্য গড়মান্দারণ দুর্গ রক্ষাকল্পে নিযুক্ত ছিল।[৮৮]

মোঘল আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে কতুল খাঁ হুগলী জেলার ধরপুরে এবং তাঁর সেনাপতি বাহাদুর কুরুহ রাইপুরে স্বসৈন্যে অপেক্ষারত ছিলেন। জগৎসিংহ, কতলু খাঁর চাতুরীর দ্বারা প্রতাড়িত হয়ে বন্দী হন; কিন্তু বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বির তাঁকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে যান। বিমর্ষ মোঘলবাহিনী জাহানাবাদ হতে সরে গিয়ে সেলিমাবাদে শিবির স্থাপন করতে মনস্থ করে। কিন্তু ঐ বৎসরের জুন মাসে ১০ দিনের পীড়ায় কতুল খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। ওড়িশা নামে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও উক্ত প্রদেশে শান্তি ফিরে আসে নাই। দশ বছর ধরে পাঠানেরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহ ছিলেন মদিরাসক্ত এবং অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটায় মানসিংহ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এই সুযোগে ওড়িশার আফগানগণ উসমান খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভদ্রকের যুদ্ধে মোগলবাহিনীকে পরাস্ত করে মেদিনীপুর ও বর্ধমান অধিকার করে। রাজমহল অধিকার করার মানসে আরও উত্তরে অগ্রসর হলে মানসিংহ বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত বর্ধমানের পথে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত সেরপুর-আতাই এর যুদ্ধে পাঠানবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে ওড়িশায় পলায়ন করে। ঐ সময়ে সরিফাবাদ সরকারের বিস্তৃতি ছিল বর্ধমান শহর হতে উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরগণা পর্যন্ত।[৮৯] সেরপুর আতাই-এর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মোঘল রাজত্বে মানসিংহই প্রথম সেনাপতি যিনি সাতহাজারী মসনবদারী লাভ করেন। আফগানদের প্রতিটি যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল হস্তীবাহিনীকে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে রেখে যুদ্ধ করা। কামানের ভয়ে ভীত হস্তীযূথ যখন বিপরীত দিকে পিছুতে শুরু করে তখন স্বপক্ষেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দাউদ খাঁর মৃত্যুর প্রায় ২২ বছর পরে সুবাবাংলার পশ্চিমঅংশে মোঘল আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। ইতিমধ্যে রাজা টোডরমল্লের ব্যবস্থাপনায় সুবাবাংলার রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। এই রাজস্বনীতি কোন জরীপ পদ্ধতি অনুসারে অনুসৃত হয় নাই। গ্রাম-ভিত্তিক কৃষিজমি ও উৎপন্ন শস্যের উপর বাৎসরিক রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। ঐ সময়ে বাংলাসুবাকে ১৯টি সরকারে এবং সরকারগুলি মোট ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। বর্তমান বর্ধমান জেলা যে ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত, সেটি আকবরের আমলে সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদের অধিকাংশ অঞ্চল, মান্দারণ ও সাতগাঁও-এর আংশিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। সরিফাদের সদর কার্যালয় বর্ধমান শহর, সুলেমানাবাদের সদর কার্যালয় সেলিমাবাদ, মান্দারণের সদর কার্যালয় গড়মান্দারণ ও সাতগাঁও-এর সদর কার্যালয় ছিল সপ্তগ্রাম।

উসমান খাঁর বিদ্রোহ দমনের পর মানসিংহের শাসনকালে সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ

ও মান্দারণে মোঘল আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং এই অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় নাই। আকবরের রাজত্বের শেষভাগে এক প্রেমঘটিত ব্যাপারে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল এবং এরপর হতে মোঘলবংশে পিতাপুত্রের মনোমালিন্য বংশপরম্পরায় চলে আসছে। পিতাপুত্রের মনোমালিন্যের জন্য ভারতের মোঘল আধিপত্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। অতি বুদ্ধিমতী ও অপূর্ব রূপলাবণ্যের অধিকারিণী মেহেরউন্নিসাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে শাহাজাদা সেলিম তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থ করায় আকবর এই বিবাহে বাধা দেন। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে শাহাজাদা সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু তাঁর আগ্রা জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে সমস্ত ঘটনার জন্য আবুল ফজলকে দায়ী করেন। ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে ১৯শে আগস্ট, তারিখে সেলিম কর্তৃক নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে সরাইবীর ও আন্ত্রির মধ্যস্থলে পণ্ডিত, বিজ্ঞ, সুদক্ষ প্রশাসক ও আকবরনামার রচয়িতা (শেষ ৪০ পৃষ্ঠা বাদে) আবুল ফজল আলামী নিহত হন এবং এলাহাবাদে সেলিমের নিকট তাঁর মস্তক প্রেরণ করা হয়। হামিদা বানু ও গুলবদন বেগমের কৃপায় সেলিম, সম্রাটের রোষ হতে নিষ্কৃতি পেলেও আকবর মেহেরউন্নিসা ও তাঁর স্বামীকে আগ্রা হতে দূরে রাজমহলে প্রেরণ করেন। সেলিম-মেহেরের প্রণয় কাহিনী আগ্রায় শুরু হলেও তার মর্মন্তুদ ঘটনার শেষ পরিণতি বর্ধমানেই ঘটেছিল।[১০]

১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবরের মৃত্যু হয় এবং ৩রা নভেম্বর নুরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নামধারণ পূর্বক সেলিম আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেহেরউন্নিসাকে অধিকার করার পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে ভেবে প্রথমে মানসিংহকে বাংলার সুবাদারের পদ হতে অপসারণ করে কুতুবুদ্দিন কোককে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়। কুতুবউদ্দিন ও শের আফগান দ্বৈত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। বর্ধমানে সংঘটিত এই করুণ কাহিনীর শেষ পরিণতির কারণে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ইতিহাসের গতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, সেকারণে এর পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। বর্ধমানের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ব্যক্তিবিশেষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে শের আফগানের কবর! ব্যাপারটা কি? এত বিখ্যাত বিখ্যাত লোক থাকতে একজন সাধারণ জায়গীদারের কবর দেখে কি লাভ! এর উত্তর পেতে হলে ইতিহাসকে নিয়ে প্রায় ৪০০ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই কবরের কান্নার ইতিহাসের পিছনে এক প্রেমকাহিনীর সন্ধান জানা যায়। এই কবরের ইতিহাসের সঙ্গে মোঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী অধ্যায়ের উত্থান-পতন এবং গৃহবিবাদের ইতিহাসও জড়িত। বাবর-আকবরের তৈরী মোঘল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ এই কবর নির্মাণের সঙ্গে ধ্বসে পড়তে শুরু হয়েছিল এবং যে হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে একজন মহিলা মোঘল সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে বিরল।

শের আফগান আলি কুলি বেগ ছিলেন ককেশীয় অঞ্চলের তুরস্ক জাতীয় ইস্তালজু

বা উস্তালজু গোষ্ঠীর লোক। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের সমসাময়িক পারস্য-রাজ দ্বিতীয় শাহ ইসমাইলের নফরচি (খানসামা)। পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে কান্দাহারে আসেন[৯১] এবং পরে মুলতানে প্রধান সেনাপতি খান খানানের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তট্টা (সিন্ধু) অভিযানে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য শের আফগান মোঘলবাহিনীতে উপযুক্ত মর্যাদা ও পদ লাভ করেন।[৯২]

ইকবালনামায় (পৃঃ ২২) আছে যে, শের আফগান পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় ইসমাইলের খানসামা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসার পথে মুলতানে আবদুর রহিম খান-ই-খানানের সঙ্গে পরিচয় লাভে সমর্থ হয়েছিলেন এবং খান-ই-খানানের অনুগ্রহে শের আফগান দিল্লীতে সম্রাটের অধীনে মনসবদারী লাভ করেন।[৯৩] এর কিছুকাল পরে শের আফগান আগ্রায় প্রেরিত হলে সম্রাট আকবর, মীর্জা গিয়াস তেহরাণীর কন্যা মেহেরউন্নিসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বিবাহের পূর্বে মেহেরের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শাহজাদা সেলিম তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই আকবর যথাশীঘ্র শের আফগানের সঙ্গে মেহেরের বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। সম্রাট হওয়ার পর সেলিম, শের আফগানকে বর্ধমানের জায়গীর দান করেন। মনে হয় মেহেরের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ এই অনুগ্রহ দর্শনের কারণস্বরূপ। কিন্তু তিনি মেহেরের রূপলাবণ্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে ভুলতে পারেননি এবং এটাই শের আফগান ও স্বয়ং সম্রাটের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে মীর্জা গিয়াস বেগ নামক এক তাতার জাতীয় মুসলমান অতি দুঃস্থ অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করার সময় সঙ্গে ছিল তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রী ও একটি রুগ্ন ঘোড়া। যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করে স্বামী-স্ত্রী অতি কষ্টে মোঘল রাজত্বের সীমানায় পৌঁছিলে গিয়াস বেগ বা খইস বেগের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। এই সময় তাঁদের তিন দিন অনাহারে কাল কাটে। আহার ও আশ্রয়হারা হয়ে শিশুকন্যাসহ স্বামী-স্ত্রীকে মরুভূমির নিকটে হিংস্র জন্তু সঙ্কুল উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থান করতে হয়েছিল। গিয়াস বেগ শিশুকন্যাসহ স্ত্রীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিজে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত দেহে পদব্রজে চললেও কিন্তু তার স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এত দুর্বল যে, ঘোড়ার পিঠে বসে শিশুকন্যাকে আগলাতেও অক্ষম। অবশেষে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে শিশুকন্যাকে একটি বৃক্ষের নীচে পাতা চাপা দিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে ভারতবর্ষের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু প্রায় এক মাইল পথ চলার পর গিয়াস বেগের স্ত্রী কন্যার জন্য ক্রন্দন শুরু করায় তিনি পুনরায় সেই বৃক্ষতলে ফিরে দেখেন যে, এক অতিকায় বিষধর কৃষ্ণবর্ণের সর্প শিশুকন্যাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু গিয়াসের পদশব্দ পেয়ে সর্পটি বৃক্ষের কোটরে চলে যায়। আল্লার কি অসীম দয়া! দৈবযোগে একদল বণিক উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন এবং তাঁদের সহায়তায় শিশুকন্যাসহ গিয়াস দম্পতি

লাহোরে পৌঁছিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৯৪] এই শিশু কন্যাই মেহেরউন্নিসা, যিনি পরবর্তীকালে ভারত সম্রাজ্ঞী 'নূরজাহান' নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রমনী।

মোঘল সম্রাট আকবরের লাহোরে অবস্থানের সময় গিয়াস বেগের আত্মীয়, আসফ খানের চেষ্টায় প্রথমে সাধারণ মনসবদার এবং স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে সম্রাটের দিয়ান-ই-বুয়ুতাত (গৃহ অধ্যক্ষ) নিযুক্ত হন।[৯৫] এই সময় একদা শাহজাদা সেলিম গিয়াস বেগের গৃহে মেহেরউন্নিসাকে দেখে তাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে নাই এবং আকবরের ইচ্ছাক্রমে ১৮ বৎসর বয়সে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে মেহেরের সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ হয়।[৯৬] আবুল ফজলের মতে মায়ের সঙ্গে মেহেরের প্রায় বাদশাহী হারেমে যাতায়াত ছিল এবং তথায় উভয়ের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। কিন্তু ঘটনা যাতে অধিক দূর না গড়ায় তার জন্য সম্রাট, শের আফগানের সঙ্গে মেহেরের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।[৯৭] মেবারের রাণার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় সেলিমের সৈন্যদলের মধ্যে শৌর্য ও বীরত্বের জন্য শের আফগান শাহজাদার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর ঐ বৎসর ৩রা নভেম্বর সেলিম ৩৬ বৎসর বয়সে নূরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণপূর্বক আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাবর্গ ও আমীর-উমরাহদের প্রতি সদয় ব্যবহার দেখালেও মেহেরকে তিনি ভুলতে পারেন নাই। শের আফগানের প্রতি বাহ্যিক অনুকম্পা দেখালেও তাঁকে ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। জাহাঙ্গীর শের আফগানের জীবননাশের দু'বার চেষ্টা করেছিলেন।[৯৮]

একদা বাদশাহ ও দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ শিকারে বের হন এবং সেই সময় খবর পাওয়া যায় যে, নিদরবাড়ী (রাজস্থান) গ্রামের সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের উপদ্রবে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জঙ্গলের মধ্যে বাঘটিকে ঘিরে ফেলা হল। ক্ষিপ্ত পশুর গর্জনে বনভূমি কম্পিত হতে থাকলে জাহাঙ্গীরের আদেশেও যখন কোন মোঘল সেনাপতি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল না, তখন সকলের দৃষ্টি শের আফগানের উপর নিবন্ধ হ'ল। ষড়যন্ত্রের কথা বুঝেও একাকী শের নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘটিকে আক্রমণ ও নিহত করলে সম্রাটের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এই বীরত্বের জন্য জাহাঙ্গীর তাঁকে শের আফগান উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্যাঘ্রের আঘাতে শের শয্যাশায়ী অবস্থায় কিছুদিন স্বগৃহে অবস্থানের পর একটু সুস্থ হলে সম্রাটের আদেশে পাল্কীতে চড়ে দরবারে আসার পথে জাহাঙ্গীরের গোপন নির্দেশে এক অতিকায় হস্তীকে ঐ রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়। হস্তীটি পাল্কীটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুনরায় তার আরোহীর প্রতি ধাবিত হয়। এই মুহূর্ত সময়ের মধ্যে শের তাঁর তলোয়ার দিয়ে হস্তীর শুঁড়ের মূলদেশে এমন জোরে আঘাত করেন যে শুঁড়টি দ্বিখণ্ডিত হয়। আর্তনাদ করতে করতে হস্তীটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ঐ সময় জাহাঙ্গীর শের আফগানের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার জন্য অলিন্দের ধারে গোপনে অপেক্ষা করেছিলেন

শের আফগানের জীবননাশের চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও আগ্রার উচ্চপদস্থ আমীর-উমরাহগণের সরস আলোচনা সম্রাটের কানে যায়। শের আফগানকে হত্যা করার দ্বিতীয় পর্যায়ের চক্রান্ত শুরু হ'ল। প্রথমে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে ১১ই মার্চ মীর্জা রাজা মানসিংহের পরিবর্তে জাহাঙ্গীরের ধাত্রীমাতার পুত্র কুতুবউদ্দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে রাজমহলে পাঠান হয়। তার কিছু পূর্বেই উপযুক্ত মনসবদারী দিয়ে শের আফগানকে বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বর্ধমানে আসার পথে শের আফগান বাংলার রাজধানী রাজমহলে কিছুদিন বাস করার সময় কুতুবউদ্দিনের মনোভাব বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নাই। কুতুবউদ্দিনও তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার দেখাত না। চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরে শের আফগান যে গৃহে অবস্থান করতেন তথায় রাত্রে স্বীয় পরিবারের লোকজন ব্যতীত কোন ভৃত্যকে পর্যন্ত রাত্রিবাসের অনুমিত দিতেন না। একদিন রাত্রে সুবাদার নিয়োজিত ৪০ জন গুপ্তঘাতক তাঁর বাসগৃহ আক্রমণ করায় তিনি একাকী ২০জন লোককে হত্যা করেন এবং অবশিষ্ট ঘাতকেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। অতঃপর রাজমহলে থাকা নিরাপদ মনে না করে সরকার সরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্ধমান শহরে চলে আসেন।[৯৯]

রাজমহল হতে দূরে অবস্থান করলেও শের আফগান সুবাদারের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলেন না। জাহাঙ্গীরের নিকট খবর পেঁীছিল যে, শের আফগান বিদ্রোহী এবং যথারীতি বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ গেল সুবাদারের নিকটে। শের আফগান যে বিদ্রোহ করেন নাই তার পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী ঘটনায়। কারণ কুতুবউদ্দিন অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বর্ধমানে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ শের আফগানকে বন্দী করবার উদ্দেশ্য তাঁর বর্ধমান আগমনের কারণ ছিল। শহরের বহির্ভাগে শিবির স্থাপন করে তথায় শের আফগানের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত আমন্ত্রণ পাঠালেন। এই সাক্ষাতের প্রাক্কালে শের আফগান তাঁর মায়ের নিকট বিদায় নিতে গেলে তিনি বলেছিলেন—"যে তোমার মায়ের চোখের জল ফেলবে, তার মায়ের চোখে যেন জল পড়ে।"[১০০] মাথির উল উমরাতে পাওয়া যায় যে, শের আফগান এই শঠতা ও প্রতারণার বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু কুতুবউদ্দিনের পত্রে অভয় প্রদানের আশ্বাস থাকায় তিনি সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। শের আফগান, শিবিরে পেঁীছিলে তাঁর অনুচরদের বাইরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কুতুবউদ্দিন দুজন অনুচরসহ শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শের আফগান আক্রান্ত হয়েছিলেন।[১০১] ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অন্য কোন উপায় না দেখে শের আফগান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কুতুবউদ্দিন কোকাকে হত্যা করেন। সুবাদারের মৃত্যুর পর অম্বা খাঁ কাশ্মীরী নামক এক সেনাপতি শের আফগানকে আক্রমণ করেন। কিন্তু দ্বৈতযুদ্ধে উভয়েই প্রাণ হারান।

'ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীর' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শহরের বহির্ভাগে কুতুব-উদ্দিনের শিবিরে শের আফগান প্রবেশ করার পর তাঁকে সুবাদারের সঙ্গে আলাপ করার

নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আগ্রা যেতে অস্বীকৃত হলে সুবাদার (কুতুবউদ্দিন কোকা) চাবুক তুলে জায়গীরদারকে (শের আফগান) মারতে যান। মুহূর্তের মধ্যে শের আফগান পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তলোয়ার দিয়ে সুবাদারকে হত্যা করেন। কিন্তু সুবাদারের দেহরক্ষীগণ তাঁকে ঘিরে ফেলেন এবং অম্বা খাঁ কাশ্মীরী নামে এক মোঘল সেনাপতির হাতে শের আফগানের মৃত্যু ঘটে।[১০২] কিন্তু 'মাথির-উল-উমরা'র সমর্থনে ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে, ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবউদ্দিন বর্ধমান (শহরের) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং তাঁর বর্ধমান আগমনের উদ্দেশ্য হ'ল শের আফগানকে বন্দী করে আগ্রায় সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা। ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ, জায়গীরদার দুর্গ হতে নির্গত হয়ে সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করার পরমুহূর্তেই মোঘল সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। কিন্তু জাহাংগীর-নামায় আছে যে, আহত হবার অন্ততঃপক্ষে ১২ ঘণ্টা পরে শের আফগানের মৃত্যু হয়।[১০৩] মাথির উল উমরায় পাওয়া যায় সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে শের আফগান তাঁর পরিবারবর্গের সম্মান রক্ষার্থে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে মেহেরকে হত্যা করতে মনস্থ করলে তাঁর মায়ের নিকট সংবাদ পান যে, যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে তাঁর আহত হওয়ার খবর পেয়ে মেহের কূয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।[১০৪] মেহেরউন্নিসাকে হত্যা করার কারণ ছিল, যাতে চিরশত্রু জাহাংগীর তাঁকে লাভ করতে সমর্থ না হন। শের আফগানের মৃত্যু সংবাদে জাহাংগীর মন্তব্য করেছিলেন, "তাঁর আত্মার অনন্ত নরকবাস হউক।"[১০৫]

অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে এই যুদ্ধটি বর্ধমান রেলস্টেশনের পূর্বে সাধনপুরের মাঠে সংঘটিত হয়েছিল এবং ঐ স্থানটি 'গঞ্জ-ই-শহীদ্দান (শহীদের স্থান) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 'শহীদ্দান' এই পার্সী শব্দটি হতে বাংলা-অপভ্রংশে 'সাধন' শব্দটি এসেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। কুতুবউদ্দিন কোকা ও শের আফগানের মৃতদেহকে পীর বহরামের চত্বরে সমাধি দেওয়া হয়। তবে কুতুবউদ্দিনের সমাধিটি বর্ধমানে সমাধি করার বিষয়ে সন্দেহ আছে। জাহাঙ্গীর তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন যে, কুতুবউদ্দিনের মৃতদেহ ফতেপুরসিক্রিতে আনয়ন করে, তথায় সমাধি দেওয়া হয়।[১০৬] অবশ্য জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে (তুজুক-ই জাহাঙ্গীর) এ ঘটনাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও লঘুভাবে বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে।

জনশ্রুতি যে, এই সময়ে প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে বর্ধমান শহরে আশক জোলাহের গৃহে মেহের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরে বর্ধমান শহর হতে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বাহাদুরপুর (বহাদুরপুর) নামক স্থানে মীরহাদীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মোঘলযুগে মৃত আমীর-উমরাহ, মনসবদার বা ফৌজদারের সম্পত্তি বাদশাহের অধিকার-ভুক্ত হওয়ার নিয়ম ছিল। সুতরাং মেহেরউন্নিসাকে রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে মেহের ও তাঁর কন্যা লাডলি বেগমকে ফতেপুরসিক্রিতে ইৎমদ্-উদ্-দোল্লার আশ্রয়ে রাখা

হয়। কিন্তু মাথিরে উল্লেখিত শের আফগানের পুত্রের বিষয়ে পরবর্তীকালে কিছু জানা যায় নাই। ফতেপুরসিক্রিতে মেহের সম্রাটের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতেন।[১০৭] চার বৎসর পরে ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মীনা বাজারে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে পুনরায় প্রণয়াসক্ত হন। ঐ বৎসর মে মাসে জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান শাহরিয়ার সঙ্গে লাডলি বেগমের বিবাহ হয়।

ভাগ্য বিবর্জিতা এই অসামান্য সুন্দরী নারীকে 'নূরমহল' বা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান-রূপে (জগতের আলো) দেখতে পাওয়া যায়, যাঁর প্রভাবে জাহাঙ্গীরের জীবন পরবর্তী-কালে ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং যাঁর প্রভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কম্পিত হয়। গৃহবিবাদের পথকে সুপ্রশস্ত করার জন্য ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দাবার চালের ঘুটির ন্যায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেন সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ ও শাহজাদা খুরমকে। 'তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী'তে পাওয়া যায় যে, জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে 'খুরম বাবা' সকলের মধ্যে কর্মদক্ষ এবং এমনকি সম্রাট আকবর পর্যন্ত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই নূরমহল ও খুরমের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। অবশ্য তীক্ষ্ন বুদ্ধিই তাঁর উত্থান ও পতনের কারণ। পরবর্তীকালে নূরজাহানের এক আত্মীয় মহম্মদ বেগ অবকাশ বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁও নূরজাহানের আত্মীয়। প্রকৃত-পক্ষে সেই সময় বাংলার শাসনকার্যে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই নূরজাহানের আত্মীয়। হিজলীর ফৌজদার বাহাদুর খাঁ পর্তুগীজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোঘলের অধীনতা অস্বীকার করেন। ইব্রাহিম খাঁর আদেশে মহম্মদ বেগ বর্ধমান হতে হিজলীর পথে রওনা হন। শেষপর্যন্ত তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাহাদুর খাঁ মোঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময়ে বর্ধমান শহর, শরিফাবাদের সদর কার্যালয় হলেও কার্যতঃ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল।[১০৮]

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করে প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন এবং শের আফগানের কন্যা লাডলি বেগমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে অপদার্থ শাহরিয়ার, জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট পদে আসীন হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শাসন ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারিণী হবেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নূরজাহান, জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা খুরমের (পরবর্তীকালে সম্রাট শাজাহান) ক্ষমতা খর্বের চেষ্টা করার ফলে শাহজাদা খুরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে খুরম আগ্রা আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। পর বৎসর শক্তি সঞ্চয় করে ওড়িশা জয়ের পর বঙ্গদেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সসৈন্যে অগ্রসর হলে বাদশাহ ও শাহজাদার অন্তর্দ্বন্দ্বে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফাঁপড়ে পড়েন।

দাক্ষিণাত্য হতে শাহজাদা খুরম ওড়িশার খুরদায় পেঁাছলে রাজা পুরুষোত্তম দেব

তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐ সময়ে ওড়িশার শাসনকর্তা ছিলেন বাংলার সুবাদারের ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ। আহম্মদ খুরমকে কোনপ্রকার বাধা না দিয়ে কোষগারসহ পিপলীপত্তন হতে কটকে পলায়ন করেন এবং পরে ১২ ক্রোশ দূরে পোতালীতে গিয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু পোতালীতে অবস্থানের বিপদ বুঝতে পেরে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার মানসে বর্ধমানে চলে আসেন। তৎকালে সালেবেগ ছিলেন বর্ধমান দুর্গের অধ্যক্ষ। সালেবেগ এই বিদ্রোহের গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় দুর্গ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই। খুরম বিনা বাধায় ওড়িশা জয় করে মেদিনীপুরে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন।[১০৯] নারায়ণগড়ের জমিদার শ্যামবল্লভ শাহজাদাকে সাহায্য করায় পরবর্তীকালে ঐ জমিদার সম্রাট শাহজাহানের নিকট বংশানুক্রমিক 'মাড়ী-সুলতান' উপাধি লাভ করেন।[১১০] মেদিনীপুর জয়ের পর বিদ্রোহীদল বর্ধমান দুর্গ অবরোধ করে। শাহজাদার বিশ্বস্ত অনুচর আবদুল্লা খান দুর্গ সমর্পণের নিমিত্ত সালেবেগের নিকট সৌহার্দপূর্ণ পত্রালাপ করলেও সেই পত্রের গুরুত্ব না দিয়ে দুর্গ সুরক্ষিত করার জন্য চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। কিন্তু খুরমের ন্যায় দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে বাধা প্রদানের ক্ষমতা সালেবেগের ছিল না। ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দে খুরম সসৈন্যে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে দুর্গ অধিকার করেন। অবাধ্যতার জন্য পরাজিত সালেবেগকে গলায় কাপড় দিয়ে বেঁধে খুরমের নিকট হাজির করা হয় এবং বৈরামবেগ বর্ধমানের জায়গীরদার নিযুক্ত হন।[১১১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানের দুর্গ ও ফৌজদারের কার্যালয় মোঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে শের আফগান ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার এবং মির্জা নাথনের বিবরণ হতে জানা যায় যে, মির্জা ইউসুফকে যশোহরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করে যশোহরের ফৌজদার মির্জা মকীকে বর্ধমানের ফৌজদাররূপে প্রেরণ করা হয়। 'বাহারীস্তান-ই-গায়বী'তে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্ধমান হতেই বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট ও বীরভূমে অভিযান পরিচালন করা হত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ক্ষেত্রে বর্ধমান দুর্গের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

খুরম কয়েক মাস বর্ধমান ও মঙ্গলকোটে অবস্থান করার পর আকবর নগরের (রাজমহল) প্রাসাদ অধিকার করেন। ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় পলায়ন করায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ বাধা প্রদান করেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। খুরম আকবর-নগরের কোষাগার হতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করে ঢাকা অধিকার করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সম্রাট হয়ে তিনি আহম্মদ বেগকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[১১২]

বঙ্গদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা পরভেজ ও মহব্বৎ খাঁর অধীনে ৪০০০০ মোঘল সৈন্য প্রেরণ করেন। বাদশাহী সৈন্যের আগমনের সংবাদ পেয়ে খুরম পুনরায় বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। প্রায় দেড় বৎসরকাল বঙ্গদেশ পিতা ও পুত্রের

শাসনে ছিল। জনশ্রুতি যে, প্রত্যাবর্তনের পথে পরমপুরে একটি মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করলেও এটি অসমাপ্ত ছিল।[১১৩]

খুরম বিদ্রোহী হয়ে যে সময়ে বর্ধমান ও মঙ্গলকোটে অবস্থানরত ছিলেন, সে সময়ে মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানিশমন্দ নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। তিনি দানিশমন্দকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং সম্ভবতঃ শাহজাদার অর্থেই পরবর্তীকালে মৌলানা দানিশমন্দ মঙ্গলকোটে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং উক্ত মসজিদের শিলালিপিতে সম্রাট শাহজাহানের নাম খোদিত আছে। দানিশমন্দের সমাধির পাশে নির্মিত নূতন মসজিদে পুরাতন মসজিদের শিলালিপি প্রোথিত আছে এবং শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে হিজরী ১০৬৫ সনে (১৬৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দ) ঐ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[১১৭]

শাহজাহানের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বঙ্গদেশের সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুলতান সুজার সময়ে বঙ্গদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। সুজার শাসনকালে সরকার সরিফাবাদ, সেলিমাবাদ ও মান্দারণের শাসনব্যবস্থা অন্যান্য সরকারের ন্যায় ফৌজদার, তালুকদার ও জায়গীরদারগণ দ্বারা শাসিত হয়। সুলতান সুজার আমলে পাঞ্জাব হতে আগত ছেত্রী বংশীয় ব্যবসায়ী আবু রায় রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী পদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী আমলে আবু রায়ের বংশধরগণ বর্ধমানের জমিদার তথা বর্ধমানের মহারাজারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের মধ্যভাগে সরকার সুলেমানাবাদের শাসনকর্তা বারাখাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রবন্ধে (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ) বঙ্গ বারা খাঁর উল্লেখ আছে, যিনি কোটসিমুলে গড়বাড়ী নির্মাণপূর্বক ঐ স্থান হতে সুলেমানাবাদ শাসন করতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পুত্র শিবরামের আনুকুল্যে শ্রীকুতুব খাঁ কর্তৃক সম্পাদিত দলিলে বারাখাঁর উল্লেখ আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, বারাখাঁ নিহত হলে তিনি গ্রাম ত্যাগ করেন—

"রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িব গাঁ
যুক্তি করে জননী জনক।"

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে আছে, 'পানাগড় স্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে সিলামপুর নামক গ্রামে বারাখাঁর সমাধি আছে। চাঁদ সদাগরের স্থানরূপে প্রসিদ্ধ চম্পাইনগর ঐ স্থান হতে ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত।'

উপরোক্ত পাঁচজন বারাখাঁ বা বরাখাঁর মধ্যে শেষ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যেরা সম্ভবতঃ এক ও অভিন্ন। সরকার সুলেমানাবাদের অন্তর্গত দামিন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের বাসস্থান ছিল। মনে হয় মুকুন্দরাম গ্রাম ত্যাগ করায় তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র শিবরাম (মুকুন্দরাম দামিন্যায় ফিরে এসেছিলেন কি না

জানা যায় না) স্থানীয় শাসকের নিকট দানস্বরূপ ২০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে পেয়েছিলেন। উক্ত দানপত্রের বয়ানটি হল নিম্নরূপ—[১১৫]

"শ্রীশ্রী যুৎ যুতায় মিঞা বারা খাঁ
ব্রহ্মোত্তর জমী দখলে শ্রীযুত কুতুব খাঁ
শ্রীযুত ৺জীউ
রকবনী অত শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী
মৌজে দামিন্যা পরগণে হাউলী—
সরকার ছিলেমাবাজ গ্রাম মহুকুরে
তোমাকে জমি বিষ ২০ বিঘা তুমি বাসবাড়ী দিন
যুতিয়া জোতাইয়া…কে দোহা করিয়া পরম সুখে
ভোগ করহ অপর হা তীন তরফে সভাপাণ্ডিতি
বিত্তি আচার্য্য বরণ ও হুদি বিবরণ ও জলদান ও
জজ্ঞেশ্বর বিধিবেবস্তার চোউত বেদীর সীমানা
ওগয়রহ তোমারে দিব ইতি ইস ১০৪৭ সাল
তাং——১ ফাল্গুন—"

শ্রীকুতুব খাঁ পারসী মোহর

উপরোক্ত দানপত্রের তারিখটি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১০৪১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দ। বারাখাঁর নিধনের পর ক্ষেমানন্দ গ্রাম ত্যাগ করেন এবং নূতন আবাসে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মনসামঙ্গল রচনার আরম্ভকাল কবির উক্তিতেই পাওয়া যায়—

'শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্ব করিয়া বন্ধ
আমার মঙ্গল গায়্যা বুল।
শূন্য রস বাণ শশী সিয়রে মনসা আসি
আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।'

এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৫৬০ শকাব্দ বা ১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই বারাখাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং শিবরামের দানপত্রের তারিখ ১০৪১ বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত।

জাহানাবাদের (তৎকালে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত) প্রাক্তন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট গৌরদাস বসাক, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে **'Notes on Khanja Khan Garh in the District of Burdwan'** নামক প্রবন্ধে স্বীয় ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা বারাখাঁর বিবরণ উল্লেখ করেছেন। বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁর পত্নী মেহেরউন্নিসাকে আগ্রায় প্রেরণের জন্য সাহায্য করায় সম্রাট জাহাঙ্গীর বঙ্গ বারাখাঁ বা বারাখাঁকে সুলেমানাবাদের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। শের আফগানকে হত্যা করার সময়ে বারাখাঁ সুবাদারের একজন অন্যতম সহকারী ছিলেন। কয়েক বৎসর

সেলিমাবাদে বসবাস করার পর দামোদরের পশ্চিম তীরে বর্তমান রায়না থানার কোট-সিমুল (মৌজা নং ২০৮) গ্রামে গড়বাড়ী নির্মাণপূর্বক বসবাস শুরু করেন এবং ঐ স্থান হতে রাজস্ব আদায়কার্য পরিচালনা করতেন। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর (১৬২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর) বারাখাঁ নিজ নামে মুদ্রা নির্মাণ ও প্রচলন করে স্বাধীনভাবে এতদঞ্চলে অবস্থানরত ছিলেন। সুবাদারের আদেশে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার পথে হীরক গলধঃকরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্যতা থাকলে শিলামপুরে সমাহিত বারাখাঁ আলোচ্য ব্যক্তি হতে পৃথক বলে অনুমিত হয়। বারা-খাঁর বিষয়ে বিস্তৃত কোন বিবরণ জানা যায় না, তবে তিনি বর্ধমান, বিষ্ণুপুর ও খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। দশঘড়ার জমিদার নারায়ণ পালের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ ছিল। বারাখাঁর আমলে খোদিত শিলালিপিসহ একটি মসজিদ নির্মাণের কাহিনী শোনা গেলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাঁর পত্নী ও শিশুপুত্রের প্রতি করুণাবশতঃ সম্রাট তাঁদের সেলিমাবাদের রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে এই শিশুপুত্র নবাব খানজাদ খান নামে পরিচিত হন। নবাব খানজাদ খাঁ কোটসিমুল দুর্গ ও প্রাসাদটি সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেন। সমগ্র গড়টির আয়তন ছিল ১০৬০ ফুট, ৮৯০ ফুট এবং ৭০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট গভীর পরিখা বেষ্টিত ছিল। গড়টি 'খাঞ্জাখানের গড়' নামে পরিচিত। বিলাসিতা ও বদান্যতার জন্য নবাব খানজাদ খানের নাম ঐ অঞ্চলে প্রবাদতুল্য। খানজাদ খানের পর তাঁর পুত্র গরদাই খান পিতার পদ লাভ করেন। গরদাইখানের পুত্র গাজী খান এই অঞ্চলের জমিদার ও আয়মাদার ছিলেন। পরবর্তীকালে খানবংশের জমিদারী বর্ধমানরাজ এস্টেটভুক্ত হওয়ায় গাজীখানের পরবর্তী বংশধরগণ সামান্য চৌধুরী পদপ্রাপ্ত হয়ে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিলেন।[১১৬]

(৯)

প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম হতে বর্ধমানের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান জানা যায়। এই সময়েই পাঞ্জাব হতে আগত একটি ব্যবসায়ী পরিবার মোঘল শাসনকর্তার সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক স্থাপন করে কালক্রমে এক বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই পরিবারের উত্তরপুরুষগণ চাকলা-বর্ধমানের জমিদারীসহ বর্ধমানের মহারাজা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ বিশ বছর কেটেছিল রাজপুত, মারাঠা ও স্বীয় পুত্রগণের বিদ্রোহ দমনার্থে। এই সময়ে তিনি বাংলাসুবার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেন নাই। তবে যতদিন পর্যন্ত শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার

ছিলেন, সেই সময় তাঁকে বিশেষ চিন্তিত হতে হয় নাই। কিন্তু ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ বাংলা হতে প্রত্যাবর্তন করার পর খানজাহান মাত্র কয়েক মাস সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাটের ধাত্রীপুত্র ইব্রাহিম খাঁর উপর বাংলা-সুবার দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তাঁর দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে বঙ্গদেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় পূর্ব-বিধিমত চলে আসছিল। কোন বড় রকমের বিদ্রোহ বা অশান্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইব্রাহিম খাঁর ছিল না।

১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ, চন্দ্রকোনার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ, ওড়িশার শাসনকর্তা রহিম খাঁ ও দশনামী শৈব সম্প্রদায়, চিতুয়া—বরদার তালুকদার শোভাসিংহের নেতৃত্বে বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বর্ধমান শহর অভিমুখে সৈন্যদলসহ অভিযান করে।

কৃষ্ণরাম নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে শিবিকা-যোগে নদীয়ার রাজধানী মাটিয়ারীতে পলায়ন করেন এবং ঢাকায় গিয়ে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয় অবগত করণার্থ এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য অনুরোধ করেন। সুবাদার সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যশোহর, হুগলী, বর্ধমান অঞ্চলের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমনের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু নুরউল্লার ব্যর্থতার জন্য সম্রাটের নির্দেশে ইব্রাহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে এই বিদ্রোহ দমনের ভার দেওয়া হল এবং ইব্রাহিম খানের পরিবর্তে সম্রাট পৌত্র আজিম-উস-শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়।

নূতন সুবাদারের সঙ্গে বিরোধের ফলে জবরদস্ত খানের বর্ধমান হতে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী শিবিরে উল্লাস দেখা দেয়। তারা আবার নূতন করে নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর অঞ্চলে লুটপাট শুরু করে। বিদ্রোহী দলের নেতা রহিম খান সসৈন্যে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির হওয়ায় শাহজাদার চৈতন্যোদয় হয়। তিনি দূত মারফৎ রহিম খানকে পত্র দিলেন। পত্রে রহিম খানের অপরাধ মার্জনা করে অভয় দেওয়া হল এবং আত্মসমর্পণের পর পূর্ব অপরাধগুলি মার্জনা করে তাঁকে সম্রাটের অধীনস্থ কোন উচ্চতর পদপ্রাপ্তিরও প্রলোভন দেওয়া হয়। কুটবুদ্ধিসম্পন্ন রহিম খান শাহজাদার দুর্বলতা বুঝতে পেরে গর্বিতভাবে দূত মারফৎ মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন যে, যদি শাহজাদার উজীর খাজা আনোয়ার স্বয়ং তাঁর শিবিরে এসে পত্রের সমর্থনে সন্ধি চুক্তি করেন তাহলে রহিম শাহ সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের কথা বিবেচনা করতে পারে। নিবুদ্ধিসম্পন্ন শাহজাদা শত্রুর মৌখিক আশ্বাসে বিশ্বাস করে তাঁর প্রধান উজীর খাজা আনোয়ারকে রহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আদেশ দিলেন। রাজ-নীতিজ্ঞানসম্পন্ন উদার স্বভাব ও সাধু প্রকৃতির উজীর স্বীয় প্রভুভক্তির বশে বিচার বিবেচনা না করে রহিমের সঙ্গে চুক্তি করার অভিলাষে তাঁর শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খাজা আনোয়ার রহিম খাঁর শিবির-দ্বারে উপস্থিত হলেও তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রহিম খাঁ শিবির-দ্বারে না আসায় উজীরের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

তাই সহসা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে শত্রু শিবিরের ভিতর প্রবেশ না করে শিবির-দ্বারেই অপেক্ষা করতে মনস্থ করেন। রহিম খাঁও স্বীয় অহঙ্কারবশতঃ বাইরে না এসে উজীরকে শিবিরের ভিতরে যাবার জন্য আদেশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা খাজা আনোয়ারের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তিনি বর্ধমান দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু সহসা রহিম খাঁ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনুচরবৃন্দসহ খাজা আনোয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে উজীরও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য নিয়ে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পর গর্বিত রহিম খাঁ শাহজাদার শিবির আক্রমণ করায় হামিদ খাঁ কুরেসীর নিক্ষিপ্ত তীরে রহিম খাঁ ও তাঁর অশ্ব উভয়েই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

বর্তমানে বর্ধমান শহরের বেড় অঞ্চল বা খাজা আনোয়ার বেড় (অপভ্রংশে খাজানোর বেড়) নামক স্থানে খাজা আনোয়ারের সমাধিস্থল অবস্থিত। আনোয়ারের সমাধিটি শহরের মধ্যে বা পীর বহরামে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণ কি? যে সম্ভাবনাগুলি হতে চিন্তা করা হচ্ছে তার মধ্যে (১) বর্ধমান শহরের সপ্তদশ শতকের অবস্থা যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, বর্তমান রাজবাড়ী অঞ্চলটিকে ঘিরে মোঘল বা পাঠান আমলের শহর গড়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে একালের পুরাতনচকের মধ্যে বহরাম বাজার, রেকাবি বাজার ও মোঘলটুলি নামক তিনটি বাজার ছিল এবং রাজবাড়ীর সন্নিকটে জুম্মা মসজিদ। রিয়াজের বিবরণ অনুযায়ী ঐ স্থানেই বর্ধমানের দুর্গ ছিল। পুরাতনচকের দক্ষিণে নির্জন গহন বনের মধ্যে যোগী জয়পালের বাগানে ধর্মপ্রাণ পীর বহরাম সক্কার সমাধিগৃহ বর্তমান। পুরাতনচক এলাকার দক্ষিণে বাঁকা নদীর প্রবাহপথের দক্ষিণ তীর হতে দামোদরনদের তীর পর্যন্ত অঞ্চলটি ছিল বনজঙ্গলে পূর্ণ ও জলা জায়গা। রিয়াজের বিবরণে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা নাই যে, রহিম খাঁ শহরের বাইরে কোন স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সম্ভবতঃ শহরের বহির্ভাগ বলতে পুরাতনচক—রাধাগঞ্জ অতিক্রম করে বাঁকার পর পার অর্থাৎ বর্তমান বেড় অঞ্চলকেই বোঝায়। বেড় অঞ্চল হতে দামোদরের দূরত্ব অধিক নয়। মনে হয় খাজা আনোয়ারের মৃতদেহ ঐ স্থানেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছিল; সেকারণে সঙ্গীগণসহ তাঁকে ঐ স্থানেই সমাধি দেওয়া হয়েছিল। খাজা আনোয়ার ও তাঁর সহযোদ্ধারা রাজকার্যে মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের শহীদ আখ্যা দেওয়া হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ধমানে প্রচলিত পার্সী কবিতার একটি ছত্র হতে—"আহ আনোয়ার শহিদ-ই-আকবর সুদ"। উক্ত কবিতায় আনোয়ারকে শহীদরূপে গণ্য করা হয় এবং ঐ ছত্রের মর্মার্থের মধ্যে পারস্যে প্রচলিত সাল-তারিখ নির্দেশ করার পদ্ধতি; যার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে তাঁর মৃত্যু-সাল। হিজরী মতে ১১০৯ অব্দে অর্থাৎ ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে বেড় অঞ্চলে সমাহিত করা হয়েছিল।

এই অঞ্চলটি পূর্বে পোদ্দারহাট মৌজা নামে পরিচিতি ছিল। সম্রাট ফারুক

সায়রের রাজত্বকালে খাজা আনোয়ারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং সমাধিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পোন্দারহাট মৌজাসহ আরও কয়েকটি মৌজা দানের কথা জানা যায় এবং খাজা আনোয়ারের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ উক্ত স্থান—'খাজা আনোয়ার বেড়' নামে পরিচিত হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দিল্লী হতে খুল্লতাত আমীর-উল-উমরা সামসুমুদ-দৌল্লা দুরান বাহাদুর মনসুর জঙ্গ এবং ভ্রাতা খাজা আসিম (সামশম-উদ-দৌল্লা খান দুরান আমীর-উল-উমরা) বর্ধমানে এসে সমাধিগৃহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। খাজা আনোয়ারের পিতামহ খাজা আবুল মহসিন, বাদাকসান (তুরাণ) হতে ভারতে আসেন এবং রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে পাঞ্জাব প্রদেশে বসবাস করতে থাকেন। তৎপুত্র খাজা মহম্মদ কাশিম, আওরঙ্গজেবের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পৌত্র আজীম-উস-শান-এর ওয়ালাশাহীতে যোগদান করে শেষ জীবনে আগ্রায় বসবাস করেন। খাজা কাশিমের দুই পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্রগণের মধ্যে খাজা আনোয়ার ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। আনোয়ারের অপর ভ্রাতাদের মধ্যে খাজা জাফর (সাধু প্রকৃতির) ব্যতীত অপর ভ্রাতাগণ, যথা—খাজা আসিম, খাজা মুজঃফর, খাজা বাকর মোঘল দরবারে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু মাথির-উল-উমরা নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাঁর যে ভ্রাতা বর্ধমানে এসেছিলেন তিনি খাজা মহম্মদ জাফর খান নামে পরিচিত, যিনি ১১৫১ হিজরীতে নাদির শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

ফারুক সায়র সম্রাট হওয়ার পর সুফী বায়াজিদের জন্য বর্ধমানে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে মনস্থ করেন ; যেটি 'বন মসজিদ' নামে পরিচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সুফী বায়াজিদের আশীর্বাদেই ফারুক সায়র সম্রাট হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় সম্রাটকে খাজা আনোয়ারের সমাধিভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সম্রাট দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাধিভবন নির্মাণ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পোন্দারহাট মৌজাসহ ছ'খানি মৌজা দান করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ৩৬৯০ টাকার বিনিময়ে উক্ত মৌজাগুলি বর্ধমানরাজাদের জমিদারীভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু অপর একটি বিবরণীতে জানা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেই উক্ত মৌজাগুলি মাতোয়ালীদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। মহারাণী বিষণকুমারীর আমলে (তেজচন্দ্রের বয়স তখন ৯ বৎসর) বাংলা ১১৮০ সালের আষাঢ় মাসে রাজবাড়ীর হিসাবপত্র হতে পাওয়া যায় খোজানর—মোকবরার খাজনা ৩০৭৷৷৹। **'Ancient Monument of Bengal'**-গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, মহারাজা মৌজাগুলি বাবদ প্রদেয় অর্থ সরকারকে দিত এবং মাসিক ৩২১৷৹ হারে সরকার কর্তৃক বংশধরদিগকে প্রদান করা হত। কিন্তু ঐ হিসাবটিতে গড়মিল থেকে যাচ্ছে।

বর্ধমান রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টারে একটি বিশাল চিত্র দেখা যায়। তাতে একটি প্রাসাদের চিত্র অঙ্কিত আছে এবং উক্ত চিত্রে লেখা আছে 'নবাব বাড়ী'—১৩১৫ হিজরী। বর্ধমান স্টেশন হতে দামোদরের সদর ঘাটের পথে বাসরাস্তা অথবা রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের রাস্তাটি বাঁকা-ব্রিজ অতিক্রম করে বেড় নামক পল্লীর

দিকে এগিয়ে গিয়েছে; উক্ত অঞ্চলে অনুসন্ধান করলে নবাব বাড়ী দেখা যাবে। খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পব সম্রাট ফারুক সায়রের অনুগ্রহে তাঁর সমাধিভবন নির্মিত হয়েছিল এবং এই সমাধিভবনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর কন্যার ওপর বর্তায়। বর্তমান শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বর্ধমান শহরে কন্যা-বংশীয়গণ বসবাস করতেন বলে জানা যায়।

চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকৃতি প্রায় ১০ বিঘা আয়তন বিশিষ্ট জমির উপর সমাধিভবনটি অবস্থিত। সম্মুখে একটি পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পাড়ে সুউচ্চ বিশাল সমাধিগৃহটি অবস্থিত। সমাধিভবনের মধ্যে খাজা আনোয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের সমাধিগুলি রয়েছে। বর্ধমান জেলায় মোঘল আমলের স্থাপত্যকীর্তি-স্বরূপ প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ সমাধিসৌধটি আজও টিকে আছে। মোঘল স্থাপত্যের সঙ্গে এখানে বাংলার দোচালা মন্দিরের স্থাপত্য মূলসৌধের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে সংযোগ ঘটিয়েছে। মূলসৌধের সংযোগকারী দোচালা দুটিকে দেখতে ঠিক হাতীর ন্যায় দেখায়। পুষ্করিণীর পূর্বপাড়ে ছিল ইমামবাড়া এবং তঁথায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের কথাও জানা যায়। বর্তমানে ইমামবাড়ার ছাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং চারি দেওয়ালও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। পুষ্করিণীর পশ্চিমপাড়ে তিন গম্বুজ সমন্বিত মোঘল যুগের নির্মিত বিশাল মসজিদটি আজও কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। তবে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের মতে এটি ফারুক সায়রের আমলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের দক্ষিণে ছিল বেগম মহল অর্থাৎ খাজা আনোয়ারের কন্যা-বংশীয়গণ প্রথমে ঐ বেগম মহলে বসবাস করতেন। ঐ অট্টালিকাও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত; কেবলমাত্র ভিত্তিস্থলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বেগম মহলের সম্মুখে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র পশ্চিমপাড় জুড়ে একটি ফুল বাগানের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এর নিদর্শনস্বরূপ কেয়াড়ীগুলি আজও বর্তমান। বিশাল পুষ্করিণীর চারিপাড় বাঁধান এবং উত্তর ও পূর্বপাড়ে স্নানের ঘাট আছে। পুকুরের মধ্যস্থলে আছে একটি মনোরম জলটুঙ্গি, যা একটি সেতুর দ্বারা পশ্চিম-পাড়ের সঙ্গে যুক্ত আছে। নবাব বাড়ীর সৌখিন মানুষেরা পূর্ণিমার রাতে এখানে বসাতেন জলসা এবং এই কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে আছে। পুষ্করিণীর উত্তরপাড়ে বিরাট তোরণদ্বারসহ বসবাসের নিমিত্ত নূতন অট্টালিকাটি নির্মিত হয়েছিল হিজরী ১৩১৫ অব্দে (১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে) এবং খাজা আনোয়ারের কন্যার শেষ বংশধরগণ এই স্থানেই বসবাস করতেন।[১১৭]

পরিশেষে, খাজা আনোয়ারের বংশধরদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। খাজা আনোয়ারের কোন পুত্রসন্তান ছিল না এবং তাঁর কন্যা ও জামাতার উপর সমাধিভবনটি তত্ত্বাবধানের ভার (মাতওয়াল্লি) দেওয়া হয়। পরবর্তী বংশধরের কোন সংবাদ জানা যায় না। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এক সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ঐ সময়ে কন্যাবংশের

জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে—(১) উমরাও জাহান বেগম, (২) অপর তরফে উমরাও বেগম ও মহম্মদ কৈশারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আবদুল লতিফের এক প্রবন্ধে জানা যায় যে, ঐ সময়ে মাতওয়াল্লিগণের মধ্যে মুন্সেফ মৌলবী মির্জা বেদার বক্ত্ ও ডেপুটি ম্যাজেস্ট্রেট মৌলবী মির্জা মেগোস্থা বক্ত্ এবং সৈয়দ মোজতোবা হোসেন। তাঁরা সকলেই বর্ধমানে বসবাস করতেন। অপর মাতওয়াল্লি অর্থাৎ উমরাও জাহানের বিবাহ হয়েছিল টালিগঞ্জে অবস্থানরত টিপু সুলতানের বংশধরের সঙ্গে। তাঁর পুত্র শাহজাদা নাসিরউদ্দিন ও শাহজাদী মাহতাব-উন-নেসা বেগম কলিকাতাস্থ টালিগঞ্জে বসবাস করলেও ওই সমাধিভবনের মাতোয়াল্লির অধিকার হতে বঞ্চিত হন নাই। সমাধিভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আট সদস্যের একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে; কিন্তু এই কমিটির আর্থিক স্বাচ্ছল্য না থাকায় তাঁদের পক্ষে এই বিরাট স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়।

(১০)

বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্যের সুবন্দোবস্তের জন্য সম্রাট ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর দাক্ষিণাত্য হতে করতলব খাঁকে সমগ্র বঙ্গদেশের দেওয়ান ও মুখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত করে পাঠান হয়। পর বৎসর ২৩শে জুলাই করতলব খাঁ মেদিনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন[১১৮] এবং এই কার্যের জন্য তিনি মুখসুদাবাদের জায়গীর লাভ করেন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাট কর্তৃক তিনি মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ওড়িশার সুবাদার এবং বঙ্গদেশ ও বিহারের দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনটি সুবার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।[১১৯] ঢাকা শহরে সুবাদার আজীম উস-শান কর্তৃক দু'বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হওয়ায় সম্রাটের অনুমতি নিয়ে দেওয়ানের সদর কার্যালয় ঢাকা হতে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারে এই স্থান 'মুর্শিদাবাদ' নামে খ্যাতি লাভ করে। দেওয়ানের সদর কার্যালয় ব্যতীত এই স্থান হতে মুখসুদাবাদ, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদারের কার্য সম্পন্ন হত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা মার্চ সুবাদার আজীম-উস-শান মুর্শিদকুলি খাঁকে আকবরনগর ও বর্ধমানের ফৌজদারের কার্যভার হতে অধিকারচ্যুত করে সরবুলন্দ খানকে স্থানদ্বয়ের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।[১২০] এতৎসত্ত্বেও সম্রাটের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদের সময় পদাধিকারী সুবাদার না হয়েও কার্যতঃ তিনি ছিলেন তিন প্রদেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। সম্রাট ফারুক সায়র তাঁকে 'জাফর খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের পূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। জাফর খাঁ ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও কর্মকুশল ব্যক্তি। তাই তিনি দুর্বল মোঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে সুবাদারের কার্য পরিচালনা

করতেন। জাফর খাঁ বা মুর্শিদকুলি খাঁর আমল হতে সময়টিকে নবাবী আমলরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে জাফর খাঁ, আকবর ও শাহ সুজার প্রবর্তিত রাজস্ব নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকারসমূহের পুনর্বিন্যাস করে সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন।[১২১] চাকলাগুলির মধ্যে বর্ধমান চাকলার রাজস্ব ছিল সর্বাধিক। এই চাকলার বৃহত্তর অংশের জমিদারী (রাজস্ব আদায়কারী) কীর্তিচাঁদের উপর ন্যস্ত হলেও অন্যান্য অংশে আরও কয়েকটি জমিদারীর সৃষ্টি হয়েছিল। তন্মধ্যে সাতসৈকা অঞ্চলের রণজিৎ ভট্ঠাকুর, পাটুলীর রামভদ্র চৌধুরী ও বংশবাটির রাজা মহাশয় রামেশ্বর দত্ত-চৌধুরী (ইনি পাটুলী ত্যাগ করে বংশবাটীতে আসেন) ও বৈদ্যবাটী-হুগলী অঞ্চলের কিঙ্করমাধব সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই পাটুলীর দত্তচৌধুরী বংশের অপর দু'শরিক যথাক্রমে শেওড়াফুলি ও রাজহাটীতে চলে আসেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর হিন্দু বিদ্বেষের ফলে অনেক জমিদার ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন, অন্যথায় তাঁদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব বাকির জন্য হিন্দু জমিদারদের উপর নানাবিধ পীড়ন করা হলেও বীরভূমের মুসলমান জমিদারের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল পক্ষপাতমূলক।[১২২] বর্ধমান জেলার খাজুরীডিহি (থানা কাটোয়া) নিবাসী বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণ রায়ের পুত্র দর্পনারায়ণ রায়ের ক্ষমতা হ্রাস তাঁর হিন্দু বিদ্বেষের অপর একটি উদাহরণ।[১২৩] সম্ভবতঃ মোঘল সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হওয়ার ফলে জমিদার কীর্তিচাঁদ জাফর খাঁর অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিঙ্কর সেনের সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁর বিরোধের কারণ ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ। হুগলী অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী জমিদার দিয়া-অল-দীন খাঁর সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর পেস্কার কিঙ্কর সেন দিল্লী পলায়ন করেন। কিন্তু সেখানে দিয়া-অল-দীন খাঁর মৃত্যুর ফলে উক্ত জমিদারীর অধিকার লাভের আশায় কিঙ্কর সেন মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে উপস্থিত হন। দরবারে সাক্ষাতের সময় কিঙ্কর সেন বাম হস্তে নবাবকে অভিবাদন করায় নবাব মনে মনে ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের আশায় তাঁকে হুগলী অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। পর বৎসর পূর্ব বিদ্বেষ-বশতঃ রাজস্ব তছরূপের অজুহাতে কিঙ্কর সেনকে বন্দী করা হয় এবং বন্দী অবস্থায় তাঁকে প্রচুর পরিমাণে মহিষের দুধ ও লবণ আহার করতে বাধ্য করার ফলে হুগলী প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১২৪] সম্ভবতঃ এই ঘটনা ১৭১৮-২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। কিঙ্করমাধব সেন ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। তিনি রাজা উপাধিধারী বা ফৌজদার ছিলেন না। অনুমান করা যায় যে, তিনি ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী জমিদার যিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার স্পর্ধা রাখতেন। মীরহাট-পাতিলপাড়া-বৈদ্যপুর-নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলটি অতীতে সরকার সপ্তগ্রামের অধীনস্থ ছিল এবং এই অঞ্চলটি হুগলীর ফৌজদারের রাজস্ব সীমার

মধ্যে অবস্থিত ছিল। জনশ্রুতি এই যে, বৈদ্যপুর, রথতলা, গড়ের ডাঙ্গায় তাঁর গড়বাড়ী ছিল এবং পাতিলপাড়ায় কোষ্ঠীপাথরের নির্মিত হরগৌরীর যুগলমূর্তি তাঁর গৃহদেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিল।[১২৫]

তৎকালে সাতসৈকা পরগণার জমিদার সমুদ্রগড়ে বসবাস করতেন এবং রাজা রণজিৎ ভট্টঠাকুর ছিলেন এতদঞ্চলের জমিদার। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণকে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) বন্দী করে রাখা হয় এবং ব্রাহ্মণ রাজার সম্মান রক্ষাকল্পে বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেবের অর্থ সাহায্যের ফলে সে যাত্রায় রামকৃষ্ণ রক্ষা পান। এই কার্যের জন্য রঘুদেব সুবাদারের নিকট হতে 'শুদ্রমণি' উপাধি লাভ করেন। এর কিছুকাল পরে রামকৃষ্ণ ও রণজিৎ ভট্টঠাকুর উভয়েই বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং রণজিৎ ভট্টঠাকুরের দেয় রাজস্ব নবাবের কোষাগারে উসুলের জন্য ঢাকায় এসে উপস্থিত হলে উদার হৃদয় জমিদার নিজের জমা উসুল না দিয়ে রামকৃষ্ণকে কারাগার হতে মুক্ত করেন। রামকৃষ্ণকে মুক্ত হতে দেখে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর রোষ সাতসৈকার জমিদারের উপর পতিত হয় এবং তাঁকে বিপাকে ফেলার জন্য কুখ্যাত অনুচর দবীর খাঁকে নিযুক্ত করা হয়। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে গিয়ে রণজিৎ ভট্টঠাকুরকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়; অথচ একই কাজের জন্য প্রতাপশালী জমিদার রঘুদেব 'শুদ্রমণি' আখ্যায় ভূষিত হলেন। ইসলামধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হল আতাহার খান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলেও কনিষ্ঠ হেমন্তকুমার ইসলামধর্ম গ্রহণ করে সাতসৈকার জমিদারী লাভ করেন এবং তিনি নবাবের বিশেষ অনুগত ছিলেন।[১২৬] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের এক ফরমান বলে সাতসৈকার জমিদারী বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদের উপর ন্যস্ত হয়।

সাতসৈকার জমিদার বংশে হিন্দু-মুসলমান দুই ধারা বর্তমান। ছোট তরফের শেষ কয়েক পুরুষের নাম বংশতালিকা হতে জানা যায় যে, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয়-বিধ নাম ব্যবহার করেন। যথা—আজাহার খান (জনার্দন ঠাকুর), মোজাহার খান (যদু ঠাকুর), ইমাদৎ খান (মধু ঠাকুর), মহঃ এজামৎ খান (মাখনলাল ঠাকুর), জিল্লার রহিম খান (তিনু ঠাকুর), মহঃ বদরুল আলম খান (মুকুল ঠাকুর) ইত্যাদি। রাজবাড়ীর বহির্ভাগে দালানমন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ, বুড়োশিব ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ও সেবা পূজার ব্যবস্থা ছিল; অনুরূপভাবে রাজবাড়ীর মধ্যে মহরম উৎসব পালিত হয়। আজও সমুদ্রগড়ে 'বুড়োমা' নামে দশভুজার মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা রাজবাড়ীর বাইরে দুর্গাদালানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[১২৭] কিন্তু বড় তরফের বংশধরগণ নদীয়ারাজের আনুকূল্যে কৃষ্ণনগরে বসবাস করেন।

কালনা মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে পাটুলি গ্রামে দত্তবংশীয় উত্তর রাঢ়ী কায়স্থগণ বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছেন। এই বংশের আদি পুরুষ দেবাদিত্য দত্তের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ কেশব দত্ত ও বিষ্ণু দত্তের সময় হতে এঁদের পরিচয়

পাওয়া যায় এবং বর্তমান বংশধরগণ কেশব দত্তের উত্তর পুরুষ। তাঁরা প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলায় বসবাস করতেন এবং মুসলমান শাসকের অত্যাচার ও ধর্মান্তি-করণের ভয়ে কিছুকাল অগ্রদ্বীপে বসবাস করার পর পাটুলিতে চলে আসেন এবং আরও পরবর্তীকালে হুগলী জেলার বংশবাটীতে বসবাস শুরু করেন। এই উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বংশটি ঠিক কোন সময়ে পাটুলিতে বসবাস শুরু করে সে কথা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তাঁরা পাটুলিতে এসে-ছিলেন ; কারণ ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে এই বংশের ষষ্ঠ পুরুষ জয়ানন্দ, মজুমদার উপাধি ও তৎসহ স্বর্ণমুষ্টিলগ্ন একটি দুমুখো তরবারি পান। এঁদের বংশতালিকা হল—কেশব দত্ত—দ্বারিকানাথ দত্ত—শ্রীমুখদত্ত—সহস্রাক্ষ দত্ত—উদয় দত্ত—জয়ানন্দ দত্ত—রাঘব দত্তচৌধুরী—রামেশ্বর—রঘুদেব—গোবিন্দদেব—নৃসিংহদেব—ঐ পোষ্যপুত্র কৈলাসদেব।

এই রাজবংশটির পাটুলিতে বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক গ্রন্থে এবং রাজা নৃসিংহদেবকৃত 'কাশীখণ্ডের' বাংলা অনুবাদে আছে,—

'শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহদেব রায় গত কাশী।'

কেশব দত্তের পৌত্র সহস্রাক্ষ ছিলেন দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ জমিদার। তিনি হিজরী ৯৮০ অব্দে সম্রাট আকবরের নিকট হতে ফয়জলপুরের জমিদারী লাভ করেন এবং তৎপুত্র উদয় দত্ত সম্রাটের নিকট সভাপতি রায় আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। হিজরী ১০৩৫ অব্দে (১৬২৮ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট শাহজাহানের নিকট উদয় দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ানন্দ কোট-এক্তারপুর পরগণার জমিদারী ও মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি সুবাদার কাশিম খাঁ কর্তৃক কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব দত্ত হিজরী ১০৬৬ অব্দে (১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ) চৌধুরী উপাধি লাভ করেন এবং পরবৎসর বহু নিষ্কর বা লাখরাজ সম্পত্তিসহ মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। রাঘব দত্তচৌধুরীর সময়ে ২১টি পরগণার ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী জমিদাররূপে এই বংশের খ্যাতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। পরগণাগুলি হল—[১২৮]

আরশা	হালদা	মামদানীপুর	পঞ্জনুর
বোরো	সাহাপুর	জাহানাবাদ	শায়েস্তানগর
সাহানগর	পাউনান	কোতয়ালী রায়পুর	খোসলপুর
বক্সবন্দর	হালিসহর	মাইহাট	পাইকন
মজঃফরপুর	হাতিকান্দা	সিলামপুর	অমিরাবাদ
জঙ্গলিপুর			

রাঘবের অধিকাংশ জমিদারী দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় হুগলী হতে চার কিলোমিটার উত্তরে বাঁশবেড়িয়ায় গড়বাড়ী নির্মাণপূর্বক বাস করলেও তিনি পাটুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নাই। কিন্তু তৎপুত্র রামেশ্বরের সময়ে তাঁরা পাটুলি

পরিত্যাগপূর্বক বাঁশবেড়িয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হিজরী ১০৯০ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক ফর্মান বলে বসবাসের নিমিত্ত ৪০১ বিঘা নিষ্কর জমি ও পাঁচ প্রস্ত খিলাতসহ বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি লাভ করেন। পূর্বোক্ত জমিদারী ব্যতীত রামেশ্বর আরও ১২টি পরগণার জমিদারী পেয়েছিলেন, যথা—[১২৯]

কলিকাতা	ধারসা	আমিরপুর	বালান্দা
খালোর	মানপুর	সুলতানপুর	হাতিগড়
মেদনমল্ল	কৃষ্ণপুর	কাউনিয়া	মাগুরা

রামেশ্বরের পুত্র রঘুদেবের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব অতি অল্প বয়সে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে নৃসিংহদেব জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন আলিবর্দী খান। নূতন নবাবের অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় এবং বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের দেওয়ান মাণিকচাঁদ চতুরতার সঙ্গে নবাবের কর্ণগোচরে আনেন যে, নিঃসন্তান অবস্থায় গোবিন্দদেবের মৃত্যু হয়েছে। মাণিকচাঁদের চেষ্টার ফলে ভাগীরথীর পশ্চিমভাগের জমিদারী রাজা চিত্রসেনের অধিকারভুক্ত হয়। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎপুত্র শম্ভুচন্দ্রের নামে হালদা পরগণার জমিদারীস্বত্ব লাভ করেন। কিন্তু হুগলীর ফৌজদার পীরখাঁর চেষ্টায় কুলিহাণ্ডা পরগণা বর্ধমানরাজ এস্টেট ভুক্ত হতে পারে নাই। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের আত্মীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রচেষ্টার ফলে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার নয়টি পরগণার পুনরাধিকার লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

উদয় দত্তের দ্বিতীয় পুত্র রূপরামের বংশধর মনোহর রায় শেওড়াফুলিতে (দশ আনা সম্পত্তি) ও তাঁর ভ্রাতা গঙ্গাধর (ছয় আনা সম্পত্তি) বালিতে বসবাস করলেও পাটুলির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই। উদয় দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র কাশিরামের বংশধর মুকুন্দদেব ও রামকৃষ্ণ যথাক্রমে শিবপুর ও রাজহাটে বসবাস করতে শুরু করেন। বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গড়বাড়ী নষ্ট হলেও রাজা মহাশয় রামেশ্বর দত্তচৌধুরী নির্মিত সুন্দর টেরাকোটা সাজে সজ্জিত বাসুদেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপিতে আজও তাঁর কীর্তি ঘোষিত হচ্ছে—

"মহী-ব্যোমাঙ্গ-শীতাংশুগণিতে শক-বৎসরে
শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরাং॥" ১৬০১

মহী=পৃথিবী=১, ব্যোম=০, অঙ্গ=৬, শীতাংশু=চন্দ্র=১। শ্লোকের রাশিফল ১।০।৬।১। অঙ্কস্য বামাগতি ধরে পাওয়া যায় ১৬০১ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামেশ্বর দত্ত কর্তৃক এই বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিল তার রেশ কাটোয়া পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে লালকেল্লার অভ্যন্তরভাগে ফারুক সায়র কর্তৃক সম্রাট জাহান্দার শাহ নিহত হন এবং পরদিন

জাহান্দার শাহের উজির জুলফিকার খান নসরৎ জঙ্গকে হত্যা করা হয়। জুলফিকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম খান আত্মীয়স্বজনসহ প্রাণ ভয়ে দিল্লী হতে পলায়ন করে কাটোয়ায় আশ্রয় লাভ করেন।[১৩০] জুলফিকারের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলে কাটোয়া নিবাসী হাফিজ আবদুস সত্তার দাবী করেন এবং উজিরের বংশধর, শাহ আলম খানের বংশধরের কন্যাকে বিবাহ করার সংবাদ জানা যায়। অনেকের মতে সৈয়দ শাহ আলম খান ছিলেন উজির। কিন্তু মাথির-উল-উমরা নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁর এ পরিচয় নাই এবং এই গ্রন্থ হতে আরও জানা যায় যে, জুলফিকারের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।[১৩১] কাটোয়ায় বসবাসের কিছুকালের মধ্যে শাহ আলম খান রাজনীতি হতে বিদায় গ্রহণ করে ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন। এ সংবাদে সম্রাট ফারুক সায়র তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সতের হাজার টাকা আয়ের এগারখানি মৌজা দান করেন। ঐ অর্থের দ্বারা শাহ আলম খান ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, প্রস্তর নির্মিত বাঁধ ও বাগানেপাড়ার গড় নির্মাণ করেন। বর্তমানে গড়টি প্রায় বুজে গেছে এবং বাঁধেরও কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মসজিদে গ্রথিত তিনটি শিলালিপি আজও সম্রাট ফারুক 'সায়র ও শাহ আলম খানের নামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে এই মসজিদটিকে মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু শিলালিপিতে কোথাও মুর্শিদকুলি খাঁর নামোল্লেখ নাই। খোদিত লিপিতে আছে ঃ—

(ক)

'আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন ওয়াস্‌সালাতো
আলা মোহাম্মাদেও ওয়া আলেহি আজমায়ীন।
চেরগুণ ওয়া মাসজেদুন ওয়া মেহরাবুন ওয়া মিন্‌বারুন
আবুবকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আলি।'

(খ)

'বিসমিল্লাহের রহমন অর রহিম। নাদেয়ান আলিয়া
মাজহারুল আজায়েব। তাজেদাহু আউনালাকা ফিন নাওয়ায়েব।
জাইফুন কুল্লেহম্মেন ওয়াগামেন।
সায়েন জালি বেনাবুওয়াতেকা ইয়া মোহাম্মদেন বেওয়ালা ইয়াতেকা।
ইয়া আলি ইয়া আলি ইয়া আলি।'

(গ)

ক-আলা রসুলুল্লাহে সাল্লুল্লাহো আলাইহে ওয়া ছাল্লাম। মিন বলি আল্লাহো তায়ালা মসজিদান কি দুনিয়া। ফাকাদ বানি আল্লাহো তায়ালা-লাহুবাইতান ফিল জান্নাতে। হাজাল মসজিদো-কি আহাদুল্লাহ কয়নে থকনেল আজমে সুলতানীল আকবর আফখাম মোহাম্মদ ফাররুখা শিয়ার বাদশাহ আলগাজী খাল্লাদাল্লাহো তায়ালা মুলকাহু ওয়াসুলতানাহু-সালাতেন আলফা ওয়া মায়াতেন ওয়া সাবয়ান ওয়া এশরিনা মিনাল হিজরাতে আলম খান।

অনুবাদ—

(ক) যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত করুণা মোহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর বর্ষিত হউক। জ্যোতি, মসজিদ, মেহরাব ও মিম্বার যথাক্রমে আবুবকর, উমর, ওসমান ও আলির সঙ্গে তুলনীয়।

(খ) পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে আরম্ভ করছি যে, হে মোহাম্মদ ! আলিকে আমন্ত্রণ জানান, যিনি অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা তোমার বিপদে আপদে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে। তোমার নবুয়াতে সুখ দুঃখ আসবে। হে আলি ! হে আলি ! হে আলি !

(গ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের উপর শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক। যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে একটি মসজিদ তৈরী করেছেন মহামহীয়ান আল্লাহ্‌ স্বর্গে তাঁর জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করবেন। এই মসজিদটি মহাপ্রতাপশালী থাকন সুলতান মোহাম্মদ ফারুখ শিয়ার বাদশাহ্ গাজীর সময়ে নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাঁর রাজ্যের ও ক্ষমতার মঙ্গল করুন। হিজরী ১১২৭ অব্দে আলম খান [এটি নির্মাণ করেন]।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে কাটোয়া হতে বর্ধমান হয়ে পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত পথে চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণার্থে কাটোয়া, মুর্শিদগঞ্জ ও পুবথেল-এ (বর্তমান পূর্বস্থলী) তিনটি থানা বা চৌকি স্থাপিত হয়েছিল এবং মহম্মদ জান নামক এক পদস্থ কর্মচারীর অধীনে এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের ভার অর্পিত ছিল। মহম্মদ জান যখন এতদঞ্চল পরিভ্রমণ করতেন সেসময়ে তাঁর অগ্রভাগে তীরন্দাজ ও কুঠারধারী সৈন্যদলসহ গমন করত ; তাঁরা কুড়ালী বা কুঠারী নামে পরিচিত ছিল। রাজপথে রাহাজানি নিবারণার্থে একমাত্র শাস্তির বিধান ছিল কুঠার দ্বারা অপরাধীর শিরচ্ছেদ।[১৩২]

১৭২৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন সুবাবাংলার নবাব হন। সুজাউদ্দিন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি হিন্দু প্রজা ও জমিদারগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন। হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের অপরাধে মুর্শিদকুলী খাঁর, নাজীর আহম্মদ ও মুরাদ ফরাস নামক দু'জন কর্মচারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিলাসিতা ও নারী ঘটিত দোষ বাদ দিলে সুজাউদ্দিনের চরিত্র নানা গুণে ভূষিত ছিল। ১৭৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে নবাব কর্তৃক চাকলা বর্ধমানে সংবাদ লেখকের (প্রেরক ?) পদে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্তির কথা জানা যায়। 'মজফরনামা' নামক পার্সী গ্রন্থের রচনাকার করমআলির পিতা এই পদে যোগদান করেন এবং ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদটি তাঁদের বংশের উপর ন্যস্ত ছিল।[১৩৩] ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব পদে আসীন হন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় উন্নত চরিত্রের ছিলেন না এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের পরামর্শও গ্রহণ করতেন না। উচ্চপদস্থ

রাজকর্মচারীগণের চক্রান্তের ফলে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁর হস্তে তিনি নিহত হন।

প্রখর রাজনীতিজ্ঞান ও সৈন্যাপত্য গুণ থাকা সত্ত্বেও নবাব আলিবর্দী খাঁর (১৭৪০-৫৬) যোল বছর রাজত্বকালের মধ্যে বর্গী হাঙ্গামা দমনের জন্য দশ বছর সময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। এই সুযোগে ইউরোপীয় বণিক-গণ বঙ্গদেশে তাদের যথেষ্ট আধিপত্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। আলিবর্দী খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও বর্ধমানের জমিদারীর সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করলেও অন্যান্য হিন্দু জমিদারগণ অনুরূপ সম্মান লাভে বঞ্চিত ছিলেন।[১৩৪] ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা তাঁর জমিদারীর মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ করার হুকুম দিলে নবাব কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করে ফর্মান জারী করেন। সুজাউদ্দিনের আমল হতে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও কীর্তিচাঁদের নিকট নবাবের কোষাগারে এক কোটি টাকার উপর পাওনা ছিল। ঘন ঘন নবাব বদলের ফলে ঐ টাকা হিসাব বহির্ভুত হয়ে যায়। কিন্তু কীর্তিচাঁদ এই হিসাব সংশোধন করায় নবাবের কোষাগারে অধিক অর্থ জমা হওয়ার ফলে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়েছিল।[১৩৫] যোল বছর ঘোর অশান্তির মধ্যে সুবাবাংলা শাসন করে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ৭৬ বছর বয়সে আলিবর্দী খাঁ ইহলোক ত্যাগ করেন। আলিবর্দী খাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর ২৪ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি দিল্লীর দরবার হতে নবাবী প্রাপ্তির ফরমান লাভ করেন। সিরাজ-দৌল্লা মোট ১ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন সুবাবাংলার নবাব পদে আসীন ছিলেন। যে চক্রান্তের দ্বারা তাঁর মাতামহ সরফরাজকে হত্যা করে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেছিলেন, অদৃষ্টের দোষে সিরাজ অনুরূপ চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। সিরাজের প্রতিপক্ষ শওকত জঙ্গের গৃহশিক্ষক ও রিয়াজ-উস-সালাতিনের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁর দোষসমূহকে অতিরঞ্জিত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিরাজ দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মীরজাফর খানসহ রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে পলাশীর প্রাঙ্গণে সুবাবংলার নবাবী শাসন তথা মোঘল আধিপত্যের অবসান ঘটে।

যুদ্ধের এক সপ্তাহ পূর্বে প্রস্তুতি পর্বটি যে বর্ধমানের মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত পত্রাবলী ও সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থ হতে প্রাক্-পলাশী যুদ্ধের তথ্যসমূহ জানা গেছে। ১১ই জুন মীরজাফরের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত স্বাক্ষরিত হওয়ার পরদিন ওয়াট্স মুর্শিদাবাদ হতে অশ্বারোহণে অগ্রদ্বীপে পলায়ন করেন এবং অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক তথা হতে দেশী নৌকা যোগে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৩ই জুন ইংরাজ সৈন্যদল (৮০০ শ্বেতাঙ্গ, ২২০০ দেশীয়

সিপাই ও ৮টি কামান) কলকাতা হতে যাত্রা করে ১৫ই হুগলীশহর অতিক্রম করে। কাটোয়া হতে প্রেরিত ক্লাইভের পত্রে জানা যায় যে, তিনি আরও পূর্বে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন এবং সসৈন্যে ১৪ই জুন রাত্রে কাটোয়ায় উপস্থিত হন। মনে হয়, শাঁকাই দুর্গের কিল্লাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি পরদিন পাটুলির শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অঞ্চল হতে যে সকল পত্র প্রেরিত হয়েছিল সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।[১৩৬]

1. Letter from Colonel Clive to Select Committee, Fort William, dated Cutwa, 15 June, 1757, at noon.

"GENTLEMEN—I arrived last night at Cutwa, and as the seapoys who came by land are a good deal fatigued, I shall only proceed to Mirzapore to-day, where I shall disembark the cannon, &C., and I hope to reaeh Agoa Diep in two days, to which place I shall order all the small boats. Mr. Watts with the gentlemen ot Cossimbuzar joined me yesterday afternoon, also Coja Petrus and a Moorman from Meer Jaffeir. I have desired Messrs. Watts and Sykes to accompany me. They left the city on the 13th at night, and acquaint us Meer Jaffeir's party daily encreases. The gunners and Laittee Cawn have joined him, so that there is the greatest probability of a happy issue to the expedition.

I have, &C., &C., ROBERT CLIVE."

১৬ই জুন অম্বিকা কালনায় কলকাতা হতে আগত সৈন্যদলের সঙ্গে ওয়াট্‌স-এর সাক্ষাৎ ঘটায় তিনি ঐ সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হন এবং ১৭ই জুন পাটুলিতে ক্লাইভ ও ওয়াট্‌স শিবির স্থাপন করেন। ক্লাইভের পত্রে কাটোয়া অভিযানের কথা জানা যায়।

2. Letter from Colonel Clive to the Select committee, Fort William, dated Pattlee, 17 June, 1757.

"...A party of 200 Europeans and 500 seapoys set out to-day to seize Cutwa town and fort, and to-morrow I shall march the army there. The killidar, in answer to a letter wrote him, has promised to be our friend. I understand there is a large quantity of grain in the place, and its situation makes it convenient to us in every respect."

3. Letter from Colonel Clive to Jafar Ali khan, dated Pattlee, 18 June, 1757.

এই পত্রে ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও মানকরায় নবাব শিবির আক্রমণের কথা জানা যায়। ১৮ই তারিখে সৈন্যদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল উত্তরে ভাগীরথী অতিক্রম করে অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করে এবং অপরদল ক্লাইভের নেতৃত্বে ১৯শে ভোররাত্রে কাটোয়া শহরের বহির্ভাগে উপস্থিত হয়ে কাটোয়া দুর্গের কিল্লাদারকে (প্রকৃতপক্ষে এটি শাঁকাই-এর দুর্গ) দুর্গ সমর্পণ করার আদেশ দেওয়া হয়। কিল্লাদার মীরজাফরের অনুগত হওয়ায় এই দুর্গ অধিকার করতে বিশেষ অসুবিধা ছিল না। কিছুক্ষণ যুদ্ধের অভিনয় করার পর দুর্গের সম্মুখভাগে অগ্নি সংযোগ করে কিল্লাদার পশ্চাৎভাগ দিয়ে পলায়ন করে। কামান ও গোলাবারুদসহ প্রায় দশ হাজার লোকের এক বছরের শস্য ভাণ্ডার ইংরেজদের হস্তগত হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হতে ক্যাপ্টেন আয়ারকুটে শহরের বহির্ভাগে শিবিরে অবস্থানরত ক্লাইভকে যুদ্ধের ফলাফল জানান।

4. Letter from Captain Eyre Coote to Colonel Clive, dated Cutwa Fort, 19 June, 1757.

"Sir,—This morning about seven o'clock took the Fort of Cutwa by storm. The timidity of the defenders gave me an easy entrance."

সঙ্গে সঙ্গে কাটোয়ার শিবির হতে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ ব্যবস্থা জানিয়ে মীরজাফরকে পত্র দেন এবং ঐ দিন পত্রের উত্তর তাঁর হস্তগত হয়।

5. Letter from Colonel Clive to Assaduzama Muhammad, Raja of Beerboom. dated Cutwa, 20 June, 1757.

"...By continued marches I have reached Cutwa, and the fort, which had a great force in it by the blessing of God fell into my hands in a very short time. If you are firmly inclined to join me call God and your prophet to witness your sincerity, and send 2 or 300 good horse to march day and night to join me in the time of battle, and I shall look upon your affairs as my own, and end them happily for you; and your country shall not be injured, nor shall any collector be put over you; and whatever may be the charge of the forces you send me I will make the Government pay you."

আসাদুজ্জামান এই পত্রের উত্তর দানে বিরত ছিলেন বা তিনি অশ্বারোহী সৈন্যসহ ক্লাইভের পক্ষে যোগদান করেন নাই। এই কারণে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে মীরকাশিম ও ইংরেজগণ রাজাকে বিভিন্নভাবে পযুর্দস্ত করেন।

6. Letter from Colonel Clive to the Sellect Committee, Fort William, dated Cutwa 21 June, 1757.

সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে এই পত্র কলকাতায় প্রেরণ করা হয়েছিল ।

২২শে জুন কাটোয়া হতে মীরজাফরের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করে ক্লাইভ ভাগীরথী অতিক্রমের পরে পলাশী অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং ২৩শে জুন সিরাজদৌল্লার শেষ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়েছিল। ২৩শে জুন তারিখে কলিকাতাস্থ সিলেক্ট কমিটির প্রসিডিংসে পূর্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। সিরাজদৌল্লার ন্যায় মীরকাশিম খানের বঙ্গদেশে শেষ পরীক্ষা নির্ধারিত হয়েছিল কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপের যুদ্ধে ।

মীরজাফর মসনদে আরোহণ করার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ষড়যন্ত্রকারী ইংরেজ কর্মচারীগণ ও দেশীয় ব্যক্তিগণকে চুক্তিমত অর্থ দিতে না পারায় ২৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে হুগলীর ফৌজদার আমির বেগ, বর্ধমান ও নদীয়া জমিদারীর রাজস্বের উপর 'বরাত চিঠি' প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১৯ লক্ষ টাকার জন্য পরবর্তীকালে এরূপ তনখার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় হতে বর্ধমান জমিদারী পরোক্ষভাবে কোম্পানির অধীনে আসে।[১৩৭] কোম্পানির প্রসিডিংস হতে জানা যায় যে, উপরোক্ত চুক্তিটি ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল সম্পাদিত হয়েছিল।

বাংলার নবাবদের শাসনকালে বর্ধমানের উপর অবিচার ও অধিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল নবাব মীরকাশিমের আমলে। যুদ্ধবিদ্যায় অপদার্থ ও কূটনীতিতে অপরিণামদর্শী নবাব মীরকাশিম, কোম্পানি ও ইংরাজ কর্মচারীদের প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বাংলার মসনদ লাভ করেন। মীরকাশিমের সপক্ষে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি যে সন্ধিপত্র রচনা করে তার ৫নং চুক্তিটি হল—**"Far all charges of the company and of the said Army, and provisions for the field, &c, the Lands of Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned, and Sunnad for that purpose shall be written and granted. The company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries, and we will demand no more than the three assignments aforesaid." (*The Treaty between the Nobab Meer Mohomed Kossim Khan and the Company.*)**

নভেম্বর মাসে প্রদত্ত এক সনদ বলে রাজা ত্রিলোকচাঁদের জমিদারীর অধিকারও রাজার কোম্পানির উপর বর্তায়।[১৩৮]

Translation of a Sunnud under the seal of the Nabob Nasseerool Moolk Imteazo Dowla Nusserut Jung Meer Mohomed Cossim Khan Bahadur.

"To the Zemindars, Canoongoes, Talookdars, Husbaddmen, and cheif Villagers of Pergunnah of Burdwan, & c. The Zemindaree of the Rajah Tilluck Chand, in the districts of the Subah of Bengal,

be it known that whereas divers wicked people have traitorously stretched forth their hands to plunder the subjects, and waste the royal dominions, for this reason the said Pergunnah, & c. is granted to the English Company in part disbursment of their expenses, and the monthly maintenance of five hundred European horse, two thousand European foot, and eight thousand sepoys, which are to be entertained for the protection of the royal dominions. Let the above officers quietly and contentedly attend and pay to the persons appointed by the English Company the stated revenues, and implicitly submit in all things to their authority and the office of the Collectors of the English Company is as follows :

They shall continue the Zamindars and Tanants in their places, regularly collect the revenues of the lands, and deliver them in monthly for the payment of the expenses of the Company, and the pay of the above mentioned forces, that they may be always ready cheerfully and vigorously to promote the affairs of the king. Let this be punctually observed. Dated the 14th of the month Rubbeeulawul Ist sun answering to the lst of the month Cartic 1166, Bengal style."

N. B.—The sunnud, for the Chucla of Midnapore in the Districts of the Subah of Orissa, and for the Thannah of Islamabad or Chattgaum appertaining to the Subah of the Bengal, are worded as above (proceeding dated 17th November, 1960)

মীরজাফর খানের সিংহাসনচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের রাজস্ব কোম্পানির হস্তে সমর্পিত হওয়ায় রাজার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। মারাঠাদের সাময়িক আক্রমণে বর্ধমান অঞ্চল উপদ্রুত হওয়ায় রাজা কোম্পানির নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করলেও, তিনি স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করে প্রস্তুত হন এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। মীরজাফরের একান্ত অনুগত নন্দকুমার ও দুর্লভরাম (রাজা জানকীরামের পুত্র) রাজা ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে পত্রাদি প্রেরণ করায় ভান্সিটার্ট তাঁদের কলকাতায় প্রহরাধানে রাখেন।[১৩৯] অপরদিকে ইংরাজদের অনুগ্রহে মসনদ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মীরকাশিম বর্ধমানের রাজা ত্রিলোকচাঁদ ও বীরভূমের রাজা আসাদ জামান খাঁর উপর পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সনদ প্রাপ্তির পর বর্ধমানে কোম্পানির অধিকার স্থাপন ও প্রভুত্ব প্রকাশের নিমিত্ত ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের অধীনে একদল সৈন্য ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের

শেষ ভাগে বর্ধমান শহরের সন্নিকটে দামোদরের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হয়। মার্টিন হোয়াইটের পরিকল্পনা ছিল যে বর্ধমানে কোম্পানির প্রভুত্বের পরিচয় প্রদানপূর্বক রাজাকে অর্থ দানে বাধ্য করে বীরভুমের পথে অভিযানের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়া। রাজা কোম্পানিকে অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেও বর্ধমান শহরে ইংরাজ সৈন্যদলকে প্রবেশ করতে দিতে রাজী না হওয়ায় দামোদরের তীরে উভয়পক্ষের সংঘর্ষ হয় এবং এই যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন। অতঃপর মার্টিন হোয়াইট বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর অত্যাচার করতে করতে বীরভুমের অভিমুখে অগ্রসর হন। ইংরাজ সৈন্য কাটোয়ায় অজয় পার হওয়ার পর মীরকাশিমের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনগরের পথে অগ্রসর হওয়ায় আসাদ জামান খাঁ বীরভুম হতে পলায়ন করেন[১৪০] এবং নবাবের সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁর উপর বীরভুমের শাসন ভার অর্পণ করা হয়। শাসনকার্যে অহেতুক হস্তক্ষেপ, লবণের উপর শুল্ক ও বিনা শুল্কে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে কোম্পানি ও নবাবের মনোমালিন্য চরম অবস্থায় পৌঁছায়। কোম্পানির আর্থিক দাবী বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় উভয়পক্ষের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে।

মীরকাশিমের পদচ্যুতি ও ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের (বর্তমান দুর্গ নহে) অভ্যন্তরে গোপনে মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানির দ্বিতীয়বার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নবাবের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়— **"I do grant and confirm to the company, for defraying the expenses of troops, the Chucklas of Burdwan, Midnapore and Chittagong, which were before ceded [at the time of nawab Meer Mohomed Kossim Ali Khan] for the same purpose."**

চুক্তি সম্পাদনের পর মীরজাফর খান ইরাজসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কলকাতা হতে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের পথে ১৭ই জুলাই অগ্রদ্বীপে অগ্রগামী অপর একদল ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হন। এদিকে মীরকাশিমও মুঙ্গের হতে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে কাশিমবাজার অধিকার করে শ্বশুর মীরজাফরকে বাধা দিতে মহম্মদ তকী খাঁকে অগ্রদ্বীপের পথে প্রেরণ করেন। কলকাতার কাউন্সিলের নির্দেশে ক্যাপ্টেন নক্স, জলেশ্বর ও বর্ধমান হতে সৈন্য সংগ্রহ করে মেজর টমাস এডামসের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন।[১৪১] এই যুদ্ধে দাঁইহাটে যে কোম্পানির সৈন্য শিবির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় উইলিয়াম গ্লিন নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষের পত্রে[১৪২] (**Camp at Dinighatt : Letter from William Gleam to Major Jhon Carnac dated 13th July 1763**)। কোম্পানি যুদ্ধের জন্য যে পূর্বেই প্রস্তুত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গভর্নর হ্যারী ভান্সিটার্ট-এর স্বাক্ষরিত মেজর টমাস এডামসের নিকট প্রেরিত-পত্রে[১৪৩]—(**Dated Fort William, the 8th July, 1763..."We have directed Mr. Johnstone at Burdwan [Resident] to remit to your**

paymaster the amount of his collections for defraying the expenses of the Army. Major Carnace is appointed to proceed and take upon him the command of Captain Knox's Detachment at Burdwan."

ভান্সিটার্টের পত্রে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে মীরজাফর খানকে নামে মাত্র সর্বাধিনায়করূপে সম্মান দেখান হয়েছিল। ক্যাপ্টেন লং-এর অধীনস্থ সৈন্যদল অম্বিকা-কালনা হতে কাটোয়ায় গ্লিনের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হন। মেজর এডামস্ কাটোয়া শহর হতে প্রায় এক মাইল দূরে (সম্ভবতঃ বর্তমান জেলখানা ও কলেজের সন্নিকটে) অজয়ের দক্ষিণ ভাগে হায়বৎ উল্লার অধীনস্থ, মহম্মদ তকী খানের সৈন্যদলকে বাধা দেওয়ার জন্য অবস্থান করেন এবং উইলিয়াম গ্লিন কাটোয়া হতে খাদ্য সংগ্রহ করে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অগ্রদ্বীপে পেঁছান। কাটোয়ায় নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যদল বর্ষায় কর্দমাক্ত ও কর্ষিত জমিতে সুবিধা করতে পারে নাই ; উপরন্তু ইংরাজসৈন্য দূর হতে কামানের গোলায় নবাব সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ভাগীরথী অতিক্রম করে পলাশীর দক্ষিণে অগ্নিতপুরে মহম্মদ তকী খাঁর মূল শিবিরে পলায়ন করে। কর্নেল কুটে অতি সহজেই অজয় অতিক্রম করে শাঁকাই দুর্গ অধিকারপূর্বক দুর্গটিকে ধ্বংস করে ১৪টি কামানসহ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯শে জুলাই মীরজাফরকে সম্মুখে রেখে অগ্রদ্বীপ হতে উত্তর দিকে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করায় মহম্মদ তকী খাঁ ও ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ, ইংরাজ সৈনদলকে আক্রমণ করেন। কাটোয়া হতে মেজর এডামস্ অগ্রদ্বীপে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করায় তকী খাঁর অবস্থা সঙ্গীন হয়। হঠাৎ কামানের গোলায় অশ্বসহ তকী খাঁ নিহত হলে অবশিষ্ট সৈন্যসহ সৈয়দ মহম্মদ পলায়ন করেন এবং মীরকাশিম মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মেজর এডামসের প্রহরাধীনে ২৪শে জুলাই মীরজাফর মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে দ্বিতীয়বার মসনদ লাভ করেন।[১৪৪] উধুয়ানালায় যুদ্ধের সময় মোঘল সেনাপতি কামগার খান সসৈন্যে বর্ধমান জেলায় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মেজর কার্নাক ইংরাজ ও মুসলমান সৈন্য সংগ্রহ করে বাধাদানে অগ্রসর হন। বর্ষাকালের মধ্যে কামগার খাঁ বিশেষ সুবিধা করতে সক্ষম হন নাই এবং পরিশেষে উধুয়ানালার যুদ্ধে কোম্পানির জয়লাভের সংবাদ পেয়ে তিনি বর্ধমান পরিত্যাগ করেন।[১৪৫] অবশেষে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম প্রদত্ত সনদ বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভ করে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ তারিখেই বাংলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়।

পাদটীকা :

১। তবকাত-ই-নাসিরী—(অনু:) মোহম্মদ যাকারিয়া, পৃ: ২৫।
২। হুগলী-হাওড়া জেলার ইতিহাস—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, পৃ: ২৮৪-৬।
৩। *History of Bengal*—Sir Jadunath Sarkar, Vol. II, p. 7.
৪। *J. A. S. B.*, 1917, p. 139.
৫। নদীয়া কাহিনী (পুস্তক বিপণি সং)—কুমুদনাথ মল্লিক, পৃ: ৫৬।
৬। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ২৭-২৮।
৭। *Tabkat-i-Nasiri*—J. Raverty, p. 573 ; *Indian Historical Quarterly*, Vol. XXX, p. 11.
৮। *Tabkat-i-Nasiri*—J. Raverty, p. 578.
৯। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ৪৪।
১০। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ৪৩।
১১। ঐ পৃ: ২৬৬।
১২। ঐ পৃ: ৫৩।
১৩। বঙ্গদেশের ইতিহাস—ডঃ সুশীলা মণ্ডল, পৃ: ১০৭।
১৪। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ৬০।
১৫। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০।
১৬। গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০।
১৭। *History of Bengal*, Vol. II, p. 22 , বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ. ১১১।
১৮। *History of Bengal*, Vol. II, p. 29.
১৯। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ: ১১০।
২০। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ১৪৪।
২১। *History of Bengal*, Vol. II, p. 48.
২২। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ: ১৩১।
২৩। *The History of Bengal*—C. Stwart, p. 69.
২৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ: ১৩০-৩১।
২৫। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ: ১৬৬।
২৬। *History of Bengal*, Vol. II, p. 60.
২৭। *Riyazu-S-Salatin*, p. 82.
২৮। *The History of Bengal*—C. Stwart, p. 89.
২৯। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬-৬৭।
৩০। বঙ্গদেশের ইতিহাস—ডঃ সুশীলা মণ্ডল, পৃ: ১৭১।
৩১। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ: ১৯৪।
৩২। ঐ পরিশিষ্ট পৃ: ১৩।

৩৩। কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৫১-৫২।
৩৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫-১৬।
৩৫। *Riyazu-S-Salatin*, p. 108.
৩৬। গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১।
৩৭। যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১২-১৪।
৩৮। *Riyazu-S-Salatin*, p. 119-20.
৩৯। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৭৩।
৪০। *J. A. S. B.*, 1909, p. 251.
৪১। *J.* A. *S. B.*, 1909, p. 250
৪২। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৩।
৪৩। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৫-৬।
৪৪। *Riyazu-S-Salatin*, p. 124-5.
৪৫। *Bengal Past & Present*, 1917, Vol. XIV, p. 101.
৪৬। *Riyazu-S Salatin*, p. 126.
৪৭। *Inscriptions of Bengal*—Shamsuddin Ahmed, Vol IV, p. 139.
৪৮। *Riyizu S-S*alatın, p. 126.
৪৯। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।
৫০। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—হরিদাস দাস, পৃঃ ১২৭-৮।
৫১। ঐ পৃঃ ১২৫২।
৫২। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১।
৫৩। *Contribution to Geography and History of Bengal*—H. Blockmann, p. 16; গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯।
৫৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩১৫-১৭।
৫৫। বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৯-৪০।
৫৬। *Riyazu-S-Salatin*. p. 128.
৫৭। *Tabkat-i-Akbari*—Nazimuddin Ahmed, Vol. III, p. 442.
৫৮। *J. A. S. B.*, 1900. pt. I, p. 186.
৫৯। *Epigraphia Indica—Arabic and Persian Supplement*, 1975, p. 31-32.
৬০। *Ibid*, p. 33-35.
৬১। *J. B. O. R. S.*, 1917. p. 374-5.
৬২। *History of Orissa*—R. D. Banerjee, Vol. I, p. 327-28,
৬৩। *Riyazu-S-Salatin*—p. 131.
৬৪। *J. A. S. B.*, 1917, No. 3, p. 134.
৬৫। বঙ্গদেশের ইতিহাস—ডঃ সুশীলা মণ্ডল, পৃঃ ২৮২।

৬৬। বঙ্গদেশের ইতিহাস—পৃ: ২৮২-৮৩

৬৭। *J. A. S. B.*, 1872, p. 332.

৬৮। *Bengal Past & Present*, 1917, p. 102.

৬৯। *The History of Bengal*—Charles Stewart, p. 135.

৭০। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ: ৩০২.

৭১। গৌড়কাহিনী—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৪।

৭২। *History of Bengal*, Vol. II, p. 177.

৭৩। *Cont. to the Geography and History of Bengal*—H. Blockmann. p. 11.

৭৪। বর্ধমানরাজ—আবদুল গনিখান, পৃ: ৪৯।

৭৫। *Bengal Past and present*, 1924, p. 24.

৭৬। *Bengal Past and Present*, 1917, p. 103.

৭৭। *J. A. S. B.*, 1898 (*Memoirs of Bayazid Biyat*—H. Beveridge), p. 296-315. J. *A. S. B.*, 1871, p. 251-52 ; *J. A. S. B.*, 1917, p. 177-84 ; *J. A. S. B.* 1924. p. 489-97 ; *Ain-i-Akbari*—Tr. H. Blockmann, Vol. I, p. 651 ; *Inscriptions of Bengal*—S. Ahmad, Vol. IV, p. 269-70.

৭৮। *The Akbar Nama of Abu-L-Fazl*—Tr. by H. Beveridge, Vol. III, p. 169.

৭৯। *Ibid*, Vol. III, p. 170.

৮০। *The Ain-i-Akbari*—Tr. H. Blockmann, Vol. I, p. 364.

৮১। *The Akbar Nama*, Vol. III, p. 173.

৮২। *Ibid*, Vol. III, p. 174.

৮৩। *The Military History of India*—Sir Jadunath Sarkar, p. 71-72.

৮৪। *The Akbar Nama*, Vol. III, p. 180.

৮৫। *Ibid*, Vol. III, p. 255.

৮৬। *Ibid*, Vol. III, p. 376.

৮৭। *Ibid*, Vol. III, p. 697.

৮৮। *Ibid*, Vol. III, p. 878-79.

৮৯। *The Ain-i-Akbari*, Vol. I, p.363.

৯০। *H. C. I. P.* (*The Mughal Empire*), Vol. VII, p. 162 , *The Akbar Nama*, Vol. III, p. 1214-18. *The History of Bengal*—Charles Stewart, p. 223-24.

৯১। *The Ain-i-Akbari*, Vol. I, p. 591.

৯২। *Maathir-ul-Umara*—Tr. H. Beveridge, Vol. II, p. 837.

৯৩। *Riyazu-S-Salatin*—Ghulam Husain Salim, p. 169.

৯৪। The History of Bengal, p. 219-221.

৯৫। *The Ain-i-Akbari*, Vol. I, p. 572 ; Maathir-Ul-Umara, Vol. II, p. 837.

৯৬। *H. C. I. P.* (*The Mughal Empire*), Vol. VII, p. 185.

৯৭। *The Ain-i Akbari*, Vol. I, p. 592.

৯৮। *The History of Bengal*, p. 223-24.

৯৯। *Ibid*, p. 227.

১০০। *Maathir-Ul-Umara*—Vol. II, p. 838 ; "Lre your mother weeps make his mother weep."

১০১। *Ibid*, Vol. II, p. 838.

১০২। *Riyazu-S-Salatin*—p. 169 ; *Iquabal Nama-i-Jahangiri*—Baini Prosad, p. 19.

১০৩। *History of Jahangir—Baini Prosad*, p. 176.

১০৪। *Maathir-Ul-Umara*, Vol. II, P. 838.

১০৫। *History of Jahangir*, p. 177 ; "He (Jahangir) heaps curses on Sher Afkun and consigns him to eternal damnation".

১০৬। *J. A. S. B.*, 1871, p. 251.

১০৭। *Maathir-Ul-Umara*, Vol. II, p. 838.

১০৮। মধ্যযুগের গৌড়—শৈলেন ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০।

১০৯। *Riyazu'-S-Salatin*, p. 188.

১১০। মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।

১১১। *Siyazu-S-Salatin*, p. 188 ; *History of Bengal*, Vol. II, p. 307.

১১১ (ক)। *Baharistan-i-Ghayabi*—Mirza Nathan (Eng. Tr. Dr. M. I. Borah), Vol. I, p. 144.

১১২। *Riyazu-S-Salatin*, p. 202.

১১৩। মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১।

১১৪। *J. B. O. R. S.*, 1917, p. 376-77.

১১৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম ভাগ (ব্রাহ্মণ্য কাণ্ড), পৃঃ ৯৯।

১১৬। *J. A. S. B.*, 1877, p. 164-67.

১১৭। *Riyazu-S-Salatin*, p. 238-40 ; *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 284-92 ; *History of Bengal*—C. Stewarts, p. 381-90 ; *History of Bengal*, Vol. II, p. 393-5 ; *J. A. S. B.*, 1917, p. 186-88 ; *The Ancient Monuments of Bengal*, 1896, p. 4.

১১৮। *Murshid Quli Khan and His Times*—Abdul Karim, p. 24.
১১৯। *History of Bengal*, Vol. II, p. 403.
১২০। *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 29.
১২১। *The Report of the Land Revenue Commission*, Vol. II, p. 174.
১২২। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮।
১২৩। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, পৃঃ ১৩২।
১২৪। *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 41.
১২৫। বর্ধমান সম্মিলনী, ১৯৭৪, পৃঃ ৫৮।
১২৬। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক (পুস্তক বিপণি সং), পৃঃ ২১ ; ভূমি লক্ষ্মী পত্রিকা, ২৯শে মাঘ ১৩৮৫ সাল।
১২৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।
১২৮। *The Family History of the Bansberia Raj*—A G. Bower p. 4-5.
১২৯। *Ibid*, p. 9-10 ; *Bengal in the Reign of Auranzib*, Anjali Chatterjee, p. 62.
১৩০। *J. A. S. B.*, 1917, p. 128.
১৩১। *The Maathir-Ul-Umara*, Vol II, p. 1044.
১৩২। *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 73.
১৩৩। *Bengal Nababs*—Sir Jadunath Sarkar, p. 15.
১৩৪। *The Seir Mutaqherin*, Vol. II, 114.
১৩৫। বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫৬।
১৩৬। *Indian Record Series (old Fort William in Bengal)*—S.C. Hill, Vol. II, p. 412-21.
১৩৭। বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০৬।
১৩৮। *Selections From Unpublished Records of Government*—The Revd. J. Long, No. 481.
১৩৯। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৩৫০।
১৪০। *The Seir Mutaqherin*, Vol. II, p. 396.
১৪১। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৪১৬।
১৪২। *Bengal Past & Present*, 1910, p. 247.
১৪৩। *Bengal Past & Present*, 1910, p. 245.
১৪৪। *History of Mediaeval Bengal*—R. C. Majumder, p. 143-45 ; *The Seir Mutaqherin*, Vol. II, p. 483-86 ; *Riyazu-S-Salatin*—p. 389.
১৪৫। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৪২৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ধমানে বর্গীহাঙ্গামা

(১)

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদের ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি শিথিল হতে শুরু হয়। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের (সৈয়দ হোসেন আলি ও সৈয়দ আবদুল্লা) চক্রান্তের ফলে সম্রাট ফারুক সায়র ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর শিবাজীর পৌত্র রাজা শাহু ও মোঘল সম্রাটের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিটিকে সম্রাটের পক্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ও রাজার পক্ষে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের অর্থ ও শাসনক্ষমতা বণ্টনের চক্রান্ত বলা যায়। এই চুক্তিতে মারাঠারা কোন রাজ্য বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দাবী করে নাই। মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ছ'টি সুবার উপর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পেয়ে ঐগুলি সর্দারগণের মধ্যে ভাগ করে নেয়। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের জন্য মারাঠা সর্দারগণ লুণ্ঠন, শিশুহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার, গৃহ, বাজার ও শস্যভাণ্ডারে অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ইত্যাদি যে কোন প্রকার অত্যাচারে বিমুখ ছিল না। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন—"বর্গীরা সাত-আটজন জুটিয়া যে এক এক স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ করিত ইহা অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ রাজা শম্ভুজীর অধীনে নিজ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ যখন ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ-রাজ্যে গোয়ার নিকট যষ্ঠি ও বার্দ্দেশ প্রদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহারা যে এইরূপ দলবন্ধভাবে স্থানীয় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার (gang rape) করিত, তাহার সাক্ষ্য তৎকালীন পোর্তুগীজ কাহিনীতে স্পষ্টই পাওয়া যায়।"[১] অতি স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র মধ্যভারত ও উত্তরভারতের অধিকাংশ অঞ্চল মারাঠাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয় এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। তাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে পূর্বভারত ও দিল্লীসহ সমগ্র উত্তরভারতে মোঘল আধিপত্য কার্যত লুপ্ত হয়। সুবাগুলির শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। একাজের ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আঞ্চলিক শাসকদের ছিল না। কিন্তু রাজ্যশাসনের পরিবর্তে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের উপর মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের ভ্রান্ত নীতির ফলে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী আহম্মদ শাহ আবদালী কর্তৃক পানিপথের প্রান্তরে মারাঠা শক্তি পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরাজরা অতি সহজেই মারাঠাদের দমন করে।

১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে ২১শে মার্চ নাদির শাহ দিল্লীর চার লক্ষ অধিবাসীকে গণহত্যা[২]

ও রাজকোষ লুণ্ঠন করে ভারত ত্যাগ করার পর অর্থের প্রয়োজনে সম্রাট মোহাম্মদ শাহের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়। একদিকে আলিবর্দী খানকে বাংলার সুবাদারীর ফরমান এবং অপরপক্ষে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র প্রথম বাজীরাওকে ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুবাবাংলার চৌথ আদায়ের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। মোহাম্মদ শাহের এই অন্তঃসারশূন্য দ্বিমুখী নীতির জন্য মারাঠাদের হাতে ওড়িশা, বিহার এবং বাংলা-সুবার অন্তর্গত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চাকলা বর্ধমান, বীরভূম, চাকলা রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীগণের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না।

(২)

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ) ওড়িশায় বিদ্রোহ ঘোষণা করায় বিদ্রোহ দমনার্থে নবাব আলিবর্দী কটক যাত্রা করেন এবং বিদ্রোহ দমন করে এপ্রিল মাসে কটক হতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুবারক মঞ্জিলে অবস্থানরত সময়ে হরকরার মুখে সংবাদ পান যে, নাগপুর হতে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য পাঁচেতের পথে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করেছে। সলিমুল্লার মতে নবাব ময়ূরভঞ্জ হতে দ্রুত 'আচালন সরাই'-এ উপস্থিত হন। কিন্তু গোলাম হোসেন সলিম ঐ স্থানকে 'উজালন সরাই' বলেছেন[৩] এবং স্থানটি বর্ধমান শহর হতে অধিকদূরে অবস্থিত নয়। নবাব সুজাউদ্দিন বর্ধমান হতে একদিনের দূরত্ব পথে মুবারক মঞ্জিলে নবাবীর সনদ পান এবং এখানে দু'টি তোরণ, একটা কাটরা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে বর্ধমান হতে ৬.৫ কিলোমিটার দূরে ভেটপুর গ্রামে সম্ভবতঃ মুবারক মঞ্জিল বা মঞ্জিল-ই-মুবারক (ইউসুফ আলি) নির্মিত হয়েছিল।[৪] তারিখ-ই-বাংলা ও রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতানুসারে স্থানটি বর্তমান রায়না থানার উচালন গ্রামকে নির্দেশ করলেও মুতাক্ষরিণ-এ বর্ণিত সহকরা (Sahkra) বা বর্তমান সাহিন-বন্দীর অবস্থিতি হ'ল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। সুজাউদ্দিনের আমলে নির্মিত তোরণ-দ্বারে খোদিত ফলক হতে জানা যায় যে, মুবারক মঞ্জিলের পূর্ব নাম ছিল 'দিননাথ'।[৫]

নবাব আলিবর্দী বর্ধমান শহরে রানি দিঘির [রানিসায়র] পারে শিবির স্থাপন করেন।[৬] এই দিন ভাস্কররাম কোলহাতকরের নেতৃত্বে ২০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ভোররাত্রে ভাস্কর নবাব শিবির আক্রমণ, নগরের একাংশ দগ্ধ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। কিন্তু ভাস্কর নবাব শিবিরের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পেরে রসদ সরবরাহ বন্ধের জন্য শিবির অবরোধ করেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নবাব বর্ধমান শহরে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করতে বাধ্য হন। কিন্তু খাদ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থা এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছিল যে, সমগ্র সৈন্যদল তিন দিন প্রায় অভুক্ত ছিল। অথচ সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের মতে "...he [Nawab] took the resolution of

advancing into Burdwan, a country, for populousness and plenty of provisions, superior to most in Bengal; his intention being to encamp with his back to this capital and his front to the enemies."[৭] কিন্তু শহরের শস্যভাণ্ডার পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাঁকে নিরাশ হতে হয়।

নবাব শিবিরকে অবরুদ্ধ রেখে ভাস্কররামের নেতৃত্বে মারাঠারা বর্ধমান শহরকে কেন্দ্র করে প্রায় ৬০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও বিভিন্ন প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। চতুর্দিক হতে জনসাধারণের ওপর মারাঠাদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী হরকরাগণ নবাবের নিকট পেশ করে। নবাবের অসহায়তার সুযোগে ভাস্কর দাবী করে—"If ten lakhs of rupees were given to me by way of hospitality, I would go back (to my place), for I have come to your Excellency's country after suffering the hardships of journey over a long distance."[৮] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্গী হাঙ্গামার প্রথম দু'সপ্তাহ ইউসুফ আলি সকল সময়েই নবাবের সঙ্গে ছিলেন।

দু'পক্ষের দূতগণ উভয় শিবিরে যাতায়াত করেও সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হন নাই। নবাবের সেনাপতিগণের পরামর্শ অনুযায়ী শত্রুকে এরূপ ঘুষ দেওয়ার পরিবর্তে ঐ অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করলে তাদের উৎসাহ ও প্রভুভক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং মারাঠাদের পরাভূত করে একেবারেই বাংলা হতে দূর করাই শ্রেয়। গোলাম হোসেন শলিমের বিবরণে পাওয়া যায় যে, এক সপ্তাহের মধ্যে নবাব শিবিরের খাদ্য ব্যবস্থা চরম পর্যায়ে পোঁছেচে।[৯]—"And when the stores and granaries of Burdwan were exhausted and the supply of imported grains was also completely cut off, to avert death by starvation, human beings ate plantain-roots, whilst animals were fed on the leaves of trees. Even these gradually ceased to be available. For breakfasts and suppers, nothing except the discs of the sun and the moon feasted their eyes." কবি গঙ্গারামের বিবরণীতেও ঐ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়—

"কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া"

অথবা

"ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল ॥"

প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ আলিও নবাব শিবিরে নিদারুণ খাদ্যাভাব ও বর্ধমান হতে কাটোয়া পোঁছাতে তিন দিনে যে সকল আহার্যবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন তার তালিকা

দিয়েছেন—[১০] "It comes to (my) memory that once in the course of three days about three-quarters of a seer of *khichri* were procured and even that was partaken of by seven persons; and next day three persons subsisted on seven pices of *shakarpdra*, a kind of sweetmeat; and on the third day, several persons lived on half a seer of beef *kabab*. However, on the day of their arrival at Katwa, the hungry people, thinking that sufficient corns of every variety would be available there, betook themselves to that place with the utmost possible haste. But the situation there was that prior to the arrival of the Nawab's men, the Marhatta troops, having entered that village to pillage it, had set fire to the store of corns which it was not possible for them to carry off. In this condition, men and animals, after starving for three days, reached Katwa on the fourthday and used the burnt grams as their food, taking them to be *manna* and *salwa*."

উপায়ান্তর না দেখে ২২শে এপ্রিল নবাব স্থির করলেন যে, পরদিন অতি প্রত্যূষে মারাঠা-ব্যূহ ভেদপূর্বক বর্ধমান শহর ত্যাগ করে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হবেন। শিবিরে অবস্থানরত ভারবাহী, চাকর ও স্ত্রীলোকদের প্রতি নবাবের হুকুম ছিল যে তারা শহরের শিবিরেই অবস্থানরত থাকবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত, কারণ বর্গীদের ভয়ে তারা সৈন্যদলের সঙ্গ ত্যাগ না করায় সৈন্যবাহিনীর গতি ধীর ও পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ঘটে এবং মারাঠারা নবাব বাহিনীকে অতি শীঘ্র বেষ্টন করতে সক্ষম হয়। বৃষ্টিপাতের জন্য নবাবের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং বর্ধমানে প্রত্যাবর্তনের উপায় মারাঠারা বন্ধ করে দেয়। গোলাম মুস্তাফা খানের অধীনস্থ আফগান সৈন্যাধ্যক্ষগণ নবাবের উপর অসন্তুষ্ট থাকায় যুদ্ধে তারা নিশ্চেষ্ট ছিল এবং শিবিরের রসদ ও অন্যান্য সামগ্রী মারাঠের দ্বারা অতি সহজেই লুণ্ঠিত হয়ে যায়। ঐদিন বৈকাল চার ঘটিকার সময় নবাব সৈন্য একেবারে অসহায় হয়ে এক জায়গায় অবস্থান করতে বাধ্য হয়। সিয়র মুতাক্ষরিণের মতে অবস্থানের জায়গাটি ছিল বর্ধমান হতে ৬।৭ ক্রোশ উত্তরে।[১১] কিন্তু সলিমুল্লা ও গঙ্গারামের মতে স্থানটির নাম ছিল 'নিগন সরাই'।

বৃষ্টিপাতের ফলে নবাব সৈন্য খোলা আকাশের নীচে নদীতীরে ও কৃষিক্ষেত্রে অবস্থান করতে বাধ্য হন এবং অনেকে সন্নিকটবর্তী একটি বড়দীঘির পাড়ে রাত্রি-যাপন করে। ২৪শে এপ্রিল প্রাতঃকালে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় বেগম শরফ-উন-নিসা 'লণ্ডা' নামক এক হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধস্থলের মধ্যে ছিলেন। মারাঠারা বেগমকে বন্দী করার কৌশল করায় সৈন্যাধ্যক্ষ উমর খানের পুত্র

মোসাহেব খান অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের দ্বারা বেগমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও তিনি নিহত হন।[১২] গঙ্গারামের বর্ণনায় আছে—

"মোসাহেব খাঁ যদি পইল [মইল] নিকুনেতে।"

কার্যতঃ প্রায় বন্দী অবস্থায় উপনীত হয়ে আলিবর্দী বর্ধমানের রাজার দক্ষিণ দেশীয় বক্সী মীর-খয়ের-উল্লার মাধ্যমে (ইনি রাজার পক্ষে দেওয়ান মানিকচাঁদের সঙ্গে আলিবর্দীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ভাস্কররামের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করায় তিনি এক কোটি মুদ্রা ও নবাবের সমস্ত হস্তীগুলি দাবী করেন।[১৩] এরূপ অবমাননাকর পরিস্থিতি হতে উদ্ধার লাভের আশায় তাঁর প্রধান উপদেষ্টা রাজা জানকীরামের পরামর্শ গ্রহণ করায় জানকীরাম সন্ধির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কামানের ভয়ে দূর হতে একদল মারাঠাসৈন্য নবাব বাহিনীকে বেষ্টন করে রাখে এবং অবশিষ্টেরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে।

মীর-খয়ের-উল্লা সন্ধির জন্য উভয় শিবিরে যাতায়াত করলেও সন্ধি-শর্ত নবাবের মনঃপুত হয় নাই। উপায়ান্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে দেহরক্ষী ছাড়াই দৌহিত্র সিরাজদৌলার হাত ধরে আফগান সেনাপতি মুস্তাফাখানের শিবিরে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে নবাব মুস্তাফার প্রতি পূর্বকৃত অবিচারের জন্য ত্রুটি স্বীকার করে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। নবাব ও তাঁর দৌহিত্রের জীবন ও সম্মান যে সেনাপতির হাতে একথা জানাতেও বিস্মৃত হন নাই। নবাবের আগমনে মুস্তাফার মনে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাঁর আবেগপূর্ণ বাণীতে আফগানেরা নবাবকে রক্ষার জন্য উদ্দীপিত হয়।[১৪] ইতিপূর্বে মুস্তাফাখান লক্ষ্য করেছেন যে, দিবাভাগে দূরে একদল মারাঠা সৈন্য স্নান-আহ্নিক ও আহারের আয়োজনে ব্যাপৃত এবং ক্ষুধার্ত নবাবসৈন্য সবেগে মারাঠাদের আক্রমণ করায় তারা প্রাণের ভয়ে অর্ধপক্ক ভোজ্যাদি ও সংগৃহীত খাদ্যশস্য পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। ঐ সকল আহার্য-দ্রব্য সংগ্রহ করে নবাবসৈন্য নিজেদের আহার সম্পন্ন করে। তিনি সমগ্র ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। মারাঠাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ক্ষুধার্ত সৈন্যবাহিনী ও নবাবের পরিবারবর্গ নিগম সরাই-এ জলা ও ধানক্ষেতের মধ্যে ১ দিন ও ২ রাত্রি অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিল।

মুস্তফাখানের নেতৃত্বে ও কামানের সাহায্যে ক্ষুধার্ত নবাবসৈন্য মারাঠাব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করায় ২৫শে এপ্রিল সকালে নিগম সরাই-এ প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কামান ও হস্তী বাহিনীর দ্বারা নবাব মারাঠাব্যূহ ভেদ করে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেও মারাঠারা বারবার বাধা দিতে থাকে। ঐদিন দুটি যুদ্ধহস্তী সমগ্র বঙ্গীয় সেনাদলকে রক্ষা করে। রণহস্তী দুটির শুঁড়ে ৩০০ পাউণ্ড ওজনের ২০ ফুট দীর্ঘ লোহার শিকল বেঁধে দেওয়া হয় এবং তারা ভীষণভাবে শুঁড় আন্দোলিত করে অগ্রসর হওয়ায় আক্রমণকারী মারাঠাদের অশ্ব ও আরোহীরা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। মারাঠারা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।[১৫] আফগান সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ

করতে করতে ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্নে কাটোয়া পেঁীছিলেও ঐ রাস্তার পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম মারাঠাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হতে রেহাই পায় নাই।[১৬]

নিগম সরাই-এর যুদ্ধে নবাবের অন্যতম সৈন্যধ্যক্ষ মীরহাবিব (ইনি ওড়িশার নায়েব নাজিম রুস্তম জঙ্গের অনুগামী) ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারাঠাদের হস্তে বন্দী হন এবং আলিবর্দীর প্রতি পূর্বদ্বেষবশতঃ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ২৪শে এপ্রিল রাত্রে বর্ধমানের জমিদার রাজা চিত্রসেনের দেওয়ান মানিকচাঁদ (ইনি ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজদৌলার অধীনে কলিকাতার ফৌজদার নিযুক্ত হন) নবাবের অনুগামী হয়েও তাঁর দুরাবস্থার সময়ে সসৈন্যে ঐ স্থান ত্যাগ করে বর্ধমানে পলায়ন করেন।[১৭]

কাটোয়ায় পেঁীছে নবাব অবগত হন যে, ইতিপূর্বেই মারাঠারা কাটোয়ার শস্য-ভাণ্ডারে অগ্নিসংযোগ করে সেটি ধ্বংস করেছে। ক্ষুধার্ত নবাবসৈন্য ঐ পোড়া-চাল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আলিবর্দী কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য মুর্শিদাবাদে হাজী আহম্মদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং ভাস্কররামও বর্ষা আগত দেখে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করেন। কিন্তু পরলোকগত নবাব সরফরাজের হত্যার প্রতিশোধের মানসে মীরহাবিব ভাস্করের পক্ষে যোগদান করে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের জন্য তাঁকে প্ররোচিত ও বাধ্য করেন। ৬ই মে গোপনে রাতের অন্ধকারে সাতশ' বাছাই অশ্বারোহী সৈন্যসহ অজয়নদ অতিক্রম করে দ্রুত ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হয়ে ঐ স্থানের 'গঞ্জ মহম্মদ খান' নামক বাজারটি লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। অতঃপর হাজীগঞ্জের ঘাটে (মহিমা-পুরের সন্নিকটে) গঙ্গা অতিক্রম করে বিদ্যুৎবেগে মহিমাপুরে জগৎশেঠের গদি হতে দু'কোটি আর্কট মুদ্রা ও প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করে মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে মীরহাবিব নদীর পশ্চিমতীরে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৮] কাটোয়া শিবিরে বসেই মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনের সংবাদ পেয়ে আলিবর্দী ৭ই মে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন এবং ভাস্কররাম ও মীরহাবিব ঐ স্থান ত্যাগ করে বর্ধমান জেলার কাটোয়া ও কেতুগ্রাম থানাসহ বীরভুম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ-পর্ব সমাধা করে বর্ষার পূর্বে কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করেন।

প্রকৃতপক্ষে মারাঠাদের মূলশিবির কাটোয়ায় ছিল না বা প্রতিরক্ষার দিক হতে বিচার করলে ঐ স্থানে শিবির স্থাপন করা নিরাপদও নয়। ভাস্কররাম দেওয়ানগঞ্জে (বর্তমান দাঁইহাট) শিবির স্থাপন করেন এবং এখানে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের প্রাসাদতুল্য রাজবাড়ী অধিকার করে তথায় অবস্থান করেন। ঐ গৃহের ধ্বংসপ্রায় এক বিশাল প্রাচীরের অস্তিত্ব এখনও দেখা যায় এবং স্থানীয় লোকে ভাস্কররামের দশেরা-পূজার স্থান হিসাবে রাজবাড়ীর ঘাটটিকে নির্দেশ করে থাকেন। কাটোয়া হতে দাঁইহাট পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার বিস্তৃত জায়গায় মারাঠারা শিবির স্থাপন করেছিল

এবং অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীগণ দলে দলে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিকিহাট-সহ (সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ বাজার) ইন্দ্রানী পরগণার বিখ্যাত বাজারগুলি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় দু'শ বছর ধরে কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি জনবসতি-শূন্য হয়ে পড়ে। মারাঠাদের দাঁইহাটে প্রধান শিবির স্থাপনের অপর একটি অন্যতম কারণ, নদী পারাপারের জন্য ভাগীরথীর উপর মাটির সেতুটি দাঁইহাটের ঘাটের পাশে নির্মিত হয়েছিল। মূলশিবির দাঁইহাটে স্থাপিত হওয়ায় এখানেই দশেরা উৎসব পালিত হয়েছিল। কাটোয়ায় মূল শিবিরের অবস্থান হলে ১১৪৯ সালে আশ্বিন মাসে দশেরা উৎসবের সময় মারাঠারা সহজেই হাজার হাজার নবাবসৈন্যের আগমনের সংবাদ পেত।

(৩)

মারাঠারা প্রথম অভিযানে বিশেষ সফল হতে পারে নাই। রণক্লান্ত ভাস্কর নাগপুরে ফিরে যেতে মনস্থ করায় মীরহাবিব বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের জন্য মারাঠাদের উৎসাহিত করে। ফলতঃ এই ঘরের-শত্রু বিভীষণ না থাকলে বর্গী-হাঙ্গামা এত ভীষণ থাকার ধারণ করত না এবং আলিবর্দী সহজেই স্থায়ীভাবে মারাঠাদের বাৎসরিক আক্রমণ বন্ধ করতে সক্ষম হতেন। একমাত্র মীরহাবিবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, অক্লান্ত শ্রমশক্তি এবং নবাবের প্রতি অজেয় প্রতিহিংসা ও শত্রুতাই মারাঠাদের বাংলা অভিযানকে এত সফল ও দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। মীরহাবিব পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য ব্যবসায়ী হতে বাকচাটুতা ও কর্মকুশলতার গুণে সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গের অধীনে ওড়িশার নায়েবের পদ গ্রহণ করেন। রুস্তম জঙ্গের পরাজয় ও পলায়নের পর তিনি আলিবর্দীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেও, তাঁর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকেন। তাই মারাঠাদের হাতে বন্দী হওয়ায় মীরহাবিব পূর্ণ ইচ্ছা ও উৎসাহে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; এমন কি বঙ্গদেশে তিনি মারাঠাদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও কার্যকারণ-রূপে ছিলেন।[১৯]

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভাস্কর বীরভুমের পথে স্বদেশে ফিরে যেতে মনস্থ করায় মীরহাবিব তাকে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে জুন মাসে কাটোয়ায় ফিরিয়ে আনেন। মীরহাবিবের পরামর্শে ভাস্কর নূতন নূতন অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ করে জুলাই মাসে হুগলীতে উপস্থিত হয়ে কূট-কৌশলের দ্বারা হুগলীর অপদার্থ ও মদ্যপ ফৌজদার মহম্মদ রেজা খানকে বন্দী করেন। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর প্রায় সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে শয়তানের অভিশাপ নেমে এসেছিল এবং বর্ধমান, বীরভুম, হুগলী ও মেদিনীপুরের আপামর জনসাধারণ বর্গীর নামে এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে, এ ঘটনার বহুকাল পরেও এই অত্যাচারের কথা তাদের স্মরণে ছিল। দলে দলে লোক ভাগীরথীর পূর্বপারে পলায়ন করেন।

শিবাজীর উত্তরসূরীদের হস্তে স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ দলবদ্ধ অত্যাচার মুসলমান সুলতানগণের আমলেও সংঘটিত হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুলে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥" (মহারাষ্ট্র পুরাণ)

সলিমুল্লার বিবরণেও একই চিত্র পাওয়া যায়—"All rich and respectable people abandoned their homes and migrated to the eastern side of the Ganges in order to save the honour of their women."[২০]

গঙ্গারাম, সলিমুল্লা ও ইউসুফ আলির ন্যায় অপর একজন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ব্যক্তি বর্গীদের নৃশংস অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এই সময়ে বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায়ের সভাকবি ছিলেন। বাণেশ্বর অন্যান্যদের ন্যায় নিজে ঐ সকল অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তাঁর 'চিত্রচম্পূ' কাব্যে বর্ণিত করেছেন। বাণেশ্বরের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"যান্ত্যেকেন দিনেন যোজনশতং হীনাস্ত্রদীনান্ স্ত্রিয়ো
বালান্ ঘ্নন্তি হরন্তি বিত্তমখিলং সাধ্বীশ্চ সীমন্তিনঃ।
সংগ্রামে সমুপস্থিতে সুনিভৃতং দেশান্তরে সুদ্রুতং
ধাবন্ত্যদ্ভুতবেগবাজিনিবহো যেষাং প্রধানং বলম্ ॥ ৩৪॥" (চিত্রচম্পূ)

অনু ঃ অদ্ভুত বেগসম্পন্ন অশ্বদল যাদের প্রধান বল, সেই সৈন্যেরা সংগ্রামে উপস্থিত হয়ে দেশান্তরে নিভৃতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তারা একদিনে শতযোজন পথ অতিক্রম করে; অস্ত্রহীন দীনদরিদ্র, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে; সকল সম্পদ, সাধ্বী স্ত্রীলোক ও গর্ভবতী নারীকেও অপহরণ করে।

(৪)

বর্গীদের আক্রমণ ও অত্যাচারের ফলে যে সকল গ্রাম ছারখার হয়েছিল প্রত্যক্ষদ্রষ্টা কবি গঙ্গারাম দত্তের বিবরণে সেগুলির পরিচয় জানা যায়—

'বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥'
* * * *
'তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া॥

চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর আর দিগনপুর ।
খিরপাই পোড়ায় আর বৰ্দ্ধমান শহর ॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমাইল ।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইল ॥
এই মতে বৰ্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে ।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥
সেরখাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল ।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল ॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর ।
কাথরা সরাই ডামধে যদুপুর ॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দাড়া ।
কুড়বন পলাসি আর বর্চাচ বেড়্ড়া ॥
সমুদ্ধরগড় জান্নগর আর, নদিয়া ।
মাহাতাপুর সুনণ্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া ॥
পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া ।
সরভাঙ্গা খিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া ॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞে ।
কুমরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞে ॥
কড়ই বৈথন (কৈথন) পোড়াএ আর চাড়াইল ।
সিঙ্গি বাক্সা ঘোড়ানাস মস্তইল ॥
গোঢপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াগদিয়া ।
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া ॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর দাঞিহাট ।
বেড়া—ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকিহাট ॥
এইরূপে ইন্দ্রাইন পরগণা বরগি লুটি ।
কাগা মোগাএ লুটে ওলন্দেজের কুটি
এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইঞে ।
রাতারাতি পহছিলা জাউমাকান্দি গিয়া ॥
তবে বিরভুই পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া ।
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা ॥
গোয়ালাভুঞি সেনভুঞি সব পোড়াইলা ।
চতুদিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা ॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষাকরে ।
য়সাদ্য বরগির তবে কি করিতে পারে ॥

সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উদ্ধানপুর কাটোয়া ডাইনে থুইয়া।
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল।
মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগী রাঙ্গমাইটা দিয়া।।
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিঘুগতি আসিয়া পহুচিলা দাহাপাড়া ॥'

উপরোক্ত বিবরণে বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত প্রধান গ্রামগুলির নাম পাওয়া যায়। 'চিত্রচম্পু'তে নরনারীগণের স্থান ত্যাগের সময় যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয় তার বিবরণ দেওয়া আছে। সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদসহ ভাগীরথীর পূর্বপারে মুলাজোরের সন্নিকটে কাউগাছিতে পলায়ন করেন। এ বিষয়ে বাণেশ্বরের বর্ণনায় আছে—

"এইভাবে মহারাজাধিরাজ (চিত্রসেন) প্রজাবৃন্দকে অনুরঞ্জিত করে অতিশয় আনন্দে বিরাজিত থাকাকালীন ১৬৬৬ শকাব্দে ভগবান সূর্য প্রথম রাশিমধ্যে সঞ্চারণশীল হলে অকালে মহাপ্রলয়কালীন মেঘসমূহের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে প্রবর্তিত ঝড়ঝঞ্ঝাদি সঞ্চারিত করে মধ্যদিনের সূর্য ও জ্যোৎস্নাকালীন চন্দ্রকেও এইরূপ অন্ধকারে রেখে, তমোময়ের ন্যায়, তমালতরুসমূহের ন্যায়, রজোময়ের ন্যায়, নিশাচরে সৈন্যচক্রসমূহের ন্যায়; কলিকালে বর্ণিত কঠোর পাপসমূহের ন্যায় মহারাষ্ট্রাধিপতি সাহুরাজ্যের স্বভাবচণ্ড সৈন্যসমূহ অকস্মাৎ যেন আংশিক প্রলয়বিধান করার মানসে গৌড়জনপদের জনগণকে উন্মূলিত করার জন্য মহাধূমকেতুর ন্যায় উপস্থিত হল। এই সৈন্যসমূহ কৃপাবিতরণে অতীব কৃপন, হাতে তাদের কৃপান। গর্ভবতী নারী, শিশু, দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণপুত্র এবং দীনদরিদ্রকে বিদারণ করতে তারা কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকলের সর্বস্ব অপহরণ, যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং সর্বপ্রকার প্রতিষিদ্ধ আচরণে তারা অতীব নিপুণ। এই প্রবল সৈন্যসমূহের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, ভেরীরব, ঘণ্টার টঙ্কার, খড়েগর ঝঙ্কার, বীরহুঙ্কার, সিংহনাদ তথা ভুরি ভুরি ভৈরব রবসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডল একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ॥ ১২ ॥

যাদের স্বরূপ এবং চরিত্র পূর্বেই বিশ্রুত হয়েছে এইরূপ নিসর্গদুর্গম বর্গিবর্গের সৈন্যসাগর সমুপস্থিত হতে দেখে স্বভাবতই ভীরু এবং কোমল স্বভাব গৌড়জনপদের প্রজাবৃন্দের মধ্যে অতীব কোলাহল সঞ্চারিত হল—'আমরা কী করি, কোথায় যাই, কোথায় থাকি, কী উপায়ে, কে আমাদের সহায় হবে? হে ভগবান, কি এই অতি নিষ্ঠুর ঘটনা সংঘটিত হল!' এই কোলাহল অকস্মাৎ প্রচণ্ড বজ্রাবিঘাতে খণ্ডিত শৈলমণ্ডলে জাত প্রচণ্ড শব্দের ন্যায় কিংবা মন্দর পর্বতের উদ্দাম মন্থনে আন্দোলিত

সমুদ্রের উত্তাল জলকল্লোলজনিত শব্দের ন্যায়। এই কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত, ধরণীর অন্দর-কন্দরে সঞ্চারিত ; এই কোলাহলের জন্য অপরাপর শব্দশ্রবণের অবসর দূরীভূত হয়েছে ॥ ১৩ ॥

তারপর তারা (গৌড়বাসী) শকটে, শিবিকায় হস্তীতে, অশ্বে, নৌকায় এবং পদব্রজে দিকে দিকে পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এর মধ্যে ধনশালীরা ধনজনের ভারে মন্থর গতিতে অতিবিস্তৃতভাবে সঞ্চরণ করছে। কেহ বা নিজেদের সারবস্তু, বস্ত্রাদি এবং অলঙ্কারাদি নিয়ে পলায়ন করছে। কারো ক্রোড়ে দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট চঞ্চল বালক সমাশ্রিত। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের গলদেশে শালগ্রামশিলা আশ্রিত। দুর্বহ এবং অতিশয় ভারী বিবিধ শাস্ত্রপুস্তকসমূহের বিনাশের আশঙ্কায় তাঁদের চিত্ত সন্তাপ-জর্জরিত। কোন কোন রমণী দুর্বহ গর্ভভারে মন্থরগতি। কেহবা নিতম্বদেশ এবং কুচকলসযুগলের (স্তনদ্বয়) ভারে অলসগমনা। কখনোবা তাঁরা পঙ্কসংকটের সম্মুখীন, কখনোবা কুশকণ্টকাদি দ্বারা কণ্টকিত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিতা। গ্রীষ্মকালে জাজ্বল্যমান মধ্যস্থ সূর্যের তীব্র তাপসমূহের প্রতাপ তারা সহ্য করতে পারছে না। সময়মত পানাহার না পাওয়ার জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল শিশুদের আর্ত চিৎকারে তাদের হৃদয় অতিশয় কাতর ও ব্যাকুল। অতিশয় করুণ আর্তনাদ, অসহ্য বেদনা এবং রোদনহেতু ব্যাকুল রমণীরা সমস্ত পৃথিবীকে বর্গীময় বলে অনুভব করছে। তাদের বিবিধ আর্তনাদে এবং পরস্পর বলাবলিতে ভূমণ্ডল ক্ষুভিত বলে প্রতিভাত হল ॥ ১৪ ॥

এই অবসরেই বিশাল সৈন্যদল দ্বারা বর্ধমান নগর রক্ষার ভার সচিবগণের উপর ন্যস্ত করে মহারাজ (চিত্রসেন) সমস্ত দিঙমণ্ডলব্যাপী, মহাবিক্রমশালী, বিপুল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ভূমিবলয়কে আচ্ছাদিত করে অনন্যপরায়ণ, শরণাগত, করুণাস্পদ, দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণবহুল প্রজাবৃন্দের মন হতে ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে অভিনব এবং নিজ অধিকারস্থিত দক্ষিণপ্রয়াগ এবং গঙ্গাসাগর এই তীর্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী, জগতের সৌন্দর্যবর্ধক "বিশাল" নামক বিশাল নগরীতে উপস্থিত হন ॥ ১৫ ॥"

(৫)

মীরহাবিব হুগলী হতে স্লুপ আনিয়ে দাঁইহাটে ভাগীরথী পারাপারের ব্যবস্থা করেন এবং এই উপায়ে মারাঠারা ভাগীরথীর পূর্বপারে পলাশী ও দাউদপুর পর্যন্ত পেঁাছে গৃহদাহ ও লুটতরাজ করেছিল। নবাব সসৈন্যে তারকপুর আসায় মারাঠারা কাটোয়ায় পলায়ন করে। ভাস্কররাম আরও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণের জন্য নাগপুরে রঘুজী ভোঁসলের নিকট দূত প্রেরণ করলেও কোন সাহায্য এসে পেঁাছায় নাই। বর্ষার মধ্যেই নবাব পাটনা ও পূর্ণিয়া হতে ফৌজ এবং জাহাঙ্গীরনগর হতে প্রচুর বড় ও মাঝারি নৌকা আনয়ন করেন। মীরহাবিব কর্তৃক হুগলী হতে আনীত স্লুপটি কাটোয়ায় নদীর উপর ভাসমান থাকায় ঐ স্থানে নদী পার হওয়া অসম্ভব ভেবে প্রথমে

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ হতে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন এবং কাটোয়ার সম্মুখে (নদীর পূর্বপারে) রহনপুরে মুর্চা বেঁধে কাটোয়ার শত্রু শিবিরের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করায় তারা এইস্থান হতে দাঁইহাটের দিকে সরে যায়। বর্ষায় দু'কূল প্লাবিত নদীকে প্রতিরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় ভেবে ভাস্কর নিশ্চিন্তে দাঁইহাটে দশেরা উৎসবে (দুর্গাপূজায়) মত্ত হন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণের নিকট জোর-জবরদস্তি পূর্বক অর্থ আদায় করে মহাসমারোহে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে নবাব মোস্তাফা খান, শামসের খান, উমর খান, রহিম খান, জৈনুদ্দিন ও জাফর খানের অধীনে বাছাই করা সৈন্যবাহিনীসহ স্বয়ং উদ্ধারণপুরের বিপরীত তীরে উপস্থিত হন। নৌকা দ্বারা নির্মিত সেতুর সাহায্যে ভাগীরথী অতিক্রম করে পুনরায় রাতের অন্ধকারে শাঁকাই-এ অজয় পার হয়েছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর অষ্টমী তিথির অন্তে ভোর রাত্রে উৎসবে মত্ত মারাঠা সৈন্যদের উপর নবাব সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাটোয়া ও দাঁইহাটের মারাঠা শিবির আক্রমণ করায় ভীত-বিহ্বল মারাঠারা শিবির ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ফেলে রেখে বর্ধমান জেলা পরিত্যাগ-পূর্বক পঞ্চকোটের পথে পলায়ন করে। নবাবও সসৈন্যে তাদের পশ্চাৎধাবন করেন। ভাস্কর পুনরায় পঞ্চকোট হতে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় চলে যান।[২১] নবাবী সৈন্য পিছনে থাকায় মারাঠারা বিষ্ণুপুর লুণ্ঠন করতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে—

"তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
য়সাদ্য বরগির তবে কি করতে পারে॥"

বিষ্ণুপুরে প্রবাদ আছে যে, মারাঠারা রাত্রে শহর আক্রমণ করায় অসহায় বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহ ও নগরবাসীগণকে রক্ষা করার জন্য নগরদেবতা স্বয়ং মদনমোহন 'দলমাদল' নামক সুবৃহৎ কামানের সাহায্যে শত্রুদের বিধ্বস্ত করেন। প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, বিষ্ণুপুর শহর গড় ও প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত থাকায় রাত্রে মারাঠারা নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই এবং পরদিন সসৈন্যে আলিবর্দীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তারা বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ পূর্বক মেদিনীপুরে পলায়ন করে। পথে রাধানগর ও নারায়ণগড় লুণ্ঠন করে ওড়িশার দিকে মারাঠারা ধাবিত হলে নবাব স্বয়ং তাদের আক্রমণ করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে নবাব মারাঠাদের চিল্কা হ্রদের তীর পর্যন্ত বিতাড়িত করে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৬)

আলিবর্দীর আবেদনে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ পেশোয়া বালাজী রাওকে নাগপুরের মারাঠাদের হাত হতে সুবাবাংলাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করায় বালাজী রাও তাঁর চির শত্রু রঘুজী ভোঁসলেকে দমনের নিমিত্ত এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিহারে উপস্থিত হন। অপরপক্ষে রাজা শাহু প্রচুর অর্থের

বিনিময়ে রঘুজীকে বাংলা ও ওড়িশার চৌথ আদায়ের ভার অর্পণ করায় তিনি ও ভাস্কররাম বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমান জেলা অধিকারপূর্বক কাটোয়ায় এসে উপস্থিত হন। বালাজী বিহার অতিক্রম করে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে রাজধানীর নিকটস্থ হলে নবাব বহরমপুর হতে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে লাউদা নামক স্থানে পেশোয়ার সঙ্গে মিলিত হন। প্রথমে নবাবের পক্ষ হতে চারটি হস্তী, দু'টি মহিষ ও পাঁচটি অশ্ব উপহার দেওয়া হয়। ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ নবাব ও পেশোয়ার মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। নবাব রাজা শাহুকে বাৎসরিক চৌথ এবং পেশোয়ার সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য ২২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। সম্মিলিত বাহিনী কাটোয়ার পথে অগ্রসর হলে রঘুজী কাটোয়া ও বর্ধমানের শিবির পরিত্যাগ করে বীরভূমে পলায়ন করেন। ১০ই এপ্রিল পেশোয়া রঘুজীর সৈন্য-বাহিনাকে প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত করায় তিনি নাগপুরে পলায়ন করেন এবং নবাব দিগনগর হতে ২৪শে এপ্রিল কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। দু'দল মারাঠা-সৈন্যের অত্যাচারে বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার জনজীবন অতিষ্ঠ ও বিধ্বস্ত হয়।[২২] ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস হতে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত বর্গীদের কোন উপদ্রব হয় নাই।

(৭)

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট রাজা শাহু পেশোয়া ও রঘুজীর মধ্যে এরূপ মীমাংসা করে দেন যে, বিহার রাজ্যের চৌথের অধিকার বালাজীর এবং বাংলা ও ওড়িশার চৌথ রঘুজীর প্রাপ্য। উক্ত বণ্টনের দ্বারা তাঁরা স্ব স্ব অধিকৃত স্থানের উপর নির্বিচারে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করার অধিকারও প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২৩] শিবাজীর উত্তরসূরীদের রাজ্যশাসন ও কর আদায়ের এরূপ অমানবিক ব্যবস্থার ফলে সুবাবাংলা ছাড়খার হয়ে যায়। রাজা শাহুর ছাড়পত্র পেয়ে পূর্ব বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ভাস্কররাম ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন দিয়েও নবাব পেশোয়ার নিকট হতে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পান নাই, উপরন্তু দু'টি রক্তপিপাসু মারাঠা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।[২৪] একে রাজকোষ শূন্য; অন্যদিকে নবাব গুরুতর-রূপে পীড়িত হওয়ায় মারাঠাদের হাতে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের জনগণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হল। তারা শিশু, স্ত্রীলোক, গর্ভবতী নারী, ব্রাহ্মণ, বণিক, কৃষক ও দরিদ্রদের তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে কুণ্ঠিত ছিল না এবং সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণে নিপুণ; তারা বাংলার জনপদের সমস্ত ধন ও সাধ্বী স্ত্রীলোকদের হরণ করে। অসহ্য গরমের মধ্যেও ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হলেও দলে দলে লোক বর্ধমান ও মেদিনীপুর পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করতে শুরু করে। রণক্লান্ত সৈন্যদলও প্রখর গ্রীষ্মে যুদ্ধযাত্রায় অনিচ্ছুক ছিল। নবাব তাঁর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফাখানের সঙ্গে

পরামর্শ করে স্থির করেন যে, মারাঠা সর্দারগণকে গুপ্তহত্যা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। হলওয়েলের মতে বর্গীদের দমনের জন্য নবাব বেগম শরফ-উন-নিসার পরামর্শ গ্রহণ করে ভাস্করকে নিরস্ত করার জন্য এরূপ চক্রান্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।[২৫]

উপরোক্ত পরামর্শের পর নবাবের পক্ষে মুস্তাফাখান ও রাজা জানকীরাম, মারাঠা শিবিরের আলি ভাই করাওওল্ নামে এক দক্ষিণ দেশীয় মুসলমান মারাঠা সেনাপতির মধ্যস্থতা প্রার্থনা করেন। আলিভাই নবাবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভাস্করকে সন্ধির জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু মীরহাবিব এই সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। সন্ধির প্রাথমিক শর্তগুলি আলোচনার জন্য আলিভাই আমানিগঞ্জে এসে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্তুষ্টচিত্তে দিগনগরে (থানা আউসগ্রাম) মারাঠা শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর নবাবের প্রতিনিধিস্বরূপ মুস্তাফাখান ও রাজা জানকীরাম প্রচুর উপঢৌকনসহ দিগনগরে ভাস্করের নিকট উপস্থিত হন।[২৬] ভাস্কর তাঁদের নিকট নিরাপত্তার আশ্বাসবাণী চাওয়ায় সেনাপতি ও দেওয়ান উভয়ে মারাঠা শিবিরে গিয়ে কোরাণ, গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা ছুঁয়ে শপথ করেন যে, সাক্ষাতের সময় মারাঠাদের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না। (সলিমুল্লার বিবরণে আছে যে, মুস্তাফাখাঁ কোরাণ-এর বদলে কাপড়ে জড়ান একটা ইঁটের উপর হাত রাখেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে এ কাহিনীটা অন্য এক ঘটনা হতে সংগ্রহ করে অত্রস্থানে আরোপ করা হয়েছে।)[২৭] বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট হতে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে গঙ্গার পূর্বতীরে 'মানকরা' (থানা বহরমপুর, জে. এল. নং ৬৩) নামক স্থানে নবাব ও ভাস্করের সাক্ষাতস্থল নির্বাচিত হয়েছিল। নবাব আমানিগঞ্জ হতে মানকরায় উপস্থিত হন এবং ভাস্কর দিগনগর হতে কাটোয়ায় প্রধান শিবির স্থাপন করে তথায় গঙ্গা পার হয়ে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। নবাব প্রকাশ্যে যুদ্ধের সব উদ্যোগ ও সতর্কতা ত্যাগ করে মারাঠা সর্দারদের উপহার দেওয়ার জন্য হাতী, ঘোড়া, বহুমূল্য রত্নদ্রব্য ও খেলাৎ একত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এভাবে ভাস্করের সকল সন্দেহ দূর হওয়ায় মীরহাবিব ও রঘুজী গাইকোয়াড়ের নিষেধকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই।

ভাস্কররাম ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ, (১লা বৈশাখ, ১১৫০ সাল) পলাশীতে শিবির স্থাপন করেন। পরদিন ২রা বৈশাখ শনিবার বাইশজন সেনাপতি ও ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ মানকরার সন্নিকটে অবস্থান করেন। ভাস্কররাম কোলহাতকর, যশোবন্ত রাও গুজর, নীলকণ্ঠ রাও মোহিতে, দাজিবা ভোঁসলে, বাবুজী মহাডীক, মানাজী ভোঁসলে, নারায়ণ ভোঁসলে, সম্ভাজী ভোঁসলে, কৃষ্ণরাও নিম্বালকর, বাপুজী কদম, শ্রীপৎ রাও মেহেকর, ব্যঙ্কট রাও ভাউ, দাজিবা পাঠনকর, বলবন্ত রাও শিকে, গোবিন্দ রাও শেলুকর, সধবাজী যাদব, শিবাজী জমাদার, সুভানজী রাও, নানা বপশি, জোতিবা কারভারী, আলিভাই করাওওল, সর্দার শাহ আহমদ খাঁ প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দের[২৮] মধ্যে ক্রমে ক্রমে কুড়িজন শিবিরে প্রবেশ করলেও রঘুজী গাই-

কোয়াড় ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। সর্বশেষে ডান হাতে মোস্তাফাখান ও বাম হাতে রাজা জানকিরামকে ধরে ভাস্কররাম শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আলিবর্দীর আদেশে সমস্ত মারাঠা সেনাপতিদের শিবিরের মধ্যে হত্যা করা হয় এবং মুতাক্ষরিণে বর্ণিত আছে[২৯]—"Mir-Cezen-qhan, being the foremost of all, closed with Bha-sukar, and at one storke felled him to the ground." সেনাপতিদের হত্যার পর নবাবসৈন্যের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া মাত্রই রঘুজী গাইকোয়াড় দশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্যসহ দ্রুতবেগে পলাশী ও কাটোয়ায় মারাঠা শিবিরে পেঁছে নিজের ও ভাস্করের সকল সম্পত্তিসহ নাগপুরে পলায়ন করেন। এই সংবাদে বর্ধমান, বীরভুম ও মেদিনীপুরে অবস্থানরত মারাঠাগণ প্রাণের ভয়ে অতি কষ্টে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। নবাবসৈন্যের হাতে প্রচুর মারাঠাসৈন্য মারা যায়। বিজয়ী আলিবর্দী নিজ সৈন্যদলের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন এবং নবাবের অনুরোধে বাদশাহ মুস্তাফাখানকে 'বাবর জঙ্গ' উপাধিতে ভুষিত করেন।[৩০] মজফ্ফরনামায় পাওয়া যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হাজি আহম্মদ, নবাবকে এহেন গর্হিত কার্যের জন্য তিরস্কার করেছিলেন—"You have to day created enemies for yourself till Doomsday."[৩১]

ভাস্কর নিহত হওয়ার পর প্রায় পনের মাস নিরুপদ্রবে কাটে। যুদ্ধ ও দুশ্চিন্তা থেকে অবকাশ পেলেও নবাব ভীষণ অর্থ-কষ্টে পড়েন। গঙ্গার পশ্চিমে অধিকাংশ গ্রাম দাহ ও লুণ্ঠনের ফলে অধিবাসীগণ স্থান ত্যাগ করে; কৃষিকার্য ও শিল্প-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় রাজকোষে অর্থের অভাব দেখা দেয়। অর্থাভাবের জন্য সৈন্য-দলের বেতন দেওয়া বন্ধ হয়। ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকদের অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলার জমিদারগণও নবাবের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই।

১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে এক নূতন বিপদ দেখা দেয়। ভাস্কর হত্যার পুরস্কারস্বরূপ মুস্তাফাখান বিহারের উপ-শাসনকর্তার পদ প্রার্থনা করায় আলিবর্দীর সঙ্গে আফগান সর্দারগণের বিবাদ শুরু হয়। মুস্তাফাখান রঘুজী ভোঁসলেকে সুবা-বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান করে নিজে বিহারে পলায়ন করেন। নবাব মুস্তাফাকে দমনের নিমিত্ত বিহার যাত্রার সুযোগে রঘুজী ওড়িশা অধিকার করে। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে রঘুজী বর্ধমান অধিকারপূর্বক আদায়ী রাজস্বের সাত লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন।[৩২] বিহার হতে আলিবর্দীর মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন ও মুস্তাফা-খানের নিধনের সংবাদ পেয়ে নিরুপদ্রবে বর্ষাকাল কাটাবার জন্য মারাঠারা ২০শে জুলাই বর্ধমান ত্যাগ করে বীরভুম যাত্রা করে। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে মারাঠারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করায় নবাবের প্রবল বাধাদানের ফলে তারা কাটোয়ায় পলায়ন করে। নবাব কাটোয়া আক্রমণ করায় শহরের পশ্চিমপ্রান্তে রানিদিঘির পারে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে রঘুজী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বর্ধমান জেলায় পশ্চিম

অঞ্চল দিয়ে নাগপুরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নবাব মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মীরহাবিব পুনরায় কাটোয়া অধিকার করলেও পর বৎসর এপ্রিল মাসে নবাব মরাঠাদের কাটোয়া হতে বিতাড়িত করেন।[৩৩]

১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মধ্যস্থতায় রাজা শাহুকে ৩৫ লক্ষ (বাংলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ও বিহারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা) টাকা চৌথ প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে আলিবর্দী এই সন্ধি চুক্তির সময় প্রতিবাদ করেন যে, রাজা শাহু ও পেশোয়া তাঁর অধঃস্তন কর্মচারী রঘুজী ভোঁসলেকে সংযত করতে ব্যর্থ; অতএব বাৎসরিক এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দেওয়া নিরর্থক।[৩৪] মুস্তাফাখানের পর নবাবের আত্মীয় মীরজাফর খানকে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করে মীরহাবিবকে দমন করার জন্য ওড়িশা প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরহাবিব ও রঘুজীর পুত্র জানোজীর যৌথ আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পেরে মীরজাফর মেদিনীপুর হতে পলায়ন করে বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্চ মাসে নবাব সসৈন্যে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে শহরের সন্নিকটে মারাঠাদের প্রবলভাবে বাধা দানের ফলে তারা বিধ্বস্ত হয়ে ওড়িশায় পলায়ন করে এবং সাময়িকভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভুম মারাঠা দস্যুদের হাত হতে নিষ্কৃতি পায়।[৩৫] মজফ্ফরনামায় বর্ণিত আছে যে, বর্ধমানে অবস্থানরত সময়ে মীরজাফর, আতাউল্লা খান ও ফকির-উল্লা বেগ নবাব আলিবর্দীকে পদচ্যুত ও বিতাড়নের চক্রান্ত করে। নুরউল্লা বেগ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ এই চক্রান্তের কথা প্রকাশ করায় নবাব মারাঠাবাহিনীকে বর্ধমান হতে উৎখাত করে তাঁর আত্মীয় মীরজাফর খান বাদে অন্যান্য সৈন্যাধক্ষগণকে বাংলা হতে বিতাড়িত করেন।[৩৬] এরপর মীরজাফর খানকে বর্ধমানেই পদচ্যুত করেন।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মারাঠারা পুনরায় বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে বর্ধমান, বীরভুম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করে। এদিকে পাটনা হতে সংবাদ আসে যে, পাঠানসৈন্যরা আলিবর্দীর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনুদ্দিন আহমদ (সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পিতা) ও নবাবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদকে হত্যা করেছে। জানোজী এই সময়ে কাটোয়ার শিবিরে অবস্থানরত ছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠী হতে সৈন্য পাহারায় নৌকাযোগে মালপত্র কলিকাতায় আনয়নের জন্য এন্সাইন ইংলিশ নামক এক সেনানীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নবাবের বাছাই করা সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফতেআলি খান কাটোয়ার মারাঠা শিবির আক্রমণের জন্য ইংরাজদের সঙ্গে চুক্তি করেন। কিন্তু এন্সাইন ফতেআলির জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে যান এবং কাটোয়ায় মারাঠাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নৌকাগুলি নদীর পশ্চিমতীরে নোঙ্গর করা মাত্র, মারাঠারা ৪·৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র লুণ্ঠন করে। এরূপ নির্বুদ্ধিতার জন্য কলিকাতার কাউন্সিল এনসাইনকে বন্দীর পর প্রকাশ্যে অপমান করে বরখাস্ত করেন।[৩৭]

ফতেআলি খানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠারা কাটোয়া ছেড়ে চলে গেলেও

তাদের প্রধান দলটি বর্ধমান জেলার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে লুণ্ঠন করতে থাকে। জানোজী বীরভূমের মধ্য দিয়ে ভাগলপুর যাত্রা করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিহারের পাঠানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পেশোয়া বালাজী রাও-এর সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদান করা। এ উদ্দেশ্যে জানোজী উমিচাঁদকে একটি গোপনপত্র প্রেরণ করেন।[৩৮] নবাব জৈনুদ্দিনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাটনায় পেঁছে সেখানে আফগানদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায় মারাঠারা ভীত হয়ে নাগপুরে পলায়ন করে। কিন্তু পুনরায় তিনি ওড়িশার মারাঠাদের দমনের জন্য ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে স্বয়ং কাটোয়ায় উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে প্রায় আট হাজার সৈন্য ও কামান পাঠিয়ে বর্ধমান শহরের অগ্রবর্তী ঘাঁটি সুদৃঢ় করেছিলেন। নবাবের আগমনের সংবাদ পেয়ে মীরহাবিব শিবিরে আগুন দিয়ে পলায়ন করেন এবং নবাব মারাঠাদের পশ্চাৎধাবন করে কটকে উপস্থিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে মারাঠারা পুনরায় বালেশ্বর অধিকার করায় ৭৫ বছরের বৃদ্ধ নবাব মেদিনীপুরে সসৈন্যে অবস্থানরত হয়ে সিরাজদৌলাকে বালেশ্বর অভিযানে প্রেরণ করায় মারাঠারা জঙ্গল পথে বিহার হয়ে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা করে। নবাব মেদিনীপুর হতে বর্ধমানে প্রত্যাবর্তনের সময় বর্ধমান-রাজার দেওয়ান মানিকচাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আলিবর্দীর প্রাণাধিক দৌহিত্র সিরাজদৌলা পাটনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করায় নবাব স্বয়ং পাটনা উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্ববশে নিয়ে আসেন। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে তিনি অসুস্থ হওয়ায় মারাঠাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তারা মেদিনীপুর অধিকার করে। বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি মীরহাবিবকে পরাস্ত করে কাটোয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু বৃদ্ধ নবাব উপলব্ধি করেন যে, রঘুজীকে চৌথ দিতে স্বীকৃত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এখান হতেই তিনি নাগপুরে দূত পাঠিয়ে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। বহু বাদানুবাদের পর সন্ধির শর্ত স্থির হয়, যথা—[৩৯]

১। মীরহাবিব নবাবের অধীনস্থ হয়ে ওড়িশার নায়েব-নাজিমরূপে ঐ প্রদেশ শাসন করবে এবং উক্ত অঞ্চলের রাজস্ব রঘুজীর সৈন্যবাহিনীর জন্য তনখা স্বরূপ নাগপুরে প্রেরিত হবে।

২। প্রতি বৎসর বার লক্ষ টাকা চৌথের বিনিময়ে মারাঠারা ভবিষ্যতে বাংলার সীমানা অতিক্রম করবে না।

৩। সুবর্ণরেখা নদীর প্রবাহ পথ মারাঠা রাজ্যের উত্তর সীমারূপে নিরূপিত হয় এবং মেদিনীপুরকে সুবা কটক হতে পৃথক করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল।

সন্ধির প্রায় পনের মাস পরে বহু পাপ কর্ম ও অত্যাচারের নায়ক মীরহাবিবের বিরুদ্ধে জানোজী ষড়যন্ত্র করেন এবং অর্থ তছরূপের অজুহাতে আলোচনার নামে তাঁকে শিবিরে আহ্বান করে হত্যা করা হয়। মীরহাবিবের শেষ দিনটি সম্পর্কে সৈয়দ গোলাম হোসেন খান মন্তব্য করেছেন,—'Doubtless so untimely a fate

had been ordered by providence in compensation for the many families he had ruined in his wars, and the many houses he had destroyed in his incursions, in one word, for the many violences he had been exercising all over Bengal by himself or by others these ten years past.'[৪০]

৮

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে পেশোয়া বাজীরাও দূত মারফৎ ড্রেক সাহেবকে পত্র দেন যে, ইংরাজদের সম্মতি লাভ করলে তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার সৈন্যসহ বাংলা লুণ্ঠনের জন্য অভিযান চালাতে সক্ষম এবং কৌশলগত কারণে এই পত্রটি সিরাজদৌলার নিকট প্রেরিত হয়েছিল।[৪১]

সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর বৃহত্তর ক্ষেত্রে বর্গী হাঙ্গামা বন্ধ হলেও বর্ধমান ও মেদিনীপুরের অধিবাসীগণ সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজদের প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দেওয়ার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের রাজকোষ শূন্য হয় এবং পূর্ব চুক্তিমত মীরজাফর মারাঠাদের দু'বছর চৌথ দিতে অসমর্থ ছিলেন ; ফলে মারাঠা সেনাপতি শিউভাট একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ চন্দ্রকোনায় এসে উপস্থিত হন এবং মুর্শিদাবাদ অভিযানে মনস্থ করায় মীরজাফর স্বীয় জামাতা মীরকাশিমসহ সসৈন্যে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। শিউভাট চাকলা বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করায় মীরজাফর বর্ধমানের জমিদার রাজা ত্রিলোকচাঁদের নিকট দশ লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং ঐ অর্থ হতে সাত লক্ষ টাকা শিউভাটকে প্রদান করায় সাময়িকভাবে তিনি কটকে ফিরে যান।[৪২] এই সময়েও মারাঠাদের অত্যাচারের ফলে বহু কৃষক ও ভুস্বামী বর্ধমান পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র চলে যান।[৪৩] নবাব ইংরাজদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হলেও তারা এই আক্রমণের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যৎসামান্য সৈন্য পাঠিয়ে যথাকর্তব্য শেষ করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে শিউভাট মেদিনীপুরের উপর চৌথের দাবীতে পত্র প্রেরণ করায় ইংরাজরা চৌথ দিতে অস্বীকৃত হন। ফলে মারাঠারা মেদিনীপুর আক্রমণ করে এবং ২১শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ওয়াটস্ ও হোয়াইট নামক দু'জন সেনাপতি কলকাতার কাউন্সিলকে মারাঠাদের অত্যাচার প্রসঙ্গে পত্র লেখেন। তার আগেই কাশিমবাজার হতে অস্থায়ী গভর্ণর হলওয়েলের কাছে কলিকাতায় এই সংবাদ প্রেরিত হয়েছিল।

এদিকে মীরজাফরের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারগণের আমন্ত্রণে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহজাদা শাহ-আলম, বাংলা অধিকারের মানসে বীরভুম ও বর্ধমান অতিক্রম করে বিষ্ণুপুরে শিবির স্থাপনপূর্বক তাঁর সঙ্গে যোগদানের নিমিত্ত মারাঠাদের আহ্বান জানান।[৪৪] কিন্তু তিনিও মারাঠাদের ন্যায় রাজা ত্রিলোকচাঁদের নিকট প্রচুর অর্থ আদায় করে এলাহাবাদে ফিরে যান। মীরকাশিমের সময়ে কোম্পানি

বর্ধমানের রাজাকে রাজস্ব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রাজার পত্রে জানা যায় যে, মারাঠাদের ও সম্রাটকে দেয় উপঢৌকনের পরিমাণ ছিল ৮,৪৪,০৬২ টাকা ১৫ আনা ১ পাই এবং উক্ত বছরের রাজস্ব হতে ঐ পরিমাণ অর্থ বাদ দিতে অনুরোধ জানান হয়। আলোচনান্তে স্থির হয় যে, আলোচ্য বছরের আদায় হতে ঐ অর্থ বাদ দিলেও আগামী পাঁচ কিস্তিতে বাকী রাজস্ব রাজা কোম্পানিকে পরিশোধ করবেন।[৭৫] মারাঠারা এতদঞ্চল হতে চলে গেলেও বর্ধমানের বহু অধিবাসী স্ব স্ব স্থানে আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এ তথ্য কোম্পানির নিকট প্রেরিত রাজা ত্রিলোকচাঁদের দুখানি পত্র (আগস্ট, ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) হতে জানা যায়।[৪৬] উক্ত ঘটনাবলীর পরও একদল তেলেঙ্গানা সৈন্য চাকলা বর্ধমানের উপর সময়ে সময়ে হাঙ্গামা ও অত্যাচার করত। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মীরকাশিম কর্তৃক কোম্পানিকে প্রেরিত এক পত্রে জানা যায় যে, বর্ধমানের জমিদার মারাঠাদের বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন। কিন্তু অপর একখানা পত্রে নবাব আরও জানান যে, বর্ধমানের রাজার গতিবিধি সন্তোষজনক নয়[৪৭] এবং এই সৈন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সৈন্যদলের অবলুপ্তি ঘটাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৪৮] ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর কোম্পানির এক বিবরণ হতে জানা যায় যে, মারাঠারা পুনরায় সমবেত হয়ে বর্ধমান ও বীরভূমের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচারের জন্য পরিকল্পনা করছে।[৪৯] ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং ইতিপূর্বেই পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে তারা পূর্বভারত অভিযান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

৯

বর্গী হাঙ্গামায় সুবাবাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা একেবারেই পঙ্গু হয়ে যায়। মুর্শিদকুলী খান ও সুজাউদ্দিনের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালে বাংলার জমিদার, কৃষক ও হস্তশিল্পীগণ মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান চাকলা বর্ধমানের অর্থনৈতিক অবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দশ বৎসরকালব্যাপী হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ফলে আকবরনগর হতে সমুদ্রোপকুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভু-ভাগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বংস হয়েছিল। অবস্থাপন্ন কৃষক ও হস্তশিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করায় কৃষিজ দ্রব্য ও বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদান প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায়। কাটোয়া, দিগনগর, মঙ্গলকোট, বর্ধমান শহর ও জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বর্গীদের ঘাঁটিগুলি অবস্থিত হওয়ার জন্য ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক। কাটোয়ায় গড়া-কাপড়ের উৎপাদন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। রাজা চিত্রসেন রায় ও রাজা ত্রিলোকচাঁদ মারাঠাদের ভয়ে কিছুকাল স্থানত্যাগ করায় বঙ্গদেশের প্রধান রাজস্ব

প্রদানকারী জমিদারীটি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। অন্যান্য জমিদারগণও সময়ে রাজস্ব উসুল দিতে সক্ষম না হওয়ায় নবাবের কোষাগারে জমার অঙ্ক ছিল প্রায় শূন্য। নবাব সময়ে সময়ে সৈন্যবাহিনীর বেতন দিতে সক্ষম না হওয়ার জন্য আফগান সৈন্যাধ্যক্ষগণের সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য দেখা দিত। 'সিয়র মুতাক্ষরিণ'-এর বিবরণে জানা যায় যে, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে তুঁতগাছের চাষ বন্ধ হয়ে যায়। বর্গীরা ঘোড়ার খাদ্য হিসাবে তুঁতের চারা ব্যবহার করার ফলে রেশম শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওড়িশা ও বিহারের সীমান্তে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলার ফলে স্থলপথে আমদানী ও রপ্তানী একেবারেই বন্ধ ছিল। সম্রাট মহাম্মদ শাহকে প্রেরিত আলিবর্দীর পত্র হতে জানা যায় যে, ভাগীরথীর পূর্বভাগ হতে আদায়ীকৃত রাজস্বের সিংহভাগ সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয়িত হয়। এইরূপ আর্থিক দুর্দিনেও পেশোয়া ও রাজা শাহুকে প্রচুর ঘুষ ও উপঢৌকন দিতে নবাব বাধ্য ছিলেন।

বর্গী হাঙ্গামার সময়ে বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে মোটামুটি নিরাপদে বসবাসের প্রত্যাশায় বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির আগমনে এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই সময়ে (সম্ভবতঃ প্রথম) বাংলার স্ত্রীজাতির সতীত্ব ও সম্মান লুণ্ঠিত হয়; অথচ উক্ত ঘটনার ষাট বছর পূর্বে শিবাজীর সময়ে স্ত্রীজাতির স্থান ছিল সকলের উচ্চে। ধর্মমত নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, চাষী-শিল্পী কোন গোষ্ঠীই মারাঠাদের হাতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। অপরপক্ষে বর্গী হাঙ্গামার পরে বহু মারাঠা ও তেলেঙ্গানা সৈন্য সহজলভ্য উপার্জনের প্রত্যাশায় আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে নাই। আজও মেদিনীপুর জেলায় এরূপ পরিবারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দশ বৎসরকালব্যাপী মারাঠাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে সুবাবাংলা তথা সমগ্র পূর্বভারতের রাষ্ট্রশক্তির স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয়। আক্রমণের শেষভাগে মারাঠাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারের আফগান সর্দারগণ অত্যধিক ক্ষমতাশালী হওয়ায় নবাবকে সেদিকে অধিক মনোযোগ দিতে হত। নবাবের অসহায়তার সুযোগে বিদেশী বণিকেরা মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। মারাঠাদের প্রতিরোধের অজুহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এই সময়ে (১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ) তারা কলিকাতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য দেশীয় লোকের অর্থ সাহায্যে 'মারাঠাখাল' খনন করে। বর্ধমানের রাজার গোমস্তাকে ইংরাজগণ অন্যায়-ভাবে কয়েদ করায় রাজা চাকলা বর্ধমানে কোম্পানির কুঠি ও ব্যবসা বন্ধের আদেশ দেওয়ায় নবাব আলিবর্দী একতরফা আবেদনের দ্বারা বশীভুত হয়ে রাজাকে তিরস্কার করেন (consultations, May 5, 1755)।[৫০] পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জমিদার পরিবারের আর্থিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ফৌজদারী ঘাটিগুলির অধিকাংশই প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। ফলে পূর্বের ন্যায় জমিদার ও ফৌজদারগণের নিকট হতে নবাবের সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ওড়িশা প্রদেশ কার্যতঃ সুবাবাংলা

হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রাজকোষ ও সামরিক শক্তির বিচারে নবাব অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হন। লুণ্ঠন ও অত্যাচারের উপর ভিত্তি করে পূর্বভারতে মারাঠা অভিযানের ফলে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং এই পতনোন্মুখ শাসনব্যবস্থাকে যেভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ ও সময়ের প্রয়োজন ছিল, সেটা ৭৬ বৎসর বয়সী বৃদ্ধ নবাবের নিকট প্রত্যাশিত ছিল না। এ হেন দুর্বল রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেওয়ানী লাভের পরবর্তী পর্যায়ে কোম্পানির আগ্রাসন নীতি যে বিশেষ সুবিধা লাভ করে, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বর্গী হাঙ্গামায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হলেও মারাঠাদের যে সামরিক প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ায় 'বর্ধমান' ও 'নিগন সরাই'-এর যুদ্ধে বঙ্গীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা করুণ হলেও পরবর্তীকালে নবাব আলিবর্দীর উপস্থিতিতে মারাঠারা কোন যুদ্ধেই জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। তাদের সামরিক কৌশল ছিল এই যে, নবাবসৈন্য প্রত্যাগমনের পর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচার করা। নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারায় তারা বিধ্বস্ত হয়। রঘুজী বা ভাস্কররাম কোনক্ষেত্রেই নবাবের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে জয়লাভে সক্ষম হন নাই; উপরন্তু তাঁরা প্রত্যেকবারই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষগণ মারাঠাদের এই রণনীতির ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে অতি সহজেই মারাঠারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অনেকে বঙ্গদেশে মারাঠাদের গঠনমূলককার্যের ইঙ্গিত করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, বর্গীদের সেনানিবাসের স্থানগুলি ও সেখানকার জনজীবন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়েছিল। সৈন্য চলাচলের জন্য দু'একটি মাটির সেতু বা সাঁকো (যথা—দাঁইহাট সেতু—মহারাষ্ট্র পুরাণ) নিজেদের স্বার্থেই তৈরী করেছিল এবং এই মাটির সেতুটি ২।৩ বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, রঘুজী ভোঁসলে প্রত্যেকবার কাটোয়ায় অবস্থান করলেও নদীর পরপারে যাবার চেষ্টা করেন নাই। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে ঐ সেতুর অস্তিত্ব থাকলে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি পলাশী ও মানকরার পথে মুর্শিদাবাদ আক্রমণে উদ্যোগী হতেন। বাংলার জনজীবনের সঙ্গে মারাঠাদের একাত্মবোধের কোন সম্পর্ক ছিল না।

অপদার্থ মহাম্মদ শাহ ও রাজা শাহু পেশোয়া বালাজী রাও-এর হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা সর্দারগণের লুণ্ঠন, অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, নারীর সতীত্বনাশ, গণহত্যা ইত্যাদি কুকার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুমোদন দান করেন। মারাঠারা ধ্বংস-নীতির উপর ভিত্তি করে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের মূল শাসনকেন্দ্র দিল্লী ও আগ্রাসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের

শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। সমগ্র উত্তর ভারতের জনজীবনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়গণের একাত্মবোধ না থাকায় ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালী অতি সহজেই মারাঠাদের বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন। পশ্চিমবঙ্গের কোন বড় জমিদার মারাঠাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন নাই। তবে অনেকে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ভয়ে অর্থ প্রদানে বাধ্য হত। আরও অনুমান করা হয় যে, মারাঠারা বঙ্গদেশে মন্দির নির্মাণ করেছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। 'ফুটিসাঁকো'র সাঁকো নির্মাণের কৃতিত্ব মারাঠাদের দেওয়া হলেও একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাদশাহী সড়কের ধারে 'ফুটিসাঁকো' অবস্থিত এবং এর জন্য যে পরিমাণ কৃতিত্বের পাওনাদার হওয়া উচিত তা হোসেনশাহী বংশের সুলতানদের উপর বর্তাবে। বর্ধমান জেলার বড় বড় সরোবর বা পুষ্করিণীগুলি হোসেনশাহী বংশের সুলতানগণ ও বর্ধমানের রাজারা খনন করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কবি গঙ্গারাম বর্ণিত 'ফুটিসাঁকো' গ্রামের অবস্থিতি হল পলাশীর সন্নিকটে, বর্ধমানে নয়।

পাদটীকা ঃ

১। প্রবাসী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ২৬১।

২। *H.C.I.P.* (*The Maratha Supremacy*), Vol. VIII, p, 93 & 820.

৩। *Riyazu-S-Salatin*—Ghulam Husain Salim, p. 338.

৪। প্রবাসী, বৈশাখ সংখ্যা—১৩৩৮ সাল, পৃঃ ১২৪।

৫। *J.A.S B.* 1971, No. 3, p. 135-37.

৬। মহারাষ্ট্র পুরাণ—গঙ্গারাম দত্ত, লাইন—১১১-২০ ; *The Fall of the Mughal Empire*—Sir Jadunath Sarkar, Vol. I, p. 47.

৭। *The Seir Mutaqherin*--Said Gholam Hossein Khan, Vol. I, p. 377.

৮। *Tarikh-i-Bangla-i-Mahabatjangi*—Yusuf Ali Khan, p. 28; *History of Bengal*—Sir Jadunath Sarkar, Vol. II, p. 455-56.

৯। *Riyazu-S-Salatin*, p. 340.

১০। *Tarikh-i-Bangla i-Mahabatjangi*, p. 32-33.

১১। *The Seir Mutaqherin*, Vol. I. p. 379.

১২। *Riyazu-S-Salatin*, p. 340.

১৩। *The Seir Mutaqherin*, Vol. I, p. 382.

১৪। *Ibid*, Vol. I, p. 383-84.

১৫। *Ibid*, Vol. I, p. 391.

১৬। *History of Bengal*—Sir Jadunath Sarkar, Vol. II, p. 455-56.

১৭। *The Seir Mutaqherin*, Vol. I, p. 387.

১৮। *History of Bengal*, Vol. II, p. 456; *The Seir Mutaqherin*, Vol. I, p. 393.

১৯। প্রবাসী, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল, পৃঃ ১২৫-২৬ ; *Riyazu S-Salatin*, p. 342-44.

২০। *History of Bengal*, Vol. II, p. 456.

২১। Alivardi and His Times—K. K. Datta, p. 60-62.

২২। *Fall of the Mughal Empire*, Vol. I, p. 58-63.

২৩। *History of Bengal*, Vol. II, p. 460.

২৪। *Fall of the Mughal Empire*, Vol. I, p. 64-65.

২৫। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, পৃঃ ৭১।

২৬। *Alivardi and His Times*—K. K. Datta, p. 71.

২৭। প্রবাসী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল, পৃ: ২৬২-৬৩।
২৮। ঐ পৃ: ২৬২।
২৯। *The Seir Mutaqherin*, Vol. I, p. 435.
৩০। *The Seir Mutaqherin*, Vol. I, p. 430-37 ; *Riyazu-S-Salatin*, p. 347-49 ; *Tarikh-i-Bangla-i-Mahabatjangi*, p. 46-49 ; প্রবাসী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল, পৃ: ২৬২-৬৪।
৩১। *Bengal Nawabs*—Sir Jadunath Sarkar, p. 31.
৩২। *History* of *Bengal*, Vol. II, p. 462.
৩৩। *The Seir Mutaqherin*, Vol. II, p. 10-14 ; Alivardi and His Times, p. 76.
৩৪। *History of Mediaeval Bengal*—R. C. Majumder, p. 463-64.
৩৫। *Fall of the Mughal Empire*, Vol. I, p. 83-85.
৩৬। *Bengal Nawabs*, p. 42-43.
৩৭। প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৩৮ সাল, পৃ: ৩৭২।
৩৮। *Selections from Unpublished Records of Government*—The Rev. J. Long., No. 13.
৩৯। *The Seir Mutqherin*, Vol. II, p. 112-13.
৪০। *Ibid*, Vol. II, p. 116-17.
৪১। বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ২৬৩।
৪২। *Selections from Unpublished Records of Government*, p. 278.
৪৩। *History of Mediaeval Bengal*, p. 126.
৪৪। *Selections from Unpublished Records of Government*, No. 309.
৪৫। *Ibid* No. 313.
৪৬। *Ibid* No. 317.
৪৭। *Ibid* No. 324.
৪৮। *Ibid* No. 325.
৪৯। *Ibid* No. 441.
৫০। *Ibid* No. 151.

পঞ্চম অধ্যায়

রাজবংশানুচরিত

বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস

(১)

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের মধ্যভাগে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চল মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয় এবং সুবাদার মানসিংহের আমলে সমগ্র অঞ্চলটির উপর অবিসংবাদীরূপে মোঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে সুবার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতক্ষমতা সুবাদারের ওপর ন্যস্ত হলেও স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে জায়গীরদার ও রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

মোঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও তাঁর আস্থাভাজন হয়ে সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরীর পদ হতে অল্পকালের মধ্যেই সুবাবাংলার অন্যতম প্রধান জমিদাররূপে 'বর্ধমান রাজবংশ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই জমিদারবংশের আদিপর্বের কাহিনী সবিশেষ জানা যায় না। তবে প্রবাদ আছে যে, বর্ধমান রাজ-বংশের আদিপুরুষ আগ্রা হতে শ্রীশ্রীজগন্নাদেব দর্শনার্থে 'শ্রীক্ষেত্র' গিয়েছিলেন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তনের পথে বাদশাহী সড়ক ধরে সরকার সরিফাবাদের সদর কার্যালয় বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গম রায়ের আদি বাসস্থান ছিল বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোর শহরের কোটুলী মহল্লায় এবং তিনি জাতিতে ছিলেন ছেত্রী।

সঙ্গম রায় বর্ধমান শহরে বসবাস না করে, তথা হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্বে রাইপুর-বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বাসস্থান নির্বাচন করেছিলেন।[১] সম্ভবতঃ বিদেশে এসে সঙ্গমরায় রাজকর্মচারীদের নিকট হতে দূরে বসবাস করাকে শ্রেয় মনে করে বর্ধমানে বাস না করে বৈকুণ্ঠপুরে এসেছিলেন। শোনা যায়, তিনি খাদ্য-শস্য ও টাকা আদান-প্রদানের (মহাজনী) ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।[২] অবশ্য ঐ যুগে উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে ভাগ্যান্বেষণে আগত বহু ব্যক্তিব বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার নজির আছে এবং অনেকেই পরবর্তীকালে জমিদারী লাভ করেছিলেন।

সঙ্গম রায়ের বৈকুণ্ঠপুর আগমনের কোন তারিখ জানা যায় না। তবে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক হিজরী ১১০৫ অব্দে কৃষ্ণরাম রায় ও হিজরী ১১১৫ অব্দে কীর্তিচাঁদ রায়কে প্রদত্ত ফরমান হতে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে কীর্তি-চাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরাম রায় বৃদ্ধাবস্থায় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। তাহলে ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কৃষ্ণরাম রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এরূপ অনুমান করা সঙ্গত এবং তাঁর পিতা ঘনশ্যাম রায় ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গম রায় হতে অধঃস্তন পাঁচ পুরুষে ঘনশ্যামের আবির্ভাব-কাল হলে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে সঙ্গম রায়ের জন্মসাল ধরা যেতে পারে। সঙ্গম রায়

প্রৌঢ় বয়সে বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করলে সময়টি কতলু খাঁর মৃত্যু ও মানসিংহ কর্তৃক ওড়িশা বিজয়ের পরের ঘটনা বলে মনে করা যায়। সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনিও পিতার ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।

সঙ্গম রায়ের পৌত্র ও বঙ্কুবিহারীর পুত্র আবু রায় বৈকুণ্ঠপুর হতে বর্ধমানে এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সময় হতে এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে আবু রায়ই এই বংশের প্রথম পুরুষ যিনি পদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজস্ব আদায়ের চৌধুরীর পদ লাভে সমর্থ হয়ে অতি সাধারণ ব্যবসায়ী পরিবারকে সম্ভ্রান্ত রাজবংশে উন্নীত করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে একদল মোঘলসৈন্য ঢাকা গমনকালে খাদ্য ও রসদের অভাবে বর্ধমান শহরে অবস্থান করতে বাধ্য হলে সৈন্যদলটির ঢাকা গমনের প্রধান অন্তরায় হয়। আবু রায় ফৌজদারের অসহায়তার সময়ে অনতিবিলম্বে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করে সৈন্যদলটিকে ঢাকা গমনের সহায়তা করেন এবং উক্ত কার্যের পুরস্কার স্বরূপ বাংলার সুবাদার সুলতান সুজার সুপারিশক্রমে মোঘল দরবার হতে তাঁকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছিল।[৩]

হিজরী ১০৬৪ সনে (১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট শাহজাহানের ফরমান বলে আবু রায় সরকার সরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে বাৎসরিক ৫৩২ টাকার (সিক্কা) বিনিময়ে রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব আদায়ের চৌধুরী ও নগর কোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন।[৪] মনে হয় ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বেই তিনি এই দায়িত্ব লাভ করেছিলেন; কারণ এই সময়ে সম্রাটের অসুস্থতার জন্য তাঁর পুত্রগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রাণঘাতী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। আবু রায় স্বীয় কর্মকুশলতার গুণে ফৌজদারের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আবু রায়ের পর তাঁর পুত্র বাবু রায় ১,০০,২৬২ সিক্কা টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে বর্ধমান পরগণাসহ আরও তিনটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন।[৫] প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র জমিদার অর্থাৎ বাবু রায় এই বংশের প্রথম ব্যক্তি যিনি জমিদারের সম্মান ও রাজকার্যভার প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করেছিলেন।

বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের পদ লাভ করেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানা যায় না; তবে তিনি পিতার আমলের মহলগুলির চৌধুরীপদে বহাল ছিলেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান শহরে সুপ্রসিদ্ধ 'শ্যামসায়র' নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খননকার্য তাঁর জনহিতকর কার্যের মধ্যে গণ্য করা যায়।[৬] ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যু হয়। যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণে' (অনাদ্যের পুঁথি), ঘনশ্যাম রায়ের পর বলরাম রায় ও তৎপরে কৃষ্ণরামের উল্লেখ রয়েছে—

'মরিল বলরাম রায় অরাজক পুরী
সেইকালে কৃষ্ণরাম নিল বসুন্ধরী।'

কিন্তু 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' বা অন্য কোন তথ্যে এর সমর্থন মেলে না। বলরাম রায়ের সঙ্গে ঘনশ্যাম বা কৃষ্ণরামের কোন সম্পর্ক পর্যন্ত জানা যায় না।

কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-৯৬):

ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে প্রভুত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় বঙ্গদেশের আসল তোমরজমা ও খালিসা জমার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে মনসবদার ও জায়গীরদারের পরিবর্তে অধিক রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে বহু খালিসাজমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদার শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হয় এবং সুবাবাংলার মধ্যে কৃষ্ণরাম রায়ই একমাত্র জমিদার যাঁর অধীনে ৫০টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল।

দীর্ঘ ২২ বছর সুবাদারের পদ অলংকৃত করে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্ত খাঁ সুবা-বাংলা হতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং খান-ই-জাহান বাহাদুর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সম্রাটের ধাত্রীপুত্র নূতন সুবাদার ছিলেন একেবারেই অপদার্থ এবং এক বছরের মধ্যে তিনি বঙ্গদেশ হতে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং শাসনকার্যের প্রতি বিশেষ মনযোগী হওয়ার পরিবর্তে পুস্তকপাঠে অধিক সময় ব্যয় করতেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সম্রাট দীর্ঘদিন রাজধানী হতে দূরে অবস্থান করায় সুবাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হলেও তিনি ছিলেন নিরুপায়। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যের সুদূর অঞ্চলের সুবাদারগণ যাতে অসন্তুষ্ট না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর ন্যায় সুদক্ষ সুবাদারের অভাবে বাংলার রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ রাজস্ব আদায় দিলেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যতঃ অর্ধ-স্বাধীন ছিলেন। এই সময়ে আঞ্চলিক ফৌজদারের পরিবর্তে একজন ফৌজদারের অধীনে যশোহর হতে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত শাসনকার্যের ভার অর্পিত থাকায় বড় বড় জমিদারগণও ফৌজদারের ন্যায় রাজস্ব আদায় ও শাসন-কার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই কৃষ্ণরাম সেনপাহাড়ী পরগণা বলপূর্বক অধিকার করেন। সুবাদার ও ফৌজদারের অপদার্থতার সুযোগে তিনি পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন এবং ভুরশুট, মনোহরশাহী, চন্দ্রকোনা ও বলাগড়ের জমিদারীও বলপূর্বক অধিকার করেন।

সুবাবাংলার এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষ্ণরাম রায় বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন এবং সুবাদার ও ফৌজদারের সম্মতিতে তিনি ছোট ছোট জমিদারগণের কয়েকটি পরগণা অধিকার করেন। কৃষ্ণরামের জমিদারী কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট ফরমান লাভের নিমিত্ত আবেদন করায়

হিজরী ১১০৫ সনে (১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ) তিনি বর্ধমান অঞ্চলের জমিদারী ও চৌধুরী-পদের জন্য নিম্নরূপ সনদ লাভ করেন।[৭]

"আবল জাফর মহাম্মদ মহী-অদ্দিন আলমগীর বাদশাহ গাজী ঃ অতি-শুভক্ষণে এই মহামান্য ফরমানে প্রচারিত হইল যে বঙ্গদেশের সুবার এলাকাধীন, পরগণে বর্ধমান ওগয়হার জমিদারী ও চৌধুরাই বাবুর পৌত্র কিষণরামকে প্রদান করিলাম। কৃষিকার্যের উৎকর্ষতা সাধন, প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন, কোন প্রকার নূতন কর গ্রহণ না করা এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কর্তব্য। সরকারের প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা নজরানা, ধার্য কিস্তি অনুসারে উল্লিখিত সুবার ধনাগারে প্রদান করে। বর্তমান ও ভাবি হাকিম, কারকুন ও মোৎসাদ্দিদিগের কর্তব্য যে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমীদার ও চৌধুরী বলিয়া মান্য করেন এবং ইহার জন্য প্রতি বৎসর নূতন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন।"

আওরঙ্গজেবের নিকট হতে সনন্দ লাভের পূর্বেই, বাংলা ১০৯০ সালের চৈত্র মাসে কৃষ্ণরাম, চৈতন্য সিংহের অধিকৃত নিজবলিয়া পরগণা আক্রমণ ও অধিকার করেছিলেন। অতঃপর নিজবলিয়া হতে ১৩ কিলোমিটার দূরে রসপুর আক্রমণ করেন। এই সময়ে রসপুরের জমিদার ছিলেন রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রসপুর রায়বংশের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। উক্ত বংশের ইতিহাসে দাবী করা হয়েছে যে, কাশ্যপ গোত্রীয় যশচন্দ্র (রামকৃষ্ণের পিতামহ) বর্ধমান শহর পরিত্যাগ পূর্বক সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রসপুরে বসবাসের নিমিত্ত আগমন করেন।[৮] রামকৃষ্ণের নিবাসস্থল আক্রমণ করে কৃষ্ণরাম বলপূর্বক 'রাধাকান্ত বিগ্রহ' বর্ধমানে আনয়ন পূর্বক তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই শোকে রামকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন এবং অতঃপর তাঁর পুত্রগণ বিগ্রহ প্রত্যাপর্ণ লাভের আশায় বর্ধমানে কৃষ্ণরাম রায়ের নিকট বিগ্রহ যাচঞা করায় তিনি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেব-সেবার জন্য ৮৫ বিঘা নিষ্কর ভুমি দান করেছিলেন। উক্ত দানপত্রখানি বাংলা ১০৯১ সালে ১১ই বৈশাখ সম্পাদিত হয়েছিল।[৯]

সম্রাট প্রদত্ত সনদ বলে ও স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলসহ কৃষ্ণরাম এক বিশাল অঞ্চলের জমিদাররূপে গণ্য হয়েছিলেন। এই সময়ে বর্ধমানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণার্থ 'কৃষ্ণসায়র' নামক এক বিশাল পুষ্করিণী খনন করান এবং শ্রমিকদের এক ঝুড়ি মাটি কাটার জন্য ১ কড়ি হিসাবে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করেন।[১০] 'ধর্মপুরাণে'র কবি যাদুনাথের ভাষায় কৃষ্ণরাম ছিলেন খ্যাতিমান পুণ্যশ্লোক জমিদার। কবির বিবরণে আরও জানা যায় যে, কৃষ্ণরামের নিধনকাল ও 'ধর্মপুরাণে'র রচনা সমাপ্তিকাল একই অর্থাৎ ১৬৯৬ সালের জানুয়ারী মাস। এ প্রসঙ্গে জানা যায়[১১]—

'খেত্রী বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণরাম
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্মরে যার নাম।
কৃষ্ণরামের নামে পাপ তাপ-বিমোচনে
চিরকাল রাজ্যুতি করেন বর্ধমানে।'

কৃষ্ণরাম ছোট ছোট জমিদারগণের জমিদারী গ্রাস করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিষয়ে নীরব। তাঁর আগ্রাসন নীতির সর্বপ্রাচীন প্রমাণ মেলে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিতং' নামক গ্রন্থে (১৭২৮ খ্রীস্টাব্দ)। ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং-এ বর্ণিত আছে—"এতস্মিন্নেব সময়ে বর্দ্ধমাননৃপবিষয়ানন্তর্বর্ত্তি-চেতুয়েতি প্রসিদ্ধদেশাধিপত্য শোভাসিংহনৃপস্য পুরং বর্দ্ধমাননৃপেণ কৃষ্ণরাম রায়েন লুণ্ঠিতং"। অর্থাৎ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায় (প্রকৃত অর্থে মোঘল সম্রাটের নিকট রাজা উপাধি পান নাই) তাঁর রাজ্যের পার্শ্ববর্তী শোভাসিংহের চেতুয়া পরগণা লুণ্ঠন করেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' (১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে শোভাসিংহ বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান আক্রমণ করেন।[১২] দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সীর জীবনীতে আছে, কৃষ্ণরাম রায় বলপূর্বক পূর্বতম জমিদারের নিকট হতে সেলিমাবাদ পরগণা অধিকার করেন।[১৩]

পরবর্তীকালে রচিত হলেও মহান্ত পরম্পরায় 'তারকেশ্বরমঠে'র প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' নামক পুস্তিকায় বর্ণিত আছে যে, ভারামল্লের পরবর্তী মহান্তগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং তম্মধ্যে একদল বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারকেশ্বরে অবস্থানরত সন্ন্যাসীর দলও এতদঞ্চলের ছোট ছোট জমিদার-গণকে তাঁদের দলে টানার চেষ্টা করেন। বর্ধমানের জমিদার ঐ স্থানে অবস্থানরত মহান্তগণের পক্ষাবলম্বন করে তারকেশ্বরের মহান্তদের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁরা সম্রাটের নিকট আবেদন করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় জমিদার ও সন্ন্যাসীরা যে কৃষ্ণরাম রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তার উল্লেখও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুপুর রাজ সহ সখ্যতা স্থাপন।
শ্রীগুমন্ সিংহ আর ভবানী চরণ॥
শোভাসিংহ নামে এক বর্দ্দা জমিদার।
ইত্যাদি সহিত করে সখ্যতা আচার॥"

আবার অন্যত্র আছে,—'গুমন ভবানী শোভা [সিংহ] বিষ্ণুপুর রাজ।' উপরোক্ত চারজন জমিদারের মধ্যে বিষ্ণুপুর-রাজ গোপালসিংহ ও শোভাসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিন্তু গুমনসিংহ ও ভবানীচরণের পরিচয় জানা যায় না। তবে বর্ধমানে সন্ন্যাসীদের আশ্রয়দান ও বর্ধমানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিরোধ সম্ভবতঃ সুবাদারের অবিদিত ছিল না, কারণ,—

"বর্দ্ধমান ভূপ পাশে তাহার সম্মান।
মোগল সম্মতিক্রমে সন্ন্যাসীর স্থান॥"

রঘুনাথসিংহ যে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট মহাম্মদ শাহ কর্তৃক কীর্তিচাঁদকে প্রদত্ত ফরমানে।[১৪]

কৃষ্ণরামের আগ্রাসন নীতিতে ভীত হয়ে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ, চন্দ্রকোনার তালুকদার রঘুনাথসিংহ, চিতুয়া ও বরদার (চাকলা বর্ধমানের অধীনস্থ) জমিদার শোভাসিংহ ও ওড়িশার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ এক যোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করলে কৃষ্ণরাম একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১৫] কয়েকটি ছোট ধরনের সংঘর্ষের পর চন্দ্রকোনার যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন।[১৬] কিন্তু 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'-এ[১৭] আছে যে, শোভাসিংহ বর্ধমানবাসীগণের অজ্ঞাতসারে বনপথে বর্ধমান শহরের প্রান্তদেশে দামোদর-নদ পার হয়ে বর্ধমান শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কোন প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বেই শত্রু কবলিত হয়ে কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়। অপরপক্ষে গোলাম হোসেন সলিম লিপিবদ্ধ করেছেন যে, বর্ধমান শহর হতে দূরে শত্রুসৈন্যকে বাধা প্রদান কালে কৃষ্ণরাম নিহত হন। 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' ও 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং'-এর অপর একটি বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী। প্রথম গ্রন্থের বিবরণ হতে জানা যায় যে, কৃষ্ণরামের অন্তঃপুরের রমণীগণ জহরব্রত অনুষ্ঠানে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণে আছে যে, তিনি স্বহস্তে নিজ পরিবারবর্গকে হত্যা করেন। অপর একটি বিবরণে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ আফগান সৈন্যদের হস্তে সতীত্বনাশের ভয়ে অন্তঃপুর-বাসিনীরা বিষপানে মৃত্যু বরণ করেন।[১৮] আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, বিদ্রোহীগণ প্রথমে বর্ধমান আক্রমণ করেন নাই।[১৯] তাঁরা চন্দ্রকোনা, চেতুয়া, বরদা অঞ্চলে সংগঠিত হওয়ার পর ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে (জুলাই-আগস্ট) বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করেন এবং বর্ষাকাল অন্তে কৃষ্ণরাম অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হলে সমবেত বিদ্রোহীগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। সলিমউল্লার মতে (তারিখ-ই-বাংলা) চন্দ্রকোনার নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, প্রথম যুদ্ধ গড়মান্দারনে সংঘটিত হয় এবং কৃষ্ণরাম ক্রমশঃ চন্দ্রকোনা অভিমুখে অগ্রসর হলে তথায় তুমুল সংঘর্ষের পর তিনি নিহত হন।

কৃষ্ণরামের নিধনের পর বিদ্রোহীগণ শোভাসিংহের নেতৃত্বে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে নগর ও কোষাগার লুণ্ঠন করেন। বাংলা ১১০৩ সালের (১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) পৌষ মাসে অমাবস্যা তিথিতে কৃষ্ণরাম নিহত হয়েছিলেন এবং ঐ তিথিকে স্মরণ করে বর্ধমান রাজবাটীতে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগেও তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হত। বিদ্রোহীদল শহরে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই কৃষ্ণরামের পরিবারস্থ মহিলাগণ সম্ভ্রম বিনষ্টের আশঙ্কায় জহরব্রত অনুষ্ঠান করেন এবং এই জহরব্রতে তিনজন বিধবা মহিলাসহ মোট তেরজন মহিলা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বর্ধমান রাজবাড়ীর পুরনো নথিপত্র হতে তেরজন মহিলার নাম জানা যায়, যথা কুন্দদেবী; কোতাদেবী, চিমোদেবী, লছমী দেবী, আনন্দ দেবী, কিশোরীদেবী,

কুঞ্জদেবী, জিতু দেবী, মুলুক দেবী, লাজোদেবী, পাতোদেবী, দাসোদেবী ও কৃষ্ণা দেবী এবং উক্ত রমণীগণের মধ্যে শেষ ছয়জন ছিলেন কৃষ্ণরামের স্ত্রী।[২০] এই জহরব্রত অনুষ্ঠানটি হয়েছিল পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অর্থাৎ কৃষ্ণরাম নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহীগণ মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল সাতদিন ধরে লুণ্ঠনের পর বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়েছিলেন। শহরে প্রবেশ করে কৃষ্ণরাম রায়ের পরিবারের ২৫ জনকে হত্যা করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কৃষ্ণরাম বর্ধমান শহরে বা সন্নিকটবর্তী কোন স্থানে নিহত হন নাই।

বিদ্রোহী দল বর্ধমানে প্রবেশের পূর্বেই তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় (সম্ভবতঃ ঐ সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ব্রজকিশোরী) নগর পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে নদীয়ারাজ রাম-কৃষ্ণের নিকট আশ্রয় লাভের নিমিত্ত মাটিয়ারীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ ও জমিদারী প্রাপ্তির আশায় তথা হতে ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) গমন করেন। কোন বিবরণেই জগৎরামের পুত্রদ্বয়ের সম্পর্কে (কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন) কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২)

জগৎরাম বর্ধমান হতে পলায়ন করে ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয়টি অবগত করান। গ্রন্থকীট সুবাদার বিষয়টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করেই (একটা সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে) তিনি একজন মুসলমান সেনাপতির সঙ্গে জগৎরামকে বর্ধমানে প্রেরণ করেন। কিন্তু শোভাসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে উক্ত সেনাপতি নিহত হলে তাঁর ভাই সৈন্যদলসহ বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে নবাববেড় অঞ্চলে অবস্থান করেন। কিন্তু এই তথ্য অপর কোন বিবরণীতে পাওয়া যায় না বা সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তীকালে ফৌজদার নুরউল্লা খাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের আদেশ দেওয়া হয়। যেমন প্রভু, তেমনি তার ভৃত্য! ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দ হতে নুরউল্লা খান যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার ছিলেন এবং যশোহরের মির্জানগরে তাঁর প্রধান কার্যালয় ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ে কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতেন এবং ফৌজের ভার তাঁর জামাতা লাল খাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।[২১]

বর্ধমান অধিকার ও কোষাগার লুণ্ঠন করে শোভাসিংহ ক্ষমতার মোহে সপ্তগ্রাম-হুগলী-চুঁচুড়া-চন্দননগর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। হুগলীতে নুরউল্লা খাঁ বিদ্রোহীদের বাধা প্রদান করেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের দমনের কোন সদিচ্ছা না থাকায় তিনি ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন শোভাসিংহ কর্তৃক পর্যুদস্ত হয়ে প্রাণভয়ে রাতের অন্ধকারে হুগলী-দুর্গ হতে পলায়ন করেন। নুরউল্লা খাঁর পলায়নের পর শোভাসিংহ চুঁচুড়া ও চন্দননগর আক্রমণ করেন; কিন্তু ওলন্দাজদের সহায়তায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শোভাসিংহ এতদঞ্চল ত্যাগ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল শোভাসিংহের দখলে চলে যায়। নূরউল্লার পলায়নের পর সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয় এবং জবরদস্ত খাঁ অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ বর্ধমানে আসার পথে রহিম খাঁর সৈন্যদল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন।[২২]

হুগলী অধিকারের কাজ অসমাপ্ত রেখে শোভাসিংহ বর্ধমানে চলে আসেন এবং জুলাই মাসের শেষভাগে রহিম খাঁর নেতৃত্বে অপর একটি সৈন্যদল নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল লুণ্ঠনের জন্য অভিযান করে। শোভাসিংহ বর্ধমানে ফিরে এসে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়ে সত্যবতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হলে তিনি চুলের বেণীর মধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকার দ্বারা শোভাসিংহের উদর চিরে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যবতীও পাপীর স্পর্শে তাঁর শরীর অপবিত্র হওয়ায় উক্ত ছুরিকার দ্বারা আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন।[২৩]

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় শোভাসিংহের অকাল মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে উচ্চ নীচ জাতির সম্পর্ক তুলে জনমানসে শোভাসিংহের সম্পর্কে সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি চন্দননগরের ফরাসী কোম্পানীর কুঠিয়াল মার্তাঁর বিবরণের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন—"শোভাসিং উঁচু ছাদ থেকে নীচের বারান্দায় হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে ঐতিহাসিক সালিমুল্লা তাঁর মৃত্যুর যে কারণ দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত সেটাই চলে আসছে। বহু ধরনের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর জনশ্রুতিরও সৃষ্টি হয়েছে।" এ হেন কাহিনীতে রোমাঞ্চকর জনশ্রুতির সৃষ্টি হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অধ্যাপক রায় প্রথম হতেই শোভাসিংহকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট।

প্রথমতঃ গোলাম হোসেন সলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' রচনার বহু পূর্বে ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং" রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে শোভাসিংহের বিদ্রোহ, কৃষ্ণরাম রায়ের নিধন, 'শোভাসিংহের মৃত্যু, রহিম শাহের পরাজয় ও আজিম-উস-শানের বর্ধমান অধিকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং' গ্রন্থে আছে—"...... শোভাসিংহঃ সুরাপানেনাতিমত্তঃ কৃষ্ণরামরায়দুহিত্রা সম্ভোগায় শয্যায়ামারোপিতয়া নিজকেশপাশস্থাপিততীক্ষ্ণধারক্ষুদ্রছুরিকয়া ভূশমুদরে বিদারিতো মুক্তপ্রাণঃ কর্মানুরূপাং গতিমবাপ ॥" অর্থাৎ একদা সুরাপানে প্রমত্ত হয়ে শোভাসিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যাকে সম্ভোগের নিমিত্ত শয্যায় টেনে তুললে তিনি কেশপাশে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা দ্বারা উদর বিদীর্ণ করলে (শোভাসিংহের) তিনি কর্মফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্ব কাহিনীও "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং" গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পার্শের (Pertch) ভাষায়[২৪]—"At this time Simha

having seen a very beautiful daughter of Krishnarama who by some chance had escaped death and fallen in love with her, began to keep as his mistress. And in spite of the admonitions of his counsellors, to the effect that he should not inconsiderately enjoy one who belonged to the party of his enemies, until, after having overcome his adversaries and firmly established his authority over Vardhamana, he night enjoy her with security, he yet persisted in his imprudence."

'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতং' ও 'রিয়াজ-উস-সালাতিনে'র বিবরণে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গ্লাডউইন-এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন[২৫]—

"She drew from under her garment a knife which she had concealed in hopes of binding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly." ('Narrative of the Govt. of Bengal' by Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8)

মার্তা ও অখবরাত (**akhbarat**)-এর বিবরণে পরস্পর বিরোধী উক্তি আছে। মার্তার মতে ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে শোভাসিংহের মৃত্যু হয়েছিল ; কিন্তু অখবরাতে-এর উল্লেখ হতে বিশ্বাস করা উচিত যে, তিনি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২৬] এখন কোন তারিখটি বিশ্বাসযোগ্য ! সমসাময়িক ইংরাজগণ প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বণে **C. R. Wilson** লিখেছেন[২৭]—

"Then a blow was struck by the hand of a woman, the young daughter of the murdered Krishna Ram, when Subha Singha had carried off captive to Burdwan. Here was enacted once again the old story of man's brutality and woman's constancy. Subha Singha, after flattering and entreating in vain, at last had recourse to violence. But the girl, driven to extremities plucking from her dress a sharp knife, stabbed the wretched to death through his body and then plunged the point in her own heart."

শোভাসিংহকে নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ রূপে দাঁড় করানোর পিছনে কেবলমাত্র মার্তার উক্তি। কিন্তু সামান্য ওলন্দাজগণের তাড়া খেয়ে ঐ সময়ে হুগলীর ন্যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করে তাঁর বর্ধমান চলে আসার দ্বিতীয় কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে তাঁকে 'বাংলার শিবাজী' আখ্যা দিয়ে ছত্রপতি শিবাজীকে হেয় করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শোভাসিংহ ও তাঁর ভাই হিম্মৎসিংহের চরিত্র কলুষমুক্ত নয়।[২৮] ঐ সময়ে শোভাসিংহের কোন প্রতিপক্ষ বর্ধমান শহরে উপস্থিত ছিলেন না বা ঢাকা হতে কোন সৈন্যদলের বর্ধমান আগমনের সংবাদও জানা যায় নাই।

সে কারণে শোভাসিংহের সপ্তগ্রাম হতে বর্ধমান আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে কোন অসুবিধা নাই।

অখবরাত হতে উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে যে, ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর শোভাসিংহ জীবিত ছিলেন। মনে হয় এ তথ্য ভুল। সম্ভবতঃ হিম্মৎসিংহের স্থলে প্রমাদবশতঃ শোভাসিংহ লেখা হয়েছে। যদি এই সময়ে শোভাসিংহ জীবিত থাকতেন তাহলে সুবাদার আজিম-উস-শানের উজির খাজা আনোয়ার সন্ধি শর্ত নিয়ে রহিম খাঁর শিবিরে গমন করতেন না। সকল ঐতিহাসিক একমত যে, ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ হতে ওড়িশার পাঠান নেতা রহিম খাঁ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন এবং রহিম খাঁর নেতৃত্বাধীনে বিদ্রোহের তীব্রতা অন্ততঃপক্ষে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শোভাসিংহ জীবিত থাকলে তিনিই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতেন। পরবর্তীকালে শাহজাদা আজিম-উস-শান ও জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে রহিম খাঁর যুদ্ধের সময় শোভাসিংহ অনুপস্থিত। শোভাসিংহ এক বছরের অধিককাল বিদ্রোহ পরিচালনা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা ঘটেছিল আকস্মিকভাবে এবং শায়েস্তা খাঁর পর বাংলা সুবায় মোঘল শাসনের হাল বেশ শিথিল হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণরাম রায়ও এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন না ; তিনি রাজস্ব আদায়কারী জমিদার মাত্র। শোভাসিংহের পরাক্রম যদি এত অধিক হত তাহলে আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রেখে বর্ধমানে এসে অকালে প্রাণ হারাতেন না। এ বিদ্রোহের প্রথম পর্বের ঘটনা হল ব্যক্তিগত আক্রোশকে চরিতার্থ করা, যা সে যুগে প্রায়ই ঘটত ; মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই। পদাধিকার বলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারগণের প্রাপ্য ক্ষমতাই কৃষ্ণরামের ছিল।

ফরাসী কুঠিয়ালের বর্ণনাও নির্বিবাধায়ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। সেই সময়ে কৃষ্ণসায়রের সন্নিকটে অথবা বারদুয়ারীতে কৃষ্ণরামের বাসস্থান ছিল ; আর বর্তমান রাজবাড়ীকে ঘিরে মোঘল আমলের যে দুর্গটি ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'রিয়াজ-উস-সালাতিনে'।[২৯] ঐ সময়ে বর্ধমান শহরে এমন কোন সুউচ্চ গৃহের অস্তিত্ব ছিল না যে, শোভাসিংহের ন্যায় একজন বলশালী ব্যক্তি হঠাৎ ছাদ হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নেবে। মার্তা এ খবর পেয়েছিল চন্দননগরে বসে এবং তাঁকেও নির্ভর করতে হয়েছিল জনশ্রুতির উপর। সম্ভবতঃ প্রকৃত ঘটনাকে আড়ালে রেখে শোভা-সিংহের অনুচরবৃন্দেরাই 'ছাদ হতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে', এরূপ খবর রটিয়ে দেয় ; অন্যথায় বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারত। সমগ্র বিষয়টির পর্যালোচনা না করে ঘটনাটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপঘাতে শোভাসিংহের মৃত্যুকে সেলিমুল্লাহের গল্প বলে উড়িয়ে না দিয়ে সত্যাসত্য উদ্ঘাটনের সূত্রগুলির সম্যক আলোচনা করা উচিত।

নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ কর্তৃক কীর্তিচাঁদকে প্রদত্ত ফরমান হতে জানা যায় যে, শোভাসিংহ হত হয়েছিলেন। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ রমজান, ১৭ জুলুস তারিখে সম্রাটের প্রদত্ত ফরমানে উল্লিখিত (বঙ্গানুবাদ) আছে—"মৃত কৃষ্ণরাম বর্ধমানের

জমিদারী ১ লক্ষ টাকা নজর দিয়া প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র জগৎরাম রায়ও ঐরূপে পিতৃ সম্পত্তির সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরগণে চন্দ্রকোনার জমিদার রঘুনাথ সিংহ এবং চিতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভাসিংহ, সরকারে মালগুজারি না দিয়া বিদ্রোহী হওতঃ চাকলে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ দখল করে এবং কৃষ্ণরাম রায়ের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করতঃ তাঁহার বাটীন প্রায় ২৫ জন পরিবারবর্গসহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া শোভাসিংহও হত হয়। কীর্ত্তিচন্দ বাদশাহী সৈন্যের সহায়তায় শোভাসিংহের ভ্রাতা হেম্মত সিংহকে আক্রমণ করায় সে পলায়ন করিয়াছে; এক্ষণে উপরোক্ত জমিদারী পরগণে চন্দ্রকোনা ওগয়রহ কীর্তিচন্দকে বন্দোবস্ত করিয়া নজরানা স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করতঃ সনন্দ দেওয়া গেল এবং আদেশ করা যায় যে কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা যেন সরকারের আদায় দেওয়া হয়।"[৩০] এরপর শোভাসিংহের মৃত্যু ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রমাণের অর্থ হল ইতিহাসকে বিকৃত করা।

অপঘাতে শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিম্মতসিংহ বিদ্রোহীদের নেতারূপে মনোনীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের সমস্ত ক্ষমতা রহিম খাঁর হাতে চলে গেল। তিনি, রহিম শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সমগ্র ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। রহিম খাঁ মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার লুণ্ঠন করে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন এবং এই অর্থের সাহায্যে তাঁর সৈন্যদলে ১০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন।[৩১] মুর্শিদাবাদ অধিকারের সংবাদ পেয়ে জবরদস্ত খাঁ একদল সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদ আগমন করেন; এ কথা প্রচারিত হলে বিদ্রোহীরা ঢাকার পথে অগ্রসর হতে সাহস করে নাই। তবে রাজমহল ও মালদহের কিয়দংশ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব সকল সংবাদ অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম খাঁকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর পৌত্র (বাহাদুর শাহের পুত্র) আজিম-উস-শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। যেহেতু শাহজাদা ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, সে কারণে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে অস্থায়ীভাবে সুবাদার নিযুক্ত করে, তাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

রহিম খাঁ রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং অর্থের দ্বারা বশীভূত হয়ে কাশিমবাজার আক্রমণ করেন নাই। মুর্শিদাবাদ আক্রমণের সময় আফগান সৈন্যদলকে বাধা দিতে গিয়ে এতদঞ্চলের জায়গীদার নিয়ামত খাঁ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পরাজিত ও নিহত হন।[৩২] ঢাকা হতে অশ্বারোহী সৈন্যসহ জবরদস্ত খাঁ প্রথমে রাজমহল ও মালদহ পুনরাধিকার করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। ইংরাজ কুঠির প্রেরিত পত্র হতে জানা যায় যে, ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিদ্রোহীরা বাদশাহী সৈন্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে বর্ধমানে এসে আশ্রয় লাভ করেন এবং বিদ্রোহীদের অপর একটি অংশ মেদিনীপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করে অবস্থানরত ছিলেন। বিদ্রোহীদের যে সময়ে প্রায় পর্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে সময়ে নবনিযুক্ত

সুবাদার আজিম-উস-শান মুঙ্গেরে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের ফলাফল ও যশ গৌরব জবরদস্ত খাঁ-এর অনুকূলে যাওয়ায় শাহজাদা এক আদেশবার্তায় জানালেন যে, তিনি বর্ধমানে না পৌঁছানো পর্যন্ত জবরদস্ত খাঁ যেন আর অগ্রসর না হন। এইভাবে শাহজাদা মুঙ্গেরে এবং জবরদস্ত খাঁ বর্ধমানে শিবির স্থাপনপূর্বক বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, জবরদস্ত ছিলেন উচ্চবংশোদ্ভূত এবং তাঁর পিতামহ নবাব আলিমর্দান খাঁ শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের অধীনে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, কাবুল ও বাদাকশানের সুবাদার ছিলেন। জবরদস্ত খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করলে যদি পুনরায় তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, শাহজাদার মনে এরূপ ভীতির উদ্রেক হয়েছিল।[৩৩]

বর্ষাকাল অন্তে ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহজাদা দ্রুত রাজমহলের পথে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে, জবরদস্তের প্রতি নির্লিপ্তভাব প্রকাশ করায় জবরদস্তও তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে মনের ক্ষোভে ৮০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ও পিতা ইব্রাহিম খাঁ-সহ বর্ধমান ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট গমন করেন।[৩৪]

জবরদস্তের বর্ধমান হতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে আফগান শিবিরে উল্লাস দেখা দেয় এবং আজিম-উস-শান বর্ধমানে কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হয়ে অবস্থান করায় রহিম খাঁ পুনরায় নদীয়া ও হুগলী লুণ্ঠন করে বর্ধমানের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। নূতন সুবাদার পশ্চিমবঙ্গের জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ও নজরানা গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকায় বিদ্রোহ দমনের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। ক্রমশঃ প্রশ্রয় পেয়ে বিদ্রোহীদলের নেতা রহিম খাঁ বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হওয়ায় শাহজাদার চৈতন্যোদয় হল। দূত মারফৎ পত্রযোগে জানিয়ে দেওয়া হল, রহিম খাঁ আত্মসমর্পণ করলে তাঁর সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে অভয় প্রদানপূর্বক তাঁকে সম্রাটের অধীনস্থ উচ্চতর কোন পদে নিযুক্ত করা হবে।

কুটবুদ্ধিসম্পন্ন রহিম খাঁ শাহজাদার দুর্বলতা উপলব্ধি করে (জবরদস্তের অশ্বারোহী বাহিনীর অনুপস্থিতি) গর্বিতভাবে দূত মারফৎ মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন যে, যদি শাহজাদার উজির খাজা আনোয়ার স্বয়ং তাঁর শিবিরে উপস্থিত হয়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন, তাহলে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিষয় বিবেচনা করা হবে। নির্বুদ্ধিসম্পন্ন শাহজাদা শত্রুর মৌখিক আশ্বাসে বিশ্বাস করে তাঁর প্রধান উজির খাজা আনোয়ারকে রহিম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন। রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন, উদার স্বভাব ও সাধু প্রকৃতির উজির সুবাদারের আদেশে কোন বিচার বিবেচনা না করেই রহিম খাঁর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের অভিলাষে তাঁর শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মনে হয় উজির স্বেচ্ছায় শত্রু শিবিরে যান নাই। ইতিপূর্বে ওয়ালশের এক পত্রে জানা যায় যে, খাজা আনোয়ারের আপত্তি সত্ত্বেও শাহজাদা খাজা মনোয়ারের পরামর্শে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ডিহিকলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দ-

পুর গ্রামের জমিদারী ক্রয়ের অনুমতি দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কেবলমাত্র খাজা আনোয়ারের বাধা দেওয়ার ফলে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় নাই।[৩৫] সম্ভবতঃ বারংবার বাধা প্রদানের ফলে শাহজাদার বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় উজির অপর কোন কার্যে আপত্তি করেন নাই। দুর্গ (বর্তমান রাজবাড়ী) হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁকা নদী (প্রাচীন দামোদরের প্রবাহ) পার হয়ে খাজা আনোয়ার কয়েকজন সঙ্গীসহ, রহিম খাঁর শিবির দ্বারে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রহিম খাঁ বা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকায় উজিরের মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দেয়। সেকারণে সহসা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে শত্রু শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে শিবিরদ্বারেই অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করেন।[৩৬]

এদিকে রহিম খাঁ স্বীয় অহঙ্কারবশতঃ শিবিরের বাইরে না এসে, উজিরকে শিবিরের ভিতরে যাবার জন্য আদেশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তিনি বর্ধমান দুর্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন। অনুচরবৃন্দসহ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রহিম খাঁ অতর্কিতে উজির ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে উজিরও পশ্চাদপদ না হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সহায়তায় বাধা প্রদান করেন এবং শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিহত হন। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে।[৩৭]

খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পর গর্বোদ্ধত রহিম খাঁ শাহজাদার শিবির আক্রমণ করেন। গোলাম হোসেন সলিম, এ যুদ্ধের একটা সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনে বর্ণিত আছে[৩৮] যে, বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও রহিম খাঁ ও তাঁর অশ্ব উভয়েই হামিদ খাঁ কুরেশীর নিক্ষিপ্ত তীরে ধরাশায়ী হলে হামিদ খাঁ, রহিম খাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে বর্শার ফলকে গেঁথে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করায় আফগান সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। মোঘল-বাহিনী আফগানদের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক শিবির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেন। কিন্তু শাহজাদা এতেও ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আফগানদের নির্মূল করার আদেশ দেন এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে যশোহর, হুগলী ও বর্ধমান হতে আফগানরা একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু রহিম খাঁর মৃত্যুস্থান নিয়ে মত পার্থক্য আছে। স্টুয়ার্ট ও গোলাম হোসেন সলিমের মতে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তথায় রহিম খাঁ নিহত হন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকারের মতে শেষ চন্দ্রকোনার যুদ্ধে তিনি নিহত হন।[৩৯]

যুদ্ধ জয়ের পর আজিম-উস শান বর্ধমান শহরে প্রবেশ করে হজরৎ বহরাম সক্কার সমাধিতে নতজানু হয়ে অভিবাদন করেন। রহিম খাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা আরও দু'বছর বর্ধমানে অবস্থান করেন। প্রায় তিন বছর সময়কালে একটা বিশাল অঞ্চলে সাময়িক অরাজকতার জন্য কোন রাজস্ব আদায় হয় নাই এবং কার্যতঃ এই অঞ্চলে ফৌজদারের কার্যালয়েরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৫০টি পরগণা নিয়ে গঠিত বর্ধমান জমিদারীতে কোন রাজস্ব-আদায়কারী ও ফৌজদার না থাকায় প্রকৃতপক্ষে

এই অঞ্চলে শ্মশানের রাজত্ব বিরাজমান ছিল। শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য তিনি বর্ধমানে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ও জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করান।[৪০]

বর্ধমানে অবস্থানরত সময়ে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা সারা হিন্দুস্থানের ইতিহাসের উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই সময়ে শাহজাদা ধর্মালোচনা ও সাধুসন্ত সুফীদেরও সঙ্গদান করতেন। তাঁর সভায় মৌলানা রুমের কবিতা ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হত। বর্ধমান শহরে সাধুসন্তদের মধ্যে সুফী বায়াজিদ ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ; একদা আজিম-উস-শান তাঁর পুত্রদ্বয়কে বায়াজিদের নিকট আশীর্বাদ যাচঞার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। রাজপুত্রদ্বয় বায়াজিদের আস্তানায় প্রবেশ করলে তিনি তাদের 'সালাম আলেকুম' বলে সম্বর্ধনা জানালে জ্যেষ্ঠ করিম-উদ্দিন রাজকীয় গাম্ভীর্যবশতঃ নিরুত্তর রইলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ফারুখসায়র নগ্নপদে, নত শিরে অগ্রসর হয়ে পিতার বার্তা পেঁছে দিলে, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বায়াজিদ উত্তর দিলেন—**"Sit down, you are Emperor of Hindustan"** (মূল পার্শী হতে অনুবাদ)। অতঃপর শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে শাহজাদা হিন্দুস্থানের সিংহাসন যাচঞা করায় বায়াজিদ উত্তরে দেন—"আপনি যা যাচঞা করছেন, তা আমি ফারুখসায়রকে দান করেছি, কারণ হস্তচ্যুত তীরকে ফেরানো যায় না। আমার বাণী খোদাতাল্লার নিকট পেঁছে গেছে।"[৪১]

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! বায়াজিদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন দারাশুকো ও আওরঙ্গজেবের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল সামুগড়ের যুদ্ধে ; অনুরূপভাবে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন আওরঙ্গজেবের পুত্রগণের দ্বন্দ্বের প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জজো-এর (সামুগড়ের সন্নিকটে) রণক্ষেত্রে।[৪২] বাহাদুর শাহের পুত্রগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও আজিম-উস-শান ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে দিল্লীর মসনদ লাভে বঞ্চিত হন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাহান্দার শাহকে হত্যা করে ফারুখসায়র দিল্লীর মসনদ লাভ করেন। সম্রাট হয়ে ফারুখ পূর্ব কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি বর্ধমানে সুফী বায়াজিদের আস্তানায় একটা মসজিদ নির্মাণ করেয়েছিলেন, যা 'বন মসজিদ' নামে খ্যাত। উক্ত মসজিদটি কালনা রোডের পাশে রেল লাইনের ধারে অবস্থিত ছিল।[৪৩]

বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের জমিদার ও ভূস্বামীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর সৈন্যবাহিনী হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দননগর আক্রমণ করলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনুরোধে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ বাহ্যিকভাবে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করলেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষেও ইউরোপীয়গণের সাহায্য লাভ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

ইউরোপীয়গণ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী নয়, সেজন্য তারা চুঁচুড়া, চন্দননগর ও কলিকাতা কুঠিকে সুরক্ষা

করার জন্য নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট অস্থায়ী দুর্গ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানালে তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়। ইংরাজগণ বর্তমান 'বিনয় বাদল দীনেশ বাগে'র পশ্চিমে তাদের দুর্গ নির্মাণ করে দুর্গ প্রাকারে ইউরোপ হতে আনা কামান স্থাপন করে।

বিদ্রোহ দমনের শেষ পর্যায়ে সুবাদার আজিম-উস-শানের বর্ধমান শহরে অবস্থান-কালে ইংরাজ বণিকেরা ইব্রাহিম খান প্রদত্ত অস্থায়ী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বর্ধমানে দূত প্রেরণ করেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ইংরাজ বণিকদের পক্ষে ওয়ালস ও খাজা সুরহদ নূতন সুবাদারের নিকট ডিহিকলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয়ের জন্য আর্জি পেশ করেন এবং পাঁচ-ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্তের আভাস দেওয়া হয়।[৪৪] কিন্তু শাহজাদার প্রধান উজির খাজা আনোয়ার এরূপ কার্যের সুদূরপ্রসারী ফল বুঝতে পেরে শাহজাদাকে বাধা দিয়ে-ছিলেন। ওয়ালসের পত্রে (২২শে জুন) আরও জানা যায় যে, তারা খাজা মনোয়ারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করছেন।[৪৫]

আরও দু'মাস পরে আগস্ট মাসে খাজা আনোয়ারের হত্যা ও রহিম খাঁ নিহত হওয়ার জন্য গ্রাম তিনটি হস্তান্তরের কাজ পিছিয়ে যায়। অবশেষে জৈনুদ্দিন খাঁর মাধ্যমে শাহজাদা ফারুখসায়রকে প্রভাবিত করা হয়।[৪৬] শাহজাদা আজিম-উস-শান ছিলেন অলস ও বিলাসী; সুতরাং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি এই হস্তান্তরের পক্ষে সায় দিলেন। অবশেষে বর্ধমানের মাটিতে ১৬৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর সুবাদারের সম্মতিতে ১৬০০০্ টাকার বিনিময়ে ডিহিকলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানির ক্রয়কার্য, কাজির মোহর ও জমিদারের স্বাক্ষর গ্রহণের পর ইংরাজদের উপর বর্তায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়গণ ১৩০০্ টাকা পেয়েছিলেন (প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক খাজনা ছিল ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৫ পাই)।[৪৭]

বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোঘল শাসকদের অদূরদর্শিতার জন্য পরোক্ষভাবে যে বিষবৃক্ষ রোপন করা হল তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরাজ বণিকগণ দস্যু বিতাড়নের নামে এদেশে কায়েমী স্বার্থের বীজ বপন করে এবং ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুখসায়রের নিকট আরও ৫৫ খানি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব লাভ করে। ক্রমশঃ তারা বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে উক্ত ঘটনার প্রায় ৬০ বছর পরে পলাশীর প্রান্তরে সমগ্র সুবাবাংলার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার পূর্ণ পরিণতি হল সসাগরা ভারতবর্ষের উপর ইংরাজ একাধিপত্য ও ভারতবর্ষের পরাধীনতা।

(৩)

জগৎরাম রায় (১৬৯৯-১৭০২):

১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যার পর তাঁর একমাত্র পুত্র জগৎরাম রায় ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে

নূতন সুবাদার কর্তৃক বিদ্রোহ দমিত হলে চাকলা বর্ধমানে মোঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জগৎরাম রায় তাঁর পৈত্রিক জমিদারী ফিরে পান। বর্ধমানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে শাহজাদা আজিম-উস-শানের সুপারিশক্রমে হিজরী ১১১১ অব্দে (ইং ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ) ৫ই জমাদিয়ল আউয়ল তারিখে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে ৫০টি মহল বা পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও চৌধুরী উপাধিসহ ফরমান লাভ করেন। কিন্তু কীর্তিচাঁদকে প্রদত্ত ফরমান হতে অনুমান করা যায় যে, জগৎরামকে ৪৫টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল।

কালনার গিরিধারী মন্দিরে কৃষ্ণরাম হতে ত্রিলোকচন্দ্র পর্যন্ত একটা বংশতালিকার ইঙ্গিত রয়েছে। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ও গিরিধারী মন্দিরলিপি হতে পাঁচ পুরুষের বংশতালিকা নির্ণয় করা যায়। জগৎরামের পত্নী ব্রজকিশোরীর গর্ভে কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র কীর্তিচাঁদ ও পৌত্র ত্রিলোকচাঁদের আমলে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দিরে ব্রজকিশোরীর নামোল্লেখ হতে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

জগৎরাম মাত্র ৪ বৎসর কাল জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। তবে জমিদারী পরিচালনার ক্ষেত্রে পিতার জীবিত অবস্থায় তাঁর এরূপ অধিকার জন্মেছিল বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। হাওড়া জেলার রসপুরের জমিদার রামকৃষ্ণ রায়ের পৌত্র কুমুদপ্রসাদকে ১১০০ সালের ১১ই আষাঢ় (১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দ) তারিখে প্রদত্ত মহাত্তরাণ পত্রে ১৪১ বিঘা ভূসম্পত্তি দান কার্যে জগৎরামের স্বাক্ষর ছিল।[৪৮] বাংলা ১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে (ইং ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ, মার্চ মাস) তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময়ে জনৈক গুপ্ত-ঘাতকের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেকারণে বর্ধমানরাজ পরিবারের কোন ব্যক্তি ঐ অভিশপ্ত সরোবরে স্নান করেন না; এমন কি এর জলপান বা মৎস্য আহার পর্যন্ত করেন না।

(৪)

কীর্তিচাঁদ রায় (১৭০২-৪০) ঃ

জগৎরামের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ধমানের জমিদারী লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে কীর্তিচাঁদের সময় হতে এই বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়েছিল। সাহসী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কীর্তিচাঁদের সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁর যে বিশেষ সৌহার্দ ছিল তা পরবর্তী কার্যক্রম হতে অনুমিত হয়।

পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বছরের মধ্যেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে) অস্থায়ী সনদে দেখা যায়—'জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দকে বর্ধমান ওগয়রহ ৪৯ মহলের জমিদারী ও চৌধুরাই খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য সম্রাটের কোষাগারে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা নজরানা স্বরূপ জমা পড়েছে।'[৪৯]

কীর্তিচাঁদের আবেদনক্রমে (সম্ভবতঃ সুবাদারের সুপারিশক্রমে) হিজরী ১১১৫ সনের ২০ সওয়াল তারিখে (ইং ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে একটি সনদ লাভ করেন ঃ

মোহর

'আবল জাফর মহাম্মদ মহী উদ্দিন আলমগীর বাদশাহ গাজী ঃ অতি শুভক্ষণে এই মহামান্য প্রথম ফরমান প্রচারিত হইল যে—বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ বর্ধমান ওগয়রহার ৪৯ উনপঞ্চাশ মৌজার জমিদারী, জগতের পুত্র কীর্তিচন্দকে প্রদত্ত হইল। তাহার কর্তব্য যে, প্রজাগণ ও অপর জনসাধারণের সহিত সদ্ভাব করতঃ মহাল মজকুরার ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়, প্রজাগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হয়; সুবা মজকুরের প্রচলিত রাজস্ব যাহা প্রজাগণ পূর্বাবধি সেচ্ছাপূর্বক দিয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা কাহারও নিকট হইতে, কোন প্রকারে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা না হয়; বর্ত্তমানের সমস্ত নজরানা এবং জগতের নিকট প্রাপ্য নজরানার অবশিষ্ট টাকা, ধার্য্য কিস্তি অনুসারে সুবার ধনাগারে দাখিল করে। উপস্থিত ও ভাবী হাকিম কারকুন ও মোৎসদ্দিগণের কর্ত্তব্য যে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমিদার বলিয়া গণ্য করেন এবং কোন প্রকার পরিবর্তন না করেন এবং প্রতি বৎসর নূতন সনন্দ দাখিল করিতে না বলেন।[৫০] ২০ সওয়াল সন ৪৮ জুলুস [ইং ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ]।'

কীর্তিচাঁদ ৪৯টি পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদাররূপে নিযুক্ত হয়ে প্রায় ৩৮ বৎসর যাবৎকাল তাঁর জমিদারী পরিচালনা করেন ও জমিদারীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। যে সকল ভুস্বামীগণের চক্রান্তে তাঁর পিতামহ নিহত হয়েছিলেন তাদের দমন করার সুযোগে ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব হলে কীর্তিচাঁদ স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

কীর্তিচাঁদ একে একে চক্রান্তকারীগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন। 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

"বিষ্ণুপুর জমিদার বরদা প্রদেশ।
ভবানী প্রদেশ করে স্বয়ং আদেশ॥
পরে সন্ন্যাসীর দল রাখিতে শাসনে।
বর্দ্ধমান ভুপ চিন্তা করে সেই ক্ষণে॥"

কিন্তু মণ্ডলঘাট পরগণার অধিকার বিষয়ে মোহান্তদের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। কারণ ঐ পরগণা মোহান্তদের অধিকারভুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের ফলে সরফরাজ খাঁয়ের স্বাক্ষরিত ফরমানে আছে—মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদার জগন্নাথ চৌধুরীর পরিবর্তে কীর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেনের নামে হস্তান্তরিত হল।[৫১] তবে বালিগড়ী পরগণার অধিকার নিয়ে তারকেশ্বরের মোহান্তদের সঙ্গে কীর্তিচাঁদের দীর্ঘদিন লড়াই চলেছিল এবং অবশেষে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরসহ বালিগড়ী পরগণা বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত

হয়। এই যুদ্ধে বর্ধমানের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন কুমার কিশোরীচাঁদ ও জাহীর সিংহ এবং মোহান্ত বলভদ্রগিরির পক্ষে ছিলেন হীরা সিংহ ও ঋদ্ধিনাথ গিরি।

কীর্তিচাঁদ ভুরশুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠী পরগণা অধিকার করেন এবং এই জমিদারীটি অধিকারের ফলে সুকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের ভাগ্যে যথেষ্ট বিড়ম্বনা জুটেছিল। ভুরসুট পরগণার ব্রাহ্মণ জমিদার ফুলিয়ার মুখটি বংশের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তিন পুত্রের মধ্যে রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের উত্তরপুরুষ গড়ভবানীপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গড়বাড়ী ছিল পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োগ্রামে এবং তিনি দু' আনা জমিদারীর মালিক। ভুরসুট পরগণার দোগাছিয়া গ্রামে দু' আনা জমিদারীর মালিক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়।[৫২]

জনশ্রুতি যে, প্রতাপনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে কীর্তিচাঁদের সদ্ভাব ছিল না এবং তিনি গড়ভবানীপুর অভিযান করায় লক্ষ্মীনারায়ণের অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে এই অভিযান সফল হয় নাই।[৫৩] কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' কাব্যে আছে—

"রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্যে
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।"

রাজবল্লভ ছিলেন মুকুট রায়ের উত্তর পুরুষ এবং নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য। জ্ঞাতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে রাজবল্লভ কীর্তিচাঁদের সহায়ক হন এবং ফলে ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে কীর্তিচাঁদ গড়ভবানীপুর ও পেঁড়ো অধিকার করেন। জমিদার নরেন্দ্র রায় হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র অগ্রজগণের প্রতারণায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যথায় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু প্রমুখের ন্যায় কীর্তিচাঁদের অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হতেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে জমিদার কীর্তিচাঁদের প্রভাব আরও বেড়ে যায়। পিতামহকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তিনি বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ ও এর অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করেন এবং বিষ্ণুপুর জয়ের পর বিজয়োৎসব পালনার্থে কাঞ্চননগরে বারদুয়ারী নির্মাণ করেছিলেন। এই ঘটনার পর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের পতন শুরু হয় এবং বর্গী হাঙ্গামার ফলে এই বংশের ধ্বংস সাধন অতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের রাজার 'ফতেপুর মহল' দীর্ঘদিন বর্ধমানের অধীনস্থ ছিল।[৫৪] এরপর ঘাটালের যুদ্ধে চন্দ্রকোনা ও বরদার জমিদারগণকে পরাস্ত করে তাঁদের জমিদারী অধিকার করেন।' অতঃপর চিতুয়া ও মনোহরশাহী পরগণা তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল।[৫৫]

মনোহরশাহী পরগণা অধিকারের পর আরও উত্তরে ফতেসিং (মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্চল) পরগণাও বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু নবাব সুজাউদ্দিন কীর্তিচাঁদের এই আগ্রাসন নীতি পছন্দ করেন নাই। অধিকৃত পরগণাগুলির ফরমানের দাবীতে কীর্তিচাঁদ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। কিন্তু এই

অভিযানের ফলাফল জানা যায় নাই। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ হতে অনুমান করা যায় যে, নবাব কীর্তিচাঁদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৫৬] ১৭৩৭ খৃীস্টাব্দে সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান বলে তিনি চন্দ্রকোনার রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব লাভ করেন[৫৭] এবং অপর এক ফরমানের অধিকার বলে বিষ্ণুপুর ও হিম্মৎসিংহের অধিকারভুক্ত জমিদারী তাঁর হস্তগত হয়েছিল।[৫৮]

কীর্তিচাঁদের বর্তমানে তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় নিজ নামে কয়েকটি পরগণার জমিদারীর ফরমান পান এবং কীর্তিচাঁদ নিজে রাজা উপাধি না পেলেও তাঁর জীবিতাবস্থায় চিত্রসেন নবাবের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। 'সম্রাট মহাম্মদ শাহ বাদশাহ গাজি'র মোহরাঙ্কিত এবং দেওয়ান সরফরাজ খাঁর স্বাক্ষরিত হিজরী ১১৪৫ অব্দের ১লা সওয়াল, ১৩ জুলুসের ফরমানে আছে—"মণ্ডলঘাট পরগণনার জমিদার জগন্নাথ চৌধুরীদিগের পরিবর্তে বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে ১১৩৮ সাল হতে উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল।"[৫৯] ইতিপূর্বে নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য ১৭২৮ খৃীস্টাব্দে ইন্দ্রানা পরগণার জমিদার রামভদ্র চৌধুরীকে উক্ত পরগণার অধিকারচ্যুত করে চিত্রসেনের আনুকুল্যে ফরমান দেওয়া হয়েছিল।[৬০]

সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমানে কীর্তিচাঁদকে বিজিত জমিদারীর সরঞ্জমী নানকর, রসুম ও নজরানা গ্রহণ করার এবং দস্যু ও তস্করগণকে দমন করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সেই সময় হতেই রাজা উপাধি না পেয়েও জনসাধারণ তাঁকে 'মহারাজা' সম্বোধনে ভূষিত করেছিল।[৬১]

১৭২২ খ্রীস্টাব্দের নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র চাকলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কীর্তিচাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোট ৫৭টি পরগণার অধিকারী ছিলেন এবং নবাবের কোষাগারে ২০,৪৭,৫০৬ টাকা বার্ষিক রাজস্ব উসুল দিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কীর্তিচাঁদের জমিদারীর মোট আয়তন ছিল প্রায় ৫০০০ বর্গ মাইল।[৬২]

প্রভাবশালী জমিদার কুটবুদ্ধিসম্পন্ন এক দেওয়ানকে কার্যে সহায়ক হিসাবে পেয়েছিলেন। ভাগ্যান্বেষী পাঞ্জাবী যুবক মানিকচাঁদ বর্ধমানে এসেছিলেন এবং মানিকচাঁদের কৌশল ও বিশেষ সহায়তার ফলে তিনি সুবাবাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। মানিকচাঁদ পরবর্তীকালে চিত্রসেন, আলিবর্দী ও সিরাজদৌলার অধীনে দেওয়ান ও সেনাপতির কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাংলার অন্যান্য জমিদারগণও কীর্তিচাঁদকে বিশেষ সম্মান করত এবং তিনিও জমিদারগণের বিপদের সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। বীরভুমের জমিদার বদর-উল-জমান নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নবাব সুজাউদ্দিন তাঁর পুত্র সরফরাজকে দ্বিতীয় বক্‌সী সরফউদ্দিন ও খাজা বসন্তসহ বর্ধমানের পথে বীরভূম অভিযানের

জন্য প্রেরণ করেন। অনন্যোপায় হয়ে বদর-উল-জমান নবাবের নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করায় বর্ধমানের জমিদার তাঁর রাজস্বের জামিনদার হতে স্বীকৃত হলে তিনি বীরভূমে ফিরে যাবার অনুমতি লাভ করেন।[৬৩] ঐ যুগে একজন হিন্দু জমিদারের সাহস ও উদার মনোবৃত্তি সত্যই প্রশংসনীয় ছিল, এতে সন্দেহ নাই। কীর্তিচাঁদ প্রসঙ্গে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন[৬৪]—'Kirti Chandra was a man of bold and adventurour spitit' এবং 'Kirti Chandra Roy was a man of great valour.'

কীর্তিচাঁদের চরিত্র নানা গুণে ভূষিত ছিল। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পারিবারিক সম্মান রক্ষাকল্পে কৃষ্ণরামের হত্যাকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাস্তি বিধান করেছিলেন। অপরদিকে দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি, প্রজানুরঞ্জক ও সাহিত্যানুরাগিতার জন্য তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি বনে বাসকারী সাঁওতালদেরও তিনি বর্ধমান শহরে বসবাসের সুযোগ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[৬৫] সুজা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান ও বদর-উল-জমান-এর জামিনদার হওয়ায় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, মহত্ব ও উদারতা—এই সকল গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মাতার নামে বর্ধমান শহরে 'রানিসাগর' (সায়র) নামক হ্রদতুল্য বিশাল পুষ্করিনী খনন করান। রানিসায়রের তীরে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠালিপির তারিখ ১৭৩৩ শকাব্দ এবং মাতা ব্রজকিশোরীর নাম ভিন্ন অপর অংশের পাঠ নির্দেশ করা যায় নাই। রানিসায়রের পশ্চিমতীরে তাঁর পত্নী রাজরাজেশ্বরীদেবী কর্তৃক রাজরাজেশ্বরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৬] রাজরাজেশ্বরীর পিতামহ পীতাম্বর ট্যাণ্ডন ও পিতা বুলচাঁদ ট্যাণ্ডনও পাঞ্জাব হতে বর্ধমানে এসে বসবাস করেন।[৬৭]

ধেঞা পরগণা কীর্তিচাঁদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ ক্ষীর-গ্রামের 'যোগাদ্যা দেবী'র নূতন মন্দির নির্মাণ করান। তাঁর আমলে এটি হল প্রথম মন্দির। এ ছাড়া দাঁইহাটে কিশোর-কিশোরীর মন্দির ও একটা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে বর্গী হাঙ্গামার সময় ভাস্কররামের শিবিরে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাসাদের সন্নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটের পাশে দশেরা উৎসবের সময় (নবমীর দিন) আলিবর্দী মারাঠা শিবির আক্রমণ করেন। কীর্তিচাঁদের আমলে নির্মিত কালনার পঁচিশরত্ন বিশিষ্ট 'লালজি মন্দির' অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্য আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বর্ধমানের জমিদারবংশের আদি-বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুরে তিনি গোপেশ্বর শিবমন্দির (১৬৫৪ শকাব্দ) নির্মাণ করান। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেনের নামে বর্ধমান ও কালনায় দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আউসগ্রাম থানার দিগনগরের সন্নিকটে হাটকীর্তিনগরে যে গঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা আজও তাঁর নাম ও কীর্তিকে অক্ষয় করে রেখেছে।

তাঁর নানা প্রজাহিতৈষী কাজের মধ্যে মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ যাগেশ্বরডিহিতে বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ রাস্তার পাশে হ্রদতুল্য এক সুবিশাল পুষ্করিণী ও সম্ভবতঃ এই

গ্রামে 'যজ্ঞেশ্বর শিবলিঙ্গ' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছু কিংবদন্তীও জড়িত আছে এবং এ বিষয়ে একটা লোকগাথা কীর্তিচাঁদের কীর্তিকে আজও বিখ্যাত করে রেখেছে। লোকগাথাটির ধুয়ো হল[৬৮]—

"রাজা রাজ বলহো, রাজা রাজা বল।
যাগেশ্বরে দিয়ে দীঘি নাম যে রহিল॥"

মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, যা একটা ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন না। তাঁর জননী ব্রজকিশোরী পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনার্থে যাত্রার প্রাক্কালে নবাব সুজাউদ্দিনের স্বাক্ষরিত, ২৫ রজব, ১১ জুলুস হিজরী ১১৪৩ সন (খ্রীস্টাব্দ ১৭৩০) তারিখের প্রাপ্ত পরওয়ানা হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলার জমিদারগণের মধ্যে কীর্তিচাঁদের কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল। পরওয়ানাটির বঙ্গানুবাদ হল[৬৯]—"বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দের মাতা পুরুষোত্তমে সমুদ্র দর্শন করণার্থ গমন করিতেছেন। অতএব ঘাটওয়াল, চৌকিদার ও ফাঁড়িদারগণ নিজ নিজ সীমা হইতে তাঁহাকে নিরাপদে অপরসীমায় পৌঁহুছিয়া দিবে এবং তাঁহার কোন প্রকার বিপদ না হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে সতর্ক থাকিবে। তাঁহার ১৫ খানি জানানা সওয়ারি, ১৩ খানি মরদানা চৌপালা ও আনুষঙ্গিক লোক গমন করিতেছে।"

কীর্তিচাঁদের বিদ্যোৎসাহিতা সাহিত্যানুরাগ ও পণ্ডিতব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতার কথা সমসাময়িককালে রচিত মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁকে অমর করে রেখেছেন। ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর বাসস্থান ছিল দামোদরের দক্ষিণে কৈয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবি ঘনরাম ১৬৩৩ শকাব্দের (১৭১১ খ্রীস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে শুক্রবার তৃতীয়া তিথিতে 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কীর্তিচাঁদের প্রশস্তি প্রসঙ্গে ঘনরামের বারংবার উক্তি হল,—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥"

অথবা—

"মহারাজ কীর্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ
শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥"

উভয়ের সম্পর্ক যে অতি মধুর ছিল সেকথা কবির বর্ণনাতেই পাওয়া যায়—

"জগত রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায়॥

আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে ॥"

মুকুন্দ মিশ্রের 'বাশুলিমঙ্গল' কাব্য চাকলা বর্ধমানের মণ্ডলঘাট পরগণার আখুড়িয়া গ্রামে অনুলিখিত হয়েছিল বলে পুঁথিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শেষাংশে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের নামোল্লেখ আছে। এই অনুলিপির তারিখ ১৬৫৭ শকাব্দ বা ১১৪২ সাল বা ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ যে সময়টিকে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়-রূপে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ ও তেজচন্দ্রের সমসাময়িক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার আঘৈরা-শ্রীরামপুর নিবাসী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী কীর্তিচাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গয়ালগ্রামে কবির পুত্রগণ বসবাস করত এবং সম্ভবতঃ মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়ে ১২০৯ সালে তাঁর পুত্রগণের আনুকূল্যে ব্রহ্মোত্তর দলিল সম্পাদিত হয়েছিল। অকিঞ্চনের ভনিতায় পাওয়া যায়,[৭০]—

"মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে ॥"

অথবা—

"চিত্রসেনের তাত কীর্তিচন্দ্র নরনাথ
রাজা জগৎরায়ের নন্দন।
বসিয়া তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
শ্রীযুত কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥"

ধর্মমঙ্গলের অপর এক কবি নরসিংহ বসু ১৬৫৯ শকাব্দে (১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর পিতামহ মথুরা বসু কীর্তিচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ মথুরা বসু, তৎপুত্র ঘনশ্যাম বসু ও তৎপুত্র কবি নরসিংহ বসু কীর্তিচাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

কীর্তিচাঁদের অসামান্য গুণগ্রাহিতা ও পণ্ডিতজনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকায় ঐ যুগের সারা বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীতে একটা পুষ্করিণী দান করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁর কীর্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"ত্বৎকীর্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতি সংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্চনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দদৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥"

অনুবাদ ঃ "হে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র। তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত

হয়েছে। এ দেখে চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হল যে পাছে তাঁর স্বামীকে চিনতে না পারেন ; এই ভেবে তিনি নিজের স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাই এটি চন্দ্রকলঙ্ক হয়।"[১১] উপরোক্ত উপমাটি সত্যই শ্লাঘার বিষয়।

জমিদার কীর্তিচাঁদ নানা সদগুণে ভূষিত ছিলেন। ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,[১২]—"জগৎরামের অন্বর্থনামা পুত্র কীর্তিচন্দ্রের কীর্তি গৌরব সমগ্র বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিল। বর্ধমান চাকলার অধিকাংশ, হুগলীর মধ্যে ভুরশুট প্রভৃতি ও মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহরশাহী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারী—একটি রীতিমত রাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে রাজা কীর্তিচন্দ্রের সহিত ৫৭ পরগণার ২০, ৪৭, ৫০৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয়। বর্ধমান-রাজের অধিকৃত ভূভাগে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, ইক্ষু, তুলা, রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের ও অন্যরূপ ব্যবসায়ের কথা সেকালের ইংরাজ লেখকগণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।" তাঁর জীবদ্দশায় উত্তরে ফতেসিং পরগণা হতে দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের মোহনায় মণ্ডলঘাট পরগণা এবং পূর্বে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর (সাতসৈকা পরগণা ও সরস্বতী নদীর পূর্বাঞ্চল বাদে) হতে পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

জমিদার কীর্তিচাঁদকে নিয়ে বর্গী হাঙ্গামার যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা ইতিহাসসম্মত নয়। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। লোকগাথার রচয়িতা অথবা গঙ্গারাম দত্ত কীর্তিচাঁদের চরিত্রের বীরত্বব্যঞ্জক দিক তুলে ধরতে গিয়ে এরূপ অনৈতিহাসিক ঘটনা তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং সেটাই জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

সুদীর্ঘ ৩৮ বছর কাল প্রবল প্রতাপের সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করার পর পরিণত বয়সে ১১৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে তিনি পরলোকগমন করেন। দাঁইহাট শহরে গঙ্গার তীরে সমাজবাড়ীতে তাঁর অস্থি সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সমাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত খোদিতলিপি হতে একথার সমর্থন মেলে। তাঁর মৃত্যুকালে মাতা ব্রজকিশোরী, স্ত্রী রাজরাজেশ্বরী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিত্রসেন রায়, পুত্র চিত্রসেন রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিলোকচাঁদ রায় জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ রাজা বা মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত না হয়েও স্বীয় কীর্তির জন্য কীর্তিচাঁদকে বর্ধমান অঞ্চলের লোকেরা রাজা বলে জানত এবং মান্য করত। সমসাময়িককালে রচিত কবিদের মঙ্গলকাব্য হতে একথার সমর্থন মেলে। কালনার লালজি মন্দিরে খোদিত "যৎ-পুত্রাঃ পৃথিবীতলে সুবিদিতাঃ সৎ-কীর্তিচন্দ্রঃকৃতী" লিপিখানি ঐ একই কথাই আজও ঘোষণা করছে।

তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট হতে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন, তা একখানি সনদে উল্লিখিত আছে। তবে তিনি রাজা উপাধি ব্যবহার করতেন না একথা মনে করা যায়। সম্রাট মহাম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীর মোহরাঙ্কিত উজির কমরুদ্দিন খাঁ বাহাদুর কীর্তি-চাঁদকে জানিয়েছিলেন[১৩]—"যেহেতু বাদশাহের হুজুর হইতে আপনাকে রাজা উপাধিযুক্ত

পরওয়ানা চারিপারচা খেলাত ও একজোড়া মুক্ত প্রদত্ত হওয়ায় আপনার কর্তব্য যে ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করত সর্বদা সরকারের হিতাভিলাসী ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি না করেন।”

(৫)

রাজা চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪) ঃ

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় বর্ধমান জমিদারীর অধিকার লাভ করেন এবং ঐ বৎসরে রমজান মাসে সম্রাট মহাম্মদ শাহ প্রদত্ত নিম্নরূপ ফরমান (বঙ্গানুবাদ) বলে রাজা উপাধিসহ চাকলা বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন ঃ[৭৪]

মোহর

“বাদসা গাজী আবুল ফতা নাসীরুদ্দীন মহম্মদ

ওমদতন মোলক বখসীয়ান মোমালেক আমীরল ওমরা মমশামদ্দোল্লা খান দোরান বাহাদুর মনসুর জঙ্গের প্রার্থনানুসারে, অনুগ্রহ ও কৃপাপূর্বক এই শুভ সময়ে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ চাকলা বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্তিচাঁদ পরলোকগমন করায় তদীয় পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা নজরাণা গ্রহণ করতঃ রাজা উপাধিসহ উক্ত জমিদারী প্রদত্ত হইল। তাঁহার কর্তব্য যে, ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য চির বাধিত থাকিয়া স্বীকৃত নজরাণার টাকা সরকারি ধনাগারে প্রদান করেন। সরকারি মালগুজারি বাদে নানকর ও রসুম স্বয়ং গ্রহণ করেন। . সতত বাদসাহের অনুগত ও হিতাভিলাসী হইয়া, প্রজা বৃদ্ধি ও দস্যুদিগের দমনার্থে যত্নবান হয়েন। উক্ত পরগণার মধ্যে কোন দুরবৃত্ত কর্তৃক দৌরাত্ম না হয়। প্রজাগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ যাহাতে কৃষিকার্যের উন্নতি হয় তৎপক্ষে যত্নবান হয়েন। সরকারি খালেসা মহলের তহশীল ও জায়গীরদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি গোমস্তাগণকে সাহায্য করেন। সুবায় ও তাঁহার নায়েবদিগের অনুগত থাকিয়া, উল্লিখিত আদেশ সকল প্রতিপালন করিলে স্বীয় ধন ও মানেরই মঙ্গল জ্ঞান করিবেন। ২০ রমজান ২১ জুলুস (ইং ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ)।”

এছাড়া নবাব আলিবর্দীর ফরমান বলে (১লা রবিয়সসানি, ২২ জুলুস হিজরী ১১৫৪) আরসা পরগণার পূর্বতন জমিদার গোবিন্দদেবের পুত্র অধিকারচ্যুত হয়েছিল এবং চিত্রসেন সেটি স্বীয় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন।[৭৫] পিতার জীবিতাবস্থায় ইন্দ্রাণী ও মণ্ডলঘাট পরগণার খাজনা তাঁর নামে নবাব সরকারে জমা হয়ে আসছে।

চিত্রসেন নিজের জমিদারী ও বর্ধমান শহরকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন

এবং এই কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর পিতার আমলের দেওয়ান মানিকচাঁদ। মুর্শিদাবাদের নিজামতে মানিকচাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। পঞ্চকোট, বীরভুম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারগণের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য রাজগড়ে একটা দুর্গ নির্মাণ করান; যার অস্তিত্ব এই শতকের প্রথমভাগেও বর্তমান ছিল। এছাড়া অজয়নদের দক্ষিণতীরে বীরভুম সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জঙ্গলের মধ্যে সেনপাহাড়ীতে অপর একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে পারসী অক্ষরে উৎকীর্ণ রাজা চিত্রসেনের নামাঙ্কিত কামান পাওয়া যায়।[৭৬]

চিত্রসেনের সময়ে সুবাবাংলার রাজনীতি ছিল ঘটনাবহুল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক নবাব সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার প্রান্তরে নিহত হওয়ায় প্রথমাবস্থায় আলিবর্দী খাঁ বাংলার প্রতিষ্ঠিত জমিদার ও মুর্শিদাবাদের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাজা চিত্রসেনের দেওয়ান মানিকচাঁদের কর্মকুশলতার গুণে মুর্শিদাবাদের দরবারে চিত্রসেনের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সমসাময়িককালের ঘটনাপঞ্জী হতে অনুমান করা যায় যে, চিত্রসেন মুর্শিদাবাদের দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, যেখানে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকতে হত। নদীয়ার রাজবংশের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের সুসম্পর্ক ছিল না। ক্ষিতীশ বংশাবলিতে উল্লিখিত আছে যে, বর্ধমানাধিপতির দেওয়ান মানিকচাঁদ নদীয়ারাজের দেওয়ান রঘুনন্দনকে নবাব দরবারে অপমান করায় রঘুনন্দন তাঁকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে উত্তর প্রদান করেন। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মানিকচাঁদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্গী হাঙ্গামার সময় মানিকচাঁদ বর্ধমান হতে পলায়ন করে মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও নবাব দরবারে কর্মে নিযুক্ত হন। নবাব দরবারে নিযুক্ত হয়ে রঘুনন্দনের উপর প্রতিশোধের উপায় খুঁজতে থাকেন। হুগলী হতে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণের সময় নদীয়রাজের জমিদারীর অন্তর্গত পলাশীতে ঐ অর্থ লুণ্ঠিত হলে সমস্ত দোষ দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর বর্তায়। তাঁকে গর্ধভ পৃষ্ঠে বসিয়ে নগর ভ্রমণ করানোর পর তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।[৭৭]

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গী হাঙ্গামার সময়ে ভাস্কররামের অধীনে ২০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী লুণ্ঠন ও চৌথ আদায়ের জন্য বর্ধমানে উপস্থিত হলে এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে পতিত হয়। বর্গী হাঙ্গামার প্রারম্ভেই দেওয়ান মানিকচাঁদ প্রাণভয়ে বর্ধমান হতে পলায়ন করায় নবাব আলিবর্দী খাঁ ও রাজা চিত্রসেন উভয়েই গভীর সঙ্কটে পতিত হন।[৭৮] এই সময়ে বর্ধমান শহরকে রক্ষা করার নিমিত্ত তালিতগড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা গড় নির্মাণ করা হয়। কিন্তু বর্গী হাঙ্গামার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে চিত্রসেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে মুলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে পলায়ন করেন। তাঁর সভাকবি বাণেশ্বর তর্কালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পু' নামক খণ্ডকাব্যে এ সকল সংবাদ জানা যায়।[৭৯] এখানেও কবি ভারত-

চন্দ্রের সঙ্গে রাজার কর্মচারী রামচন্দ্র নাগের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কবি 'নাগাষ্টক' রচনা করে তাঁর মনের জ্বালা মিটিয়েছেন।

মহাম্মদ শাহের প্রদত্ত ফরমান হতে জানা যায় যে, চিত্রসেন 'গোয়ালাভুম' (গোপভুম) পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনেকে অনুমান করেছেন যে, তিনি গোয়ালাভুমের রাজা ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে জয়লাভ করেন। পারম্পরিক ঘটনাপ্রবাহের বিচার না করে চিত্রসেন ও লাউসেনকে একই ব্যক্তিরূপে সনাক্ত করলে ঐতিহাসিক ক্রম বিঘ্নিত হয় (বর্তমান গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পিতার ন্যায় চিত্রসেন প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে তিনি সর্বদা প্রজাগণের সুখদুঃখের অংশীদার ছিলেন। আলিবর্দীর সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল এবং মুর্শিদাবাদের কোষাগারে দেয় রাজস্ব যথাসময়ে উসুল হওয়ার কারণে তিনি নবাব দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বাকী খাজনার দায়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রায় লাঞ্ছিত ও কারাগারে কাল কাটাতে হত। সে কারণে বর্ধমানের রাজাকে কৃষ্ণচন্দ্র কোনদিনই সুনজরে দেখেন নাই, অথচ তিনি ছিলেন নিরুপায়। চিত্রসেন ২২, ৫১, ৩০৬ টাকা রাজস্ব ও জায়গীর তহফিরবাবদ ১৯, ১৬৬ টাকাসহ মোট ২২, ৭০, ৪৭২ টাকা নবাবের কোষাগারে জমা দিতেন।[৮০]

তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গুপ্তিপাড়া নিবাসী শোভাকর পণ্ডিতের বংশধর রামদেব তর্কবাগীশের পুত্র বাণেশ্বর রচিত 'চিত্রচম্পু' নামক (রচনাকাল ১৬৬৬ শকাব্দ) গদ্য-পদ্যাত্মক কাব্যগ্রন্থে চিত্রসেনের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় 'চন্দ্রাভিষেক' নামক নাটকের প্রস্তাবনায় রাজা চিত্রসেন ও মন্ত্রী মানিকচন্দ্রের (দেওয়ান মানিকচাঁদ) প্রশস্তি করেছেন[৮১]—

> "ধীরঃ শ্রীচিত্রসেনঃ ক্ষিতিপালকঃ শ্রীল মাণিক্যচন্দ্রো-
> মন্ত্রিস্তোমাগ্রগণ্যস্তদুভয় মিলনং রঙ্গহেমাভিষঙ্গং।
> আস্তাং ভুভুষণায় প্রকটিতমহিমা পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রৈঃ
> স্ফুর্জদ্দীপ্তিশ্চিরায় প্রথয়তু পরমং কীর্তিকর্পূররাশিম্ ।।"

চিত্রসেন মাত্র চার বছর বর্ধমান জমিদারীতে অধিষ্ঠিত থেকে ভগ্নমনোরথ চিত্তে বাংলা ১১৫১ সালে (ইং ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ) রাসপূর্ণিমার পূর্বদিনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ছত্রকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী নাম্নী দুই পত্নী জীবিত ছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় চিত্রসেন ইহলোক ত্যাগ করায় মৃত্যুর পূর্বে খুল্লতাত পুত্র ত্রিলোকচাঁদকে উত্তরাধিকারী (দত্তক?) মনোনীত করে যান।[৮২]

(৬)

মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় (১৭৪৪-৭০):

১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপুত্রক অবস্থায় রাজা চিত্রসেন রায় পরলোক-

গমন করায় তাঁর খুল্লতাতের পুত্র (জগৎরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও কীর্তিচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মিত্রসেন রায়ের একমাত্র পুত্র) ত্রিলোকচাঁদ রায় বর্ধমান জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। জমিদারীপ্রাপ্তির কাল হতে আমৃত্যু তাঁকে কঠোর সংগ্রাম ও কূটকৌশল অবলম্বন করে জমিদারী পরিচালনা ও রক্ষা করতে হয়েছিল ।

ত্রিলোকচাঁদের সমসাময়িককাল ছিল বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ। মারাঠা, শিখ ও জাঠ শক্তির অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষয়িষ্ণু মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ইতিমধ্যেই শিথিল হয়ে উঠেছিল। এহেন রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশের অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়। দক্ষিণ ও পূর্বভারতে বিদেশী বণিকগণ প্রভুত্ব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে। তিনি যে সময়ে জমিদারীর অধিকার পেয়েছিলেন বর্ধমানে শ্মশানের রাজত্ব বিরাজ করছিল। সশস্ত্র মারাঠাদের ও মীরহাবিবের পদাতিক বাহিনীর আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, খাদ্যবস্তু (মানুষ ও পশুর) সমূহ লুণ্ঠিত অথবা অগ্নিদগ্ধ, বাদশাহী সড়কের উভয় পার্শ্বের গ্রামসমূহ জনশূন্য, বর্ধিষ্ণু ও সম্পদশালী ব্যক্তিগণের দেশত্যাগের ফলে বর্ধমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্গী হাঙ্গামায় নবাব আলিবর্দী খাঁ ও বর্ধমানের জমিদার ত্রিলোকচাঁদ অধিকতর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এমন কি ত্রিলোকচাঁদের বিবাহ পর্যন্ত বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাউগাছিতে বসবাসের সময় ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় রূপকুমারীর সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের বিবাহ হয়েছিল।[৮৩]

ত্রিলোকচাঁদ হিজরী ১১৬৭ অব্দে (১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ) সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান বলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে রাজাবাহাদুর উপাধিসহ চার হাজার অশ্বারোহী ও দু'হাজার পদাতিক সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন।[৮৪] ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আহম্মদ শাহের ফরমান বলে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন।[৮৫]

ত্রিলোকচাঁদ ছিলেন স্বাধীনচেতা জমিদার। বাংলার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে। ঘটনাটি হল, রামরঞ্জন কবিরাজ নামক রাজার এক পদস্থ কর্মচারী জন উড নামক এক ইংরাজের নিকট ৬৩৫৭ টাকা কর্জ করেন এবং ঐ পাওনা টাকার জন্য জন উড মেয়রকোর্টে নালিশ করায় অনাদায়ীকৃত অর্থের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরওয়ানা পান। মেয়রকোর্টের পরওয়ানা বলে ত্রিলোকচাঁদের কলিকাতাস্থ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। উক্ত কার্যের প্রতিবাদে রাজা ক্ষীরপাই-এর ফ্যাক্টরী ও বর্ধমানের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দান করেন। এই কার্যের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ নবাব আলিবর্দী খাঁর স্মরণাপন্ন হন এবং ১লা এপ্রিল তারিখের এক পত্রে রাজার ঔদ্ধত্য ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য,

নবাবের নিকট প্রতিবাদ পত্র দাখিল করেন। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের একজন হিন্দু জমিদার নবাবের বিনা অনুমতিতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আলিবর্দী খাঁ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি ইংরাজদের আনুকূল্যে ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দান করেন, যাতে বিদেশী বণিকেরা অবাধে চাকলা বর্ধমানে ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারে। মহারাজা চৌকি বসিয়ে ইংরাজকুঠি বন্ধ করেছিলেন, তা উঠিয়ে নেওয়ার আদেশও জারী হয়েছিল বলে জানা যায়।[৮৬]

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ক্লাইভকে লেখা ওয়াটস্‌-এর পত্রে (১৭ই মে, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ) জানা যায় যে, নবাবের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করায় উমিচাঁদ বর্ধমানের রাজার নিকট হতে চার লক্ষ টাকা পেয়েছিল।[৮৭] ইতিপূর্বে ইংরাজরা যাতে খাদ্যদ্রব্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ যোগাড় করতে না পারে তার জন্য বর্ধমানের রাজার উপর সিরাজদৌলার নির্দেশ ছিল।[৮৮] (ওয়াটসের পত্র তারিখ—১৭.৭.১৭৫৬)। সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে বর্ধমানের জমিদার ত্রিলোকচাঁদ ও বীরভূমের জমিদার আসাদ-জামান ষড়যন্ত্রকারীগণের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। এরূপ কার্যের জন্য এই দুজন জমিদার নূতন নবাব দরবারে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন।

সিরাজদৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর নূতন নবাব মীরজাফর খান ইংরাজদের অনুগ্রহে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মীরজাফর কোম্পানিকে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে, চাকলা বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব হস্তান্তর করে নিষ্কৃতি পেলেও[৮৯] কোম্পানির সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের সুসম্পর্ক না থাকায় বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়রায়াণের মাধ্যমে আদায় হত। প্রথমাবস্থায় ইংরাজরা স্বীয় স্বার্থে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল, কারণ ঐ সময়ে নির্মীয়মান নূতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তৈরার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে প্রচুর শ্রমিক সরবরাহের প্রয়োজন দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী এলাকা বোঝাতে ত্রিলোকচাঁদের জমিদারীকেই বোঝাচ্ছে। তাছাড়া চাকলা বর্ধমানের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮,৫৬,১১৯ টাকা ৭ আনা ৬ পাই, যা বঙ্গদেশের যে কোন চাকলার রাজস্ব হতে অধিক। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্ণর হলওয়েলকে লিখিত হগ ওয়াটস্‌-এর এক পত্রে জানা যায় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ত্রিলোকচাঁদের সম্পর্ক মোটেই স্বাভাবিক ছিল না।[৯০] জমিদার মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ কোম্পানির কর্তৃত্বকে মেনে নিলেও কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন জড়িত থাকায় সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। ওয়াটস্‌-এর পত্র পেয়ে লেফঃ নোল্লিকিনসের অধীনে ৪৩০ জন সৈন্যের একটা দল বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে ৪৪ জন সৈন্য নিহত ও ৫৭জন আহত হয়েছিল।[৯১] যুদ্ধান্তে উভয়পক্ষের একটা মিটমাটের ব্যবস্থাও হয়।

মীরজাফর খানের পদচ্যুতির পর ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক চুক্তিতে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাবরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ঐ বছরের ১৭ই নভেম্বর তারিখের কোম্পানির কার্যবিবরণী হতে জানা যায় যে, চাকলা বর্ধমানসহ মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের সনদ ইতিমধ্যেই নবাব মীরকাশিম খানের নিকট ১৫ই অক্টোবর (১লা কার্তিক, ১১৬৬ সাল) তারিখে কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল।[৯২]

নূতন সনদ লাভের পর ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানি ও মীরকাশিমের বিরোধ যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা তিন পক্ষের পত্রাবলী হতে জানা যায়। মীরকাশিমের চরেরা সংবাদ সংগ্রহ করে কোম্পানির কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছে দিত। বর্ধমান বীরভুম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণ (ঐ সময়ে মেদিনীপুরে বহু জমিদার ছিলেন) বিদ্রোহ করতে পারে, এই সংবাদ মীরকাশিম কর্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ত্রিলোকচাঁদও প্রায় ১৫ হাজার পদাতিক সংগ্রহ করে, যাকে অনেকে ফকির বিদ্রোহের প্রথম পর্যায় বলে মনে করেছেন। বর্ধমানের রাজাকে উচিত শিক্ষা দেবার সুযোগ গ্রহণ করে কোম্পানি যেন প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীসহ বর্ধমান অভিযান করে; মীরকাশিমের পত্রাবলী হতে এসকল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বের ঘটনাবলী স্মরণ রেখে ইংরাজগণ নবাবের কথামত সহসা বর্ধমান আক্রমণ করে নাই। মেদিনীপুরের জমিদারগণকে মীরকাশিম কোম্পানির সহায়তায় দমন করেন এবং অতঃপর নবাবসৈন্য সহসা বীরভুমের জমিদার আসাদ জামান খানকে আক্রমণ করায় তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ত্রিলোকচাঁদ ও আসাদ জামান খান সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস নীরব হলেও ত্রিলোকচাঁদ সম্পর্কে এক সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায়[৯৩]—**"The early days of British rule in Burdwan were trouble ones. The Burdwan Raja was against this transfer of Government and rallied against the British authorities but Major White completely defeated him on the 29th December, 1760."**

বাংলার রাজনীতিতে অস্থিরতা, নবাব ও কোম্পানির অসহযোগিতা, বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে সাময়িকভাবে মারাঠা-তেলেঙ্গানা সৈন্যদলের হাঙ্গামা ও দেশব্যাপী অরাজকতার ফলে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব অনাদায়ী হয়, ফলে রাজাও দেয় রাজস্ব যথাসময়ে উসুল দিতে অক্ষম ছিলেন।[৯৪] ক্লাইভের অসুস্থতা ও ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু হয়। হলওয়েলকে অস্থায়ীভাবে গভর্ণর নিযুক্ত করার পর কোম্পানির সঙ্গে রাজার বিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত তিন মাস কাল যাবৎ মারাঠা ও তেলেঙ্গানা সৈন্যদল শিউভাটের নেতৃত্বে মেদিনীপুরসহ বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করে এবং বর্ধমান জমিদারীর অধীনস্থ মণ্ডলঘাট, মানকুর, চিতুয়া, ভুরশুট, বালিগড়ী, চৌমহা ও জাহানাবাদ পরগণায় প্রায় ২।০ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করে। অপরদিকে মীরকাশিমের নিযুক্ত সুলেমান বেগ নামক গুপ্তচরের নিকট সংবাদ

পাওয়া যায় যে, রাজা ১৫000 হাজার সিপাহী সংগ্রহ করছেন এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আরও ছোটখাট ঘটনা তাঁদের নজরে আনার চেষ্টা করেন। মীরকাশিমের নবাবী ও ইংরাজদের বর্ধমানের দেওয়ানী উপঢৌকন দেওয়ার বিষয় ত্রিলোকচাঁদ যে নির্বিধায়ভাবে মেনে নেয় নাই সে খবরও কলিকাতায় পৌঁছেছিল। মীরকাশিম কলিকাতার কাউন্সিলে আরও অভিযোগ করেন যে, বর্ধমানের ভূতপূর্ব জমিদার কীর্তিচাঁদ রায় চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোনার জমিদারী অধিকার করে নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট ফরমান আদায় করেছিলেন এবং ঐ ফরমান বাতিল করে পূর্বোক্ত জমিদারগণের বংশধরদের ফিরিয়ে দিলে বর্ধমানের রাজা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।[৯৫]

নবাবের নিকট হতে এসকল সংবাদ পেয়ে একদল ইংরাজ সৈন্যকে বর্ধমানে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য সৈন্যদলটি বর্ধমানে না গিয়ে মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করে। নবাব ইংরাজদের আরও পরামর্শ দিয়েছিল যাতে রাজা তাঁর সিপাহীবাহিনী ভেঙ্গে দেন। ইংরাজদের এই সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার অপর একটা কারণ অনুমান করা যায়। নবাব ও কোম্পানি—এই উভয়পক্ষের ষড়যন্ত্র ও রাজস্বের জন্য অত্যধিক চাপের ফলে ত্রিলোকচাঁদ মারাঠা সেনাপতি শিউভাটের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন[৯৬] এবং ত্রিলোকচাঁদ বীরভূমের জমিদার ও মারাঠাদের সহায়তায় সম্মিলিতভাবে মুর্শিদাবাদ অবরোধ করতে পারে, এই সংবাদ পেয়েই সম্ভবতঃ কোম্পানি রাজার সঙ্গে সংঘর্ষের পথ পরিহার করে।[৯৭]

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষ ভাগে কোম্পানির সঙ্গে রাজার বিবাদ এরূপ চরম পর্যায়ে পৌছেছিল যে, উভয়পক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হগ ওয়াটস, হলওয়েলকে যে পত্র প্রেরণ করেন তা'হতে জানা যায় যে, ব্রাউনের অধীনে ২০০ জন সৈন্যের একটি দল বর্ধমান অভিযান করতে গেলে রাজাও ৭।৮ শত সিপাহী নিয়ে বাধা প্রদান করেন। এই সংঘর্ষে কোম্পানির ৪৫জন সিপাহী মারা যায় এবং ৫৭জন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল। রাজা প্রায় ৫000 হাজার পাইক-বরকন্দাজ সংগ্রহ করছে, এ খবর পেয়ে ইংরাজগণ শহরের দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে বীরভূমের নূতন জমিদার সেরগড়, সেনপাহাড়ী, গোয়ালাভুম, আজমৎশাহী, মজঃফরশাহী ও মনোহরশাহী পরগণা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলেও ত্রিলোকচাঁদের পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানি এর কোন প্রতিকার করে নাই।[৯৮]

উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে অক্ষম হওয়ায় রাজা বর্ধমান শহর হতে পলায়ন করে সপরিবারে আত্মগোপন করায় ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের নেতৃত্বে একদল সৈন্য দামোদরের দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন পূর্বক অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে না যেতে হোয়াইটকে নিষেধ করা হয়েছিল। সৈন্যদলকেও কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন স্থানীয় জনসাধারণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে ; কারণ দেওয়ানগঞ্জের ঘটনা সম্পর্কে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ

সচেতন ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যদল কলিকাতা হতে হুগলীর পথে কালনায় উপস্থিত হয় এবং সেখান হতে তারা বর্ধমানের পথে অগ্রসর হতে থাকে। কলিকাতা হতে সংক্ষিপ্ততম পথে না গিয়ে দীর্ঘতম পথে অভিযানের (মার্চপাস্ট) অর্থ হল এতদঞ্চল কোম্পানির অধীন, একথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া ও রাজাকে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা অধীনতা স্বীকার করানো।

রাজা সেনপাহাড়ী দুর্গে অবস্থানরত আছেন এই সংবাদ অবগত হয়ে মেজর হোয়াইট সেনপাহাড়ী দুর্গ অবরোধ করে কামানগুলি দখল করে নেয় ও দুর্গের অন্যান্য দ্রব্যও লুণ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপর কিল্লাদার হায়ার সিংকে বন্দী করে দুর্গটিকে প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হয়।[৯৯] সম্ভবতঃ ত্রিলোকচাঁদ এই সময়ের পূর্বে সেনপাহাড়ী ত্যাগ করেছিলেন। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর কোম্পানির সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাতের সময় মিঃ সামনার বর্ধমানের রাজার জন্য রাজাধিরাজ উপাধি, ঝালরদার পালকি ও শিরোপা প্রার্থনা করায় দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সী নিজ তহবিল হতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য রাজরাজেন্দ্র উপাধি ও শিরোপা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ত্রিলোকচাঁদের ভাগ্যে সম্রাটের আনুকুল্য বর্ষিত হলেও এ যাত্রায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রার্থনা নিষ্ফল হয়। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সম্রাটের নিকট হতে রাজরাজেন্দ্র উপাধিসহ ঝালরদার পালকি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিলেন।[১০০]

কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরাজদের সঙ্গে ত্রিলোকচন্দ্রের একটা আপোস-মীমাংসা হওয়ায় কোন সংঘর্ষের সংবাদ জানা যায় না। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের এক ফরমান বলে তিনি 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি পান। পুনরায় ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিসহ ৫০০০ হাজার পদাতিক ও ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন। ত্রিলোকচাঁদ সম্রাটের নিকট হতে যেরূপে শেষ ফরমানখানি লাভ করেছিলেন, ঐ যুগে বহু জমিদারের এটি আকাঙ্ক্ষিত ও ঈপ্সিত ছিল। হিজরী ১১৮১ অব্দের রমজান মাসের ১৪ই তারিখে (১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ) প্রধান সেনাপতি মারফৎ তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহারের ফরমান লাভ করেন। এছাড়া সম্রাট প্রদত্ত ফরমানে আরও উল্লেখিত ছিল যে, তিনি সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী সৈনা ও কামান ব্যবহারের অধিকারপ্রাপ্ত এবং সৈন্যবাহিনীতে সামরিক বাদ্য ব্যবহারের অনুমতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান।[১০১] এ উপাধি সেকালে বাংলার অপর কোন জমিদারের ছিল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ইতিপূর্বে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তিন হাজার টাকার মূল্যের তিন প্রস্থ খিলাত পেয়েছিলেন (হস্তী-২০০০ টাকা, পোষাক-৬০০ টাকা ও শিরপেচ ৪০০ টাকা)।

১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৬ বছরের মধ্যে তিনি নিরুপদ্রবে এক বছরও

কাল কাটাতে পারেন নাই। সেকারণে তাঁর সময়ে বর্ধমানে বা রাজসভায় সাহিত্য-চর্চার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্ধমানের ঘটনা নিয়ে গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' লিখিত হলেও কবি, ত্রিলোকচাঁদের অনুগৃহীত ছিলেন না। এই সময়ে মেদিনীপুর জেলার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এরূপ মনে করা যায়। এছাড়া রাজপরিবারের দেওয়ান চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর ও তাঁর পুত্র নন্দকুমারের শাক্তপদ রচনার জন্য খ্যাতি ছিল। পরবর্তীকালে ব্রজকিশোরের পুত্র অকিঞ্চনও রাজঅনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাংলার সর্বপ্রধান জমিদার হিসাবে ত্রিলোকচাঁদ বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর আনুকূল্যে যে সকল টোল, দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভূমিদানই তাঁর অক্ষয়কীর্তিকে আজও স্মরণ করছে।

ত্রিলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সকল দেবায়তন নির্মিত হয়েছিল, স্থাপত্য ও অলঙ্করণের বিচারে সেগুলি ছিল শ্রেষ্ঠতর। তাঁর সময়ে কালনা শহরে পঁচিশরত্ন বিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালজী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া কালনায় অনন্তবাসুদেব, রূপেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বর শিব, কাশীনাথ শিব, বিজয় বৈদ্যনাথ শিবমন্দির নির্মাণ করান। বর্ধমান শহরে রাজবাড়ীর পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দির তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। শোনা যায় যে, রাজবাড়ীর একাংশের নির্মাণকার্য তাঁর আমলেই শুরু হয়েছিল (যেখানে বর্তমানে 'উয়োমেন্স কলেজ' স্থাপিত হয়েছে) এবং এই অট্টালিকার নির্মাণকার্য তেজচন্দ্রের আমলে শেষ হয়। ত্রিলোক-চাঁদের আমলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি তাঁর কীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

সারাজীবন ধরে সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যে জমিদারী পরিচালনা করে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুবিধাভোগী কর্মচারীগণের হাত হতে পৈত্রিক ও স্বীয় অধিকৃত জমিদারী রক্ষা করে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১১৭৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে, ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ) সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচাঁদ পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে দুই পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। প্রথমা পত্নীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বিষণকুমারী ছিলেন সেরগড় পরগণার অন্তর্গত উখরা গ্রামের মেহেরচাঁদ হাণ্ডের কন্যা ও বক্তারসিংহ হাণ্ডের ভগিনী। মেহেরচাঁদ লাহোরের মচ্ছিহাট্টা হতে বর্ধমানে আসেন এবং রাজানুগ্রহ ও পত্তনীদারী বন্দোবস্তের দরুণ এই বংশ এখনও উখরায় বসবাস করছে। মহারানী বিষণকুমারীর গর্ভে একমাত্র পুত্র তেজচন্দ্র ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী, ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তোতাকুমারী ও চিত্রকুমারী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে লাহোর নিবাসী আলমচাঁদ শেঠ ও দয়াচাঁদ শেঠের বিবাহ হয়েছিল। মৃত্যুকালে মহারাণী বিষণকুমারী ও সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর উপর নাবালক পুত্র ও জমিদারী পরিচালনার ভার অর্পণ করে যান।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈতশাসন এবং কোম্পানির রাজস্বনীতির

ফলে ত্রিলোকচাঁদের কোষাগার এরূপ শূন্য হয়েছিল যে, ৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারের উত্তরাধিকারীকে তাঁর পারলৌকিকক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত কোম্পানির নিকট অর্থ কর্জ করতে হয়েছিল। অথচ ইংরাজ রেসিডেন্টগণের প্রদত্ত বিবরণে তাঁর সম্পর্কে বহু ভুল তথ্য তুলে ধরা হলেও পিটারসন ত্রিলোকচাঁদের প্রশংসা করে গেছেন[১০২]—"The Maharaja of Burdwan whose province had been the first to cry out and the last to which plenty returned, died miserably towards the end of the famine, leaving a treasury so empty that the heir had to melt down the family plate, and, when this was exhausted, to beg a loan from the government in order to perform his father's obsequies.

(৭)

মহারাজা তেজচন্দ্র রায় (১৭৭০-১৮৩২) ঃ

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৭ সাল) মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর ছ'বছর বয়স্ক নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের অভিভাবকরূপে মাতা মহারানী বিষণকুমারী দেবী জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তেজচন্দ্রের জমিদারীর দায়িত্ব তাঁকে দিতে অনিচ্ছুক থাকলেও বিষণকুমারীর বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অবশ্য এর জন্য তাঁকে প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছিল। মহারানী তাঁর পুত্রের পদপ্রাপ্তির জন্য দশসহস্র মুদ্রা নজরানা-সহ এলাহাবাদে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট আবেদন করেন। হিজরী ১১৮৪ সনের ১২ সওয়াল ১২ জুলুস (১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে) তারিখে এলাহাবাদের দরবার হতে প্রধান সেনাপতি সয়ফৎ-উদ্-দৌল্লা মীরসারেফ খাঁর মাধ্যমে তেজচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ উপাধিসহ ৫০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, কামান, সামরিক বাদ্য, ঝালরদার পালকি ও তোগ (পতাকা) ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।[১০৩]

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল পদে ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর নিযুক্তির পর বর্ধমান জমিদারীর দেওয়ান মনোনীত করার বিষয়ে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে বিষণকুমারীর মতান্তর শুরু হয় এবং তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও ত্রিলোকচাঁদের আমলের দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর পরিবর্তে চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর রায়কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ান নিযুক্তির ব্যাপারে বর্ধমানের রেসিডেন্ট জন গ্রাহাম ও পরবর্তী রেসিডেন্ট চার্লস স্টুয়ার্ট উভয়েই দু'লক্ষ টাকা হিসাবে উৎকোচ গ্রহণ করে-ছিলেন।[১০৪] ব্রজকিশোরের সঙ্গে প্রথমাবধি মহারানীর বিরোধ ছিল এবং বর্ধমানের রেসিডেন্ট স্বাভাবিক কারণেই দেওয়ানের পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে মহারানী কাউন্সিলে অভিযোগ আনেন যে, ব্রজকিশোর ও রেসিডেন্ট, হেস্টিংসের সম্মতিতে তাঁর নাবালক পুত্রের আয় ও সম্পত্তির অপচয় ঘটাচ্ছে। হেস্টিংসের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও কাউন্সিলে ব্রজকিশোরকে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতে বাধ্য করা

হয়। মহারানীর অভিযোগে আরও জানা যায় যে, বর্ধমান জমিদারী হতে হেস্টিংস ১৫000 টাকা, তাঁর দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলাল ৫000 টাকা ও সহকারী কাশীলাল ৫00 টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে হেস্টিংসের পক্ষীয়গণ তীব্র বিরোধিতা করলেও[১০৫] ব্রজকিশোর রায়ের অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে হেস্টিংস জড়িত না থাকলে তদন্তের স্বপক্ষে তাঁর বিরোধিতার অপর কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল না।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কাউন্সিলের আদেশে ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করে মহারানীর হস্তে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং এ কাজের জন্য কাউন্সিলের সদস্যগণ দু'লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। মহারানীর অভিযোগে জানা যায় যে ব্রজকিশোর ১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিল এবং এর সিংহভাগ হেস্টিংস-এর প্রাপ্য ছিল। অবশ্য সংখ্যাধিক্যের জোরে অভিযোগ বাতিল হলেও বহু সদস্য নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, অভিযোগটি ভিত্তিহীন নয়। হেস্টিংসের জীবনীকারের মতে মহারাজ নন্দকুমার কর্তৃক আনীত অভিযোগ ইংলণ্ডে প্রচারিত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারানী অভিযোগ করেন এবং এটি হেস্টিংসের বিচারের সময় উত্থাপিত হয়েছিল।[১০৬] ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহারানী নিজে জমিদারী পরিচালনা করেও রাজস্ব জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় ১৫ বছর বয়স্ক তেজচন্দ্রকে জমিদারীর ভার অর্পণ করা হয়। ১১৮৪ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তেজচন্দ্রের পিতামহীর (ইনি অম্বিকার রানী নামে পরিচিত) মৃত্যু হয় এবং তাঁর দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্র রাজস্ব-জমা উসুল দিতে না পারায় নবকৃষ্ণ মুন্সী জামিনদার হন (২৫শে এপ্রিল, ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ)।[১০৭]

বিষণকুমারীর পরিচালনাধীনে ১৭৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে জমিদারীর দেয় রাজস্ব ৬ লক্ষ টাকা উসুল দিতে না পারায় হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ মুন্সীর গোপনচক্র সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শে নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল পদের জন্য আবেদন জানায়। নবকৃষ্ণ বর্ধমান জমিদারীর বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের জন্য তেজচন্দ্রকে ১২% হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন।[১০৮] এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি ২৬শে জুলাই-এর মধ্যে হেস্টিংসকে ৫% হার সুদে ৩ লক্ষ টাকা ধার দেন। হেস্টিংস-এর বিচারের সময় (ইমপিচমেন্ট) প্রকাশ পায় যে, তিনি ঐ অর্থ নবকৃষ্ণকে পরিশোধ করেন নাই এবং টাকা ধার নেওয়ার জন্য কোন সন্তোষজনক জবাব ছিল না। উৎকোচের তিন লক্ষ টাকা লিখিতভাবে ধার হিসাবে দেখালেও বিচারকগণ হেস্টিংস-এর জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না ; উপরন্তু প্রজাপীড়ন ও কোষাগার তছরুপের আংশিক দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তায়। নবকৃষ্ণ আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর ১½% হারে 'রসুম' (কমিশন) পেয়েছিলেন।[১০৯]

৪ঠা আগস্ট নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮ মাস বহাল ছিলেন। প্রথম বছরে তিনি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও পর-

বৎসর বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন এবং বাংলা ১১৮৮ সালে তাঁর সাজোয়াল পদের কার্যকাল শেষ হয়।[১১০] নবকৃষ্ণের জীবনীকার যদিও উল্লেখ করেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। মনে হয় এই সময় দেওয়ানী আদালতের জজ মিস্টার অস্টিন, মহারানী বিষণকুমারী ও দেওয়ান রামকান্তের অসহযোগিতাই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। নবকৃষ্ণের পদচ্যুতির পর ২০ বছর বয়সী যুবক তেজচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময় নবকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন ব্যক্তি সদাসর্বদা তেজচন্দ্রকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। ফলে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে তিনি জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে কার্যত অত্যধিক অমনোযোগী হওয়ায় বাকী খাজনার দায়ে তাঁর কয়েকটি পরগণা নিলাম হয়ে যায়।

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের নথিপত্র হতে জানা যে, রানী বিষণকুমারী ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মাসিক 8000 টাকা ভাতা বরাদ্দ নিয়ে অম্বিকাতে অবস্থানরত ছিলেন। ঐ বছর ২৫শে মে তারিখে গভর্ণর-জেনারেলকে লিখিত কালেক্টর কিনলোচের পত্রে তেজচন্দ্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে—[১১১]"....dangerous and intriguing persons have gained the young Raja's confidence and are leading him astray". কালেক্টর তেজচন্দ্র ও বোর্ডের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলেও তেজচন্দ্রের ব্যবহারে বোর্ডের সদস্যগণ ক্ষুব্ধ ছিল। ১,৭৬, ৪৬২ টাকা বাকী খাজনার দায়ে তেজচন্দ্রকে গৃহ-বন্দী করা হয় এবং বোর্ডের নির্দেশে কালেক্টর রাজার ৭টি হাতী, ১২টি ঘোড়া, ১টি উট, ১টি রুপার হাওদা, ১টি সোনার পাখা, দামী কার্পেট ও বহু মূল্যবান আসবাব-পত্র বাজেয়াপ্ত করেন এবং জমিদারীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরবর্তী কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের সুপারিশে জমিদারী পরিচালনার ভার পুনরায় বিষণকুমারীকে অর্পণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। রাজস্ববোর্ডের সভাপতি উইলিয়াম কুপারকে লিখিত কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের পত্রে (১১.১০.১৭৯৩) জানা যায় যে মহারানীর অংশের জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯, ৯৯, ৫৮৩ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই ২ কড়ি।[১১২] অতঃপর মাতা ও পুত্র পৃথকভাবে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান এবং ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষণকুমারীর মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ বন্দোবস্ত বহাল ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বর্ধমান জমিদারীর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলে যায়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তেজচন্দ্র কোম্পানির নিষেধ সত্ত্বেও একতরফাভাবে পত্তনীপ্রথার প্রবর্তন করায় তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা শুরু হয় এবং অবশিষ্ট বত্রিশ বছর সুনির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন। পত্তনীপ্রথার দৌলতে তাঁর আয়ের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ঐ সময়ে তিনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী জমিদাররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

তেজচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও প্রজানুরঞ্জক জমিদার ছিলেন। বর্ধমানে ইংরাজী শিক্ষা

প্রসারেব জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং এই সময়ে মিশনারীগণ এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সময় তাঁর নিকট হতে বিবিধ প্রকার সাহায্য লাভ করেছিল। কলিকাতার হিন্দু কলেজে এককালীন অর্থদানের জন্যে ঐ কলেজের পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্ধমান ও পার্শ্বস্থ জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু মন্দির নির্মাণ করেন এবং ঐ সকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে আজও তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। তেজচন্দ্রের সময়ে বর্ধমান শহরের সন্নিকটে নবাবহাটে ও কালনা শহরে একশ' নয়টি 'শিবমন্দিরক্ষেত্র' নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান শহরে বাঁকা নদীর উপর ও মগরায় সরস্বতী নদীর উপর সেতু দু'টি (প্রথমটি সংস্কার ও দ্বিতীয়টি নির্মাণ) তাঁর জনহিতকর কাজের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েও তেজচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিলাসী ও উচ্ছৃংখল। মধ্যযুগের আমীরওমরাহদের ন্যায় আটবার বিবাহের পরও তাঁর একজন বিদেশিনী রক্ষিতা ছিল। মহারানী বিষণ-কুমারী পর্যন্ত অভিযোগ করেন যে, তাঁর পুত্র রাজবাড়ীকে হারেমে পরিণত করেছে। তাঁর বিবাহিত আটজন পত্নীর নাম জানা যায়, যথা—(১) জয়কুমারী (২) প্রেমকুমারী (৩) সেতাবকুমারী, (৪) তেজকুমারী, (৫) কমলকুমারী, (৬) নানকীকুমারী, (৭) উজ্জ্বলকুমারী ও (৮) বসন্তকুমারী।[১১৩] মোট আটজন পত্নীর মধ্যে নানকী-কুমারী ব্যতীত অপর কোন পত্নীর জীবিত সন্তান ছিল না। বাংলা ১১৯৮ সালের ১০ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ) নানকীকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম হয়।[১১৪] উজ্জ্বলকুমারীর গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেও তারা অতি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং চতুর্থবারে সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ১২৩৩ সালের ১৩ই মাঘ তাঁর মৃত্যু ঘটে।[১১৫]

তেজচন্দ্রের আটবার বিবাহ-সূত্রে প্রচুর আত্মীয়স্বজনের রাজবাড়ীতে অবস্থান হেতু পারস্পরিক বিবাদ শুরু হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তেজচন্দ্রকে এর ফলভোগ করতে হয়েছিল। পারিবারিক অন্তঃকলহ শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এর ফলে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদকে বর্ধমান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অবশেষে প্রতাপের নিরুদ্দেশ বা অকালমৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পর প্রবল প্রতিপক্ষীয়েরা জয়লাভ করেন। তেজচন্দ্রের পত্নীগণের মধ্যে মহারানী কমলকুমারীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁর অদূরদর্শিতার ফলে কমলকুমারীর ভ্রাতা পরানচাঁদ কাপুরকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। কমলকুমারী ও পরানচাঁদের চক্রান্তে তেজচন্দ্র ও প্রতাপচাঁদ ক্রমশঃ অসহায় হয়ে পড়েন। অবশেষে বৃদ্ধের কামাহূতিতে পরানচাঁদ তাঁর এগার বছরের কন্যা বসন্তকুমারীকে আহূতি দিয়ে জমিদারীর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হন। তেজচন্দ্র নামে জমিদার হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন পরানচাঁদ। পরানচাঁদ একাধারে দেওয়ান ও পারিবারিক সম্পর্কে প্রথমে শ্যালক ও পরে শ্বশুর রূপে পরিচিতি লাভ করেন। প্রতাপের গৃহত্যাগের পর পরানচাঁদ তাঁর কনিষ্ঠপুত্র

চুনীলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করার পরামর্শ দান করেন। সবশেষে একতরফা-ভাবে প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পর তেজচন্দ্র, কমলকুমারী ও পরানচাঁদের হাতের ক্রীড়নক হয়েছিলেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট (২রা ভাদ্র, ১২৩৯ সাল) ৬৮ বছর বয়সে (৬২ বৎসরকাল জমিদার) ভগ্নহৃদয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

(৮)

রাজা প্রতাপচাঁদ (১৭৯১—১৮২১/১৮৫৬):

তেজচন্দ্রের ষষ্ঠ পত্নী নানকীকুমারীর গর্ভে প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় এবং জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় পিতামহী মহারানী বিষণকুমারীর নিকট সস্নেহে লালিতপালিত হন। আট বছর বয়ঃক্রমকালে পিতামহীর মৃত্যু হলে প্রতাপ-চাঁদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে বিষণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীন জমিদারী তাঁর নামে হস্তান্তরিত হয়।

নাবালক প্রতাপচাঁদের পক্ষে গঙ্গানারায়ণ মিত্র সরবরাহকার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মহারানীর এই হস্তান্তর প্রথমে অস্বীকার করলেও এই ব্যবস্থা তেজচন্দ্র ও কালেক্টর মানতে বাধ্য হন। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পত্রালাপ ও তথ্যাদি হতে জানা যায় যে, প্রতাপ মহারানীর অধিকৃত জমিদারীসহ মহারাজা উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলি হল—

1. 'Letter from Collector of Burdwan, reporting the death of Maharani Bishnu Kumari, the Zamindar of Burdwan and stating that no agent (*Mukhtar*) had appeared, requesting orders thereon. (7728) Dated-13. 11. 1798.'

2. 'Petition from Maharajadhiraj Pratap Chand Bahadur, informing the Board that his grandmother, the Late Rani, left the whole of the Zamindari of Burdwan to him and praying to be allowed to pay the revenue through his agent, and enjoy his estate. (7818) dated-2.1.1799.'

3. 'Petition from Ganganarayan Mitra, Manager (*Sarbarahkar*) of Maharajadhiraj Pratab Chand, informing the Board that he delivered a petition and a voucher (chalan) for the instalment due to the end of Kartik, together with the Rani's will, to the Collector of Burdwan, who would not accept it, and praying to be allowed to pay the money at Board's Office. (7819) Dated-2.1.1799.'

4. 'Letter from Collector of Burdwan, in reply to orders of

2nd January requiring a report upon the claim of Maharaja Pratab Chand to the Zamindari of Burdwan, in virtue of a mortgage deed (*Hebanama*) said to have been executed in his favour by the Late Rani. (7999) Dated-9.4.1799.'

5. 'Letter to Collector of Burdwan, transmitting a letter from the Secretary to Government, and of the Board's address to which it refers regarding the mortgage (*Hebanama*) supposed to have been ex‹cuted by the Late Rani of Burdwan. (8001) Dated-26.4.1799.'

সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জী সকাশে প্রেরিত প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের আবেদন-পত্রের বিষয়গুলির সঙ্গে উপরোক্ত রাজস্ববিষয়ক পত্রগুলির বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁরা আবেদনপত্রে জানিয়েছিলেন—"আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজা ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরেব পুত্র বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭শে পৌষ ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমাদের ৺প্রাপ্ত স্বামীর জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমিদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন।"

প্রতাপচাঁদ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর সাহস, বৈষয়িক বুদ্ধি ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য বর্ধমান ও কলিকাতার শিক্ষানুরাগী মহলে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। অপরিণামদর্শী মহারাজা তেজচন্দ্রকে আজীবন নারীসঙ্গদোষে ইন্ধন জুগিয়েছিল কাশীনাথ কাপুরের পুত্র পরানচাঁদ কাপুর। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় কাশীনাথ পাঞ্জাব হতে ভাগ্যান্বেষণে বর্ধমানে এসেছিলেন। তাঁর কন্যা কমলকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তেজচন্দ্র পঞ্চমবার দারপরিগ্রহ করেন এবং এই বিবাহসূত্রে পরানচাঁদ দেওয়ানের কার্যভার লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিষণকুমারীর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্র, পরানচাঁদ ও কমলকুমারীর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রতাপচাঁদের বিষয়বুদ্ধি জ্ঞানের ফলে পরানচাঁদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তেজচন্দ্র পরলোকগত মাতার সম্পত্তির বিরাট অংশ তাঁর নামে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কমলাকান্ত পিতা ও পুত্রের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করলেও পরানচাঁদ সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। বর্ধমানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পরানচাঁদ নানা-ভাবে তেজচন্দ্রকে কমলাকান্তের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ব্যবহারে প্ররোচিত করায় তিনি মহারাজাকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দেন। প্রতাপচাঁদকে দু'বার বিষ প্রয়োগে

হত্যার চক্রান্ত করেও পরানচাঁদ ও কমলকুমারী সফল না হওয়ায় অতি হীন ও জঘন্য চক্রান্তের জালে প্রতাপকে আবদ্ধ করা হয়। হুগলী কোর্টে সাক্ষ্যদানের সময় প্রতাপচাঁদ কোন প্রকারেই তাঁর প্রকৃত অপরাধের উল্লেখ না করলেও তাঁর জবানবন্দীতে পাওয়া যায়—"ক্রমে অধিক মদ খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।" এখন প্রশ্ন জাগে যে মহাপাপটি কোন শ্রেণীভুক্ত! একদিকে বিশাল জমিদারীর মালিক হওয়ার সম্ভাবনা এবং পাপ ব্যক্ত না করার জন্য অপরদিকে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে; অথচ পৈত্রিক সম্পত্তি ও জমিদারীর জন্য মামলা দায়ের করেও তিনি তা প্রকাশে অনিচ্ছুক। এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান (মনুসংহিতা ১০৪-৫/১১) হতে অনুমান করা যায় যে অপরাধটি ছিল 'গুরুপত্নীগামী' বা 'বিমাতৃগামী'। প্রতাপের দুই সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান। এক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, কমলকুমারীর যোগাযোগে ও হীন চক্রান্তের দ্বারা তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন, অবশ্য তেজচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে এটি ঘটেছিল। সম্ভবতঃ সুরাপানে মত্ত অবস্থায় কমলকুমারী কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রতাপচাঁদ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি অন্যান্য দোষে দোষী হলেও নারীঘটিত কোন দুর্বলতা তাঁর ছিল না। হুগলী কোর্টে কোন সাক্ষীই এবিষয়ে ইঙ্গিতও করেন নাই।

সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ধমান ত্যাগ করেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতাস্থ বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছদ্মবেশে থাকা অবস্থাতেও সকলে তাঁকে চিনতে পারায় তিনি বরকে একটি হীরকাঙ্গুরীয় দান করে পুনরায় নিরুদ্দেশ হন। বৃদ্ধ তেজচন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে চর্তুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন এবং বহু প্রচেষ্টার পর এক মুসলমান কর্মচারীর তৎপরতায় তাঁকে রাজমহল হতে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। প্রায়শ্চিত্ত না হওয়ায় গৃহত্যাগের জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে প্রতাপচাঁদ গুরুতর পীড়ার ভান করেন এবং প্রাণের কোন আশা নাই, একথা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে গঙ্গাযাত্রার জন্য তিনি ১৬ই পৌষ কালনায় গমন করেন। কেবলমাত্র রাজবল্লভ কবিরাজ ব্যতীত তাঁর নিজের কোন লোক কালনায় সহগমন করে নাই। এমনকি মহারাজা তেজচন্দ্র ও তাঁর পত্নীদ্বয়ও বর্ধমানে ছিলেন। সংবাদে প্রকাশ যে মহারাজা প্রতাপচাঁদ স্বাভাবিকরূপে বারদুয়ারী হতে নেমে হস্তীতে আরোহণপূর্বক অম্বিকাতে গমন করেছিলেন।

কালনায় তিন দিন অবস্থানের পর কবিরাজের পরামর্শে অন্তর্জলি করার ইচ্ছায় শেষযাত্রার জন্য রাত্রি দেড় প্রহরের সময় পালকি করে গঙ্গার ঘাটে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনা ঘটেছিল বাংলা ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ, বুধবার

(ইংরাজী ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী)। এরপর প্রতাপচাঁদের তিরোভাব ও আবির্ভাব রহস্যজনক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রতাপের মৃতদেহ তেজচন্দ্র বা তাঁর রানীদের দেখান হয় নাই। স্বভাবিক মৃত্যু হলে সে যুগে উইল সম্পাদন করা ও দত্তক গ্রহণ (নিঃসন্তানের ক্ষেত্রে) করার প্রথা ছিল। প্রচার যে, প্রতাপের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে অথচ তিনি কোন কার্যই সম্পাদন করেন নাই বা তাঁর রানীদের জন্য কোন ব্যবস্থা করে যান নাই। বর্ধমান রাজবংশের আরও প্রথা ছিল যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর ভস্ম সমাজগৃহ নির্মাণপূর্বক রক্ষিত হত ; কিন্তু তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রতাপচাঁদের সমাজ নির্মিত হয়েছিল। ঐ সময় একটা জনপ্রবাদ ছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই—অন্ধকার শীতের রাত্রে নৌকাযোগে পলায়ন করেছে। এ বিষয়ে তেজচন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে নিরুত্তর ছিলেন। তিরোধানের সময়ে প্রতাপচাঁদের বয়স ছিল ২৯ বৎসর ২ মাস ১০ দিন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর পরানচাঁদের কুপরামর্শে তেজচন্দ্র পুত্রবধূদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার শুরু করেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে বর্ধমান হতে প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমারী কর্তৃক কলিকাতাস্থ গভর্ণর জেনারেলের সেক্রেটারী হোল্ট ম্যাকেঞ্জীকে লিখিত পত্র হতে জানা যায় যে, তেজচন্দ্র ও পরানচাঁদ, বিধবাদ্বয়কে নানাভাবে উৎপীড়িত করেছিলেন।[১১৬] বর্ধমানের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জে· আর· হ্যাচিনসন, কালেক্টর এলিয়ট, রেজিস্টার এডমণ্ড মলোচি ও সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও হুগলীর জজ ওকলি তেজচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে প্রতাপচাঁদের নামে হুগলী জেলার জমিদারী অন্যায়ভাবে তেজচন্দ্রকে দেওয়ার আদেশ দেন (৬ই এপ্রিল, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে)। ঐ বৎসরের ১০ই নভেম্বর প্রতাপচাঁদের পত্নীরা সুপ্রিম কোর্টে তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এই মামলার ফলাফল জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, তেজচন্দ্রের অনুকুলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রতাপের পত্নীরা রাজবাড়ী হতে মাসোহারা পেতেন।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী (১৩ই মাঘ, ১২৩৩ সাল) সপ্তম রানী উজ্জ্বলকুমারীর মৃত্যুর পর পরানচাঁদের কৌশলে বংশরক্ষার প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে ৬৩ বছরের বৃদ্ধ তেজচন্দ্র পরানচাঁদের একাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এরপর পরানচাঁদ ও কমলকুমারী, পরানচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র চুনিলালকে 'দত্তকপুত্র' রূপে গ্রহণ করার জন্য তেজচন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও প্রতাপচাঁদের গৃহে প্রত্যাগমনের আশায় তিনি প্রথমে 'দত্তক' নিতে অস্বীকৃত ছিলেন। বিকৃতরুচির বৃদ্ধ জমিদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরানচাঁদ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে 'হরিহরমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দান করেন এবং পরানচাঁদ ও কমলকুমারী নাবালক চুনিলালের অভিভাবক নিযুক্ত হন। চুনিলাল বর্ধমান জমিদারীর মালিক হয়ে মহারাজা মহতাবচন্দ বাহাদুর নামে পরিচিত হন। ১৮৩৩

খ্রীস্টাব্দের ২২শে আগস্ট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, কমলকুমারীর অভিভাবকত্ব ও মহতাব্ চাঁদকে জমিদাররূপে স্বীকৃতি দিয়ে বর্ধমানে পত্র প্রেরণ করেন।

প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের ১৪ বছর ও তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের তিন বছর পর ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে গৌরাঙ্গসুন্দর এক সুপুরুষ সন্ন্যাসী বর্ধমান শহরে[১১৭] আবির্ভূত হলে গোপীনাথ ময়রা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, তারাচাঁদ ঘোষ প্রমুখ পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ ঐ সন্ন্যাসীকে 'প্রতাপচাঁদ' বলে সনাক্ত করে এবং অপরপক্ষে—'পরানবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খেতেছে।' বর্ধমান শহরে বসবাস করা নিরাপদ মনে না করে প্রতাপচাঁদ কাঞ্চননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু পরানচাঁদের নিযুক্ত লাঠিয়ালরা তথায় উপস্থিত হলে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের আশ্রয়প্রার্থীরূপে বাঁকুড়াতে বসবাস করলেও পরানচাঁদের চক্রান্তে মানভুমের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অজুহাতে তাঁকে বাঁকুড়ার জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং আট মাস পরে বিচারের জন্য হুগলী কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বর্ধমানে প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষে বহু সাক্ষী থাকার ভয়ে কয়েক লক্ষ টাকা উৎকোচস্বরূপ ব্যয় করে হুগলী কোর্টে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ বেলফোর ওগলবি তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে মামলাটি বর্ধমানের পরিবর্তে হুগলীতে স্থানান্তরিত করেন। হুগলী জেলার জর্জ কার্টিস সাহেবও যে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন, তার প্রধান প্রমাণ হল তিনি সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বেই বিচারের ফলাফলের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন। কোন কৌশলি নিযুক্ত করতে না দিয়ে একতরফা বিচারে ৬ মাস জেল এবং মুক্তির পর ৪০,০০০ টাকার পরিমাণে এক বছরের জন্য 'ফেলজামিন' দিতে হুকুম হয়। কলিকাতাস্থ নিজামত আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও জেলা জজের রায় বহাল থাকে। প্রতাপচাঁদ স্বীয় অপরাধ জানতে চাওয়ায় জজসাহেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, আসামী আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী এবং তার অপরাধ হল সে নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলে প্রচার করে লোক জোটাচ্ছে ও শান্তিভঙ্গ করছে। সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদ ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বর্ধমান শহরে আসেন এবং ঐ মাসেই বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন। আট মাস পরে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে হুগলীতে চালান দেওয়া হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জজসাহেব রায় দেন এবং ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেল হতে মুক্তিলাভ করেন।

জেল হতে ছাড়া পেয়ে তিনি তিনমাসকাল চুঁচুড়ার বিপরীত তীরে ভাটপাড়ায় (?) অবস্থান করেন। প্রতাপচাঁদ কলিকাতাস্থ তাঁর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করতে মনস্থ করেন এবং সাক্ষী যোগাড়ের জন্য বর্ধমান যাত্রা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রায় ৩০০ জন অনুগামীসহ প্রতাপচাঁদ ২রা মে, হুগলী হতে কালনা যাত্রা করেন। প্রতাপের কালনা আগমনের পূর্বেই বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ওগলবির নির্দেশে ক্যাপ্টেন লিটিলের অধীনে একদল সশস্ত্র সৈন্য কালনার গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায়। তিনি শান্তিপুরে পলায়ন

করেন এবং সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতাপচাঁদের উকিল ডাব্লিউ. ডি শ'কে পাইগাছির নীলকুঠি হতে বন্দী করে বর্ধমানের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ই মে 'ইংলিশম্যান পত্রিকা' ও 'বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা'র খবরে প্রকাশ যে, শ'-এর পক্ষে লেইথ সাহেব 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর (*writ of habeas corpus*) আবেদন করায় সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে মুক্তি দানের আদেশ দেয়। ওগলবির বিরুদ্ধে নরহত্যা ও বিনা বিচারে আটক করার অপরাধে তাঁকে ছুটিতে যাবার আদেশ দেওয়া হয় এবং পরে বর্ধমান হতে অন্যত্র বদলি করা হয়।

হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট ই. এ. সামুয়েল (পূর্বে বর্ধমানে ছিলেন) নিজেই সাক্ষী যোগাড়ের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সাক্ষী সংগ্রহ করার জন্য পত্র লেখেন। শোনা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর সাক্ষী হতে রাজী হয়েছিলেন ; কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি উক্ত কর্ম হতে বিরত ছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ অতি অল্পমূল্যে মহতাব্ চাঁদের নিকট রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েকটি কালয়ারীর বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন। সামুয়েল, যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মামলার তদ্বির করেছিলেন তাতে মনে হয় যে, ওগলবির অপেক্ষা তার ঘুষের পরিমাণ অল্প ছিল না।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর, হুগলীর জজকোর্টে বিখ্যাত 'জাল প্রতাপচাঁদ মামলা'র শুনানী আরম্ভ হয়। এই মামলায় সরকারী তরফে বিগনেল সাহেব ও প্রতাপচাঁদের পক্ষে মর্টন সাহেব আইনজ্ঞ ছিলেন। প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি হল,—

১। আলোক শা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী মৃত রাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করেছে।

২। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করে কলিকাতার ট্রেজারির দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাকের নিকট জবরদস্তিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করেছে।

৩। বেআইনি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ ও কালনায় লোক জমায়েত করেছে।

'জাল প্রতাপচাঁদ মামলায়' আসামীর স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য সাক্ষীগণের মধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ, ডাঃ রবার্ট স্কট, জন রিডলে, মিসেস হেরিয়েট কিটিং, মিসেস মফিয়া ক্রেন, ফাঁসুয়ে সুলেমান (চন্দননগর), মেজর জন মার্শাল (৭১নং পল্টনের ব্রিগেডিয়ার), হাজি আবু তালেব মোগল, ডাঃ জুলিয়ান নাইটার্ড, জন ফ্রেডারিক, গোলোকচন্দ্র ঘোষ, গোপীমোহন পরামাণিক, রামধন বাগদি, আমিরউদ্দিন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রামজয় সিংহ, হাকিম আলি উল্লা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, পিটার এমার, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা ইস্পাহানী, স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী, ভি এ. ওভারবেক প্রমুখের নাম করা যায়। সরকার পক্ষের সাক্ষীগণের মধ্যে সি. টি. ট্রোয়ার (প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমান ১৮০৮-১৭,) এইচ. টি প্রিন্সেপ, জেমস্ পিটার, জন বুচার, দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিতীয়বার

সাক্ষ্যদানে বিরত ছিলেন), রাধামোহন সরকার, বসন্তলালবাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান মহারাজার বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস ডু বোর্ড্যু (Charles Du Bordieuxe), গয়া হতে পত্র লেখেন (৩১শে মে, ১৮৩৬) যে, তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজী আছেন ; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাঁকে হুগলীতে আনা সম্ভব হয় নাই। সরকারী উকিলের আপত্তিতে প্রতাপচাঁদের মাতুল, পিতৃস্বসা তোতাকুমারী ও রাজবাড়ীর ডাক্তার হ্যালিডে সাহেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। সামুয়েলের আপত্তিতে রাজবাড়ীর প্রাক্তন চিকিৎসককে বারাণসী হতে আনা সম্ভব হয় নাই। সামুয়েল ও লিটলের ভয়ে তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্যদানে বিরত ছিলেন। সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য 'সমাচার দর্পণ' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেই সামুয়েল উক্ত পত্রিকা দুটির ৩০ কপি সংগ্রহ করে কোর্ট প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। প্রতাপচাঁদের পত্নীদ্বয় লোকলজ্জার ভয়ে প্রথমে সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতা ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁরা রাজী হলেও প্রতাপচাঁদের আপত্তিতে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই।

মামলাটি যে প্রচুর উৎকোচের বিনিময়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হুগলী কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়,—

১। প্রতাপচাঁদকে প্রথমবারে বাঁকুড়া জেলায় বন্দী করা হয়েছিল, সেকারণে তাঁর বিচার বাঁকুড়ায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার নাম ছিল 'পশ্চিম বর্ধমান জেলা'। তাহলে এই মামলার বিচার হওয়া উচিত ছিল বর্ধমানের জজসাহেবের আদালতে। বর্ধমানের জেলাজজকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করতে না পেরে পরানচাঁদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হুগলীতে মামলাটি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন।

২। দ্বিতীয়বারের বিচারের সময় 'চার্জ দাখিল' করা হয়েছে যে, ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে (মতান্তরে ৭ই মে) প্রচুর লোক জড়ো করে তিনি কালনায় হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাঙ্গামা ঘটেছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা শহরে, অথচ প্রতাপচাঁদসহ সাতশ' লোককে হুগলীতে চালান দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩। পরানচাঁদের ভয় ও দুর্বলতা ছিল এই যে, বর্ধমানের জজআদালতে মামলার শুনানি হলে বর্ধমানের বহু বিশিষ্টব্যক্তি, রাজবাড়ীর কর্মচারীবৃন্দ ও অন্তঃপুরের মহিলারা স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে পারে।

৪। বর্ধমানে প্রতাপচাঁদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ ছিল।

৫। জাল প্রতাপচাঁদের দাবী ছিল বর্ধমান জমিদারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে এবং এটি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল বর্ধমান অথবা কলিকাতার দেওয়ানী আদালতে। এই মামলায় মহতাবচাঁদ অথবা কমলকুমারী ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। অথচ সুকৌশলে বিনাকারণে সরকার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারী মামলায় তাঁকে দু'বার আসামী করেন। সরকারী মামলা চলাকালীন পরানচাঁদ সাক্ষী ও অর্থ সরবরাহ করেছিলেন

কার স্বার্থে ? মামলা চলাকালীন ভূমিরাজস্ব জমা না পড়লেও এই সময় কোন এক অজ্ঞাত কারণে জমিদারী নিলাম হয় নাই।

৬। ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসের পর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছায় প্রতাপচাঁদ অসুখের ছলনা করেছিলেন ; নচেৎ ঐ যুগে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে দত্তকপুত্র গ্রহণের রীতি ছিল—প্রতাপচাঁদ কোন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন নাই।

সাক্ষীদের জবানবন্দীর শেষে জজের সম্মুখে প্রতাপের বক্তব্য হল—"পরাণের আত্মীয় কুটুমের কথায় নির্ভর করে কেন আমার মাথা খাও ! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি কেহই ছিল না ? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।" জজ একথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই। আদালতে প্রতাপ আরও বলেন—"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমার পরম শত্রু, আমার বয়স ১৬।১৭, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার একটা ইঁদুরকে খাইতে দিই। ইঁদুরটি তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। শেষ অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলালবাবু আমার সর্বনাশ করিবার নিমিত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। তাঁহারা পিতার মন এরূপ ভারাক্রান্ত করিলেন যে, আমি তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না। আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই অধিক মদ খাইতে লাগিলাম। শেষে অদৃষ্ট দোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অশক্তে চতুর্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। তিনি এই সঙ্গে বলিয়া ছিলেন যে এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে যে সকলেই জানিবে —তুমি মরিয়াছ। বাড়ী হইতে পলায়ন করায় রাজমহল হইতে পিতাব লোকদ্বারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। প্রায়শ্চিত্ত হইল না দেখিয়া পীড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম। কালীপ্রসাদকে বলা ছিল সে ভাউলিয়া লইয়া ঘাটে থাকিবে এবং সঙ্কেতসূচক শাঁক বাজাইবে ; শঙ্খধ্বনি শুনিয়া বিকার রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এরপর অন্তর্জলিযাত্রার ব্যবস্থা হইলে গঙ্গার পাড়ে আনীত হইলাম। শীতকালের রাত্রে রাজবাড়ীর লোকেরা তাঁবুতে ছিল, অবসরেই সে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া ভাউলিয়ায় উঠি এবং রাত্রি শেষে সেটি মুর্শিদাবাদের উদেশ্যে যাত্রা করে।"

একজন কাজীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতাপচাঁদ ১৪ বছর কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেছেন তার বর্ণনা করেন। কালনায় কাশীপ্রসাদ পূর্বব্যবস্থা মত নৌকা প্রস্তুত রাখে এবং রাত্রি শেষে উভয়ে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করেন এবং তথা হতে ঢাকা-ব্রহ্মপুত্রনদ-চন্দ্রশেখর-আদিনাথ (এক বছর)-বৈত্তেশ্বরী-ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করে

বানেশনাথে এক বছর অবস্থান করেন। অতঃপর কাশী-প্রয়াগ-চিত্রকুট-অযোধ্যা-বৃন্দাবন-মথুরা কুরুক্ষেত্র-পুষ্কর প্রভাস-বদরিকাশ্রম-হরিদ্বার-হিঙ্গুলা-জ্বালামুখী-লাহোর-অমৃতসর দর্শনান্তে ছ'বছর কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। কাশ্মীর হতে দিল্লী হয়ে প্রথমে কলিকাতা (কালীঘাট) ও পরে বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন। সমুদয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত ছিল এবং এই বিবরণটি তাঁকে বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তারের সময় জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট সাহেব কেড়ে নেন ও পরে আর ফেরত পান নাই।

জবানবন্দী শেষ হলে, অপর একজন কাজী মন্তব্য করেন যে, ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ এমন জোরাল নয়, যার উপর ভিত্তি করে প্রতাপচাঁদ নাম ধারণের জন্য তাঁকে দণ্ড দেওয়া যায়। কিন্তু জজসাহেব তাঁকে দণ্ড দিতে কৃতনিশ্চয়। তাঁর মতে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ন্যূনতম পক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া উচিত। কাজী ও জজের মতের অনৈক্য হওয়ায় নিজামত আদালতে মামলাটি প্রেরণ করা হয়েছিল। নিজামত আদালতের রায়ে মৃত মহারাজা প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলোক শা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ'মাস কারাবাসের হুকুম হয়, তবে অন্যান্য চার্জ হতে মুক্তি দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতাপচাঁদ নিজামত আদালতে আপীল করায় বিচারপতি ডব্লিউ· রডিন ও সি·টুকার রায় দেন—"**The court further remarks, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Maharajah Protap Chand, they cannot, in future, receive any petitions or applications from him under that name and title.** ***Extract from order dated 19th July 1839.*** এই হুকুমই প্রতাপচাঁদের সর্বনাশের মূল কারণ হয়েছিল। তিনি প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি চাওয়ায় জজেরা তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করেন। অপরপক্ষে মামলা চলাকালীন যাঁরা প্রতাপ-চাঁদকে কর্জ দিয়ে সাহায্য করছিলেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সরকার যে কোন কৌশলে তাঁকে বর্ধমানের জমিদারীর অধিকার হতে বঞ্চিত করবেন। অতএব তাঁরা পুনরায় কর্জ দিতে রাজী হন নাই। জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহের সৌহার্দ ছিল এবং সরকার অবগত ছিল যে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই। যদি প্রতাপ-চাঁদ বর্ধমানের জমিদারী লাভ করে, তাহলে রঞ্জিৎ সিংহের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

মামলায় পরাজয়ের পর প্রতাপচাঁদ কিছুকাল চাঁপাতলায় (কলিকাতা) বাস করে গোবিন্দ পরামাণিকের কলুটোলার গৃহে দু' তিন মাস ছিলেন। শ্যামপুকুর পল্লীতে বসবাসের সময় লাহোরে ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি কোম্পানির রাজ্য হতে পলায়ন করে চন্দননগরের বড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসীদের আশ্রয়ে কয়েক বৎসর ছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাস জীবনযাপনের নিমিত্ত প্রায় ৭ বছর শ্রীরামপুরে বসবাস করেন এবং সেখানে তাঁর প্রচুর শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৫৬

খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগরে চলে আসেন ; এই সময়ে তাঁর শরীর অসুস্থ এবং আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল। অবশেষে ঐ বছরের ১৯শে নভেম্বর দু'-চার জন সঙ্গীসাথী পরিবৃত হয়ে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষযাত্রার সময়ে চোখের জল ফেলার জন্য কেউই উপস্থিত ছিল না। সঙ্গম রায়ের বংশ তথা শেষ বংশধর লুপ্ত হয়।[১১৮]

(৯)

মহারানি বসন্তকুমারী (১৮১৬-১৯০০) ঃ

মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু সময় তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী বসন্তকুমারীর বয়স ছিল প্রায় ষোল বছর। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তেজচন্দ্র তাঁকে কলিকাতা ও বর্ধমানে বহু স্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। কিন্তু ২১ বছর বয়ঃক্রম না হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ভোগ দখলে বঞ্চিত ছিলেন। এই সম্পত্তির পরিচালনভার পরানচাঁদ ও কমলকুমারীর উপর বর্তায়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বসন্তকুমারীর বয়স ২১ বছর উত্তীর্ণ হলে উক্ত সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগদখল ও অধিকার লাভের জন্য সুপ্রিমকোর্টে নালিশ করেন। তাঁর হলফনামায় আরও বলা হয়েছিল যে, পরানচাঁদ ও কমলকুমারী তাঁকে প্রকারান্তরে নজরবন্দী করে রেখেছে। বসন্তকুমারী বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজসাহেবের নিকট আবেদন করেও কোন প্রতিকার হয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর উকিল ডব্লিউ. এন. হেজর, সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করায় জজ সি.টুকার আদেশ দেন যে, ঐ রানি স্বেচ্ছামতে সর্বত্র গমনাগমন করার অধিকারিণী এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তির পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে সক্ষম। নগর দেওয়ানী আদালতের রায় বর্ধমানের জজ সাহেব নানা কারণে স্থগিত রাখার চেষ্টা করায় তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়।

কলিকাতাস্থ নূতন চীনাবাজারের অধিকারিণী ছিলেন বসন্তকুমারী। পূর্বোক্ত মামলা চলাকালীন তাঁর কর্মচারী মদনমোহন কাপুরকে কর্মচ্যুত করে উইলিয়ম প্রিন্সেপ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেজর সাহেবকে প্রজাগণের নিকট ভাড়া আদায়ের অধিকার প্রদান করে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে বসন্তকুমারী এক নোটিশ জারী করেন।

বর্ধমান ও কলিকাতায় মামলার সময় বসন্তকুমারীর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। পিতার শঠতা ও লোভের কাছে বলি দিয়ে নিজেকে তিনি বঞ্চিতা করে রেখেছিলেন। মামলা চলাকালীন তাঁর এটর্নি কারটেগোর এণ্ড কোম্পানির উকিল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ লাভ ঘটত এবং সুপুরুষ ও বিপত্নীক দক্ষিণারঞ্জনও রানির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। সম্ভবতঃ মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে বা সম্পত্তির তদারকির জন্য বসন্তকুমারী কলিকাতায়

গিয়েছিলেন এবং আর বর্ধমানে প্রত্যাগমন করেন নাই। এবিষয়ে টমাস এডওয়ার্ড অনেক মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যার মধ্যে বহু অতিরঞ্জিত তথ্য আছে। সম্ভবতঃ ১৮৪৩-৪৯ সালের মধ্যে বসন্তকুমারীর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের হিন্দুমতে বিবাহ হয়। গড়ুগড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। এতদ্সত্ত্বেও অসবর্ণ বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বিবেচিত হতে পারে এই আশঙ্কায় তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে সাক্ষী রেখে সিভিল ম্যারেজ সিদ্ধ হয়েছিল। কর্মসূত্রে নানাস্থানে অবস্থান করার পর শেষজীবনে তাঁরা অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ-এ বসবাস করেন। তাঁদের এক পুত্র ও দু'টি কন্যাসন্তান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ও বসন্তকুমারী ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।[১১৯]

(১০)

মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চাঁদ (১৮৩২-৭৯):

তেজচন্দ্রের শেষ ইচ্ছানুসারে মহতাব্ চাঁদ বর্ধমানের জমিদারী লাভ করেন। 'জাল প্রতাপচাঁদ' সংক্রান্ত মামলা প্রকাশ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় হলেও এই মামলা পরিচালনার জন্য যে প্রভুত অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার সবটাই মহতাব্ চাঁদের অভিভাবক পরানচাঁদকে বহন করতে হয়। সেকারণে সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারায় আংশিক জমিদারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয় এবং অবশেষে সমগ্র জমিদারীকে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র অধীনে রেখে একজন কমিশনারকে বর্ধমানে পাঠান হয়।

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চাঁদ বাহাদুর স্বহস্তে বর্ধমানের জমিদারীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে জমিদারীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হলেও বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। বর্ধমানের রাজাদের একমাত্র পরিচয় ছিল এই যে, তাঁরা প্রভুত অর্থ ও সম্পত্তির মালিকরূপে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান জমিদার। পত্তনীতালুক ও কলিয়ারী ইজারা দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং অপরদিকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে পরিচিত ব্যক্তি ও দেববিগ্রহের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে আদর্শ জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। বর্ধমান জমিদারীর প্রায় সবটাই পত্তনী তালুকরূপে ইজারা দেওয়া ছিল এবং সাধারণ প্রজার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না বা পত্তনীদার ও দরপত্তনীদারগণের অত্যাচার ও জুলুম হতে চাষী বা প্রজাকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন নাই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়েও তাঁরা স্বাভাবিক কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সহায়তা করে গেছেন এবং সে কাজের ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁরা সরকারী খেতাব, ছোটলাট ও বড়লাটের কাউন্সিলে সম্মানজনক সদস্য পদটি লাভ করতেন। বর্ধমানের এই সামন্ততান্ত্রিকবংশটি চরিত্রগতভাবে বঙ্গদেশের অন্যান্য জমিদারশ্রেণী হতে পৃথক ছিল না।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ) সময় এঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরাজদের সহায়তা করেছেন।

পাঞ্জাব নিবাসী কেদারনাথ নন্দ, পুত্র বংশগোপাল নন্দ ও কন্যা নারায়ণকুমারী (জন্ম ৫ই জুন, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ) সহ বর্ধমানে বসবাস করতেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে নারায়ণকুমারীর সঙ্গে মহতাব্ চাঁদের বিবাহ হয়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী বহু চক্রান্তের অংশগ্রহণকারী মহারানি কমলকুমারীর মৃত্যু হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে যোগদান করেন। মহতাব্ চাঁদের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মার্চ বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ইনিই কুমার আফতাব্ চাঁদ নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তী বংশধরগণের প্রসঙ্গে বলা যায় যে সঙ্গম রায়ের শেষ বংশধর প্রতাপচাঁদের পর দেওয়ান পরানচাঁদ কাপুরের বংশই জমিদারী পরিচালনা করেছিল। পরানচাঁদের অপর এক পুত্র রাসবিহারী, সোঁয়াই নিবাসী গোপাললাল শেঠ তলওয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র জহুরিলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ইনি পরবর্তীকালে রাজা বনবিহারী কাপুর নামে পরিচিত হন। বনবিহারী কাপুরের কর্মনিষ্ঠার গুণে ইনি মহতাব্ চাঁদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের 'দেওয়ান-ই-রাজ'-এর পদ লাভ করেন। অপুত্রক অবস্থায় আফতাব্ চাঁদের মৃত্যু সময় বনবিহারীর পুত্র বিজনবিহারীকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান। এ সিদ্ধান্ত নারায়ণকুমারীর মনঃপূত হয় নাই। বংশতালিকা হতে পাওয়া যায় যে, তেজচন্দ্রের পর বর্ধমান রাজবংশের ধারা পরানচাঁদ কাপুরের উত্তরপুরুষের উপর বর্তেছিল যা তাঁর একান্ত কাম্য ছিল এবং এই কামনা বাসনাকে সফল করার জন্য প্রতাপচাঁদকে তাঁর জীবন বলি দিতে হয়।

সাহিত্যানুরাগী জমিদার হিসাবে মহতাব্ চাঁদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু বর্ধমানের প্রাথমিক শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি শাক্তপদ রচনা করে গেছেন। তাঁর সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ধমানে যাতায়াত ছিল। বিদ্যাসাগর মহতাব চাঁদকে '*First Man of Bengal*' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিধবাবিবাহের আইন প্রণয়নের জন্য যে আবেদন করা হয়, তাতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে হরিবংশ, রামায়ণ, চাহারদরবেশ, সিকন্দরনামা, মসনবী আলাও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত বহু প্রাচীন গ্রন্থ রাজবাড়ীর মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভারতের অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নাই। এই অসমাপ্ত

কাজটি আফতাব্ চাঁদের আমলে সমাপ্ত হয়। এই শুভ কাজটি শুরু হয়েছিল ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে মহারানি ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' রূপে ঘোষণার সময় সভায় মহতাব্ চাঁদ উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সভায় তাঁর নামের পূর্বে 'হিজ হাইনেস্' শব্দ ব্যবহার ও ১৩টি কামান রাখার অধিকার প্রদত্ত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে মহতাব্ চাঁদই একমাত্র জমিদার যিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন। উপাধিপ্রাপ্তির প্রতিদান স্বরূপ তিনি মহারানি ভিক্টোরিয়ার একটি শ্বেতমর্মর মূর্তি জনসাধারণকে উপহার দেন এবং এটি কলিকাতার যাদুঘরে স্থাপিত আছে; লর্ড লিটন এই মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন। বর্তমান রাজপ্রাসাদ 'মহতাব্ মঞ্জিল' তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর বায়ুপরিবর্তনের জন্য ভাগলপুরে গিয়েছিলেন এবং তথায় ৫৯ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। কালনার সমাজবাড়ীতে ত্াঁর দেহাস্থি প্রথিত আছে। মহতাব্ চাঁদের সময় বর্ধমান রাজবাড়ীর ভু-সম্পত্তি ও নগদ অর্থের পরিমাণ প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। মহতাব্ চাঁদ সম্পর্কে বর্ধমানবাসী আবদুর গনি-খানের একটি সুন্দর মন্তব্যে জানা যায় যে, তিনি পাঞ্জাবী পাগড়ির পরিবর্তন ঘটিয়ে শিরস্ত্রাণের জন্য 'মহতাব্ ক্যাপের' ব্যবহার শুরু করেন। এ জাতীয় টুপি তৎকালে বর্ধমান শহরের গোলাহাট ও পুরাতনচকের কারিগররা তৈরী করত।[১২০]

মহারাজা আফতাব্ চাঁদ মহতাব্ (১৮৭৯-৮৫):

মহতাব্ চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র আফতাব্ চাঁদ ১৯ বছর বয়সে বর্ধমান জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন এবং তিনি মাত্র পাঁচ বছর বর্ধমানের গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্বলচিত্তের মানুষ আফতাব্ চাঁদ বয়সে অত্যন্ত নবীন হওয়ায় তাঁর সময়কালে জমিদারী পরিচালনার বিষয়ে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ছিল। মহতাব্ চাঁদের সংগৃহীত প্রচুর অর্থ ও ধনরত্নের অধিকাংশই রাজকোষে জমার পরিবর্তে রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাদের হস্তগত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে বনবিহারী কাপুর জমিদারী কার্য পরিচালনা করতেন। আফতাব্ চাঁদ নিজ ব্যয়ে বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর আমলে তেজচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী হাই স্কুলটিকে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয়েছিল। শহরের জলকষ্ট নিবারণার্থে ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে লাকুর্ডিতে জলকল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ পাবলিক লাইব্রেরীর বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পত্নী বিনোদেয়ী দেবীকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পরে বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ (১৮৮৭-১৯৪১) :

আফতাব্ চাঁদের ইচ্ছানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করা তাঁর মৃত্যুর পরেই সম্ভবপর হয় নাই। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে নারায়ণী দেবীর সঙ্গে বিনোদেয়ী দেবীর মনোমালিন্যের কারণে দত্তকপুত্র গ্রহণে বিলম্ব ঘটেছিল। আফতাব্ চাঁদের মৃত্যুর দু'বছর পরে দত্তকপুত্র গ্রহণের ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি প্রমাণস্বরূপ কলিকাতাস্থ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি নিমন্ত্রণ পত্র উদ্ধৃত করা গেল,—[১২১]

"শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জয়তি

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—আমার পতি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ ৺আফতাব্ চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে এবং বঙ্গদেশাধিপতির সম্মতিক্রমে বিগত ৬ই শ্রাবণ যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছি, আগামী ১৬ই শ্রাবণ [৩১শে জুলাই, ১৮৮৭] রবিবার তদুপলক্ষে বৈদিক ক্রিয়া ও উৎসবাদি হইবে। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্দ্ধমান রাজভবনে শুভাগমনপূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

পত্রিকা নিমন্ত্রিকা হইল। ইতি

সন ১২৯৪ সাল ১৪ই শ্রাবণ

মহারাণী অধিরাণী

স্বাঃ শ্রীমতী বেনদেয়ী দেব্যা।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে বেলা ২ ঘটিকার সময় বেনদেয়ী দেবীর মৃত্যু হয়।

আফতাব্ চাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত না হওয়ায় জমিদারী 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর তত্ত্বাবধানে যায়। আফতাব্ চাঁদের সময়ে বনবিহারী কাপুর ও টি. ডি. বর্গমিলার জয়েণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন। মিলারের মৃত্যুর পর এইচ আর. রেইলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ওড়িশায় বদলি হওয়ায় বনবিহারী এককভাবে ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে জমিদারীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। মিলার ও বনবিহারী ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হলেও জমিদারীর হাল ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখের 'দি স্টেটসম্যান পত্রিকা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রকাশ—"The friends of this old family insists in particular upon the necessity of enquiry being made into the vast sums of money that had been drawn from the hoards of the Raj during the last six years by the Joint managers, Bun Behari and Mr. Miller on the plea that they were required for current expenditure or for investments in Government securities; also into the amounts that are declared

to have been remitted by these same gentlemen during the same period to London, and to local tradesmen, with the invoices of the goods bought ; the aggregate amount of Mr. Miller's personal drawings from the Prince during the five years of his Raj ; the amounts entered as gifts during the same period to Bun Behari and his crew of personal followers ; and the sale of eight lakhs of old coins through the cashier of the Raj, and their disposal." ঐ সময়ে 'ইংলিশম্যান পত্রিকা'য় বনবিহারীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল। বনবিহারীর পুত্র বিজয়চাঁদ মহতাব্ রাজগদিতে আসীন হওয়ার পর 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্'-এর তত্ত্বাবধানে নাবালকের অভিভাবকরূপে বনবিহারী ম্যানেজারের পদ লাভ করেন এবং এই সময় হতে রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বনবিহারী 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজগদি লাভের সময় বিজয়চাঁদের বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর (জন্ম ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর)। সেকারণে তাঁর জমিদারী 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানে যায় এবং এবারেও তাঁর পিতা ছিলেন রাজবাড়ীর ম্যানেজার। সাবালকত্ব লাভের পর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে বিজয়চাঁদ স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে বিজয়চাঁদ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। ঐ বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর অভিষেকক্রিয়া উপলক্ষে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর বোর্ডিলিয়ন বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে বর্ধমানে আগমন করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য শহরের প্রবেশ পথে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক ইষ্টক নির্মিত সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করা হয়। পরে বড়লাটের নামানুসারে ঐ তোরণটি 'কার্জনগেট' নামে অভিহিত করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নির্মাতার নামানুসারে এটির নাম হয় 'বিজয়তোরণ'।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে লাহোর নিবাসী ঋণ্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে বিজয়চাঁদের বিবাহ হয়। বিজয়চাঁদের দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। সর্বজ্যেষ্ঠা সুধারাণী দেবী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই) বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা কন্যা ললিতারাণী ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ও কনিষ্ঠপুত্র অভয়চাঁদ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর আলিপুরে 'বিজয় মঞ্জিলে' জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব লেফঃ গভর্ণর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে আততায়ীর হাত হতে রক্ষা করার জন্য 'কে· সি· আই· ই·' উপাধিসহ তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন হতে এই বংশ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিটি বংশগত রূপে ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদাররূপে তিনি

বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দানের পরিমাণও কম নয়। তিনি ফ্লাউড কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বিজয়চাঁদের অবদান যৎসামান্য। তিনি নিজেও সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'বিজয় গীতিকা' বাংলা কবিতার বই রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর ইংরাজী রচনার মধ্যে 'Impression,' 'Meditations,' 'The Indian Horizon' (1932), 'Studies' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে বিজয়চাঁদের সভাপতিত্বে (মূল অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি) ও বর্ধমানের অপর এক সুসন্তান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (পৈত্রিক নিবাস মাথরুণ, থানা মঙ্গলকোট) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্ধমান শহরে 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২২শে চৈত্র অপরাহ্নে সভার শেষে বঙ্গের সুধীজন ও বর্ধমানবাসীদের বিজয়চাঁদ যে ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তা সে যুগের এক প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের নিকট আশা করা কল্পনাতীত ছিল। তাঁর অভিভাষণটি ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ—"আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য এখানকার সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মিলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আমায় মুখপাত্র করিয়া আমার উপর আয়োজনের ভার দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জানাইতেছি যে, আমার কার্যে যদি প্রশংসনীয় কিছু থাকে, তবে সেটা তাঁহাদের, আর ত্রুটি যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমগ্র আমারই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনোমত কার্য করিবার জন্য আমায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মোটের উপর আমাকে ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। বর্ধমানের প্রতি আপনাদের এই আকর্ষণ বর্ধমানবাসী বহুদিন ভুলিবে না। আপনারা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া, যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়া যাইতেছেন, তাহার জন্য আপনারা বর্ধমানবাসীর ও আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।"

বহু দোষ-গুণে যুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর বাংলা ১৩৪৮ সালের ১২ই ভাদ্র (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, শুক্রবার) ৬০ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।[১২২]

(১১)

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব্ (১৯৪১-৫৫) ঃ

বিজয়চাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়চাঁদ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হন। তেজচন্দ্রের পরবর্তী জমিদারগণের মধ্যে ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে পৈত্রিক জমিদারীর

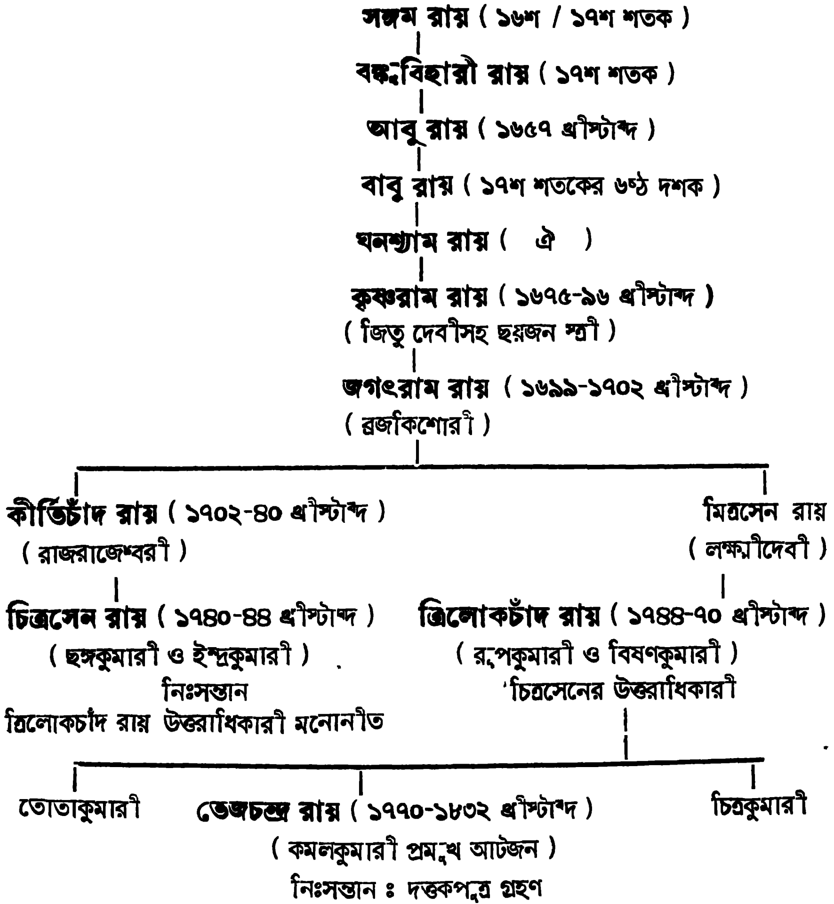
মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু উদয়চাঁদই এই বংশের তথা বর্ধমানের শেষ জমিদার। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ভূমিরাজস্ব কমিশন সুপারিশ করে যে, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা উচিত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। অবশেষে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩', আইন দ্বারা বর্ধমানসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

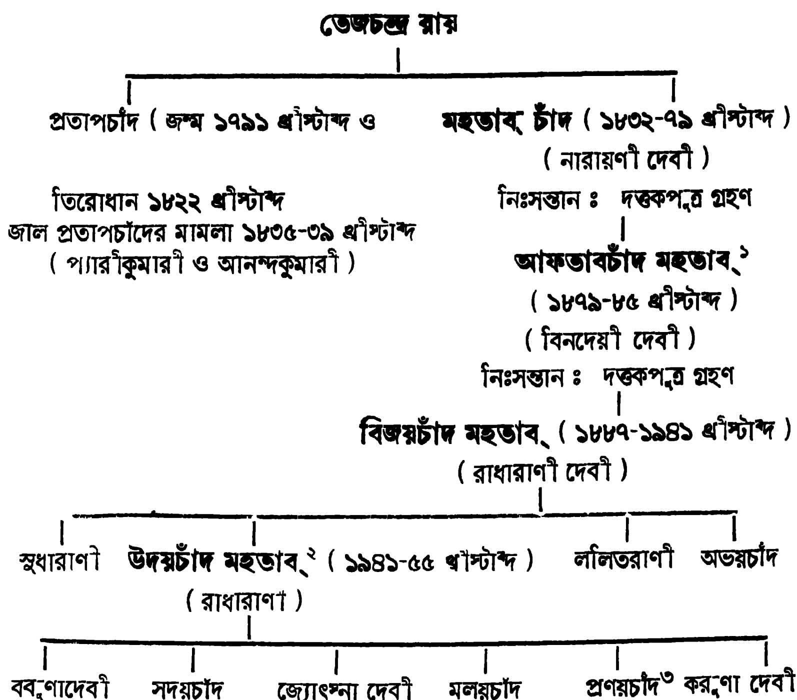
জমিদারী প্রথা বিলোপের পর বর্ধমানের বিপুল সম্পত্তি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করে উদয়চাঁদ তাঁর পিতার নির্মিত কলিকাতার 'বিজয় মঞ্জিলে' বসবাস করতেন। উদয়চাঁদ যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্পত্তি দান করেছেন তার মধ্যে সিংহভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে গেছে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে 'মহতাব্ মঞ্জিলে' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বর্ধমান রাজবংশের সর্বশেষ জমিদার মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করেন। উদয়চাঁদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল। রাধারাণী দেবী কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। উদয়চাঁদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান এবং তাঁর উইল অনুসারে কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব্ দেবসেবা ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে কলিকাতাস্থ 'বিজয় মঞ্জিলে' বসবাস করছেন।

বঙ্গের অন্যান্য জমিদার বংশের ন্যায় আবু রায়ের প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণরাম ও কীর্তিচাঁদের দ্বারা পালিত জমিদারীর বিলোপ সাধন হলেও এখনও বর্ধমানবাসীর মনে ঐ অবাঙালী জমিদারবংশের প্রতি একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুকম্পার ছাপ আছে। রাজবাড়ীর 'উত্তর ফটক' হতে 'মহতাব্ মঞ্জিলে'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে আজও সেই প্রতীক চিহ্নের কথা মনে পড়ে যায়,—

দু'পাশে উল্লম্ফনরত অবস্থায় দুটি বলশালী অশ্বের মধ্যস্থলে ঢাল সহ উন্মুক্ত তরবারি। প্রতীক চিহ্নের নিম্নভাগে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে—'*Deo Credito Justician Colito*' যার অর্থ হল—'সুপ্রশংসিত-সুবিবেচক-সুপ্রজাপালক।'

বর্ধমান রাজবংশের বংশতালিকা





১। মহতাবচাঁদের নামানুসারে 'রায়' উপাধির পরিবর্তে 'মহতাব্' উপাধি গ্রহণ।

২। জমিদারী প্রথার বিলোপ—১লা বৈশাখ, ১৩৬২ সাল।

৩। মহারাজাধিরাজের উইল অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত।

পাদটীকা :

১। ভারত গৌরব—সুরেন্দ্রমোহন বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭।
২। *Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan*—J. C. K. Peteɪson, p. 26.
৩। *Calcutta Review*, 1910, p. 122.
৪। *Calcutta Review*, 1872, p. 76 ; বিশ্বকোষ—১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩১।
৫। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩।
৬। *Calcutta Review*, 1910, p. 122 ; বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৪।
৭। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫-৬।
৮। রসপুর রায় বংশের ইতিকথা—পৃঃ ২-৪।
৯। ঐ পৃঃ ১৬।
১০। সাহিত্য প্রকাশিকা—পঞ্চানন মণ্ডল সং, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০।
১১। *Calcutta Review*, 1910, p. 124.
১২। *Riyazu-S-Salatin*—Ghulam Husian Salim, p. 231.
১৩। *Memoirs of Maharaja Nabakisen Bahadur*—N. N. Ghose, p. 84.
১৪। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১।
১৫। *Calcutta Review*, 1910, p. 123.
১৬। *History of Aurangzib*, Vol. V, Sir Jadunath Sarkar, p. 285.
১৭। ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিতং (ইং), পৃঃ ৩৫।
১৮। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৮ ; ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিতং (ইং), পৃঃ ৩৫।
১৯। *History of Bengal*—Sir Jadunath Sarkar, Vol. II, p. 393.
২০। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৯।
২১। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ১১৯।
২২। *History of Bengal*, Vol, II, p. 393 ; *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 287.
২৩। *Riyazu S-Salatin*, p. 233 ; *History of Bengal*, Vol. II, p. 394 ; *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 286 ; *The History of Bengal*—C. Stewart, p. 373-74 ; ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং (ইং) —পৃঃ ৩৬।
২৪। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং (ইং), পৃঃ ৩৫।
২৫। বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৮।
২৬। *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 288.
২৭। *The early Annals of the English in Bengal*—C. R. Wilson, Vol. I, p. 148.

২৮। কৌশিকী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৩ সাল, পৃঃ ১০।
২৯। *Riyazu-S-Salatin*, p. 244.
৩০। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২১।
৩১। কৌশিকী, ১৩৮৩ সাল, পৃঃ ৩৫।
৩২। *The History of Bengal*—C. Stewart, p. 375.
৩৩। *History of Aurangzib*, Vol. V, p. 288; *Riyazu-S-Salatin*, p. 238-9.
৩৪। *The History of Bengal*, p. 385; *History of Bengal*, Vol. II, p. 394-5.
৩৫। *Old Fort William Records*—C. R. Wilson, Vol. I, p. 37.
৩৬। *Riyazu-S-Salatin*, p. 240.
৩৭। *History of Bengal*, Vol. II, p. 395.
৩৮। *Riyazu-S-Salatin*, p. 242.
৩৯। *Riyazu-S-Salatin*, p. 243; *History of Bengal*, Vol. II, p. 395; *The History of Bengal*—C. Stewart. p, 389.
৪০। *Riyazu-S-Salatin*, p. 243-44, *Bengal Dist. Gezetteers, Burdwan*, p. 28.
৪১। *Ibid*, p. 243-4.
৪২। *H. C. I. P.*, *The Mughal Empire*, p. 215 & *The Maratha Supremacy*, p. 10.
৪৩। *J. A. S. B.*, p. 1924, 498-99.
৪৪। *Old Fort William Records*—C. R. Wilson, Vol. I, p. 36; *A Short History of Calcutta*—A. K. Roy, p. 36-37.
৪৫। *Old Fort William Records*—C. R. Wilson, Vol. I, p. 37.
৪৬। *A Short History of Calcutta*, p. 39.
৪৭। *Old Fort William Records*—C. R. Wilson, Vol. I, p. 40, কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃঃ ৩১৯।
৪৮। রসপুর রায়বংশ, পৃঃ ১৮। 'বর্তমান হাওড়া জেলাস্থ রসপুর, কলিকাতা, কুমারিয়া ও হাঁসুধাড়া গ্রাম বর্ধমান রাজপরিবারের অধীনস্থ ছিল, তাহা জগৎরামের সম্পাদিত দলিল হইতে জানা যায়'।
৪৯। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২০।
৫০। ঐ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১০।
৫১। ঐ পৃঃ ২৪।

৫২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৩১।
৫৩। ঐ পৃঃ ৪৩১।
৫৪। *Bengal Dist. Gazetteers Bankura*—L. S. S. O'Malley, p. 28 & p. 88.
৫৫। *Bengal Dist. Gazetteers Burdwan*, p. 29; *Indian Land System*, Radhakumud Mookherjee, p. 41.
৫৬। *Statistical Accounts of Bengal*, Vol. IV, p. 146. 'Kritichand, then proceeded to Murshidabad and got his name registered as proprietor of the new properties.'
৫৭। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১।
৫৮। ঐ পৃঃ ১৩।
৫৯। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৩৮।
৬০। ঐ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৯।
৬১। ঐ পৃঃ ২১।
৬২। *Calcutta Review*, 1910, p. 125; *Imp. Gazetteers*, Vol. IX, p. 101.
৬৩। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭।
৬৪। *Statistical Accounts of Bengal*—Hunter, Vol. IV, p. 124.
৬৫। *Annals of Rural Bengal*—W. W. Hunter, p. 429.
৬৬। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৩৭।
৬৭। ঐ পৃঃ ৩৩।
৬৮। ঐ পৃঃ ৩১।
৬৯। ঐ পৃঃ ৩২।
৭০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—পৃঃ ৪৬০।
৭১। রাজসভার কবি ও কাব্য—দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮১।
৭২। বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮৮।
৭৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ২১।
৭৪। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৩।
৭৫। ঐ পৃঃ ৩৯।
৭৬। Bengal Dist. Gazetteers, Burdwan, p. 3.
৭৭। ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিত, পৃঃ ৬৭।
৭৮। *The Seir Mutaqhrin*—Gholam Hossein Khan, Vol. II, p. 37.
৭৯। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ সাল, পৃঃ ৫৭-৬১।
৮০। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৪৩।

৮১। রাজসভার কবি ও কাব্য, পৃঃ ১৮৫।
৮২। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৪৩-৪৪।
৮৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০০-১।
৮৪। ভারত গৌরব—সুরেন্দ্রমোহন বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২।
৮৫। *Calcutta Review*, 1910, p. 125.
৮৬। *Sel. From Unpublished Records of Govt*, No. 151.
৮৭। *Old Fort William Records*—S. C. Hill, Vol. I, p. 386.
৮৮। *Ibid*, Vol. II, p. 56.
৮৯। *Fifth Report*, p. 142.
৯০। *IBID*, p. 142.
৯১। *IBID*, p. 142.
৯২। *A Summary of the changes in the Jurisdictions of Bengal*—Monmohan Chakrabatti, p. 3.
৯৩। *The Story of Administration Laws in Bengal*—Govt. of West Bengal (Judicial Dept.), p. 72.
৯৪। *Selections From Unpublished Records of Govt.*, No. 483.
৯৫। *Ibib*, No. 508.
৯৬। *Ibid, No.* 534.
৯৭। *Bengal Manuscript Records*—W. W. Hunter, Vol. I, p. 98.
৯৮। *Selections From Unpublished Records of Govt*, No. 468 & No. 503.
৯৯। *Ibid*, No. 539.
১০০। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ৩০; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ২৯।
১০১। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ৮৫।
১০২। *Bengal Dist. Gazetteers*, Burdwan—J. C. K. Peterson, p. 34.
১০৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পরিশিষ্ট পৃঃ ৮৬।
১০৪। *East Indian Fortune*—P. J. Marshall, p. 195.
১০৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)—ডঃ কিরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৪-৯৫।
১০৬। *Memoirs of Warren Hastings*,—G. R. Gleig, Vol. I, p. 501;
১০৭। *Memoirs of Maharaja Nabakisen Bahadur*, p. 149.
১০৮। *Bulletin of School of Oriental and African Studies* : University of London, Vol. XXVII, Part-2, 1964, p. 389. হেস্টিংস-এর বিচারের সময় 'Nabakisen produced bonds for sicca rupees

934, 727 with interest at 12%.' *Nabakisen versus Hastings*—P. J. Marshall.

১০৯। *East Indian Fortune*, p. 195 ; Ibid, p. 388-94.

১১০। *Memoirs of Maharaja Nabakissen Bahadur*—N. N. Ghosh, p. 150-6৪.

১১১। *Bengal Past & Present*, 1910, Vol. VI ; p. 229 : (Early collectorate Records of Burdwan—R. J. Hirst.)

১১২। *Bengal Historical Records (New Series) Burdwan : letters* issued—Ed. Asoke Mitra, p. 82, p. 98 & p. 109.

১১৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১৩০।

১১৪। ঐ পৃঃ ১০৩।

১১৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮।

১১৬। *Bengal Manuscript Records*—W. W. Hunter, Vol. III, Ref. No. 7228 / 7818, 7788, 7819, 7999, 8001 ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯-৪২।

১১৭। জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপচাঁদ বর্ধমান শহরে প্রত্যাগমনের পর শহরের বহির্ভাগে অর্থাৎ রেলস্টেশনের উত্তরে ও কাটোয়া-বর্ধমান রাস্তার ধারে বর্তমান 'বাজেপ্রতাপপুর' পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম 'বাজেপ্রতাপপুর' হয়।

১১৮। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ; জালপ্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *Calcutta Monthly Journal*—1839-40, p. 97-133 & p. 257-267.

১১৯। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৩৭-৪৪ ও পৃঃ ৯৩-৯৪, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)।

১২০। *Calcutta* Review, 1872, p. 174-95 ; 1910, p. 112-130 ; *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders etc. etc.*—Loke Nath Ghosh, Part-II, p. 8 ; বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; বংশপরিচয় (৩য় খণ্ড) ; ভারত গৌরব (১ম খণ্ড)—সুরেন্দ্রমোহন বসু।

১২১। নন্দবংশ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৪।

১২২। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন (অষ্টম অধিবেশন, ১৩২১ সাল), ভারত গৌরব (১ম খণ্ড) ; বংশ পরিচয় (৩য় খণ্ড) ; *Glimpses of Bengal*—A. Cloude Campbell, p. 46-47.

পরিশিষ্ট—১

বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির তালিকা :

বিগ্রহের নাম	স্থান	নির্মাণকাল	প্রতিষ্ঠাতা
যোগাদ্যা	ক্ষীরগ্রাম	১৭৩০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে	কীর্তিচাঁদ
গোপেশ্বর শিব	বৈকুণ্ঠপুর	১৭৩২	ঐ
সর্বমঙ্গলা	বর্ধমান	—	ঐ
বারদুয়ারী	কাঞ্চননগর	—	ঐ
বারদুয়ারী ঘাট	দাঁইহাট	—	ব্রজকিশোরী
লালজী	কালনা	১৭৪০	ঐ
সিদ্ধেশ্বরী	ঐ	১৭৪১	চিত্রসেন
শিব	ঐ	১৭৪৬	রামদেব নাগ *
গোপীনাথ	ভরতপুর	১৭৪৭	রাজরাজেশ্বরী
কৃষ্ণচন্দ্র	কালনা	১৭৫১	লক্ষ্মীকুমারী
রামেশ্বর	ঐ	১৭৫৩	ছঙ্গকুমারী
চন্দ্রেশ্বর	বর্ধমান	—	ঐ
মিত্রেশ্বর	ঐ	—	ইন্দ্রকুমারী
অনন্তবাসুদেব	কালনা	১৭৫৪	ত্রিলোকচাঁদ
বৈকুণ্ঠনাথ শিব	ঐ	১৭৫৪	ব্রজকিশোরী
গিরিধারী	ঐ	১৭৫৮	ঐ
রূপেশ্বর শিব	ঐ	১৭৬১	রূপকুমারী
বিজয় বৈদ্যনাথ	ঐ	১৭৬৩	লক্ষ্মীকুমারী
শিব	ঐ	১৭৬৩	বিষণকুমারী
লক্ষ্মীনারায়ণ	বর্ধমান	—	ত্রিলোকচাঁদ
শিব	কালনা	১৭৬৪	—
কাশীনাথ শিব	ঐ	১৭৬৫	তুলসী দেবী *
গোপাল	ঐ	১৭৬৬	কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন *
কিশোর কিশোরী	দাঁইহাট	—	ত্রিলোকচাঁদ
বর্ধমানেশ্বর শিব	ঐ	—	ঐ
রাজরাজেশ্বর শিব	ঐ	—	ঐ
কর্পূরেশ্বর শিব	ঐ	—	ঐ
গঙ্গাধর শিব	ঐ	—	বিষণকুমারী
ত্রিলোকেশ্বর	খাসহাভেলী	—	ত্রিলোকচাঁদ
রামেশ্বর শিব	কালনা	১৭৮৩	বিষণকুমারী
১০৯ শিব	নবাবহাট, বর্ধমান	১৭৮৯	ঐ

শিব	সুন্দরবাগ, বর্ধমান	১৮০০	তেজচন্দ্রের পত্নী
শিব	ঐ	—	ঐ
শিব	আনন্দবাগ, বর্ধমান	১৮০১	ঐ
শিব	ঐ	১৮১০	ঐ
১০৯ শিব	কালনা	১৮১০	তেজচন্দ্র
রামেশ্বর	বর্ধমান	১৮১২	তেজচন্দ্র
কমলেশ্বর	ঐ	১৮১২	কমলকুমারী
কালী	তেজগঞ্জ, বর্ধমান	—	তেজচন্দ্র
কালী	বোরহাট, বর্ধমান	—	ঐ
শিব	কালনা	১৮৪২	গঙ্গা দাসী *
কাশীনাথ শিব	ঐ	১৮৪৫	দেবকী দেবী *
প্রতাপেশ্বর শিব	ঐ	১৮৪৯	প্যারীকুমারী
বৈকুণ্ঠনাথ শিব	ঐ	১৮৫০	ঐ
রাধাবল্লভ	শাঁকটিগড়	১৮৬০	ঐ
ভুবনেশ্বরী	বর্ধমান	১৮৯৯	নারায়ণকুমারী
নারায়ণেশ্বর	ঐ	১৮৯৯	ঐ
ক্ষীরেশ্বর	ক্ষীরগ্রাম	১৯ শতক	বিজয়চাঁদ
সায়র			
শ্যামসায়র	বর্ধমান	১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দ	ঘনশ্যাম রায়
কৃষ্ণসায়র	ঐ	১৬৯১ খ্রীস্টাব্দ (আনু.)	কৃষ্ণরাম রায়
রানিসায়র	ঐ	১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ	ব্রজকিশোরী
কমলসায়র	ঐ	১৮১২ খ্রীস্টাব্দ (আনু.)	কমলকুমারী

* রাজাদের অনুগত ব্যক্তি অথবা অমাত্যগণ কর্তৃক নির্মিত।

রাজবাড়ী

আদিনিবাস—বৈকুণ্ঠপুর (থানা বর্ধমান)

বর্ধমান—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাম রায়ের সময়ে কাঞ্চননগর ও ইদিলপুরের সন্নিকটে রাজাদের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করতেন।

বর্ধমান—বর্তমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অর্থাৎ বর্ধমান দুর্গের একাংশে ত্রিলোকচাঁদ বসবাস বরতেন বলে শোনা যায়।

কালনা—সিংহদ্বারের প্রতিষ্ঠালিপি হতে জানা যায় যে তেজচন্দ্রের সময়ে ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।

বর্ধমান—ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মহতাব্‌ চাঁদ কর্তৃক বর্তমান রাজবাড়ী নির্মিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনীতি বিকাশের ধারা

(১)

আঞ্চলিক ইতিহাসের কাঠামো ও সংস্কৃতির লোকায়তধারাকে উন্নততর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন ও জনসমষ্টির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি বিধানের প্রয়োজন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্পকলা, সমাজ-জীবন, লোকশিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে উন্নততর সোপানে উন্নীত হতে হলে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও তার বিকাশের ধারা সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান ও উৎপাদনের উপায় নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সঞ্চয়, কৃষিশিল্পের সমন্বয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সামাজিককাঠামোকে স্থিতিশীল অথবা অস্থিতিশীল করে তোলে। অবশ্য এর মধ্যে শেষতমটি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কোন অঞ্চলকে তার আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধান করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে ধরে নেওয়া চলে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি অঞ্চল বা জেলা সমপর্যায়ভুক্ত। এতৎসত্ত্বেও প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বনিয়াদ নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যের (রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অঙ্গ) নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপকে বাদ দিলেও কৃষিযোগ্য ভুমি ও তার উর্বরতাসহ উৎপাদন ব্যবস্থা, খনিজ উৎপাদন, শিল্প স্থাপনের সুযোগ, শিক্ষা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিকীকরণের মাধ্যমে যেরূপ রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক উন্নতি বা অবনতির মূল্যায়ন নিরূপণ করা সম্ভবপর, সেরূপ কোন রাজ্যের জেলা-গুলির মধ্যে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, জীবনযাত্রার মান ও সঞ্চয়ের হার ইত্যাদির উপর সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করা যায়। বিংশ শতকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত ঋণ ও অনুদানগুলি বণ্টনের সময় অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এসে পৌঁছায় এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে জেলাগুলির মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা করে থাকেন। অবশ্য রাজনৈতিক প্রভাব শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এদেশে মূলধন যোগানের বৃহৎ অংশ আসছে প্রধানতঃ—১। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

ও রাজ্য পরিকল্পনা খাতে, ২। রাজ্য সরকারের অনুদান, ৩। জীবনবীমা ও ব্যাঙ্ক ঋণ, ৪। যৌথ কোম্পানি ও অংশীদার সংস্থা এবং ৫। ব্যক্তিগত মালিকানা।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাস করায় আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ সংশোধনের ফলে মূলধন যোগানের প্রথম দু'টি হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ দু'টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার মাধ্যমে বিনিয়োগ নির্ভরশীল হয় প্রধানতঃ নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, বিনিয়োগের ইচ্ছা ও লভ্যাংশের আশার উপর।

সাম্প্রতিককালের এক সমীক্ষায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা—১। সর্বোন্নত অঞ্চল, ২। অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চল ও ৩। প্রায় অনুন্নত অঞ্চল।

জেলাভিত্তিক অঞ্চলবিন্যাস পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক মান অনুসারে সর্বোন্নত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলা। বর্ধমান ও বাঁকুড়ার পশ্চিম অঞ্চল এবং ২৪ পরগণা জেলার সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল ব্যতীত জেলাগুলির মধ্যে ভু-প্রকৃতিগত ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া হাওড়া, হুগলী, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলকারখানাগুলির অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নতমানের এবং এই পাঁচটি জেলার উন্নতির হার অর্থাৎ রাজ্যের গড় অর্থনৈতিক মানের উপরে অবস্থান করছে।

প্রায় চতুর্দিকে নদী পরিবেষ্টিত ও অধিকাংশ ভুমিভাগ পলি গঠিত হওয়ায় বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বনিয়াদ মূলত ও প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক বা কৃষি নির্ভরতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং এ যুগেও 'পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার' বর্ধমানের আর্থিক উন্নতির মূল অবদান হল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য। কৃষিজদ্রব্য উৎপাদন ও এই খাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ অন্য যে কোন জেলা হতে ন্যূন নয়। বর্তমান দুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং আঞ্চলিক উৎপাদনের উপ-কেন্দ্ররূপে বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্র ও মূলধন বিনিয়োগসহ কৃষি শ্রমিক এবং (২) খনি ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমশিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ। কৃষি শ্রমিক ও মূলধন বিনিয়োগ ক্ষেত্রটি সাধারণভাবে আঞ্চলিক হলেও শিল্পশ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রটিতে সারা দেশের শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি আন্তর্জাতিকস্তরের শ্রম ও মূলধন উভয়ই এ অঞ্চলের শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে।

মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থানীয় সঞ্চয়ের একটা বিরাট অংশ কৃষিতে নিয়োজিত করা হয় এবং এর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ জেলারই মধ্যেই থাকে। কিন্তু স্থানীয় কৃষিসঞ্চয়ের একটা প্রধান অংশ ব্যাঙ্কে আমানতরূপে জমা হলেও তার সিংহভাগ জেলার বাইরে চলে যায়, যা এ জেলার কৃষি ও শিল্পোন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয় না। আঞ্চলিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত

বা লভ্যাংশ সেই অঞ্চলে বিনিয়োগ করা না হলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নূতন শ্রম-বিনিয়োগের ব্যবস্থা হ্রাস পাবে।

এই জেলার অর্থনৈতিক বিকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, উপ-অঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। অবশ্য এটার জন্য মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতিই দায়ী। জেলার ভূ-প্রকৃতি, ভূতত্ত্ব ও নদ-নদী প্রসঙ্গে বিশদভাবে দেখান হয়েছে যে, কাঁকসা থানার পূর্বাংশ পলি ও নূতন পলি গঠিত সমতলভূমি হওয়ায় কৃষিকার্যের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। পক্ষান্তরে পশ্চিমাংশ ল্যাটেরাইট, রুক্ষ-ঊষর ও গণ্ডোয়ানা শিলা দ্বারা গঠিত ভূভাগ কৃষির অনুপযুক্ত হলেও খনি ও বনভূমির অবস্থিতির জন্য শিল্পোৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি বর্তমান। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম রাজপথ ও রেলপথ এই অঞ্চলের উপর দিয়েই প্রসারিত হয়েছে। অকৃষিযোগ্য ভূমির অধিকাংশই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতির জন্য ব্যাপকভাবে কৃষিযোগ্য ভূমি নষ্ট না করেই উৎকৃষ্ট কয়লার খনি ও শিল্পোৎপাদনের জন্য ভূমি-অধিগ্রহণের ফলে কৃষিজ-উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। ভূমি অধিগ্রহণ, শিল্পে ব্যবহার্য জল, জ্বালানী ও বনজ সম্পদের সহজলভ্যতার জন্য ঊনবিংশ শতক হতেই বিদেশী পুঁজি এই অঞ্চলের উপর আকৃষ্ট হয়েছিল। জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি-সহ 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫,' 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলী ১৯৫৬', 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (বর্গাদার) নিয়মাবলী ১৯৫৬' ও এগুলি ব্যবহারিক কার্যে প্রয়োগের জন্য সাম্প্রতিককালের সংশোধিত আইনবলে অনাবাদী ও পতিত জমির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বর্ধমানের কৃষি-অর্থনীতির উন্নতির মূলে অনাবাদী ও পতিতজমি উদ্ধার ও প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি প্রত্যাপর্ণ করে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গেছে।

(২)

ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবর্তিত গতিপ্রবাহের ন্যায় আঞ্চলিক অর্থনীতির ধারাও পরিবর্তনশীল। সামাজিক যোগান ও চাহিদা অর্থনীতি বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করলেও মূলধন বিনিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর এটি একান্তই নির্ভরশীল। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ কৃষির উপর ততটা কার্যকরী নয়। অতীতে স্থানীয় উপশাসক (কারণ শাসক-শ্রেণী খাজনা পেলেই সন্তুষ্ট ছিল), বণিক শ্রেণী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্মেষ ঘটত। কৃষি ও কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বর্ধমানের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক উন্নতির বিকাশ সকল সময়ে দেখা যায় নাই। এ যুগেও গ্রামীণ জনবসতি ও তাদের জীবিকার উপায়গুলি পর্যালোচনা করলে সে চিত্র পরিস্ফুট হবে।

বর্ধমানের কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ধারা সুদূর অতীতকাল হতে

চলে আসছে। সীমিতক্ষেত্রে এর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলে সর্বপ্রথম যে মানবগোষ্ঠীর বসতি ছিল ; তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস জানা যায়। পাণ্ডুরাজারঢিবি ও মঙ্গলকোট উৎখননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাঢ় তথা বর্ধমানের আদিম মানবসমাজ তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষপর্বে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত এবং সেই সঙ্গে খাদ্যসঞ্চয়, শিল্পকর্মের উদ্ভাবন (আধুনিক সংজ্ঞানুসারে নয়), বহির্বাণিজ্য, তামা ও লোহার ব্যবহার হতে আজ থেকে ৩০০০ বছর পূর্বে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর উন্নত জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত জীবজন্তুর হাড়ের নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, মোরগ, সককুদ জীব (সম্ভবতঃ গরু), মহিষ, ছাগল, শুয়োর ছিল প্রধান গৃহপালিত জন্তু। উৎখননের সময়ে কয়েক শ্রেণীর মাছের কাঁটাও পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, বর্ধমানের আদিম মানবগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, দুধ, মাছ ও মাংস এবং জীবজন্তুর হাড়ে নির্মিত দ্রব্যাদি দেখে অনুমান করা যায় যে, এগুলি শিল্পকর্মে ও শিকারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হত। শিমুলতুলোর তৈরী সুতো, পোড়া মাটির নৌকা, মাটির তৈরী গাড়ীর চাকা (খেলনা ?), শীলমোহর, অলঙ্কার, পোতাশ্রয় (মঙ্গলকোটে ইঁটের তৈরী প্রাকার) প্রভৃতি প্রত্নদ্রব্য নগর সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করছে। পাণ্ডুরাজারঢিবি, মঙ্গলকোট ও মহিষদলে (বীরভুম) প্রাপ্ত চালের নমুনা হতে অনুমান করা যায় যে, খাদ্য সঞ্চয়ের অভ্যাস সে যুগেও ছিল।

ভেলেরিয়াস ফ্লাকাস, ভার্জিল ও অজ্ঞাতনামা নাবিকের বিবরণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে রাঢ়ের বাণিজ্যিক যোগসূত্রের পরিচয় জানা যায়। উৎখননের সময় ও মৃত্তিকার উপরিভাগে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা হতে স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে, বিনিময় প্রথার সঙ্গে এখানে তাম্র ও স্বর্ণ মুদ্রামানের প্রচলন ছিল। সপ্তদশ শতকেও কড়ির প্রচলন ছিল, সেকথা জানা যায় কৃষ্ণসায়র ও রানিসায়র খননকার্যের সময়ে। অগ্নিকাণ্ডের নিদর্শন হতে অনেকে অনুমান করেন যে, মগধের শুঙ্গরাজশক্তির আমলে অথবা ত্রিকালঙ্গাধিপতি খারবেলের সময়ে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

সুদূর অতীতকাল হতে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলেও এ অঞ্চলে কার্পাস ও রেশমবস্ত্র উৎপাদিত হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (অধ্যক্ষ প্রচার ২।১১) বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, খাদ্য ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ ঐতিহাসিক যুগের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল। মানভুম, বীরভুম ও বর্ধমানের জঙ্গলমহলে (আউস গ্রাম ও কাঁকসা থানা) প্রাপ্ত লৌহ নিষ্কাসন চুল্লীগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তামা ও লোহা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন সুদূর অতীত কালের। কৃষি, গৃহস্থালি, যানবাহন ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নানা শ্রেণীর ধাতবদ্রব্য নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈদেশিক বিবরণ, দ্বীপবংশ, মহাবংশ, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের ইঙ্গিত হতে

প্রমাণিত হয় যে, খ্রীস্টপূর্ব যুগে তাম্রলিপ্তের সঙ্গে (সপ্তগ্রাম অথবা বৈদ্যবাটীর নিকট দ্বিগঙ্গে ছিল নদী-বন্দর) রাজগৃহ, চম্পা, পাটলিপুত্রের যোগাযোগ কর্ণ-সুবর্ণ হয়ে অজয়-দামোদর অববাহিকার মধ্যভাগ দিয়ে প্রসারিত প্রাচীন পথঘাটকে অবলম্বন করে সার্থবাহের দল স্থলবাণিজ্য নিয়ামকের অধীনে যাতায়াত করত। প্রত্নতত্ত্ববিদ জে. ডি বেগলারের মতে প্রাচীন পথের ধারেই মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপগুলি নির্মিত হয়েছিল। বরাকরের মন্দির, ভরতপুরের স্তূপ, সাতদেউলিয়ার জৈনমন্দির প্রভৃতির অবস্থিতি দেখে অনুমিত হয় যে, এগুলির কোন লুপ্ত পথের পার্শ্বেই নির্মিত হয়েছিল।

মহিষদলের সন্নিকটে আবিষ্কৃত একটি প্রত্নক্ষেত্রের ভূগর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত শস্যভাণ্ডার হতে অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্বকালের মানবগোষ্ঠী যৌথভাবে ধন উৎপাদন ও সঞ্চয় করত। পাণ্ডুরাজারঢিবির গৃহতলগুলিও যৌথভাবে বসবাস করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্র তাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠীর পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনোৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে ক্ষেত্র ও সীমার উল্লেখ আছে। অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে ক্ষেত্র-বিভাগ ও মালিকানার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে সীতাধ্যক্ষ (২।১৫) নামক রাজকর্মচারী ও মনুসংহিতায় (৭।১৩০-৩১) উল্লিখিত ভূমিরাজস্বের সূত্র হতে মনে করা যায় যে, ঐ সময়ে যৌথ-মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত-মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৩)

গোপচন্দ্রের আমলে তাঁর সামন্তরাজা বিজয়সেন (ইনি সেনবংশের বহুপূর্ববর্তী) কর্তৃক সম্পাদিত মল্লসারুল তাম্রশাসনে খোদিত আগ্রহারিক, ঐর্দ্রাঙ্গিক, ঐর্ণস্থানিক, আবস্থিক, চৌরদ্ধারণিক, দেবদ্রোণী, বাহনায়ক ইত্যাদি উপাধিধারী রাজপুরুষের উল্লেখ কৃষিভিত্তিক নগর সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করছে। ভূমিরাজস্ব আদায়কারী রাজকর্মচারীগণের উপাধি ছিল 'ঐর্দাঙ্গিক' এবং 'ঐর্ণস্থানিক' উপাধিধারী রাজকর্মচারীর উল্লেখ হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রেশম ও পশম দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায় সুনির্দিষ্ট রাজকর্মচারী নিযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ছিল। যানবাহন ও পথঘাট অন্ততঃপক্ষে সামান্য পরিমাণেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে অনুমান করা যায় এবং 'বাহনায়ক' উপাধিধারী রাজকর্মচারী নিযুক্তি এর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল ও শশাঙ্কের এগরা তাম্রশাসনে খোদিত আছে যে, নিষ্কর ভূমি দানের জন্য রাজার অর্জিত পুণ্যের অংশ ছিল এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ঐ নিষ্কর ভূমির জন্য রাজকোষে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিরাজস্ব উসুল হবে না। নিষ্কর ভূমি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে উৎপন্ন শস্যের 'এক-ষষ্ঠাংশ' রাজকর দেওয়ার আইন ছিল। 'আগ্রহারিক' উপাধিধারী রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে নিষ্কর ভূমির হিসাবপত্র রক্ষিত হত।

সীমানা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মল্লসারুললিপিতে পদ্মবীচির মালা-চিহ্নিত কীলক দ্বারা সীমা নির্ধারিক করার রীতি দেখা যায়। তাছাড়া সে সময়ে অন্যান্য প্রকার চিহ্ন দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করার প্রথা ছিল। ভূ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার বলবৎ থাকলেও সে অধিকার রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা শাসিত হত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেকোন শর্তে ক্রেতার নিকট বিক্রয় বা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী দানের ক্ষমতা ছিল না। ভূমি বিক্রয় বা দান-কার্যকে আইনানুগ করার জন্য 'পুস্তপাল' উপাধিধারী রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। ভূমি হস্তান্তরের জন্য প্রথমে অধিকরণের নিকট আবেদন করতে হত এবং অধিকরণ আবেদনপত্রটি পুস্তপালের দপ্তরে জমা দিত, কারণ ভূমির মাপজোক, সীমা-নির্দেশ, ভূমির স্বত্বাধিকার ইত্যাদি সকল বিষয়ে দলিলপত্র পুস্তপালের দপ্তরে রক্ষিত হত। ভূমি ক্রয়বিক্রয় 'দীনার' নামক স্বর্ণ মুদ্রামান দ্বারা নির্ধারিত হলেও 'পুরাণ' নামক মুদ্রামানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ভূমি পরিমাপের দণ্ড হিসাবে 'নল'-এর ব্যবহার ছিল এবং সর্বনিম্ন পরিমাপ ছিল 'দ্রোণ'। অধিক পরিমাণ ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'কুল্যবাপ' ও 'পাটকে'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ যে পথ ধরে কর্ণসুবর্ণ হতে উ-চা (ডঃ ওয়াডেল ও ক্যানিংহামের মতে যাজপুর) গিয়েছিলেন, তার মধ্যে দীর্ঘতম অংশের জন্য বর্ধমান জেলার উত্তর হতে দক্ষিণে অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় এই অঞ্চলের মনোরম জলবায়ু, অপর্যাপ্ত ফল-ফুল, প্রচুর দুধ, বলিষ্ঠ ও কর্মঠ অধিবাসী প্রভৃতির উল্লেখ হতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে কিছুটা অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হিউয়েন সাঙের রাঢ় ভ্রমণের সময়কাল ছিল। কর্ণসুবর্ণ ও ভরতপুরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার এবং সাতদেউলিয়া ও বরাকরের জৈনমন্দির প্রভৃতি নিদর্শনাবলীর দ্বারা সমর্থিত হয় যে, ভারতশিল্পের সঙ্গে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল এবং শিল্পীসঙ্ঘের একটা বিরাট অংশ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। দাঁইহাটের সংলগ্ন স্থানে ইন্দ্রেশ্বরের প্রস্তর নির্মিত এক বিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ ঐ শিল্পীগোষ্ঠী ভাগীরথীর তীরে বসবাস করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে সারা বঙ্গদেশের মধ্যে ভাস্কর্যশিল্পে তারা খ্যাতি লাভ করেছিল।

রাঢ়েশ্বর ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে 'হট্টপতি' (হাট বা গঞ্জের অধিকর্তা), 'গমাগমিক' (যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী), 'শৌল্কিক' (সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কর আদায়কারী, যা বর্তমানকালে টোলকরের সঙ্গে তুলনীয়) ইত্যাদি উপাধিধারী রাজকর্মচারীবৃন্দের উল্লেখ হতে জানা যায় যে, ভূমিরাজস্ব (শাসনে উল্লিখিত) ব্যতীত হাটবাজার, যানবাহন ও একালের ন্যায় সীমান্ত কর আদায় হত। এর দ্বারা সমর্থিত হয় যে, ঢেক্করী অঞ্চলে কৃষিকার্য ব্যতীত সহযোগী অর্থনৈতিক কার্য-

কলাপের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বলবৎ ছিল। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জীবজন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতডড্ চতুরকের উল্লেখে ব্যবসা-বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে। তাছাড়া ঈশ্বরঘোষ ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে বেগার-খাটানোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পালরাজারা ধর্মে বৌদ্ধ হলেও তাঁদের প্রধান পরিচয় ছিল বাঙালী। সেকারণে বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া সুদীর্ঘকাল পাল-রাজত্বে বহুবার বহিঃআক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও সে আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক চিত্র মোটামুটিভাবে সচ্ছল ছিল বলে মনে হয়। প্রকারান্তরে বহিরাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবাজাদের আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চবর্ণের লোকেরাই সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছিল। বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের লোকেরা রাজকীয় অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিল। এমনকি তারা রাজসভায় ন্যায্য বিচার পর্যন্ত পেত না; 'শেখশুভোদয়' গ্রন্থে এর বহু প্রমাণ আছে। দেশের সাধারণ মানুষের কোন রাজানুগত্য ছিল না; অন্যথায় অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজী অতি সহজে রাঢ়-বঙ্গ জয় করতে সমর্থ হতেন না। ধর্ম ও বর্ণাশ্রমের নামে বাঙালী সমাজে চরম অধঃপতনের যুগরূপে এই সময়টিকে চিহ্নিত করা যায়।

ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনপর্বে বর্ধমানের অর্থনীতির কোন ধারাবাহিত লিখিত ইতিহাস নাই। সেকারণে সমসাময়িককালে রচিত সাহিত্য, তাম্রশাসন ও অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভর করে রূপরেখা দেওয়া যায় মাত্র। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা ছিল একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর এবং কৃষিকার্যের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিরাজস্ব দিতে হত। গোপচন্দ্রের মল্লাসারুল তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, রাজা অর্থাৎ দেশাধিপতি, তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ভূমির উপর অধিকার থাকলেও বলপূর্বক কোন প্রজার জমি অধিগ্রহণ করতেন না। মহারাজ বিজয়সেন ভূমিদান ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত উচিতমূল্যে ভূমিক্রয় করে বৎসস্বামীকে দান করেছিলেন। তাম্রশাসনে আরও পাওয়া যায় যে, মহারাজা বিজয়সেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করলেও দানক্রিয়া সম্পাদনে গোপচন্দ্রের পূর্বসম্মতির কোন উল্লেখ নাই এবং তিনি ঐ ভূমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করেন নাই। এটি হল সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আহার্য দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, গুড়, ঘৃত, সরিষার তৈল, মাছ, মাংস, নানা ফলমূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিধেয় বস্ত্রেব মধ্যে কার্পাস, রেশম ও পশম সুতার ব্যবহার ছিল। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রপাতি তৈরী হত। রাঢ় অঞ্চলে বহু লোহার খনি ছিল এবং এই সকল অঞ্চলের লোকেরা লৌহ উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল। বস্তুতঃ বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহের উৎপাদন হত।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রজার নিকট হতে রাজকর আদায় ও দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। সম্ভবতঃ অসমভূমি-বন্টন ব্যবস্থার জন্য ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কৃষিযোগ্যভূমির অধিকারী ছিল না। তারা দিনমজুর, বেগার অথবা ভূমিদাস হিসাবে কৃষি-উৎপাদনের একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য হত। চর্যাপদে একদিকে যেমন ঐশ্বর্যজ্ঞাপক ধান্যস্তূপ ও নগরবিন্যাসের চিত্র দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে ক্ষুধায় অবসন্ন শীর্ণ শিশু ও জীর্ণ-বস্ত্র পরিধান করে দরিদ্র গৃহিণীর দারিদ্র্যের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

(৪)

১০৫ বৎসরকাল সেনরাজত্ব ছিল বাংলার অবক্ষয়ের যুগ। বর্ণবিন্যাসের নামে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্ত সেনআমলে বাংলার সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য একেবারেই বিনষ্ট হয়েছিল। মুসলমান আমলের প্রথম দু'শ বছরে এতদঞ্চলের অর্থনীতি বিষয়ের কোন পরিচয় জানা যায় না। তবে বলপ্রয়োগ ও লুণ্ঠননীতির উপর ভিত্তি করে চাষীর নিকট রাজস্ব আদায় করা হত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাধারণ প্রজার কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। সুলতান ফকরউদ্দিনের শাসনকালে হিন্দুপ্রজাগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক ছিল প্রজার প্রাপ্য এবং বাকী অর্ধেক ভূমিরাজস্ব হিসাবে নগদ অথবা শস্যে জমা দেওয়ার আদেশ ছিল। কৃষিনির্ভরশীল হিন্দু প্রজার দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না। তবে জনসংখ্যার চাপ অধিক না হওয়ায় কৃষক যাতে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট থাকে, তার জন্য অনেক সময় অত্যাচারী সুলতানগণও স্থানীয় হিন্দু জমিদারের সহায়তায় কৃষকের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করত। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনী হতে সপ্তগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলের বাণিজ্যের সমৃদ্ধি, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও কৃষক, শ্রমিক বা সাধারণ লোকের অবস্থা জানা যায় না। তবে ইবন বতুতার বিবরণ হতে জানা যায় যে, ঐ সময়ের অর্থনীতি কেবল-মাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাসুবাকে ১৯টি সরকারে ভাগ করে, তার উপ-বিভাগ অর্থাৎ 'পরগণা' ছিল রাজস্ব আদায়ের বৃহত্তম একক। মোঘল আমলে প্রধান চাষ ছিল ধান। পাট চাষের প্রচলন থাকলেও এর প্রসার তত অধিক ছিল না। রেশম ও সুতী-বস্ত্রের উৎপাদন হতে রাজস্ব আদায় হলেও, প্রাথমিক উৎপাদনকারীগণ তাদের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হত না। আবুল ফজল, সরিফাবাদের বলদের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন এবং ১৫ জন লোকের ভার বহনে সক্ষমকারী বলদের উচ্চতা ছিল উটের সমান। বেশ উঁচুজাতের ছাগল ও লড়াকু মোরগ এই অঞ্চলে অপর্যাপ্ত পাওয়া যেত। সরিফাবাদ ও সুলেমানাবাদ ছিল সম্রাটের খাসমহলের অন্তর্গত; 'সরিফাবাদ' নামটিই ছিল; তার

আভিজাত্য ও উন্নতির প্রতীক। মোঘল আমলে জমির প্রকৃত মালিক ছিল চাষী, তবে কৃষিযোগ্য জমি আবাদ না করলে সাময়িকভাবে হস্তান্তর করারও রীতি ছিল এবং পুনরায় কৃষকের সামর্থ্য ফিরে এলে সেই জমি তাকে ফেরৎ দেওয়া হত। মোঘল আমলে গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ স্বয়ম্ভর। কৃষি ও হস্তশিল্পের দ্বারা অর্জিত উপার্জনের উপর গ্রামীণ জীবনযাত্রা নির্বাহ হত এবং গ্রামীন উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ শহরের বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হত, কিন্তু শহর থেকে তারা প্রায় কিছুই পেত না। মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে যে, গ্রামীণ উৎপাদন ও অর্থনীতি রাজস্ব আদায়কারী জমিদার, মহাজন, শস্যব্যবসায়ী ও বড় বড় ধনীচাষীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ছোট চাষী ও ভাগচাষীরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করলেও কর ও ঋণভারে তারা জর্জরিত ছিল।

(৫)

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বর্ধমানের দুজন খ্যাতনামা কবি ঐ সময়ের নৈরাশ্যজনক অর্থনৈতিক চিত্র এঁকেছেন। মুকুন্দরামের বর্ণনায় বর্ধমানের গ্রাম-গঞ্জে বণিককুলের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ণনা হতে সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা সমসাময়িককালের বর্ণনা বলে গ্রহণ করার অসুবিধা আছে। কারণ মঙ্গলকোট অঞ্চলে ঐ সময়ে সম্ভবতঃ কোন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল না এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও ঐ সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিংহল যাত্রার পূর্বে ধনপতির প্রতি খুল্লনার উক্তিতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। তবে গ্রন্থারম্ভে মুকুন্দরাম যে দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন, সেটা পুরোপুরি গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে। প্রথমতঃ ডিহিদার মাসুদ শরীফের অত্যাচার যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বোধহয় তার জন্য কবি ও কবির প্রতিপালক গোপীনাথ নন্দী ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। মোঘল আমলে ডিহিদার ছিল গ্রামপ্রধান মাত্র এবং এই পদটি এত ক্ষুদ্র যে, আইন-ই-আকবরীতে এর কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। কবি বর্ণিত মোঘল শাসনব্যবস্থার দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র মেনে নেবার অপর একটা প্রধান বাধা হল যে, তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে মোঘল শাসনাধীনেই অপর এক অতি ক্ষুদ্র রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের শরণাপন্ন হওয়াতে। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় 'রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িব গাঁ' বা 'প্রজা নাহি চাষ চষে'—এই উক্তিতে মনে করার কোন কারণ নাই যে, শাহজাহানের ভুমিরাজস্ব নীতির ফলে ঐ সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছিল। কেবলমাত্র এই সকল স্থানীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলের পরিস্থিতি বিচার করা যায় না। কারণ সুলতান সুজার সময়ে সামগ্রিকভাবে আকবরের আমল অপেক্ষা ভুমিরাজস্ব বর্ধিত হয় নাই। তবে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক ব্যতীত অন্যান্যরা জায়গীরদারী মহল অপেক্ষা খাসমহলে বসবাস ও চাষআবাদ করা পছন্দ করত ; কারণ সম্রাটের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিল খাসমহলের উপর, জায়গীর মহলের উপর রাজস্ব আদায় বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব ছিল পরোক্ষ।

সুলতানী আমল ও মোঘল আমলের অর্থনীতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অনাবাদীভূমি হাসিল করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। সূতী, রেশমবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হতে উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রীর কোন নির্দিষ্ট বাজার না থাকায় বণিকদের উপর উৎপাদকগণ একান্তরূপ নির্ভরশীল ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে হস্তশিল্পের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হলেও বণিকদের অপেক্ষাকৃতভাবে হাল্কা করের বোঝা বহন করতে হত। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্থল-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে শাসক বা আঞ্চলিক শাসকদের কোন আগ্রহ ছিল না। কৃষকের পক্ষে উৎপন্নশস্যের ⅓ অংশ থেকে ½ অংশ কর প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল, সেখানে বণিকেরা মাত্র শতকরা ২½ ভাগ হতে ৫ ভাগ করভার বহন করত। ফলে কৃষকের সঞ্চয় ছিল না বললেই চলে। অপরপক্ষে বণিকেরা ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা বাড়ালেও, সেই মুনাফা শিল্পে কোনদিনই মূলধন হিসাবে নিয়োজিত না হওয়ায় পলাশীর যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশীয় বণিকেরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় কৃষিই ছিল আয়ের প্রধানতম উৎস এবং কৃষির উন্নতিকল্পে কোন অর্থ মূলধন-লগ্নী হিসাবে বিনিয়োগ করার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কৃষির পর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় বস্ত্রশিল্পের স্থান ছিল দ্বিতীয়। বর্ধমান জেলায় প্রাচীন বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলি বর্ধমান, মেমারী, কালনা, সমুদ্রগড়, কেতুগ্রাম, কাটোয়া ও মানকরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কৃষি অর্থনীতিতে স্থানীয় কামার ও সূত্রধরদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এদের বিরাট অর্থলগ্নীর কোন সামর্থ্য ছিল না। কারণ দু'একটি সামগ্রী বাদ দিলে বর্ধমান অঞ্চলের লৌহ নির্মিত কোন দ্রব্যের চাহিদা অন্যত্র না থাকার প্রধান কারণ হল দেশীয় পদ্ধতিতে কৃষি-শিল্পে লৌহনির্মিত দ্রব্য বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই তৈরী হত। তবে যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাতাগণের অধিকাংশের বাসস্থান ছিল বনপাস-কামারপাড়া, বর্ধমান শহরের মোঘল টুলি ও কাঞ্চননগরে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে কুমারদের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, কারণ ধাতব নির্মিত পাত্রের প্রচলন থাকলেও অধিকাংশ লোকের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের বাইরে ছিল এবং গবাদি পশুর আহার্য-পাত্র হিসাবে আজও মৃৎপাত্রের যথেষ্ট কদর আছে। বর্ধমানের কাঁসা-পিতলের তৈরী দ্রব্যের গুণগত মান ছিল অতি উচ্চ। দাঁইহাট, কাটোয়া ও বনপাসে এ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট ছিল এবং তারা সারা বৎসর এ কর্মে নিয়োজিত থাকত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, একমাত্র কাঁসা-পিতল ও লৌহদ্রব্য নির্মাণ ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনকারীগণ সারা বছর কাজ না থাকায় কৃষির উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিল।

বর্ধমানের গ্রাম্যসমাজ ছিল মোটামুটিভাবে স্বনির্ভর এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন না থাকায় গ্রামের উদ্বৃত্ত সামগ্রী শহরের বাজারে বিক্রি

হত। অপরপক্ষে শহর থেকে তারা কিছুই পায় না একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বণিক ও প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে নানাস্তর ছিল। ফলে কৃষিনির্ভরশীল প্রাথমিক উৎপাদকেরা মূলতঃ ব্যবসায়ী না হওয়ায় দালাল ও পাইকারী ব্যবসাদারগণের উপর তাদের নির্ভর করতে হত। বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা ও বর্ধমান ব্যতীত কোন গঞ্জ ছিল বলে জানা যায় না এবং সন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে ক্ষীরপাই, কাশিমবাজার, হুগলী ও নবদ্বীপের বাজারে এ সকল দ্রব্য বিক্রি করা হত। নিকটে গঞ্জ না থাকার প্রধান কুফল হল দাদনের আকারে চড়া সুদে মূলধন আমদানী করে হস্তশিল্পের প্রাথমিক উৎপাদকগণ নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ত এবং লভ্যাংশ চলে যেত বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে। নীটফল হল কৃষি ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি কোনদিনই সাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে নাই। বর্ধমানের জমিদার তথা মোগল শাসকের প্রতিভু কোনদিনই পতিতজমি হাসিল, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বা হস্তশিল্পীদের মূলধন যোগান দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা কবার চেষ্টা করে নাই। প্রকারান্তরে মোঘল সম্রাটের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সু-বৎসর বা দুর্বৎসরে তারা নির্মমভাবে রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে স্বীয় জমিদারী রক্ষা ও বিলাসের স্রোতকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নবাবী আমলেই দেখা যায় বর্ধমান, কুচুট, সাতগাছিয়া ও আটঘরাতে ইংরাজদের রেশম কুঠি ছিল, যার উপর দেশীয় জমিদার বা বণিকদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। দাদনের মাধ্যমে বিদেশীগণ এই সকল রেশম কুঠিতে বর্ধমানের হস্তশিল্পীদের তৈরী দ্রব্য সস্তায় কিনে চড়াদামে বিদেশের বাজারে বিক্রি করত।

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন নির্ভরশীল ছিল ৪টি উপাদানের উপর। সামাজিক উৎপাদন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও মালিকানার (সংগঠন) উপর নির্ভরশীল ছিল ; অনুরূপভাবে বণ্টন ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল রাজস্ব, মজুরী সুদ ও লভ্যাংশের উপর। ভূমি হতে উৎপাদনের জন্য রাজস্ব, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকের পাওনার জন্য মজুরী, মূলধন সরবরাহকারীর পাওনা সুদ এবং যে ব্যক্তি উদ্যোগী হয়ে চাষবাস, কুটিরশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতেন তাঁর পাওনা ছিল লভ্যাংশ।

উপরোক্ত সবগুলি কিন্তু নির্ভর করত আঞ্চলিক শাসক ও উপশাসকদের মর্জির উপর। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন ও বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সুষ্ঠু উপায়ে সামাজিক অর্থনীতির উন্নতির কথা চিন্তা করে মূলধন যোগানের বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত ছিলেন। মূলধন বিনিয়োগ হত দাদন ও কর্জের দ্বারা ; ফলে উৎপাদকেরা প্রচুর সুদ প্রদান ও উৎপন্ন দ্রব্য সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হতেন এবং সঞ্চয়ের বিশেষ কোন সুযোগ না থাকায় মূলধন প্রাপ্তি সর্বদাই পরনির্ভরশীল ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় পরিবর্তন শুরু হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আমলে। কেন্দ্রীভুত শাসনব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা না থাকলেও শায়েস্তা

খাঁর বণ্টন ও বিক্রয় ব্যবস্থার ফলে তাঁর ও উচ্চপদস্থ আমলা-জমিদারগণের মুনাফা লাভের সহায়তা হলেও মূল উৎপাদকের কোন লাভ ছিল না, বরং দুরাবস্থার চিত্রই পাওয়া যায়। আরও পরবর্তীকালে ১১ বৎসরব্যাপী বর্গীহাঙ্গামায় বর্ধমানে জমিদারী কৃষক ও কুটিরশিল্পীসঙ্ঘের বনিয়াদ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। বহু সম্পদশালী ব্যক্তি ধন-সম্বল নিয়ে বর্ধমান হতে পলায়ন করেন। সমসাময়িককালে রচিত গ্রন্থসমূহে অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। কবি গঙ্গারামের বিবরণে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পলায়নের কাহিনী ও মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ ও অত্যাচারের কাহিনী জানা যায়। সিয়র মুতাক্ষরিণে উল্লেখ আছে যে, বর্ধমানে তুতের চাষ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ মারাঠারা চারাগাছগুলিকে ঘোড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত এবং ঐ সময় হতেই বর্ধমানের রেশম শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিল্পনীতিও এর জন্য কম দায়ী ছিল না। বর্ধমানের রেশম শিল্প ধ্বংসের কারণ হিসাবে হলওয়েল বর্গীহাঙ্গামাকে দায়ী করেছেন,—"The Marathas, committed the most horrid devastation and cruelties: they fed their horses and cattle with mulberry plantations and thereby irreparably injured the silk manufacture···on this event, a general face of ruin succeeded. May of the inhabitants, weavers and husbandmen fled. The *Arungs* were in a great degree deserted, the land untilled....The manufactures of the *Arungs* received so injurious a blow at this period, that they have ever since lost their original purity and estimation, and probably will never recover them again. A scarcity of grain in all parts; the wages of labour *greatly enhanced*; *trade, foreign and inland, labouring* under every disadvantage and oppression."

(৬)

অষ্টাদশ শতকের বর্ধমান জেলার অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেছেন,—"Throughout the eighteenth century Burdwan was one of the most prosperous commercial districts of Bengal." কিন্তু এই শতকের মধ্যভাগ হতে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর শাসকশ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র বদল হলে উৎপাদনের ধারায় পরিবর্তন আসে। ফলে দেশীয় বণিক ও মহাজনদের সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসায়িক-মূলধনের সংঘাত শুরু হয়। শাসনের রাজদণ্ড বিদেশীদের অধিকারে থাকায় দেশীয় বণিকগণ দাদন-সংগ্রহ ও বণ্টন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। চাষীর নিকট হতে বলপূর্বক স্বল্পমূল্যে ধান সংগ্রহের উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায় যে, ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের বাজারে (কাঞ্চননগর)

যখন ১ টাকায় ২ মণ চাল পাওয়া যেত, সে সময়ে জেলাকালেক্টর গুদামে খাদ্যমজুত করার জন্য টাকায় ৩ মণ দরে চাল সংগ্রহ করেন।

১৭৫৭-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, বর্ধমানের জমিদার ত্রিলোকচাঁদ, বড় রায়ত ও তালুকদার, দেশীয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অসহযোগিতার মনোভাব ছিল এবং যার পরিণত ফল-স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কবলে বর্ধমানের কৃষি ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়। দু'এক বছরের অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাকে মন্বন্তর আখ্যা দেওয়া যায় না। মন্বন্তর কোনদিন একলা আসে না। সমস্ত প্রকার সামাজিক সঞ্চয় ও উৎপাদন বন্ধ হলে আর সেই সঙ্গে অনাবৃষ্টিজনিত শস্য ও খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হলে মন্বন্তর দেখা দেয়। বর্ধমানের আর্থিক দুরবস্থার কারণগুলি হল,—

১। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা স্থান হতে স্থানান্তরে বিনা শুল্কে মাল চালান দিত। কিন্তু দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর শুল্কধার্যসহ নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। ফলে দেশীয় উৎপাদক ও বণিকগোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। ব্যবসায়ের এই একচেটিয়া আধিপত্যের অধিকার বলে কোম্পানির লভ্যাংশ বহু গুণ বর্ধিত হলেও দেশীয় ব্যবসা ও শিল্পোৎপাদনের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। উৎপাদন ও সঞ্চয় উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু হয়।

২। ১৭২২-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভূমিরাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক তালিকা হতে বর্ধমানের কৃষক ও জমিদারের করুণ অবস্থার চিত্র পাওয়া যাবে,—

আকবরের আমলে	(১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ)	১২'৩৮ লক্ষ সিক্কা টাকা	
জাফর খাঁর আমলে	(১৭২২ খ্রীস্টাব্দ)	২২'৪৫	ঐ
আলিবর্দী খাঁর আমলে	(১৭৫২ খ্রীস্টাব্দ)	২৬'৩৮	ঐ
মীরকাশিমের আমলে	(১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ)	২৮'৫৬	ঐ
দেওয়ানী লাভের সময়ে	(১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ)	৩৬'২৯	ঐ
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	(১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ)	৪৩'২৪	ঐ

উপরোক্ত তালিকা হতে দেখা যায় যে, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে ভূমিরাজস্ব দ্বিগুণ হওয়ায় বর্ধমানের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে। উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে গিয়ে জমিদার ও প্রজা উভয়ের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। এর ফলে সমস্ত প্রকারের সঞ্চয় একেবারে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পেঁছেছিল।

৩। নীল ও পাট চাষের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস।

৪। সুতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র উৎপাদন বর্ধমান জেলায় বহুকাল ধরে চলে আসছে। রামপ্রসাদ সেন, বর্ধমান বাজারে বনাত, মখমল, পটু, ভুষনাই, খাসা, ঢাকাই, মালদই, নলাটী, চিকন, সরবন্দ প্রভৃতি উত্তম শ্রেণীভুক্ত বস্ত্রের বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন। হলওয়েলের মতে রাজা ত্রিলোকচাঁদের জমিদারীতে অন্ততঃপক্ষে

পনের রকমের সুতীবস্ত্র তৈরী হত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির আমলে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়ের বাজারে ইংরাজগণ নিজেদের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করায় উৎপাদক ও মহাজন উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উইলিয়ম বোল্ট-এর বিবরণে পাওয়া যায়,—'মোঘল শাসনে এমনকি নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়েও তন্তবায়গণ স্বাধীনভাবে বস্ত্র তৈয়ারী করত'। কিন্তু কোম্পানির আমলে মুচলেকা দিয়ে বস্ত্র তৈরী ও বিক্রয় ব্যবস্থায় বহু নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে বয়ন শিল্পীরা শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হত। বর্ধমানের বস্ত্রশিল্পীরা সমবেতভাবে বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছিল; পরবর্তীকালের একটা ঘটনা হতে জানা যায় "রেসিডেণ্ট" জন চিপ 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর নিকট ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুলাই যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার মর্মার্থ হল,—

"সোনারুণ্ডি গ্রামে (কাটোয়া মহকুমা) তন্তুবায় কারিকরগণের উপর মণ্ডলদের অর্থাৎ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের অপরিসীম প্রভাব আছে। তাহাদের কাজই হইল ইংরেজদের বস্ত্র ফ্যাক্টরী ও তন্তুবায় কারিগরগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ জাতিবর্ণ একই ও একই গ্রামে বসবাসই তাহাদের এত প্রভাব প্রতিপত্তির কারণ এবং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করা যেকোন 'রেসিডেণ্ট'-এর সাধ্যাতীত। বাস্তবিকই এই কেন্দ্রে (আরঙ্গে) পূর্বের কার্য পরিচালনা পদ্ধতি এরূপ অত্যাচারমূলক যে, এই সমগ্র অঞ্চলে তরুণ বয়স্ক তন্তুবায় এখন অল্পই আছে। কারণ তাহাদের পিতামাতা এখন আর তাহাদেব বস্ত্র বয়নের কর্মশিক্ষা দেয় না, ইহার পরিবর্তে তাহারা এখন মাঠে গিয়া চাষের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কেবল চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে গেলে দুঃখদুর্দশা অনিবার্য, কিন্তু তাহাই তাহারা স্বীকাব করিয়া লইয়াছে।"

৫। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে অনাবৃষ্টির পর ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যার কবলে সারা জেলার দুই-তৃতীয়াংশ জলের তলায় চলে যায়। বন্যার ভয়াবহতা এরূপ প্রবল ছিল যে, ঐ সময়ে দামোদরের বর্তমান খাতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্ধমান শহরে কয়েকটি গৃহ ব্যতীত সমূহ বসবাসের বাড়ী বিনষ্ট হয়েছিল। পর পর তিন বছর ধরে খাদ্যোৎপাদন না হওয়ায় সারা দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

৬। ছিয়াত্তরের মণ্বন্তরের কবলে বর্ধমানের এক-তৃতীয়াংশে চাষী, কৃষি-শ্রমিক ও হস্তশিল্পী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে খাদ্যোৎপাদন কোনক্রমে সম্ভবপর হলেও বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিম ভারত হতে আমদানীকৃত তুলার গুণগতমান ও মূল্যের প্রতিযোগিতায় স্থানীয় তুলার চাহিদা হ্রাস পায় এবং তাঁতিরা আমদানীকৃত তুলার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। বর্ধমানের মাটি তুঁত চাষের উপযোগী ছিল। কিন্তু তুঁত চাষের জন্য উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায়

চাষীদের নিকট তুলনামূলকভাবে ধানের চাষ লাভজনক ছিল। বর্ধমান জমিদারীর দুরবস্থার, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মাতা-পুত্রের কলহ, নবকৃষ্ণ মুন্সীর সাঁজোয়াল পদ গ্রহণ, হেস্টিংস—ব্রজকিশোরের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কারণে জেলার কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থলোভী কর্মচারীগণের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। তুঁত চাষের জন্য দাদন গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় কোম্পানির আরঙ্গে চাষীদের অবরুদ্ধ করে বেত্রাঘাত করা হত। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উপর কোন বিধিনিষেধ ছিল না; কিন্তু তুলা ও রেশমের ক্ষেত্রে কাঁচামাল বিক্রির স্বাধীনতা না থাকায় ক্রমে ক্রমে এ দুটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। রেশমের চাষ হ'ত জমি ইজারার ভিত্তিতে এবং উৎপাদনের উপর চাষীর কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল না। 'বোর্ড অব রেভেনিউ'-এর প্রেসিডেন্ট জন শোর-এর নিকট প্রেরিত কালেক্টর ল'মার্শারের পত্র (৮ই এপ্রিল, ১৭৮৯) হতে জানা যায় যে, তুঁত চাষের জন্য চাষীদের দাবী ছিল বিঘা প্রতি ১৪ টাকা হতে ১৬ টাকা—এমন কি কখনো কখন ১৮ টাকায় উঠেছিল। কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের অত্যাচারের কথা মার্শার অস্বীকার করেন নাই। এমতাবস্থায় কার্পাস, তুঁত ও ইক্ষুর প্রভৃতি বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন লাভজনক না থাকায় এগুলির চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

৭। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে পত্তনি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রজা বা কৃষকের জমি উপর সর্বস্বত্ব বিনষ্ট হয় এবং শাসক ও জমিদারের সঙ্গে কৃষকের যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যায়। কৃষিকার্য ও কৃষির উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে এর কুফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর পাঁচশালা, তিনশালা ও দশশালা বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও কৃষক কেউই উপকৃত হয় নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গের পরামর্শে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ, ১নং রেগুলেশন বলে চিরস্থায়ীভাবে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত রেগুলেশনের বলে, এক কথায় রায়ত ও কৃষককে জমির উপর সমস্ত রকমের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হল। পাঠান ও মোঘল আমলে কৃষকের যে ক্ষতি হয় নাই, ত্রিশ বছরের বিদেশী শাসনে সেটা সম্ভবপর হয়ে গেল। এক্ষণে জমির উপর জমিদারগণের সকল প্রকার অধিকার বলবৎ হওয়ায় অধিকারচ্যুত কৃষকেরা উৎপাদনের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। কারণ আগামী বছরে ঐ জমি হয়ত অন্য কৃষককে বিলিব্যবস্থা করা হতে পারে।

প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল। প্রথমতঃ কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব এবং বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানির স্বার্থ বজায় রেখে এক শ্রেণীর দেশীয় অভিজাতবর্গকে দলে টেনে কোম্পানির শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করা। তৃতীয়তঃ দেশীয় মূলধন যাতে শিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হতে না পারে তজ্জন্য দেশীয় অভিজাতশ্রেণী গড়ে তোলা, যারা জমিদারী

ক্রয় করে রাজস্ব উসুল দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থে বিলাসিতায় কাল কাটাবে এবং কোম্পানি শাসনকে মদত যোগাবে।

বর্ধমানের মহারাজার চাপে কোম্পানি বাধ্য হয়ে পত্তনি প্রথা মেনে নিয়েছিল এবং দীর্ঘ বিলম্বের পর ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে 'পত্তনি আইন, বলবৎ হয়। পত্তনি আইনের বলে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তনিদার ও চৌপত্তনিদার নামক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং এরাই পরবর্তীকালে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বিবাদে প্রজাশোষণ ও রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। আইন অনুযায়ী জমিদার না হয়েও এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাররা গ্রাম বাংলায় বৃটিশদের এজেণ্টরূপে কাজ করে নিজেদের ধন্য মনে করত। জমিদারী হতে উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্প ও ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে নিয়োগ না করে নূতন নূতন তালুক ক্রয়, মন্দির নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, সামাজিক আড়ম্বর, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতে অর্থ ব্যয় করা হত। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা এবং তাঁর অধস্তন রাজস্ব সংগ্রহকারীর সংখ্যা এই জমিদারীতেই সর্বাধিক ছিল। জমিদারের অধীনস্থ পত্তনিদার ২৪৪৬ জন, দরপত্তনিদার—৮১৭ জন, সেপত্তনিদার—৪৪ জন ও চৌপত্তনিদারের সংখ্যা ছিল—৫ জন।

প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের কৃষি ব্যবস্থায় বর্গী হাঙ্গামার সময় হতেই দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির উপর কৃষকের অধিকার লুপ্ত হওয়ায় উৎপাদনও অসম্ভব রকমের হ্রাস পায়, কার্পাস ও রেশমবস্ত্র বয়নশিল্পীদের উপর অত্যাচারের ফলে তারাও কৃষিকার্যকে জীবিকা হিসাবে বেছে নেয়। ইংলণ্ড হতে লৌহ-ইস্পাত দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় কামারগণ চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে কৃষিকার্য শুরু করে। যার ফল হল অর্থনীতির সমস্ত চাপ পড়ে কৃষির উপর। অপর-পক্ষে জমিদারশ্রেণীর প্রতিকূল আচরণ, পতিতজমি উদ্ধারের অনীহা ও ভূমির উপর কৃষকের অধিকারের অনিশ্চয়তার ফলে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমানের সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। জলনিকাশের ব্যবস্থা না করে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেলপথ নির্মাণের ফলে নদীর ধারা একদিকে যেমন শুকিয়ে গেল, অনুরূপভাবে বৃষ্টির জল নিষ্কাষিত হতে না পেরে ঘন ঘন বন্যা কবলিত হয়ে কৃষিতে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল। বিগত শতকের ষাটের দশকের ম্যালেরিয়া এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের জন্য বিদেশী শাসকই দায়ী। নূতন নূতন পাটকলগুলিতে পাটের যোগান দিতে জেলার পূর্বাঞ্চলে পাট চাষের ফলে বড় বড় চাষীর অবস্থা উন্নত হলেও ছোট ছোট চাষীরা দালালদের উপর নির্ভরশীলতার ফলে প্রকৃতমূল্য কখনই পায় নাই। কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, কালনা, বুদবুদ ও আউসগ্রাম থানায় নীলচাষ ও নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলায় নীলের চাষ শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে; কালেক্টরের এক পত্রে এ খবর জানা যায়। তবে অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার মাত্রাধিক না

হওয়ার প্রধান কারণ ছিল মহতাব্ চাঁদের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের উপস্থিতি এবং এখানে বহু দেশীয় লোক নীলের চাষ ও নীলের কারবারে নিযুক্ত ছিল। তবে শাকাই-এর নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী কিছু কিছু শোনা গেলেও পরবর্তীকালে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাট ও নীল চাষের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে, কালনার জাপোটে একটি চিনির কারখানা ছিল।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ায় দীর্ঘকাল পরে কৃষক, রায়ত ও চাষা জমির উপর আংশিক অধিকার ফিরে পেলেও নিরিখ বৃদ্ধির মামলায় এদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ সময় কেটে যায় এবং ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে K. C. S. Hill-এর তত্ত্বাবধানে প্রকৃত প্রজা, মধ্যস্বত্ব-ভোগী ও জমিদার-পত্তনিদারের সম্পর্ক নির্ণয় করে খতিয়ান নথিভুক্ত করা হয়। ভূমির উপর ব্যবহারকারীর অধিকার না থাকলে কৃষির উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নয়। পরবর্তীকালে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমিরাজস্ব ও ভূমি-সংস্কার কমিশন গঠিত হলে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হয়। বর্ধমানের মহারাজার পক্ষে তাঁর অতিরিক্ত ম্যানেজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নজির তুলে জমিদারের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করেন। অপরপক্ষে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য দেশে আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বিষয়টি অস্থায়ীভাবে চাপা পড়ে যায়।

বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ মুর্শিদাবাদের দরবারে এক ঘোষণার মারফৎ আনুষ্ঠানিকভাবে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন চালু হয় এবং এই আইন বলে সমস্ত মধ্য-স্বত্বাধিকারীর সকল প্রকার অধিকার সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় সরকারে বর্তায়। জমিদার-পত্তনিদার ও বড় রায়তের অনাবাদী ও পতিত জমি উদ্ধার ও বিলি বণ্টনের জন্য সময়ে সময়ে জমির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে জোতের উপর চাপ কমে যাওয়ায় সীমিত পরিমাণ জমিতে কৃষির উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর হচ্ছে। তবে কৃষির উন্নতি বিধান করতে হলে প্রত্যেকটি জোতের জন্য একটা ন্যূনতম পরিমাণ জমির প্রয়োজন; তা না হলে কৃষিকার্য লাভজনক হবে না। এ জেলায় রেজিস্ট্রিকৃত বর্গাজমির পরিমাণ ৯৮,৮৮২ একর এবং এই জমি যদি ১,১২,১২২ জন বর্গাদারের মধ্যে পাট্টা বিলি না করে বর্গাদার সমবায় গঠন করা হত, তাহলে মূলধন বিনিয়োগ ও শ্রম উৎপাদনমুখী হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্ধমানের কৃষিতে প্রভুত উন্নতির পিছনে প্রধানতম কারণ হল, ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের পর বিভিন্ন সময়ে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও সংশোধন। এছাড়া দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে একটা বিরাট অঞ্চলের কৃষক প্রকৃতির রোষ হতে নিস্কৃতি পেয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা করায় সারা বছর ধরে কৃষিকার্য সম্ভবপর হচ্ছে। অতীতে বর্ধমানের জমিদার-

পত্তনিদারগণ কোনদিনই সেচ, পতিতজমি হাসিলের সহায়তা বা কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেন নাই। উপরন্তু তাঁরা মহাজনী কারবারের মাধ্যমে কৃষককে সর্বস্বান্ত করেছিলেন। একালেও গ্রামীণ বিদ্যুৎ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সরকার কর্তৃক ঋণ ও অনুদানের ভিত্তিতে মূলধন যোগান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি করতে পেরে বর্ধমান আজ 'পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার'রূপে চিহ্নিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে মহাজনদের অত্যাচারের হাত হতে পল্লীর কৃষক বহুল পরিমাণে রেহাই পেয়েছে।

(৭)

উনবিংশ শতকে বর্ধমানে খনি, বৃহৎ ও ভারী শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা হলেও এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি ছিল না। কিন্তু বহু পূর্বকাল থেকে বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, কুটিরশিল্প ও কারুশিল্পের দ্বারা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় ছিল। এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় একমাত্র বস্ত্রশিল্প ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ অধিক প্রয়োজন হত না। দেশীয় পদ্ধতিতে লোহা, তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ, কাঁসা ইত্যাদি ধাতব নির্মিত দ্রব্য এখানেই প্রস্তুত হত এবং স্থানীয় বাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এগুলির বিশেষ কদর ছিল। দাঁইহাট ও বনপাসের কাঁসার বাসন, কাঞ্চননগর ও কামারপাড়ার ছুরি-কাঁচি, তরোয়াল, বর্শা, খাড়া, দা, দীননাথপুরের শাঁকের করাত আজও বিশেষ আদরণীয় বস্তু। বিগত শতকেও মেমারী, দাঁইহাট, বাঘটিকরী, মুস্থুলি, ঘোড়ানাশ, জগদাবাদ, পঞ্চকোলা ও মানকরের রেশম ও তসর বস্ত্রের উৎপাদন হত এবং বাজারে চাহিদা ছিল। সুতী-বস্ত্র উৎপাদনে বর্ধমান, কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, কালনা ও মেমারী থানার বয়নশিল্পীদের উৎপাদিত বস্ত্র ও তার গুণগতমানের উৎকর্ষতা অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পাতি, বেত, বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে কুটির তথা গৃহশিল্প-গুলিও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব রেখেছিল। অতীতে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পীদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। মন্দির, মসজিদ, বসতবাড়ী ও মূর্তি নির্মাতাদের বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠী কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করত। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বড় বড় গ্রামগুলি মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য গ্রামগুলিকে স্বয়ংম্ভরপূর্ণ করে তুলেছিল। শ্রমের ব্যাপারে সেকালের ভদ্রস্থ গৃহের মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। ঘরে বসে নেচা, মটকা ও পলুপোকার গুটি হতে তারা সুতা প্রস্তুত করে, স্থানীয় তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বুনিয়ে নিতেন, সেগুলি ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের প্রয়োজন ছিল। এছাড়া গৃহশিল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমকে কাজে লাগাতেন।

রেলপথ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত স্থলপথে মহিষ ও গরুর গাড়ীর সাহায্যে হাট-

বাজার ও গঞ্জে উদ্বৃত্ত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করার পদ্ধতি ছিল। পরিবহনের ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর পেশাদারী মাল-বাহকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পূর্ব হতেই দেখা যায়। বর্ধমান শহরের 'আট হাট' ও 'বত্রিশ বাজার', ইন্দ্রাণীর 'বারহাটে'র উল্লেখ কেবলমাত্র কবিকল্পনা নয়। বর্ণনায় কিছু অতিশয়োক্তি থাকলেও বর্ধমান, উজানী, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা, নাদনঘাট প্রভৃতি স্থানের গঞ্জগুলি ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে জনগণনা দপ্তরের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণশিল্পীর বসবাসের প্রধান কারণ হল জেলা দুটির অতীত সমৃদ্ধি। মুকুন্দরামের বর্ণনায় বণিকগণের বসবাসের নিমিত্ত যে সমস্ত গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তদ্দ্বারা অন্ততপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের অবস্থা বোঝা যায়। সে আমলে অজয়, দামোদর, খড়ি ও বাঁকার স্রোতপথ রুদ্ধ হয়ে যায় নাই এবং এগুলি ছিল ভারী দ্রব্য দূরস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রধান অবলম্বন। স্থানীয় জঙ্গলমহল থেকে নৌকা নির্মাণের জন্য কাঠ সংগ্রহের অসুবিধা ছিল না।

গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্প ও শিল্পীরা টিকে ছিল প্রধানতঃ নির্দিষ্ট পরিমাণে উপার্জনের ভিত্তিতে। পূর্বে ভূমিদানের মাধ্যমে শিল্পীদের আহার ও বাসস্থানের একটা সংস্থানের ব্যবস্থা ব্যতীত স্থানীয় ধনাঢ্য ও জমিদারদের পৃষ্ঠ-পোষকতার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। উৎপাদনের জন্য মূলধনের যোগান আসত দাদন ও কর্জের দ্বারা। প্রতিযোগিতা অবশ্যই ছিল এবং সে প্রতিযোগিতা বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের ন্যায় অসম প্রতিযোগিতা নয়।

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেভাঃ লঙের বিবরণে জানা যায় যে, কালনার বাজারের দোকানের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার এবং এই বাজারে চাল, ডাল, রেশম, উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র, চিনি, গুড় প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করা হত। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনদিনব্যাপী এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই বাজার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। কাটোয়ার বাজারের প্রধানতঃ প্রসিদ্ধি ছিল উৎকৃষ্ট তাঁতবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, গুড়, চাল, পিতল-কাঁসা ও লৌহ নির্মিত দ্রব্যের জন্য। কাটোয়ার 'চাউলপট্টি' ও 'গুড়েহাট' নাম দুটির পূর্ব প্রসিদ্ধির ইঙ্গিত আজও বহন করে চলেছে। আরও বহুপূর্বে রচিত 'তীর্থ-মঙ্গল' কাব্যে এ সকল বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় বর্ধমান শহরের বাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

'চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার
আটহাট ষোল গোলি বত্রিশ বাজার।'

কিন্তু তার পূর্বেও বর্ধমান শহরে তিনটি বাজারের পরিচয় জানা যায়, যথা—রেকাবী বাজার, মোগলটুলি ও বহরাম বাজার এবং পরবর্তীকালে নূতন রাজবাড়ীর অবস্থিতির জন্য জহুরী বাজার ও মহাজনটুলির পত্তন হয়েছিল। মুদ্রা বিনিময় ও হুণ্ডি আদানপ্রদান কার্য প্রধানতঃ রেকাবী বাজারে অনুষ্ঠিত হত। মোগলটুলিতে

দেশীয় পদ্ধতিতে ছোট ছোট অস্ত্র নির্মাণের কারখানা ছিল বলে জানা যায়। মুকুন্দ-রামের বর্ণনায় মধ্যযুগের বিনিময়ের দ্বারা দ্রব্যসংগ্রহের সুন্দর তালিকা পাওয়া যায়। দ্রব্য বিনিময় ব্যতীত রাজকীয় মুদ্রা ও কড়ি দিয়ে মুদ্রামান নির্ণীত হত।

(৮)

এযুগে শিল্প অর্থে ভারী যন্ত্রশিল্পকেই বোঝায়। প্রারম্ভিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন ও যন্ত্রশিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্ধমানের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নাই। যন্ত্রশিল্প স্থাপনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল জ্বালানী। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে রানিগঞ্জে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মেসার্স আলেকজাণ্ডার কোম্পানি সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের খনি হতে কয়লা উত্তোলন কার্য শুরু করে। জাহাজ, স্টীম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্পে জ্বালানী হিসাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় রানিগঞ্জের কয়লার ক্রমাগত বর্ধিত চাহিদার দিকে নজর রেখে দেশী ও বিদেশী সংস্থা-গুলি মূলধন নিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিল। দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে দ্বারাকানাথ ঠাকুর হলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। আরও বহু সংস্থা এ বিষয়ে মূলধন বিনিয়োগ করে এককভাবে সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সম্মিলিত ভাবে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠা করে। এরপর থেকে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানের কয়লা শিল্পে বিদেশী পুঁজিপতি ও মূলধনের একাধিপত্য গড়ে উঠে। মোট উৎপাদন ০ ৩৬ লক্ষ টন হতে বেড়ে বর্তমানে ১ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে।

জাহাজের প্রয়োজন ছাড়াও ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রিষড়াতে সর্বপ্রথম চটকল স্থাপনের ফলে কয়লার ব্যবহার বেড়ে যায় এবং এর কুড়ি বছরের মধ্যে হুগলী নদীর উভয়পার্শ্বে প্রচুর চটকল স্থাপিত হওয়ায় জ্বালানী হিসাবে রানিগঞ্জের কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলিকাতায় ও চটকলের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আনয়নের কাজ দামোদর ও অজয়-ভাগীরথীর নদীপথে দেশী নৌকা ও স্টীমার যোগে সম্পন্ন করা হত। কাটোয়া শহরের কয়লার গুদাম স্থাপনের কথাও জানা যায়; কিন্তু নদীগুলির নাব্যতা নষ্ট হতে থাকায় ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হতে রানিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। সে সময়ে ভূমি-অধিগ্রহণের কোন আইন না থাকায় কার্জটি বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার প্রধান বাধা ছিল। কিন্তু ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মাসের প্রবল বন্যায় ২০০০ টন কয়লাসহ ১১০খানি নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় রেলপথ নির্মাণের দ্রুত প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী, 'বর্ধমানের কালো হীরের' ভাণ্ডার লুণ্ঠনের নিমিত্ত বিদেশী বণিক ও শাসককুল তাদের বহুদিনের প্রতীক্ষিত রানিগঞ্জে পেঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রীতির বশবর্তী হয়ে রেলপথ স্থাপন করে নাই। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতা শহর, জাহাজ ও চটকলের জ্বালানী সংগ্রহ করা। রানিগঞ্জের কয়লার গুণগতমান উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং সমগ্র অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ কয়লার পুরু স্তরের জন্য প্রচুর লভ্যাংশের আশায় বিদেশী মূলধন ও শ্রম নিয়োজিত হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারী-গণের সে আশা মাত্রাতিরিক্তভাবে পূরণ হয়েছিল।

কয়লা শিল্পে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন এবং এ সমস্যার সমাধান হয়েছিল স্থানীয় অনুর্বর অঞ্চলের অনুন্নত বাউরী সম্প্রদায় হতে শ্রমিক সংগ্রহের মাধ্যমে। ঐ অঞ্চলে কৃষিকার্যের অনুন্নত অবস্থার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা খনিশ্রমিক রূপেই বংশানুক্রমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। পরবর্তীকালে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, কোল গোষ্ঠীর আদিবাসীগণও খনিশ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে। বর্তমানে অবশ্য এ ব্যবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং কুশলী ও অকুশলী উভয় শ্রেণীর শ্রমিকের একটা বিশেষ অংশ পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে আমদানী করা হচ্ছে। পূর্বে রানিগঞ্জ ও আসানসোল গ্রামরূপে চিহ্নিত ছিল। একমাত্র কয়লা শিল্প ও খনির জন্যই রানিগঞ্জ (১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ) ও আসানসোল (১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ) মিউনিসিপ্যালিটি শহরে পরিগণিত হয়েছে। তাছাড়া বর্ধমান জেলার ৪৯টি শহরের মধ্যে ৪০টির অবস্থিতি হল খনি ও শিল্প অঞ্চলে।

বেঙ্গল কোল কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রাথমিক পর্বে বহু বিদেশী মূলধন কয়লাশিল্পে নিয়োজিত হলেও দেশীয় মূলধন যৎসামান্য নিয়োজিত হয়েছিল। দেশীয় ধনী ও জমিদার—পত্তনিদারগণ শিল্পে মূলধন নিয়োগ অপেক্ষা জমিদারী ক্রয়কে উত্তমপন্থা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। অন্য লোকের কথা ছেড়ে দিলেও বর্ধমানের মহারাজাও এ বিষয়ে কোন ভাবনাচিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত ২·৫০ লক্ষ একর জমি বিদেশীদের লিজ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন মাত্র। এ বিষয়ে সিয়ারসোলের জমিদার ও কাশিমবাজারের রাজার একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই শিল্প ও খনিগুলিকে জাতীয়করণ করে 'কোল ইণ্ডিয়া' নামক ভারত সরকারের একটি সংস্থার অধীনে আনা হয়। রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে কয়লাখনিতে সঞ্চিত মজুত কয়লার পরিমাণ সারা ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ এবং বর্তমানে ৭১টি খনি কার্যরত অবস্থায় আছে।

(৯)

এত গেল সেকালের কথা। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে বর্ধমানের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর হলেও খনি ও ভারীশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ও কুটিরশিল্প এ জেলার অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে পৃথিবীব্যাপী মন্দার সময় দেখা গেছে যে, কোন নির্দিষ্ট খাতে শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের সমূহ বিপদ আছে এবং যেকোন রকমের মন্দার হাত হতে উদ্ধার পেতে হলে উৎপাদনকে বহুমুখী করতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূলত কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হলেও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া উত্তরোত্তর জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপ কেবলমাত্র কৃষির উপর পড়ায় বর্তমান শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এ জেলার অর্থ-

নীতির বিকাশ ছিল স্তিমিত এবং সেই সঙ্গে কৃষিশ্রমিকের অর্ধ-বেকারত্ব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে যথেষ্ট নিম্নমুখী করেছিল। বর্ধিত জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে অবাঞ্ছিত ছিল।

বর্ধমানের কলকারখানা স্থাপনে বেসরকারী মূলধন নিয়োজিত হলেও তার পরিমাণ ছিল সীমিত এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে মুনাফা অর্জন করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অধিকাংশ কলকারখানা দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রসারিত হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইংলণ্ডের ১৩টি কোম্পানি ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুরে একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, যৌথ সংস্থা, যৌথ কোম্পানী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকারখানা স্থাপনের ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ শিল্পশ্রমিক হিসাবে যোগদান করায় কৃষির উপর চাপ কিছুটা কমেছে। দুর্গাপুর-আসানসোল-হিরাপুর-চিত্তরঞ্জন শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগে এবং সেকারণে এগুলির প্রতিষ্ঠাপর্বে বর্ধমানসহ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রচুর লোক কর্মসংস্থান লাভে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া কয়লাশিল্প জাতীয়করণের পর হতে এ শিল্পও লভ্যাংশ-মুখীর পরিবর্তে শ্রমমুখীতে রূপান্তরিত হওয়ায় অনুর্বর অ-কৃষি অঞ্চলের বর্ধিত জনসংখ্যাকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। বর্তমানে বার্নপুর লৌহ ইস্পাত কারখানাকে আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান তিনটি শিল্পবলয়ের মধ্যে শ্রম ও উৎপাদনের ভিত্তিতে বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের স্থান তৃতীয় এবং এই শিল্পবলয়টি প্রধানত সরকারী প্রশাসন ও মূলধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় শিল্পনীতির অনুসৃত পথ ধরে এর পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়; ফলে অনেক সময় দেখা গেছে যে আঞ্চলিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় এই শিল্পবলয় হতে যে পরিমাণে আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নতি আশা করা গিয়েছিল, সেটা পূরণ হয় নাই বা হওয়ার পক্ষে অনেক বাধা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' প্রারম্ভিক পর্বের ঘোষিত কর্মনীতি, উৎপাদন ও শ্রমিক নিয়োগের পন্থা থেকে সরে এসেছে এবং ঐ সংস্থার দ্বারা কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা আশা করা হয়েছিল সে লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন'-এর বর্তমান কর্মপন্থার দ্বারা বৃহৎ ও ভারী শিল্প এবং রেলওয়েজের সুবিধা হয়েছে। শ্রম-নিয়োগও মূল লক্ষ্য হতে দূরে সরে গেছে। অবশ্য এর জন্য তিনটি মূলধন যোগানকারী সরকারও কম দায়ী নয়। সরকারী পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে চলেছে এবং এর উন্নতি বিধান করতে হলে নূতন মূলধন ও উন্নতমানের পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন ও আধুনিকীকরণের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, অনুরূপভাবে যেসকল কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে আছে, সেগুলি উৎপাদন ও শ্রমিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আধুনিকী-করণের মাধ্যমে পুনরায় চালু করা প্রয়োজন।

(১০)

সম্পদ সংগ্রহ ও তাকে মূলধন হিসাবে নিয়োগ করতে না পারলে আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এখানে কৃষক পিছু গড় জমির পরিমাণ ·৫৮ একর। এত ন্যূনতম পরিমাণ জমির উৎপাদিত শস্যের উপর নির্ভর করে সম্পদ সঞ্চয়ের আশা করা যায় না। মাথা পিছু জমির পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় কম হওয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্য যোগানের জন্য নিবিড় চাষের মাধ্যমে সারা বছর খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। তাই একদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতি ও পরিকল্পনায় প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন ও তার জন্য আঞ্চলিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র জলসেচের ব্যবস্থা, নলকূপ স্থাপন, কৃষিযোগ্য ভূমি, গোচারণ ক্ষেত্র, পুষ্করিণী সংরক্ষণ, পতিতজমি, অনাবাদী জমির উন্নয়ন, বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, কুটির শিল্পের উন্নয়ন, স্বয়ং নিযুক্ত কর্মসূচী (যাদের কৃষিতে নিযুক্তির সম্ভাবনা নেই, তাঁরা উদ্যোগী হতে পারেন) ইত্যাদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকাশ ঘটানর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে কিছু কিছু প্রকল্পের কাজও শুরু হয়েছে।

রাজ্য পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সম্পদ বণ্টন ও বহুমুখী উৎপাদনশীলতার জন্য গ্রামপঞ্চায়েতকে সর্বদা সজাগ থেকে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা প্রকার প্রচেষ্টা করছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র, নদী হতে পাম্পের সাহায্যে জলসেচ, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, মিনিকিট বণ্টন, ভূমিহীনদের বাস্তুভিটা বণ্টন, বর্গাদার নথিভুক্ত ইত্যাদি উন্নয়নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা রাজ্য পরিকল্পনার তত্ত্বাবধানে গ্রামপঞ্চায়েতগুলি পালন করে যাচ্ছে। তাছাড়া তফশিলী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে। গ্রামোন্নয়নের প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে কৃষি ও কুটিরশিল্পের জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার ২৬৭৯টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ২000 গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেচে। কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বারা সম্যকরূপে লাভবান হওয়া যাচ্ছে না।

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি বিকাশের জন্য বর্তমানে জেলা ও ব্লকস্তরে প্রয়োজনভিত্তিক মূলধন ও অনুদান যোগানের কাজগুলিকে ছ'ভাগে ভাগ করা যায়,—

১। জাতীয় শিল্পনীতি হিসাবে ঘোষিত বৃহদায়তন শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে।

২। শিল্পোন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের ন্যায় মাঝারী ধরনের মূলধন বিনিয়োগকারী প্রকল্প রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে।

৩। ক্ষুদ্র নগরোন্নয়ন, রাস্তা, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায়।

৪। কৃষি ও কুটিরশিল্প ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে। এছাড়া উল্লিখিত পঞ্চায়েতের কার্যাবলী এর মধ্যে ধরা হবে।

৫। সমবায় প্রতিষ্ঠান।

৬। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

ক। যৌথ পুঁজি।

খ। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

গ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা আছে, সে অর্থের যোগান আসে কেন্দ্রীয় সরকার, যৌথ কোম্পানি, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অনুদান, ব্যক্তিগত মালিকানার নিকট হতে। সঙ্গতিসম্পন্ন চাষীদের সঞ্চয় দু'ভাবে মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হয়, যথা—(১) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক-সঞ্চয়, (২) উদ্বৃত্ত-অর্থ শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহনে নিয়োগ। কৃষিতে মূলধনের পুনর্নিয়োগ ব্যাঙ্ক ঋণ ও ব্যক্তিগত উদ্বৃত্ত হতে আসে।

বর্ধমান জেলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খাদ্য-শস্য, রাইস মিল, আলু, গুড়, পাট, কলাই, বস্ত্র, হিমঘর, ট্রাকটর, পরিবহন, পেট্রল পাম্প, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মোটর গাড়ী মেরামত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব অসীম হলেও সমমনোভাবাপন্ন লোকের অভাবে এ জেলায় সনবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, বণ্টন ও সমবায় বিপণি ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নতি ঘটে নাই। সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যঙ্ক, পরিবহন সমবায়, বিপনন সমবায়, বস্ত্র উৎপাদক সমবায় ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকলেও দীর্ঘ সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এগুলি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে নাই। অধিকন্তু এর একটা বৃহৎ অংশ সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক কাজকর্ম ব্যতীত সমবায়গুলির কোন ভুমিকা নাই এবং এগুলি প্রধানত উৎপাদনমুখী নয়। জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে গ্রামভিত্তিক প্রাপ্ত অতিরিক্ত জমি সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটের অসুবিধা হতে সামগ্রিকভাবে গ্রামের কৃষিই উপকৃত হবে। প্রকারান্তরে বলা যায়, পৃথক পৃথক ইউনিট হিসাবে জোতের জমির পরিমাণ অন্ততপক্ষে তিন একরের কম হলে কৃষিকার্যের পক্ষে সেটা হবে অ-লাভজনক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সেচ, সার ও উন্নতমানের বীজ বপন করে সমবায়ের মাধ্যমে বিলিকৃত জমির একত্রীকরণ করলে কৃষি অর্থনীতির ধারাই পালটিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটের মালিকগণ যদি অন্য উপার্জনের উপায় উদ্ভাবন করতে না পারে তাহলে কৃষিঋণে জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের অবস্থা সামগ্রিকভাবে অধোগতি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। জেলাসমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা ১০০টির উপর ; কিন্তু সময়োপযোগী ঋণ বণ্টন ব্যবস্থা ও

আদায় মোটেই সন্তোষজনক নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির শাখার সংখ্যা প্রায় ৪০০ অধিক হলেও তারা কৃষি অপেক্ষা শিল্প ও বাণিজ্যে লগ্নী করতে অধিক আগ্রহশীল।

গ্রামীণ আর্থিক উন্নতিবিকাশের পরিচালনাগত দায়িত্ব গ্রামপঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ স্থানীয় লোককেই গঠন করতে হবে, যার উপর জাতীয় অর্থনীতির কাঠোমো ও ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে, অন্যথায় সমূহ প্রকল্পটি অনুদানের রূপ নিয়ে অর্ধ-শতাব্দী পরে সামগ্রিকভাবে আর্থিক অবনতির নৈরাশ্যজনক চিত্রটি দেখা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর আর্থিক উন্নতিবিধানের ক্ষমতা দেওয়া হলেও কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যথা—(১) পরিকল্পনা, (২) পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ট্রেনিং, (৩) অপচয়রোধকল্পে পর্যবেক্ষণ, (৪) ঋণ গ্রহণকারীর উপর তদারকি ক্ষমতা প্রয়োগ, (৫) রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার অপব্যবহাররোধ, (৬) বাৎসরিক সমীক্ষা ও অপচয়ের জন্য সতর্কীকরণ, (৭) উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রের সমন্বয়সাধন, (৮) সময়ানুবর্তিতা ও (৯) হিসাব পরীক্ষা ও উৎপাদন সমীক্ষা।

(১১)

ছ'টি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ২৯টি থানা নিয়ে বর্ধমান জেলার মোট আয়তন ৭০২৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জেলার গড় জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৮৮ জন; যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় লোকসংখ্যা ৬১৫ জন। জেলার মোট লোকসংখ্যাকে মহকুমা ভিত্তিক ভাগ করলে আঞ্চলিক পরিসংখ্যান চিত্র পাওয়া যায়,—

মহকুমা	থানা	আয়তন	গ্রাম	শহর	জনসংখ্যা (লক্ষ)		অনুপাত	
		বঃ কিঃ মিঃ			গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
বর্ধমান (১)	৪	১৭০১	৫১৫	২	৭'০৮	১'৮০	৮০%	২০%
বর্ধমান (২)	৪	১৪২৯	৬৪০	১	৭'৮১	০ ১৬	৯৮%	২%
কাটোয়া	৩	১০৬০	৩৬৮	৩	৫'৬০	০ ৬০	৯০%	১০%
কালনা	৩	৯৯৭	৫৩০	১	৬'১৯	০.৩৫	৯৫%	৫%
আসানসোল	৮	৮৩৯	২৮৫	৩০	৪'০৫	৭'০৯	৩৬%	৬৪%
দুর্গাপুর	৭	৯৯৮	২৩২	১২	৩'৪১	৪'২১	৪৫%	৫৫%
মোট	২৯	৭০২৪	২৫৭০	৪৯	৩৪ ১৪	১৪.২১		

বুদবুদ, ফরিদপুর ও কাঁকসা থানাকে কৃষি অঞ্চলভুক্ত হিসাবে ধরে জেলার কৃষি অঞ্চল ও শিল্প-খনি অঞ্চলের তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়—

অঞ্চল	আয়তন বঃ কিঃ মিঃ	থানা	মৌজা সংখ্যা	পরিত্যক্ত মৌজা	শহর	গ্রাম	শহর	লোকসংখ্যা মোট
কৃষি	৫৮০৬	১৭	২৩২৮	৮৯	৯	২৬˙৬৬	২.৯৪	২৯ ৬০
শিল্প-খনি	১২১৮	১২	৩৫১	২০	৪০	৭˙৪৮	১১˙২৭	১৮˙৭৫
মোট	৭০২৪	২৯	২৬৭৯	১০৯	৪৯	৩৪ ১৪	১৪ ২১	৪৮ ১৫

কৃষি ও শিল্প অঞ্চলের ভূমিভাগ ও লোকসংখ্যার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৩ঃ১৭ ও ৬১ঃ৩৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিভাগের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ খনি-শিল্প অঞ্চলেই অধিক। এছাড়া কৃষি অঞ্চলের একটা উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা বর্ধমানের খনি-শিল্প অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য উপার্জনে লিপ্ত আছেন। কিন্তু শিল্প অঞ্চলে কৃষিকার্যের কোন সুযোগ নেই এবং শিল্প অঞ্চলের শ্রমিককে ঐ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়; কারণ বর্ধমানের কৃষি-শ্রমিক সাধারণত সন্নিকটবর্তী স্থানগুলি হতেই সংগ্রহ করা হয়।

অতীতে অরণ্যসঙ্কুল ও রুক্ষ অঞ্চল অপেক্ষা নদীবহুল পলি গঠিত অঞ্চলে সহজ জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধার জন্য প্রাচীন, বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এবং বড় বড় ব্যবসায় কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল। খনি ও লৌহ-ইস্পাত শিল্প-কারখানা পত্তনের পর রানিগঞ্জ হতে বরাকর নদের তীর পর্যন্ত ভূভাগে জনবসতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে শুরু হয় এবং দুর্গাপুর শিল্পনগরীর সৃষ্টির পর এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি উন্নতির পথে। অনুরূপভাবে সমগ্র শিল্প অঞ্চলের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কৃষিঅঞ্চল হতে আমদানী হয়। দুর্গাপুরের শিল্প-শ্রমিকের একটা বিরাট অংশের বাসস্থান কৃষিঅঞ্চলেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ধমানের কৃষি ও শিল্পাঞ্চল পরস্পরের প্রতিযোগী নহে, পরিপূরকমাত্র বলা যায়। জাতীয় অর্থনীতি ও শিল্পনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে যেভাবে খনি হতে কয়লা তোলা সুরু হয়েছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শিল্পাঞ্চলে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী নির্মাণ করা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং হয়ত সেই সময়ে শিল্প অঞ্চলের জনবসতি কৃষি অঞ্চলের দিকে সরে আসার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এদিকে দৃষ্টি রেখে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রকে দুর্গাপুরের পূর্বাঞ্চলের দিকে প্রসারিত করার যুক্তি আছে। দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বাসগৃহের সমস্যা দেখা দিয়েছে। জেলার সদর শহর বর্ধমানকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' গড়ে তুললে জনসংখ্যার চাপ দুর্গাপুরের উপর হতে কিছুটা লাঘব হবে।

বর্ধমানের শিল্পন্নোয়ন সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতির কথা প্রচার করা হলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এ চিত্র যথেষ্ট আশাপ্রদ নয়। রানিগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি ও খনি-অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র শিল্প-শ্রমিক নিযুক্তির সম্ভাবনাও কম।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনামূলকভাবে যে তথ্য পাওয়া যায়, সে বিচারে বর্ধমানের স্থান চতুর্থ।

পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার শতকরা হিসাব (১৯৮০-৮১)

জেলা	বড় ও মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্রায়তন শিল্প
২৪ পরগণা	৪৫·৬৭	১১·৭৭
হাওড়া	২৩ ৩০	৯ ৩৭
কলিকাতা	৮·৯১	১৪ ৭২
বর্ধমান	৪ ৯১	১২·৮৭

উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, বর্ধমানের বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের সম্ভাবনা আশাপ্রদ নয়, অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ এ জেলাতেই। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি তালিকায় দেখা যায় যে, ১৪.৮৬ লক্ষ জনসংখ্যা ১১৯ বছর পরে ৫৯.৭৯ লক্ষে পেঁছেচে এবং সে তুলনায় কৃষিযোগ্য আবাদী জমির পরিমাণ ও শিল্পন্নোয়নের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই।

(১২)

মানব সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে নগরের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রাচীন কৃষি-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর নগর সভ্যতার বিকাশলাভ ঘটে। অতীতে শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান যুগে পৌরবসতি স্থাপিত হবার মূলে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন-মূলক কার্যকলাপ প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে অতি দ্রুত হারে নগরের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আধুনিককালের নগর বা শহর পত্তনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে গৃহীত মতবাদ হল যে, ঐ সকল স্থানের মোট জনসংখ্যা ৫০০০-এর অধিক এবং জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১০০০ জন হওয়ার প্রয়োজন। এছাড়া মোট কর্মরত ব্যক্তির শতকরা ৭৫ জনের অধিক জীবিকার জন্য কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। 'ভারত' ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জনঘনত্বকে পৌরবসতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয় না। পৌর-বৈশিষ্ট্য হিসাবে বরং বসতির অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব অনেক বেশী। পৌর ক্রিয়াকলাপের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এটি মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত অর্থাৎ জীবিকার দিক হতে খাদ্যোৎপাদনের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ।

বর্ধমান জেলায় প্রাচীন নগরের অস্তিত্বের কোন পুরাতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া যায় না। সাহিত্যে 'ইন্দ্রাণীনগর,' 'উজানীনগর' ও 'চম্পাইনগরী'র উল্লেখ থাকলেও অপর কোন তথ্যভিত্তিক প্রমাণ অনুপস্থিত। প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে 'বর্ধমান' শহর হিসাবে মধ্যযুগেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কাটোয়া ও অম্বুয়া ষোড়শ শতকেই

শহর হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প ও কান্তিদেবের তাম্রশাসনে উল্লেখিত 'বর্ধমানপুর'কে বর্ধমান শহর মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮-১১১ দ্রষ্টব্য)। বর্ধমানের মহারাজার আমলে বর্ধমানের শ্রীবৃদ্ধি প্রমাণ পাওয়া যায় ঘনরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের বর্ণনায়। উজানী-মঙ্গলকোটের কোন প্রাচীনতা থাকলে এটি বাণিজ্যকেন্দ্রিক তথা প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে গণ্য করা যায়।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মোট ৬টি এবং এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে ৪৯টি শহরে পরিণত হয়েছে। অবস্থানগতভাবে এই জেলার শহরগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে, ৫৮০৫.৭ বর্গকিলোমিটার কৃষিঅঞ্চলে ৯টি মাত্র শহর গড়ে উঠেছে এবং অপরপক্ষে ১২১৮.৩ বর্গ-কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে ৪০টি শহরের অবস্থিতি। বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা মহকুমার প্রাকৃতিক পরিবেশকে গ্রামাঞ্চল বলা চলে এবং এই তিনটি মহকুমায় অবস্থিত ৭টি শহরের মধ্যে বর্ধমান ব্যতীত অপর ৬টির অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবেশ গ্রামাঞ্চলভুক্ত। বর্ধমান শহরটি গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হয়েও এই স্থানের প্রাচীনতা, অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা প্রসারের শ্রীবৃদ্ধি, জনসমষ্টির গঠন ও উন্নত সাংস্কৃতিক ভাবধারার জন্য প্রকৃত অর্থে বর্ধমানকে শহর বলা চলে। তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বর্ধমান শহরের অর্থনীতিতে কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের বিরাট অবদান রয়েছে। আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় শহরের সংখ্যা মোট ৪২টি হলেও আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি, রানিগঞ্জ ও অণ্ডাল ব্যতীত অপর ৩৭টি শহরের প্রাচীনত্ব ৫০ বছরের অধিক নয়। এ অঞ্চলে শহরের সৃষ্টি শুরু হয়েছে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পর এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খনি ও ভারীশিল্পের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়ায় আধুনিক সংজ্ঞানুসারে একের পর এক শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। তবে এগুলির মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে আসানসোল, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পূর্বাঞ্চলের ৭টি শহরের লোকসংখ্যা মোট ২.৯১ লক্ষ ও পশ্চিমাঞ্চলের ৪২টি শহরের লোকসংখ্যা ১১.৩০ লক্ষ। পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ ও শহরের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২৬.৬৮ লক্ষ ও ২.৯১ লক্ষ এবং পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ ও শহরের লোকসংখ্যার যথাক্রমে ৭.৪৬ লক্ষ ও ১১.৩০ লক্ষ। তবে ৪৯টি শহরের মধ্যে অধিকাংশই হল নন-মিউনিসিপ্যাল শহরের তালিকাভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলার মোট ২৯১টি শহরের মধ্যে বর্ধমান জেলার শহরের সংখ্যা ৪৯টি এবং জেলার মোট লোকসংখ্যা ৪৮.১৫ লক্ষ জনের মধ্যে শহরবাসীর সংখ্যা ১৪.২১ লক্ষ জন। শহর ও গ্রামের লোকসংখ্যার অনুপাত হল ৭১ ঃ ২৯। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে এ জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল ৫টি এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আসানসোল-গ্রাম শহরে পরিণত হওয়ায় ঊনবিংশ শতকে জেলার মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৬টি। তুলনামূলকভাবে শহর ও শহরবাসীর সংখ্যা একশ বছরে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে শহরগুলি যাতে বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নতি বিধানের চেষ্টা চলছে। পুরসভা, টাউন অ্যাণ্ড কাণ্ট্রি প্ল্যানিং দপ্তর, প্ল্যানিং অথরিটি, দুর্গাপুর ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে জেলার নগরোন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। গৃহ সমস্যা, রাস্তাঘাট, নর্দমা, পরিবহণ, বাজার উন্নয়ন, শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি সমস্যা সমাধানকল্পে নগরোন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমবর্ধমান শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে নগর-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ঃ—

শহর	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১
বর্ধমান	·৪০	·৬৩	·৭৫	১·০৮	১·৪৩	১·৬৭
আসানসোল	·৩১	·৫৬	·৭৬	১·০৩	১·৫৫	১·৮৭
রানিগঞ্জ	·১৬	·২৩	·২৬	·৩০	·৪০	·৫২
কাটোয়া	·০৮	·১১	·১৬	·২১	·২৯	·৩৭
কালনা	·১০	·১৩	·১৭	·২৩	·২৯	·৩৫
দাঁইহাট	০৫	·০৫	·০৮	·১১	·১৩	·১৬
দুর্গাপুর	—	—	—	—	২·০৭	৩·১২

অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয়করণের শ্রেণী বিন্যাসে বর্ধমান জেলার শহরগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ—

১। প্রাথমিক উৎপাদনমূলক কেন্দ্র (খনি এলাকাভুক্ত) ঃ বগড়া, বহুলা, চকবনকোল, ছোড়ড়া, চিনাকুড়ি, জামুরিয়া, জেমরী, কাজোড়া, নিয়ামৎপুর, নিমেহা, নিঙ্গা, পারাশিয়া, পারাশকোল, পরিহারপুর, পেতনা, রঘুনাথচক, সরকডিহি নদিহা, শীতলপুর, শিয়ারসোল, উখরা, বরাকর, আমকুলা, খাঁদড়া, কেন্দা, রামনগর, ভানওয়াড়া ও শ্রীপুর।

২। বৃহৎশিল্প কেন্দ্র (ভারী শিল্প) ঃ দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর, বল্লভপুর ও হিন্দুস্থান কেবলস্ টাউন।

৩। মাঝারি ও ক্ষুদ্র ঃ দিসেরগড়, কুলটি, বাহির-বার্ণপুর, দিগনালা ও লাল-বাজার।

৪। হস্তশিল্প ঃ পানুহাট ও দাঁইহাট।

৫। অন্তর্দেশীয় পরিবহণ কেন্দ্র ঃ আসানসোল ও অণ্ডাল।

৬। অসামরিক রাজনৈতিক কেন্দ্র ঃ বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়া।

৭। বিবিধ ঃ মেমারী, গুসকরা, কাঁকসা, সুখডাল ও বুদবুদ।

উপরোক্ত বিভাগগুলি ব্যতীত কাটোয়া ও কালনা শহর দুটি ধর্মকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ এবং বর্ধমান শহরটিকে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা যায়।

বর্ধমান জেলার শহরগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—

১। দুর্গাপুর, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন ও হিন্দুস্থান কেবলস্ টাউনসিপ ব্যতীত অন্য শহরগুলি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে।

২। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের পর খনি অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরে পরিণত হয়েছে।

৩। অধিকাংশ শহর নন-মিউনিসিপ্যালিটিরূপে চিহ্নিত।

৪। বর্ধমান শহর ব্যতীত অন্যত্র গ্রাম্য-পৌর উপকণ্ঠের সম্প্রসারণ ঘটে নাই।

৫। প্রধানতঃ খনি ও শিল্পাঞ্চলভুক্ত গ্রামগুলিকে শহরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

৬। অপরিকল্পিত উপায়ে শহর পত্তন ও পরবর্তীকালে শহর এলাকা বৃদ্ধির অনুপাতে পানীয় জল, আবাসনগৃহ, পথঘাট, যানবাহন ও আভ্যন্তরীণ-যোগাযোগ, পয়ঃপ্রণালী, শিক্ষাব্যবস্থা ; স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি নগরজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি অবহেলিত অথবা অপর্যাপ্ত।

৭। একই কারণে বর্ধমান, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া শহরে কোন বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠে নাই।

৮। নটিফায়েড এরিয়ার তুলনায় অন্যান্য শহরগুলির নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

৯। শহররূপে চিহ্নিত হলেও অধিকাংশ শহরের পরিবেশ ও গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

১০। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগ শহরবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাগুলির তুলনায় বর্ধমান জেলায় শহরবাসীর স্থান চতুর্থ।

১১। পূর্বাঞ্চলের শহরগুলি ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিজশিল্প ও কুটিরশিল্পের উপর অধিক নির্ভরশীল।

নগরজীবনের আকর্ষণ মানুষকে শহরমুখী করেছে। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও প্রাত্যহিক জীবনের সুখ সুবিধার জন্য গ্রামের মানুষ 'পৌর-আকর্ষণে' আকৃষ্ট হয়। ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় বর্ধমানে পৌর-আকর্ষণ তত প্রবল হয় নাই ; কারণ কর্মসংস্থান, বৃত্তিবহুলতা ও পৌরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অভাবে এগুলি আশানুরূপ আকর্ষণীয় না হওয়ায় অনেকেই কর্মজীবনে শহরবাসী হলেও জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাতে প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বেছে নেয়।

(১৩)

বর্ধমান জেলার অর্থনীতি বিকাশের ধারার সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাসের পথ অনুসরণ করে আধুনিক শিল্প-নির্ভরশীল অর্থনীতি ব্যবস্থায় উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টা হলেও আজও এ জেলার আর্থিক বনিয়াদের মূল কৃষির উপর নির্ভরশীল। একই কারণেই অতীতে রাষ্ট্রশক্তি কৃষিজ উৎপাদনের

উপর ভিত্তি করে ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি-সংস্কার নীতি প্রয়োগ করেছিল যা আজও বলবৎ আছে। জনজীবনের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাও কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের উপর গড়ে উঠায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের হার যথাক্রমে ২৩·২৬% ও ৩০·৫৬%। সে তুলনায় শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের হার অপেক্ষাকৃত কম। মোঘল আমলে অথবা বৃটিশ শাসনাধীনকালে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্প অথবা নিবিড় চাষের কোন প্রচেষ্টা না হওয়ায় জেলার সমগ্র লোকসংখ্যা প্রধানত প্রাচীন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরগুলিতে দুর্দশার অন্ত ছিল না এবং সমগ্রিকভাবে বিকাশে গতি ছিল নিম্নগামী। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে জেলার কৃষক যে অনেকাংশে স্বস্তি পেয়েছে সেটা পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সামগ্রিকভাবে এ জেলার অর্থনীতির পরিবেশের বিবর্তন ঘটায় ক্রমশঃ খনি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে শুরু হয়েছে। অবশ্য শিল্প বিকাশের কাজ শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লভ্যাংশে বৃদ্ধি। কর্মসংস্থা বৃদ্ধি ছিল গৌণ : সেক্ষেত্রে বৃহৎ ও ভারী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সহায়ক মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, শ্রমনিয়োগের কাজকে ত্বরান্বিত করে। অবশ্য সরকারী শ্রমনীতির জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিক যৌথভাবে জেলার উৎপাদন ও অর্থনীতি বিকাশের প্রধান সহায়ক। এতদ্‌সত্ত্বেও এ জেলার বেকার সংখ্যার হার পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় ঊর্ধ্বগামী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের হার বৃদ্ধি করা সম্ভবপর না হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত কারণে অর্থনীতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কলিকাতা শিল্পবলয় ও ধানবাদ খনি-অঞ্চলের মধ্যস্থ বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের অবস্থিতি এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সহায়ক পরিবহণ ব্যবস্থা জেলার শিল্পাঞ্চলকে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে চলেছে। নিবিড় চাষের মাধ্যমে সার, উন্নতমানের বীজ ও জলসেচের দ্বারা কৃষির উন্নতি বিধান করা হচ্ছে ; কিন্তু এমন একটা সময় আসতে পারে যখন অত্যধিক পরিমাণে খাদ্যোৎপাদনের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পেতে পারে। এ বিচারে সমগ্র অর্থনীতি একমুখী করে তোলার পরিবর্তে কৃষিভিত্তিক শিল্পের (**Agro-Industries**) বিকাশ ঘটান উচিত ; কারণ, পাটশিল্পে নৈরাশ্যজনক অবস্থার জন্য পাটচাষীরা বিপর্যয়ের মুখে।

কৃষিজাত দ্রব্যের অসংগঠিত বিক্রয় বাজার, মূলধন ও পরিচালন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তুলনামূলকভাবে কৃষিজাতপণ্য অপেক্ষা শিল্পজাত পণ্যের মূল্য অধিক এবং এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যমানের জন্য কৃষিনির্ভর অর্থনীতি কালক্রমে

পরমুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে। আরও দেখা যায় যে, কৃষিজপণ্য শিল্পজাতপণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক মুনাফায় বিক্রয় হলেও কৃষক তার ন্যায্য ও বর্ধিত মূল্য লাভে বঞ্চিত থাকে।

বর্ধমান জেলার মোট কৃষিযোগ্য ভূমির ৯৪.৬৭% ভাগে চাষআবাদ হয় এবং কৃষক পিছু জমির পরিমাণ ১.৫৮ একর। এত অল্প পরিমাণ জমি জোতের পক্ষে লাভজনক নয়। চাষবাসের বিরতির সময়ে কুটিরশিল্প, গৃহশিল্প ও বয়ন-শিল্পের দ্বারা জীবিকানির্বাহের সম্ভাবনা থাকলেও মূলধন ও উৎপাদকের স্বেচ্ছাধীন বিক্রয়কেন্দ্র না থাকায় তারা উচিত মূল্যলাভে বঞ্চিত।

ভারী ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি লাভ ঘটেছে। আসানসোল, দুর্গাপুর ও বর্ধমান শহরে পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং এই খাতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ খুব নগণ্য নয়। কিন্তু উন্নতমানের পথঘাটের অভাবে পরিবহণের ক্ষেত্রে যে দ্রুততা ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল বাস্তবে কিন্তু তা ঘটে নাই।

বৃহৎ ও ভারী শিল্প-কারখানা ও মাঝারি শিল্প-কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও যৌথ কোম্পানির বিনিয়োগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি ও ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, পরিবহণ ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রধান বাধা হল মূলধনের অভাব, অনভিজ্ঞতা, সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, ব্যাঙ্কঋণ (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক) ও সরকারী অনুদানের মাধ্যমে মূলধনের যোগান আসে। জনসাধারণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হলেও তাদের ধারণা ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র ঋণদান করে থাকে। গৃহীত ঋণের অর্থ বহু ক্ষেত্রেই নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করার জন্য দ্বিতীয়বার ঋণ দানের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতও তার যোগ্য কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও কিন্তু ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ; ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে প্রশাসনের কোন সমন্বয় থাকছে না। বর্ধমান জেলায় মোট ব্যাঙ্ক ঋণ অপেক্ষা আমানতের পরিমাণ অধিক এবং এই আমানতের একটা বিরাট অংশ বর্ধমানে ব্যবহৃত না হয়ে কলিকাতা শিল্পবলয়ে চলে যাচ্ছে। শহরের জীবনযাত্রার মান নগরোন্নয়নের সুবন্দোবস্তের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বর্ধমানের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শহরগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না ; সেকারণে শহরগুলির জন্য উন্নতমানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শ্রমের মান, শ্রমিকের সংখ্যা, আবাসন প্রকল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সম্প্রসারণের আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তথা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে সুদৃঢ় করতে হলে সর্বাগ্রে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা ও ব্যবহারিক কর্মশিক্ষার প্রসারের জন্য অধিক গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট—১

বর্ধমান জেলায় চাউলের বিক্রয় মূল্য

(এক টাকায় প্রাপ্ত সাধারণ চাউলের পরিমাণ)

সাল	পরিমাণ		সাল	পরিমাণ	
	সের	ছটাক		সের	ছটাক
১৬৩২	২০০	— *	১৮৯৫	১৫	৮
১৬৮৯	৩২০	— *	১৮৯৭	৮	—
১৭২২	২০০	— * *	১৯০০	১২	৮
১৭৩৮	১২০	— * *	১৯০৫	১২	৮
বর্গীহাঙ্গামা	৫৬	— *	১৯১০	৯	৮
১৭৬৮	১২০	— *	১৯১৫	৬	১২
১৭৬৯	৩০	— *	১৯১৮	৮	—
১৭৭০	৩	— *	১৯২৫	৫	৪
১৭৮১	১০৯	— * *	১৯৩০	৮	১২
	৭০	— * * *	১৯৩৫	৯	—
১৭৯৪	৮০		১৯৪০	৭	৮
১৮৬২	৩৪	—	১৯৪২	৫	—
১৮৬৬ (জানুয়ারী)	২০	—	১৯৪৩	১	১২
ঐ (জুলাই)	৮	—	১৯৪৭	২	৪
১৮৬৮	২৪	—	১৯৫০	২	৪
১৮৭০	২০	—	১৯৫৫	২	—
১৮৭৪	১১	১২	১৯৬০	১	৮
১৮৮০	২০	—	১৯৭০	৩৫০ গ্রাম	
১৮৮৫	১৫	১২	১৯৮০	২৫০ „	
১৮৯০	১৬	—	১৯৯১	২০০ „	

* সমগ্র বঙ্গদেশের হিসাব। * * উৎকৃষ্ট চাল। * * * উৎকৃষ্ট আতপচাল।

পরিশিষ্ট—২

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কালপঞ্জী

(বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে অতীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে এবং বর্ধমানের জনজীবন প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

কাল		কারণ
আনু. ১৭৪১ পূর্বে	:	পঙ্গপালের আক্রমণে সমুদয় শস্যের ক্ষতি। ‘বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে’।
১৭৬৮	:	অনাবৃষ্টি।
১৭৬৯	:	প্রথম ৯ মাস অনাবৃষ্টির পর প্রবল বন্যা।
১৭৭০ (২৯শে সেপ্টেম্বর)	:	দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী নদীতে জলোচ্ছ্বাস।
১৭৭০-৭১	:	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
১৭৮৭	:	দামোদর ও অজয়নদের বন্যা।
১৭৯৪ (৩০শে সেপ্টেম্বর)	:	দামোদরের বন্যা।
১৮২৩	:	দামোদরের বন্যা।
১৮৫৫ (এপ্রিল মাস)	:	সমগ্র জেলা জলপ্লাবিত।
১৮৬৫	:	অনাবৃষ্টি।
১৮৬৬	:	ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
১৮৭৪	:	অনাবৃষ্টিজনিত কারণে দুর্ভিক্ষ।
১৮৮৪	:	ঐ এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে শস্য ও গবাদি পশু বিনষ্ট।
১৮৮৫	:	অনাবৃষ্টি।
১৮৮৬	:	ঐ।
১৮৯৪	:	ঐ।
১৮৯৪	:	ভূমিকম্পের ফলে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি।
১৯০৪	:	অনাবৃষ্টি।
১৯০৫ (জুলাই)	:	দামোদরে বন্যা।
১৯০৭	:	অনাবৃষ্টি : কালনা মহকুমায় দুর্ভিক্ষ।
১৯১৩	:	দামোদরে বন্যা : শস্য ও গবাদি পশু বিনষ্ট।
১৯১৪	:	দামোদরে প্রবল বন্যা।
১৯১৬	:	অজয় ও দামোদরের বন্যায় বর্ধমান ও কাটোয়া মহকুমায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি।
১৯১৭	:	দামোদরের বন্যা।

কাল		কারণ
১৯১৮	:	প্রথম ছয় মাস প্রচণ্ড খরা এবং পরে প্রবল বর্ষণের ফলে সমগ্র জেলা জলপ্লাবিত।
১৯১৯	:	জেলার পূর্বাংশে বন্যা ও পশ্চিমাংশে খরা।
১৯২০	:	প্রবল বর্ষণের ফলে শস্য, গৃহ ও গবাদি পশু বিনষ্ট।
১৯২১	:	দামোদর ও ভাগীরথীতে জলোচ্ছ্বাস।
১৯২৮	:	বন্যা।
১৯৩২	:	অনাবৃষ্টির ফলে আংশিক দুর্ভিক্ষ।
১৯৩৩	:	প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যা।
১৯৩৪	:	দামোদরে জলোচ্ছ্বাস এবং একাংশে খরা।
১৯৩৪	:	ভূমিকম্প।
১৯৩৫	:	অনাবৃষ্টির ফলে অভূতপূর্ব খরা ও দুর্ভিক্ষ।
১৯৩৬	:	ঐ
১৯৪০	:	খরা।
১৯৪২ (অক্টোবর)	:	ঘূর্ণিঝড়।
১৯৪৩ (জুলাই)	:	দামোদরে বন্যা।
১৯৫০	:	টর্নেডো ঝড়ের ফলে খণ্ডঘোষ থানায় প্রভূত ক্ষতি।
১৯৫৬	:	অজয় ও দামোদরনদে প্লাবন।
১৯৭৮ (সেপ্টেম্বর)	:	সমগ্র জেলা জলপ্লাবিত।
১৯৮৭	:	প্রবল বৃষ্টিপাত।

পরিশিষ্ট—৩

গ্রামীণ দুর্গোৎসবের ব্যয় বরাদ্দের তালিকা

বাংলা ১১৮৭ সালে (১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ) কাটোয়ার নিকটস্থ বেনগ্রামে জনার্দন শর্মার বাটীতে দুর্গোৎসবের ফর্দ[১] :—

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
প্রতিমা	৫	—	জের	৫৫	৪½
পুরোহিতের দক্ষিণা	৮	—	গুড়	৬	—
ভাল চাউল ১৭ মণ	৬	৪	দধি	৫	—
ঘৃত ১ মণ	৫	—	দুগ্ধ	৩	—
ময়দা ৪ মণ	২	২	চিনি	—	৮
ক্ষীর	৫	—	কাষ্ঠ	২	—

	টাকা	আনা		টাকা	আনা
সন্দেশ	৭	—	নারিকেল	২	—
তরকারি	২	—	লবণ	—	৮
তৈল ১½ মণ	২	—	পানসুপারী	—	৮
ফুলফলারি	১	—	চন্দনধূপ	—	৬½
মশলাদি	১	২	নাপিত	—	৮
চূর্ণ	—	½	বাদ্যকর	৩	—
কাপড়	৮	—	বেহারা	১	—
উত্তম আতপ চাউল ৪ মণ	২	৪	অন্যান্য	—	৮
কলাই	—	৮			
	৫৫	৪½	মোট ব্যয় ৮০ টাকা ৩ আনা		

মন্তব্য : আহার্যের জন্য ১৭ মণ চাল, ৪ মণ ময়দা, ১ মণ ঘি ও ১½ মণ তৈলের প্রয়োজন হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং এটি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২২ হতে গৃহীত।

: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। *Bengal District Gazetteers, Burdwan*—J.C.K. Peterson.

২। *Bengal Historical Records* (New Series) : *Burdwan*, (in 2 Vols.)—Ed. Asoke Mitra, I.C.S.

৩। *Cambridge History of India*, Vol. VI.

৪। *Census of India*, 1981, Barddhaman District.

৫। *District Census Hand Book, Burdwan*, 1951—Asoke Mitra.

৬। *Early Revenue History of Bengal*—F. D. Ascoli.

৭। *East Indian Fortunes*—P. J. Marshall.

৮। *Economic History of Ancient India* (in 2 Vols.)—R. C. Dutt.

৯। *Economic History of Bengal* (in 3 Vols.)—N. K. Sinha.

১০। *Economics of Kautilya*—B. C. Sen.

১১। *Economic Transition in the Bengal Presidency*—H. R. Ghosal.

১২। *Everyday life in the Pala Empire*—S. Hussain.

১৩। *From Akbar to Aurangzib*—W. H. Mareland.
১৪। *Historical Introducation to the Bengal portion of the Fifth Report*—W. K. Ferminger.
১৫। *History of Bengal* (Dacca University) Vol. I & II.
১৬। *History of Ancient Bengal*—R. C. Majumder.
১৭। *Interesting Historical Events*—J. Z. Halwell, 1774.
১৮। *India at the Death of Akbar*—W. H. Mareland.
১৯। *Imperial Gazetteers, Provincial Series*, Vol. I.
২০। *Land Revenue Policy, 1902*—Govt. of India.
২১। *Old Fort Williams Records* (in 5 Vols.)—Wilson & Hill.
২২। *Report on the Land Revenue Commission of Bengal, 1940.*
২৩। *Statistical Accounts of Bengal*—W. W. Hunter. Vol. IV.
২৪। *12 years of Left Front Govt.*—Govt. of West Bengal.
২৫। ভারতেব কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন—সুপ্রকাশ রায়।
২৬। মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা (অনুবাদ)--ইরফান হাবিব।
২৭। বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়।
২৮। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন।
২৯। মুকুন্দরামেব চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাদেমী)—ডঃ সুকুমার সেন, সং।
৩০। বর্ধমান রাজবংশানুচবিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়।
৩১। সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূগোল—ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য।
৩২। পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—ডঃ বিশ্বনাথ জানা।

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বনিয়াদ ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ব্যাপকতর অর্থে কৃষিযোগ্য ভূমি, গোচারণ-ক্ষেত্র ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, বণ্টন ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে হলে ভূমি সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থাকে সঠিক পদ্ধতিতে কালোপযোগী করে কৃষক ও সমাজের কাজে গ্রহণযোগ্য করা উচিত। বঙ্গদেশ তথা পূর্ব ভারতে প্রথম কোন সময়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল তার কোন প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তি অধিকারের বিধি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগে অথবা তার স্বল্পকাল পরে ভূমিরাজস্ব প্রথার উদ্ভব হয়। কৌমসমাজে সম্পত্তির মালিকানা গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত ছিল। রাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রজার ধন ও প্রাণ রক্ষা বিধানের মূল্যেরূপে রাজা বা স্থানীয় শাসক রাজস্ব বা কর ভোগের অধিকার লাভ করতেন।[১] কৃষিজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান উৎপন্নদ্রব্য, সেকারণে কৃষি-প্রধান অঞ্চলে প্রাচীনকালে কর্ষিত ভূমিতে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর রাষ্ট্রের অংশ রাজাকে বলি বা কররূপে দেওয়ার বিধি চালু হয়। কৃষির উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলাও আয়ত্ত হয়েছিল এবং একই কারণে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর রাষ্ট্রের পাওনা হিসাবে রাজাকে কর স্বরূপ দিতে হত।

ঋগ্বেদে ক্ষেত্র ও সীমার উল্লেখ আছে,[২] সেকারণে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ঐ সময় হতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের প্রথা চালু ছিল। অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে গ্রাম, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র বিভাগ ও মালিকানার পরিচয় পাওয়া গেলেও ভূমিরাজস্বের কোন উল্লেখ নাই।[৩] কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে (২।১৫) ভূমিরাজস্বসহ দশ প্রকার করের উল্লেখ আছে। 'সীতাধ্যক্ষ' পদাধিকারী রাজকর্মচারীর উপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে[৪] মৌর্যযুগে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি রাজস্ব আদায়ের বিধি ব্যবস্থা ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে ⅛ অংশ রাজস্ব সংগ্রহের উল্লেখ তাঁর শিলালিপিতে পাওয়া যায়।[৫] ভূমির গুণগতমানের উপর রাজস্ব ধার্যের উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে,—

'পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥
আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রু-মাংস-মধু সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি-রসানাঞ্চ পুষ্প-মূল-ফলস্য চ। ৭।১৩০-১৩১

অনুঃ লাভ স্থানীয় স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদি বার্ষিক পঞ্চাশভাগ এবং ভূমির উর্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ

রাজার প্রাপ্য। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষ, ফলমূল, রসদ্রব্য ও পুষ্প—এই সমস্ত দ্রব্যের লাভের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

অর্থশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় রাজস্ব ধার্যের যে নির্দেশ আছে, তা হিন্দুযুগে বিভিন্ন সময়ে বলবৎ ছিল। মনুসংহিতায় (৭।১৩৩) ব্রাহ্মণের নিকট কর গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে বর্ণিত; অনুরূপভাবে বৃটিশ আমলের আইনে ব্রাহ্মণকে দেয় ও দেবোত্তর সম্পত্তি 'নিষ্কর' আখ্যায় খতিয়ানভুক্তির বহু নির্দশন পাওয়া যায়। আইনের জটিলতা সৃষ্টি ব্যতীত বর্তমানকালে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় নূতন কিছু পাওয়া না গেলেও ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে যে অধিকার হতে কৃষককে বঞ্চিত করা হয়েছিল, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে সেই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মৌর্য যুগে গ্রামপত্তন ও কৃষিযোগ্য ভূমির উন্নতি বিধান রাষ্ট্রীয় বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। গ্রাম পত্তনের ক্ষেত্রে বসবাসযোগ্য নূতনস্থান অথবা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উপর অধিবসতি পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, জনসংখ্যার চাপের আধিক্য দেখা দিলে নূতন গ্রামপত্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হত।[৬] মৌর্যযুগে প্রচলিত কৃষি ও কৃষক সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন[৭]—"The land-development policy is, to a large extent, intended to benefit *Sudras* and *Cultivators*, and thus provide relief to the lower socio-economic strata, the artisan class and the peasantry, forming the backbone of the rural population. Among the recipients of land, there may be peasants who have the necessary means to carry on cultivation but no land to cultivate. When land is provided to such poeple, they accept the obligation of carrying on the work of cultivation with a liability to pay tax in the shape of what is called '*Kara*' in return for a life-interest in the property distributed by the state. The parties to the contract must be the heads of the families concerned and the State."

বিষ্ণু সংহিতায় আছে—'সীমা ভেত্তার মুত্তমং সাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ
সীমাং লিঙ্গান্বিতাং কারয়েৎ। ৫/১৬৭।

অনুবাদ: 'জমির সীমা ভাঙিয়া পরের জমি দখল করলে রাজা তাকে উত্তম সাহস দণ্ড দেবেন এবং সীমা চিহ্ন যুক্ত করার নির্দেশ দেবেন।'

নারদ স্মৃতিতে ভূমির মালিকানা-স্বত্ব, কর্ষণকারীর অধিকার ও জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

১। যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দ্বারা নিবারিত না হয়ে অপরের ক্ষেত্র কর্ষণ করে তাহলে কর্ষণাদির জন্য আট ভাগের সাত ভাগ শস্য পাবার অধিকারী। কিন্তু

পূর্বক্ষেত্রী, এর মধ্যে উপস্থিত হলে কর্ষণ ব্যয় দিয়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এইভাবে আট বছর অতিক্রান্ত হয়ে ক্ষেত্রের অধিকার কর্ষণকারীর উপর বর্তাবে।

২। বেদী, গর্ত, জলনিগম-পথ, বিষ্ঠাত্যাগ, ছেঁদ প্রভৃতির দ্বারা চতুষ্পথ (চৌমাথা) বা প্রশস্ত পথ, দেবস্থান, রাজপথ ও সাধারণপথ রোধযোগ্য নয়।

৩। যেক্ষেত্র তিন পুরুষ ধরে কর্ষণাদির দ্বারা ভোগ দখলে থাকে এবং পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বাসগৃহে অন্যের স্বত্ব নিবারক হবে।

নারদ আরও উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিক্ষেত্রের চারা গাছ, বাঁধ, ফল, ফুল, জলসেচের খাল নষ্ট করা হলে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে। কৃষক কৃষিযোগ্য ভূমি আবন্ধ বিহীনভাবে পতিত করে রাখলে জরিমানা দিতে বাধ্য।[৮]

বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের শেষ পর্ব হতে আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ, কারণ এর পূর্বে বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কোন প্রাচীন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্তযুগে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্ব ধার্য ছিল। গুপ্তযুগের শেষপর্বে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের আমলে ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সম্পর্কিত হিসাবপত্র ও রাজস্ব আদায়কারী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করার প্রথা ছিল। এদের মধ্যে অগ্রহারিক (ব্রাহ্মণগণকে দানকৃত নিষ্কর ভূমির তদারককারী), ঐদ্রঙ্গিক (স্থায়ী প্রজার রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারী), ঐর্ণস্থানিক (পশমদ্রব্যের তদারককারী কর্মচারী) হিরণ্যসামুদায়িক (নগদ রাজস্ব আদায়কারী) প্রভৃতি রাজকর্মচারীর পদ উল্লেখযোগ্য।[৯] মল্লসারুল তাম্রশাসনে 'ভোগপতি' নামধেয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ এবং ঢেক্করী হতে প্রচারিত ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জে তাম্রশাসনে 'মহাভাগিক' নামক উচ্চপদস্থ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়।[১০]

প্রাচীন যুগে উৎপন্ন শস্যের উপর ধার্য রাজস্বে রাজার অধিকার বলবৎ হলেও আপৎকালীন সময় ব্যতীত ভূমির উপর প্রজার অধিকার বলবৎ ছিল। মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ হয়েও বিজয়সেন বলপূর্বক প্রজার জমি অধিগ্রহণ না করে উচিত মূল্যে ক্রয় করেছিলেন[১১] এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের প্রথা ঐ যুগে বলবৎ ছিল। নিষ্কর ভূমিদানের জন্য রাজস্ব লাভ না হলেও এক-ষষ্ঠাংশ পুণ্যার্জন লাভের অর্থ হল যে, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন শস্যের ছ'ভাগের এক ভাগ। গুপ্তযুগে প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ষষ্ঠ শতকে বর্ধমানভুক্তিতে দেখা যায়। বিজয়সেন গোপচন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করেও স্বাধীনভাবে ভূমিদান করেছেন এবং গোপচন্দ্রের পূর্ব সম্মতির কোন উল্লেখ নাই। দানকৃতভূমিও বিজয়সেন তাঁর অধীনস্থ প্রজার নিকট হতে ক্রয় করেন। এটা হল সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বহু প্রাচীনকাল হতে ভূমিদান ক্রিয়া পুণ্যকর্মরূপে বিবেচিত হত। 'মল্লসরুল তাম্রশাসন' হতে জানা যায়—

'ষষ্ঠিং বর্ষ সহস্রানি স্বর্গে নন্দতি ভূমিদং।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥'

ঈশ্বর ঘোষের 'রামগঞ্জ তাম্রশাসনে' ভূমিদান ও গ্রহণ উভয়কার্যই পুণ্যকর্মরূপে বিবেচিত হত—

'ভূমি যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমি প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥'

এছাড়া বহু তাম্রশাসনে লেখক, সন্ধিবিগ্রহিক (রাজার পক্ষে নিযুক্ত কর্মচারী) ও পুস্তপালের (রেকর্ড কিপার) উল্লেখ হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, একালের ন্যায় অতীতেও ভূমিসংক্রান্ত নিয়মাবলী যথোপযুক্তভাবে লিখিত ও রক্ষিত হত। প্রাচীনকালে পদ্মমালার বীচি, ভস্ম, অঙ্গার, নালা, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতির দ্বারা ভূমির সীমানা নির্ধারণের রীতি ছিল।

শশাঙ্কের আমলে অন্ততঃপক্ষে সমগ্র রাঢ় ও ওড়িশার উত্তরভাগ কর্ণসুবর্ণের অধীনস্থ ছিল। শশাঙ্কের এগরা তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, দোষতুঙ্গ নামক এক ব্যক্তি রাজার নিকট অনাবাদী ভূমি প্রার্থনা করছে এবং ঐ ভূমি হতে কোনরূপ রাজকর আদায় না হলেও ভূমিদানের ফলে রাজার এক-ষষ্ঠাংশ পুণ্য লাভ হবে। এমতাবস্থায় অনুমান করা যায় যে, শশাঙ্কের রাজ্যকালীন সময়ে আবাদী ভূমির রাজকর ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ; আবার রাজার নিকট হতে ভূমি ক্রয় করে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসনে আছে।[১২]

ধর্মপালের খলিমপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত ষষ্ঠাধিকৃত নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ হতে অনুমান করা হয় যে, প্রজার উৎপন্নজাত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব পালনৃপতিগণের প্রাপ্য ছিল[১৩] এবং যে শ্রেণীর কর্মচারীগণ ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন তাঁদের পরিচিতি ছিল 'ষষ্ঠীধিকৃত'। উপরিউক্ত তাম্রশাসনে 'পিণ্ডক' নামক অপর এক প্রকার করের উল্লেখ আছে।[১৪] বিজয়সেন বা বল্লালসেনের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব আদায়ের উল্লেখ ঐ আমলে সম্পাদিত কোন তাম্রশাসনে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজারা পালআমলের নির্ধারিত রাজস্ব আদায় পদ্ধতি বলবৎ রেখেছিলেন। তবে লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, বর্ধমান-ভুক্তিতে ভূমির পরিমাপ নল দ্বারা নির্ধারিত হত এবং বন, কৃষিযোগ্য ভূমি, পতিত-জমি, জলাশয়, পানেরবোরজ, নারিকেলবৃক্ষের উপর কর ধার্য করা হত এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব ধার্যের পরিমাণস্বরূপ দেখা গেছে যে, একদ্রোণ পরিমিত ভূমির রাজস্ব ১৫ পুরাণ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।[১৫] বিশ্বরূপসেনের 'সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসনে' পানবোরজের উপর রাজস্ব নির্ধারণের উল্লেখ আছে এবং পুরাণ নামক মুদ্রায় রাজকর আদায় হত।[১৬]

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে হিন্দু-আমলে সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের উপর এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর আদায়ের প্রথা ছিল; তবে বিশেষ জরুরী অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ

বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৭] আবার অজন্মার সময়ে খাজনা থেকে বেকসুর অব্যাহতি পাওয়া যেত। গ্রামে সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ যথা—পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট তৈরী ইত্যাদি কাজের সময় সাময়িকভাবে খাজনা আদায় স্থগিত করা হত। জমির মালিকানা হস্তান্তরিতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হস্তান্তরকরণের পূর্বে গ্রাম-অধিকরণের নিকট পূর্বঅনুমতি নেওয়ার প্রথা ছিল; এমনকি রাজা ভূমিদান করতে প্রবৃত্ত হলে, 'মত মস্তু ভবতাম্' এই সম্বোধনপূর্বক প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মতি গ্রহণ করতেন। ভূমি-হস্তান্তরের পূর্বে বাকী খাজনা পরিশোধ শর্তটি আবশ্যক ছিল। প্রজার মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত বৃহদাকার জলাশয় প্রতিষ্ঠার বিষয় স্থানীয় প্রবাদ ও তাম্রশাসন হতে জানা যায়। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিলিপি এর মধ্যে অন্যতম।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি কর্তৃক লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের পর বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মুসলমান রাজত্বের প্রথম ১০০ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হওয়ায় বলপ্রয়োগ ও লুণ্ঠন নীতির উপর ভিত্তি করে শাসকেরা রাজস্ব আদায় করতেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকেও রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন নজির পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে আমীরবর্গের মধ্যে বিজিত ভূখণ্ড বণ্টন করার প্রথা ছিল। যদিও আমীর শব্দের অর্থে 'কর্মকর্তা' বা রাজকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমীরগণ ছিলেন সৈন্য-পরিচালক বা সৈন্যাধ্যক্ষ। অনেক সময় আমীরগণকে সামন্ত ভূম্যকারীর ভূমিকায় দেখা যেত; কখন কখনও তাঁরা ফৌজদার অথবা শাসন বিভাগীয় কর্মচারীরূপে গণ্য হতেন। আমীরগণের অধীনস্থ ভূখণ্ড সুনির্দিষ্ট থাকলেও সেনানিবাস সন্নিবেশের (দমদমা) উপর তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতার প্রতিফলন হত।[১৮] মধ্যযুগে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সামরিক। মুসলমান আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ হিন্দুদের উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিতেন। হিন্দুগণ ছিলেন রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাদের উপর অত্যাচার করা চলত, কিন্তু মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীগণের উপর বলপ্রয়োগ করলে, গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু-ভূস্বামীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যাই ছিল অধিক।[১৯] দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের কায়স্থ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধন, সমুদ্রগড় ও পূর্বস্থলীর ব্রাহ্মণ জমিদার মুকুটরায় ও শিখরভূমের রাজার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য গৌড়ের সুলতানগণ নির্ভর করতেন। সুলতান ফকরউদ্দিনের শাসনকালে হিন্দু প্রজাগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ ছিল প্রজার প্রাপ্য এবং অর্ধাংশ রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য করও প্রদান করতে বাধ্য করা হত।[২০]

মুসলমান আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধাংশ। ঐ সময়ের জনসংখ্যার চাপ অধিক না হওয়ায় কৃষক যাতে কৃষিকার্যে উন্নতি-

বিধানে সচেষ্ট হন, তার জন্য অত্যাচারী সুলতানগণও স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণের সহায়তায় কৃষকের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ভূমির উপর কৃষকের স্বত্বসহ তিন প্রকারের রাজস্ব বন্দোবস্ত ছিল, যথা,[২১]—

১। প্রতি মরশুমে উৎপন্ন ফসলের উপর নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব ধার্য হত এবং রাজস্বের পরিমাণ প্রতি বৎসর নির্ধারিত হওয়ার নজির আছে।

২। কোন ক্ষেত্রে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণের উপর রাজস্ব ধার্য হওয়ার বিধি ছিল; এক্ষেত্রে গড় রাজস্ব নির্দিষ্ট হ'ত। উৎপন্ন শস্যের উপর এই গড় নির্ভর করত না। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে কৃষক অব্যাহতি পেলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে সুলতানের ইচ্ছা অনিচ্ছাই প্রবল ছিল।

৩। কৃষক তার সমগ্র ভূমির উপর চুক্তি সম্পাদনপূর্বক রাজস্ব জমা দিত। উৎপন্ন শস্য বা ভূমির পরিমাণের পরিবর্তে লাঙ্গলের সংখ্যার উপর কখন কখন রাজস্ব ধার্য হত।

ভূমিরাজস্ব নগদে দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। নগদের পরিবর্তে বাজার দরে শস্য জমা দিয়ে ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করার প্রথা ছিল। এই যুগে রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন রাজকর্মচারী ছিল না। এক একটি অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব চুক্তি শর্তে বিলি করা হত এবং আদায়কারী চুক্তিমত রাজ সরকারে অর্থ বা শস্য জমা দিয়ে অবশিষ্টাংশ মুনাফা স্বরূপ গ্রহণ করার অধিকারী ছিল। কোন কোন অঞ্চলে জায়গীদার নিয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ছিল এবং উক্ত জায়গীরদার তার নির্দিষ্ট এলাকায় শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করার অধিকার প্রাপ্ত হতেন।[২২]

আকবরনামায় পাওয়া যায় শেরশাহ সর্বপ্রথম জরীপের প্রবর্তন করেন। সমগ্র কৃষিযোগ্য ভূমি জরিপ করে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভূমির জন্য পৃথক পৃথক হারে রাজস্ব ধার্য ছিল। গড় উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কৃষকের এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিল সুলতানের। শেরশাহের অল্পকাল রাজত্বে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের কোন বিশদ বিবরণ জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, ভূমি পরিমাপ করে জরিপ পদ্ধতি চালু হয় নাই; গ্রামভিত্তিক আনুমানিক হিসাবের উপর রাজস্ব ধার্য হত। এই সময়ে বাংলাসুবা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং বর্ধমান অঞ্চল সুলেমানাবাদের অধীন ছিল। বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল বাদে অধিকাংশ ভূমি ছিল উর্বর অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর, সেকারণে মনে করা যেতে পারে যে, এই অঞ্চলের কৃষকগণকে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দিতে হত। নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রদান করলে ভূমির উপর উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষকের অধিকার ছিল এবং উক্ত ভূমি বিক্রয়, বন্ধক ও অন্যান্য প্রকার হস্তান্তর করার ক্ষমতা কৃষককে প্রদান করা হয়েছিল। শেরশাহের বিধিব্যবস্থা কেবলমাত্র খাসমহলের উপর বলবৎ ছিল; তাঁর অধিকারভুক্ত অন্যান্য স্থানে (জায়গীরমহল) পূর্ববৎ বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিলে ভূমির উপর উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষকের অধিকারসহ উক্ত

ভূমি বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ক্ষমতা কৃষকের ছিল। কিন্তু হিন্দু প্রজার প্রতি শেরশাহের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। Von Neor's 'Akbar' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে[২৩]—"When the collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax they should pay it with all humility and submission; and if the collector wishes to spit into their mouths without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to show contempt to false religions" আকবর এই ব্যবস্থা রদ করেন।

আকবরের সময়ে বর্ধমান তথা বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ জানা যায়। দাউদ খাঁ ও কতলু খাঁর মৃত্যুর পর বাংলাসুবা মোঘল সাম্রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হয়। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে রাজা টোডরমল্লের উপর বাংলা সুবার রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার ন্যাস্ত করা হলে তিনি শেরশাহের রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করে 'আসল জমা তুমার' প্রস্তুত করেন। আকবরের পরিকল্পনা ছিল সরাসরি কৃষকের কাছ হতে রাজস্ব গ্রহণ; অপরপক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বড় বড় জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করে নবাব সরকারে জমা দিত।

রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য আকবর বাংলাসুবাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন এবং বর্ধমান জেলার ভূমিরাজস্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির ভূমিরাজস্বের উল্লেখ 'আইন-ই-আকবরী'তে পাওয়া যায়।

সরকার সরিফাবাদ : 'সরিফ' শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্তশালী লোকের বাসস্থানকে ইঙ্গিত করে। বীরভুম জেলার দক্ষিণাংশ ও বর্ধমান জেলার মধ্যাংশ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরবকশাহ ও ফতেশাহ নামক মহল বা পরগণা দু'টি এই সরকারের অধীন ছিল অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চল সরিফাবাদের অন্তর্গত।[২৪]

সরকার সুলেমানাবাদ : নদীয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের কয়েকটি পরগণা, হুগলী জেলার উত্তর ভাগ, বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ ও কাটোয়া থানার উত্তরাংশ এই সরকারের অধীনস্থ ছিল। এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং উৎপন্ন শস্যের উপর ধার্য ভূমি-রাজস্ব বাদশাহের নিজস্ব ব্যয়নির্বাহের জন্য নির্ধারিত হওয়ার জন্য এটি সরকার 'হাবেলী' নামে পরিচিত ছিল (হাবেলী=অন্তঃপুর)।

সরকার মদারন : বীরভূমের পশ্চিম হতে রানিগঞ্জ-আসানসোল সহ বাঁকুড়ার পশ্চিম অঞ্চল, আরামবাগ মহকুমার দক্ষিণ অংশ (এই অঞ্চলে গড়মন্দারণ অবস্থিত) বারবার রূপনারায়ণ নদের মোহানা পর্যন্ত সরকার মদারনের বিস্তৃতি ছিল। ঝাড়গ্রাম ও সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উপরোক্ত সরকারত্রয়ের অধীনস্থ পরগণা ও রাজস্বের পরিমাণ আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত আছে—

সরকার	পরগণা সংখ্যা	রাজস্বের পরিমাণ
সুলেমানাবাদ[২৫]	৩১	৪৪০,৭৪৯ আকবরশাহী মুদ্রা
সরিফাবাদ[২৬]	২৬	৫৬২,২১৮ ঐ
মদারন[২৭]	১৬	২৩৫,০৮৫ ঐ
মোট সরকার ৩	৭৩টি পরগণার রাজস্ব	১২,৩৮,০৫২ আকবরশাহী মুদ্রা

প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার একজন চৌধুরী বা রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের উপর ন্যস্ত ছিল এবং কৃষকের উপর যাতে অত্যাচার না হয় তার জন্য প্রত্যেক পরগণায় একজন কানুনগো নিযুক্ত করা হয়। কানুনগোর কর্তব্য ছিল ভূমিরাজস্ব ধার্য, জরিপ ও চাষীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।[২৮]

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে 'আলত মঘা' নামক এক নূতন পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। এই ব্যবস্থার ফলে বহু স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, কিন্তু সম্রাটের সম্মতি ছাড়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা যেত না। এই ব্যবস্থাকে প্রজাস্বত্বের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।[২৯] শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজার আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। এই সময়ে গ্রামের মোট উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধাংশ পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত। আকবরের সময় যা সর্বোচ্চ ভূমি রাজস্ব ছিল, সুলতান সুজা ও আওরঙ্গজেবের আমলে তা সর্বনিম্ন রাজস্বে পর্যবসিত হয়। আকবরের ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের ভিত্তি ছিল প্রকৃত কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ ও উৎপন্ন শস্যের উপর ; কিন্তু স্থানীয় জমিদার বা মোড়ল শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পাওয়া যায় যে, এক শ্রেণীর রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী ভূমির মাপের পরিমাণ নির্ধারণের সময় অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন।[৩০]

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জাফর খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হল। জাফর খাঁ সমগ্র বাংলাসুবাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ ও মদারন —এই তিনটি সরকারের পুনর্বিন্যাস করে 'চাকলা বর্ধমানে'র সৃষ্টি হয়। তেরটি চাকলার মধ্যে আয়তনে দ্বিতীয় হলেও 'চাকলা বর্ধমান' হতে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হত। বর্তমান জেলা পরিচিতির ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমগ্র বর্ধমান জেলা, হুগলী ও হাওড়ার অধিকাংশ অঞ্চল, বাঁকুড়ার পশ্চিম অঞ্চল, পাঁচেৎ রাজ্য, মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি থানা ও বীরভূম জেলার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ৬১টি পরগণায় 'চাকলা বর্ধমান'-এর বিস্তৃতি ছিল। এই চাকলার জন্য ২২,৪৪,৮১২ সিক্কা টাকা রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল এবং সদর কার্যালয় ছিল বর্ধমান শহরে।[৩১]

পরগণা তালিকা (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯) হতে জানা যায় যে, উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরগণা ও দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত এবং পূর্বে সরস্বতী

নদীর পশ্চিম ভাগ হতে পশ্চিমে পাঁচেৎ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে 'চাকলা বর্ধমান' গঠিত ছিল। জাফর খাঁর সময়ে সমগ্র চাকলার রাজস্ব ব্যতীত সুতীমহলের জন্য আবওয়াব ধার্য ছিল ১,১৬,৭১১ সিক্কা মুদ্রা। কিন্তু নবাবের আদেশানুসারে উক্ত সেস আদায় কার্যকরী করা হয় নাই। সুজাউদ্দিনের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি না হলেও সেস বা আবওয়াব বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অন্যান্য চাকলার ন্যায় বর্ধমানের রাজস্ব দেওয়ান মারফৎ জমা দেবার প্রথা ছিল না। বর্ধমানের জমিদার সরাসরি মুর্শিদাবাদের কোষাগারে রাজস্ব জমা দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রেজা খাঁ ছিলেন নামে মাত্র ইজারাদার। মনে হয়ে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তৎপরবর্তী সম্রাটগণ বর্ধমানের জমিদার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় বাংলার নবাবও সদয় ব্যবহার করত।

নবাব আলিবর্দী খাঁর (১৭৪০-৫৬) শাসনকালে দশ বৎসরব্যাপী বর্গী হাঙ্গামা ও অবশেষে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে নবাব চৌথ আদায় দিতে স্বীকৃত হলে মুর্শিদাবাদের কোষাগার শূন্য হয় এবং ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত চাকলার জমিদার ও বিদেশী বণিক-গণকে অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে আদেশ করেন। এ সময়ে চাকলা বর্ধমানের রাজস্ব ছিল ২৬,৩৭,৯৩৭ সিক্কা টাকা ; কিন্তু সুজা খাঁর পুনঃপ্রবর্তিত সুতীমহলের সেস বাবদ ১,১৬,৭১১ সিক্কা টাকা না আদায়ের আদেশ ছিল। সিরাজদৌলার স্বল্প-কালীন রাজত্বে রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন সুযোগ না থাকলেও ঐ সময়ে ২২,৫১,৩০৬ সিক্কা মুদ্রা আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়।[৩২]

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে জুন সিরাজদৌলার পরাজয়ের পর মীরজাফর খান, নবাবী-প্রাপ্তি ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হন ; মীরজাফর চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় 'তনখা'র নিমিত্ত বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। নদীয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবর্তে নবকৃষ্ণ মুন্সীকে তিন বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হলেও বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদার ত্রিলোকচাঁদকে দিতে বাধ্য হন।[৩৩] ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব ও কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিতে বর্ধমানের জমিদারের দেয় রাজস্ব মুর্শিদাবাদের রায়রায়ান মারফৎ কোম্পানিকে উসুল দেওয়া স্থির হয়। সম্ভবতঃ ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ হতে কোম্পানির সঙ্গে ত্রিলোকচাঁদের সুসম্পর্ক না থাকায় এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ইংরাজরা মীরজাফর ও মীরকাশিম খানের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ১১ই অক্টোবর কোম্পানি কর্তৃক মীরজাফরকে প্রেরিত পত্রে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের জমিদারগণ ইংরাজ ও নবাবের পক্ষাবলম্বী হওয়া অপেক্ষা শাহজাদার পক্ষে যোগ দিতে অধিকতর ইচ্ছুক। কিন্তু তৎপূর্বেই ২৭শে সেপ্টেম্বর মীরকাশিমের সঙ্গে গোপনে সম্পাদিত চুক্তির পাঁচ নং অনুচ্ছেদে বর্ধমান চাকলা, কোম্পানিকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হল।[৩৪]

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ফোর্ট উইলিয়ম হতে লণ্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-

গণকে প্রেরিত পত্র হতে বর্ধমান জমিদারীর কর্তৃত্ব গ্রহণে কোম্পানির অত্যধিক আগ্রহের কারণগুলি জানা যায়—[৩৫] (১) অত্যন্ত সম্পদশালী জনপদরূপে পরিচিত বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব উসুলের নিশ্চয়তা, (২) কলিকাতার সংলগ্ন জমিদারী কোম্পানির অধিকারে থাকায় কলিকাতার প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং (৩) বর্ধমান ও মেদিনীপুর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে মারাঠাদের আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে।

মীরকাশিমকে উৎখাত করার পূর্বে পুনরায় মীরজাফরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে 'চাকলা বর্ধমান'-এ কোম্পানির অধিকার বলবৎ থাকে (**Item No. 2, Fort William, the 10th day of July, 1763**)। আবার নজম-উদ্-দৌলার সঙ্গে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সম্পাদিত চুক্তির বয়ান ছিল মীরজাফরের চুক্তির অনুরূপ—**"I do confirm to the company, as a fixed source, for defraying the ordinary expenses of their troops, the Lands of the Chucklas of Burdwan, Midnapore, the Chittagang in as full manner as heretobefore ceded by my father."** তা'হলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সম্রাট শাহ আলমের নিকট হতে সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভের পূর্বে প্রত্যেক নবাবের আমলে চাকলা বর্ধমানের রাজস্ব স্বত্বে কোম্পানির অধিকার বলবৎ ছিল।

(২)

বর্ধমান জমিদারীর স্বত্ব লাভ করে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্তের জন্য ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জন জনস্টোনকে বর্ধমানের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করে পাঠান হয়। রেসিডেণ্ট-এর চেষ্টায় বর্ধমানরাজ ত্রিলোকচাঁদ সৈন্যসংখ্যা হ্রাস ও তিন বছরের জন্য বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে সম্মত হন। কর্মচ্যুত সৈন্যগণ প্রথমে ডাকাত দলে যোগ দেয় এবং এর এক অংশ ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল। তিন বৎসর পরে এই সকল সৈন্য কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধের সময় নবাবের পক্ষে যোগদান করে।[৩৬] প্রথম বৎসরের ৩৭,২৪,২৭৪ সিক্কা টাকা আদায়ের মধ্যে কোম্পানি ও রাজার প্রাপ্য অর্থ ছিল যথাক্রমে ৩১,৯৮,৮৯৬ টাকা ও ৫,২৫,৩৭৮ টাকা। ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হলেও রাজস্ব উসুল না হওয়ায় ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ডব্লিউ. বি. সুমনারকে রেসিডেণ্ট হিসাবে বর্ধমানে পাঠান হয়। সুমনার কলিকাতায় রিপোর্ট পেশ করে যে, কোম্পানিকে দেয় রাজস্ব অপেক্ষা বর্ধমানরাজের আদায় অনেক বেশী।

সুমনারের আগমনের ফলে ত্রিলোকচাঁদ বিপদ বুঝতে পেরে কোম্পানির সঙ্গে নূতন চুক্তি সম্পাদন করেন এবং অনাদায়ী রাজস্বসহ ৪১,৫৮,৭০৮ সিক্কা টাকা উসুল দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মীমাংসা করেন।[৩৭] কলিকাতার কাউন্সিল নিলামের মাধ্যমে জমি বিলি-বন্দোবস্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এই ব্যবস্থায় আপত্তি করেন এবং তাঁদের অভিমত হল যে, এরূপ ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে বর্ধমান রাজপরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কোম্পানির ডিরেকটরগণ আদেশ দেন যে,

ইংরাজ কর্মচারীগণ যেন রাজার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। পূর্বে রেসিডেণ্ট বর্ধমানের রাজার নিকট হতে বাৎসরিক ৮০,০০০ টাকা উপঢৌকন পেত এবং নূতন নির্দেশে এরূপ অর্থ গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বরের এক পত্রে জানা যায় যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর নির্দেশে মরিয়ট, লরেল, গুডউইন ও গ্রাহামকে রেসিডেণ্ট থাকাকালীন রাজার নিকট প্রাপ্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হয়েছিল। ভেরেলস্ট-এর হিসাবে দু'বছরে ১৬,৫৪, ১৩৫ টাকা রাজস্ব অনাদায়ী ছিল।[৩৮] প্রকৃত জমির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ডিরেকটরদের নিকট হতে ক্রমাগত চাপ আসে[৩৯] এবং পরবর্তীকালের নথিপত্র হতে জানা যায় যে, ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব বাবদ ৩৯'৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছিল।[৪০] ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভেরেলস্ট বর্ধমানের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ভেরেলস্ট-এর সুপারিশ মত ডি. গ্লাসকে বর্ধমানের সার্ভেয়ার নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, সমগ্র চাকলায় কৃষিযোগ্য ভুমির পরিমাণ নির্ধারণ করা।[৪১] সম্ভবতঃ ডি. গ্লাসের সুপারিশ অনুসারে নিলাম বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমি বিলি করা হয়। কিন্তু রাজার অসহযোগিতার ফলে রাজস্ব আদায় সম্ভবপর হয় নাই এবং বাধ্য হয়ে নিলাম প্রথা বন্ধ করে পুনরায় রাজা ও দেশীয় কর্মচারীদের সহায়তায় রাজস্ব আদায় শুরু হয়। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপের সৃষ্টি ও কৃষিযোগ্য ভুমির মোট পরিমাণ দাখিলের জন্য রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। হিসাব বহির্ভুত অতিরিক্ত ভুমি হতে রাজস্ব আদায় হলেও কোম্পানির এর জন্য কোন লভ্যাংশ ছিল না। কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী ৫,৬৮,৭৩৬ বিঘা 'বাজে-জমীন' অর্থাৎ এই পরিমিত জমির রাজস্ব রাজা নিজে ভোগ করেন, যা কোম্পানির প্রাপ্য ছিল। অবশেষে বহু বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হয় যে, উক্ত জমির উপর বাৎসরিক একর পিছু ৯ আনা হিসাবে রাজস্ব ধার্য করে কোম্পানিকে অতিরিক্ত রাজস্ব বাবদ ১,০৩,৮২৫ সিক্কা টাকা দেওয়া হবে। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কোষাগারে মোট ৩৮,৫৮,৪২৯ সিক্কা টাকা জমা পরে এবং মোট আদায়ের শতকরা ৫ ভাগ রাজা মুনাফা হিসাবে লাভ করেন।[৪২]

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে, ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্ণর হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। এই সময়ে রাজার আর্থিক দুরাবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তার উপর সংবাদ আসে যে, মারাঠাগণ পুনরায় ওড়িশা অতিক্রম করে তিন মাস যাবৎ মেদিনীপুর অঞ্চলে লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত আছে। এ দিকে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম স্বসৈন্যে পাটনা হতে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হন। এই উভয়বিধ সংবাদে ভীত হয়ে বর্ধমানের বহু অধিবাসী দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করেন। ফলে রাজস্ব পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার জন্য কোম্পানির সঙ্গে রাজার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মারাঠাগণ পলায়ন করলেও তাদের সঙ্গে আগত তেলেঙ্গানা সৈন্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মণ্ডলঘাট, মানকুর, জাহানাবাদ, ভুরশুট, চিতুয়া, বালিগড়ী, ধনিয়াখালি, চৌমহ প্রভৃতি অঞ্চলে অবাধে লুণ্ঠনকার্যে অংশগ্রহণ করে।[৪৩] এই সুযোগে রাজা

ত্রিলোকচাঁদ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদানের নিমিত্ত ভীতি প্রদর্শন করায় অনাদায়ী রাজস্ব পাঁচ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিবেচনায় এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।[৪৪]

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ১২ই আগস্ট রাজা দুর্লভরামের পরামর্শে কোম্পানির ভাগ্য নূতনভাবে নির্ধারিত হয়। ইংরাজদের সহায়তায় দ্বিতীয় শাহ আলম দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠিত হলে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানীর স্বত্ব ঐ মাসের ১২ই তারিখে কোম্পানিকে হস্তান্তর করে একটি ফর্মান জারী করেন। সম্রাট প্রদত্ত ফরমান বলে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের 'পুণ্যাহ'-এর দিনে মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে ক্লাইভ বাংলার সকল জমিদারকে আহ্বান করে বুঝিয়ে দেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত খাজনা (বকেয়াসহ) উসুল দিতে হবে।[৪৫] উপরোক্ত সনদ বা ফরমান বলে এবং বাৎসরিক ৭৯ লক্ষ টাকার (দিল্লীর সম্রাটকে দেয় ২৬ লক্ষ টাকা এবং সুবাবাংলার নবাবকে দেয় ৫৩ লক্ষ টাকা) বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হল বঙ্গদেশের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্তা।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চাকলা বর্ধমানের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৫,৬৭,৮৫৪ সিক্কা টাকা এবং এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দরবারী আদায় বাবদ ২,১৮,১৮২, সিক্কা টাকা সেস ধার্য হয়েছিল। তবে ত্রিলোকচাঁদের বিরোধিতার ফলে সুতীমহলের সস (আবওয়াব) আদায় রদ হয়। দেওয়ানী লাভের পর হতে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব বৃদ্ধির কারণে উভয় পক্ষের বিরোধ চরম সীমায় পেঁছেছিল। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য এই যে, সে যুগে দিনাজপুরের ফৌজদার সদ্রুহক খান ও বর্ধমানের জমিদার ত্রিলোকচাঁদ রায় এককভাবে ইংরাজদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণসহ অন্যান্য জমিদারগণ সর্বোতভাবে ইংরাজদের সহায়তাকর্মে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ঐ দু'জন জমিদার বাংলার ইতিহাসে অপাংক্তেয় ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েছেন। তিনজন দেশদ্রোহীর মধ্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র মীরজাফরের নাম চিহ্নিত করা হল। প্রকৃতপক্ষে দেশদ্রোহিতায় মীরজাফর ও মীরকাশিম উভয়েই সমান। বীরভুমের জমিদার ও মেদিনীপুরের জমিদারকে সমূলে ধ্বংস ও বর্ধমানের জমিদারকে পঙ্গু করার মূলে ছিল মীরকাশিমের প্রত্যক্ষ সাহায্য।[৪৬] কোন নৈতিক আদর্শ নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের সংঘাত উপস্থিত হয় নাই। ভূমিরাজস্ব ও শুল্ক আদায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উভয়ের বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল। ইতিপূর্বে মীরকাশিম বীরভুম ও বর্ধমানের জমিদারগণের গতিবিধির বহু গোপন সংবাদ গুপ্তচর মারফৎ কোম্পানিকে পাঠাত। মীরকাশিম তাঁর বশংবদতার নিদর্শন স্বরূপ কোম্পানির নিকট অভিযোগ করেন যে, বর্ধমানের জমিদার বহুকাল যাবৎ চিতুয়া, বরোদা ও চন্দ্রকোনার জমিদারগণকে বঞ্চিত করে জমিদারী ভোগদখল করছে, সেগুলি তাদের উত্তরাধিকারীগণকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।[৪৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও কৃষ্ণরাম রায়ের নিধনের পর বিরোধী জমিদারগণকে

উৎখাত করে কীর্তিচাঁদ উক্ত জমিদারীগুলি অধিকার করেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান বলে ঐগুলি তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হলওয়েলের এক পত্রে (১১ই মার্চ, ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ) কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের সুসম্পর্কের কথা জানা যায়[৪৮]—**"The advantages to be reaped by the company, from the revolution, were, the grant of the Zamindarries of Burdwan, Midnapore and Chittagong the payment of the balance due from Nabab Jaffier Aly Chan ; with a present of five lack of rupees from Cassim Aly Chan, towards defraying the expenses of the war against the French, on the Coast Coromandel."**

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুবাবাংলার প্রকৃত শাসনকর্তারূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে, অথচ কোন দায়দায়িত্ব বহন করার হাত হতে তারা অব্যাহতি পেয়েছিল। রেজা খাঁ, সিতাব রায় ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ন্যায় কুখ্যাত ও অত্যাচারী নায়েব-দেওয়ানগণকে রাজস্ব আদায়ের ইজারা দেওয়া হয় এবং এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কান্ত নন্দী ও নবকৃষ্ণ মুন্সীর ন্যায় বাঙালী বেনিয়ানগণ অতি সামান্য আর্থিক সামর্থ্য হতে রাজা মহারাজার ন্যায় বিত্তশালী হয়েছিল। নবকৃষ্ণ মুন্সী, বর্ধমান জমিদারী হস্তগত করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছিল এবং রাজমাতা ও তাঁর কর্মচারীগণের অসহযোগিতার জন্য বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিযুক্ত হয়েও এই জমিদারী গ্রাস করতে পারেন নাই। কিন্তু ক্লাইভের ৬০ টাকা মাস মাহিনায় নিযুক্ত দেওয়ান নবকৃষ্ণের মৃত্যুর সময় ১৮ লক্ষ টাকার ভূ-সম্পত্তিসহ মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের সিজনা গ্রামের অধিবাসী এবং হেস্টিংসের বহু কুকীর্তির সহায়ক কান্ত নন্দী, হেস্টিংসের অনুগ্রহে সেরগড় পরগণার একাংশ উপঢৌকন স্বরূপ পেয়েছিলেন।[৪৯] এই অঞ্চলটি পরগণা কান্তনগর নামে পরিচিত হয়। কেবলমাত্র দেশীয় ব্যক্তিগণ নন, কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে বর্ধমান জমিদারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রেসিডেণ্টসহ রাজস্ব বিষয়ক কর্মচারীগণ অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এদের মধ্যে রেসিডেন্ট জন জনস্টোন ২ লক্ষ টাকা ও তৎসহ অবৈধ ভাতা ৮০ হাজার টাকা, জন গ্রাহাম ২ লক্ষ টাকা, চার্লস স্টুয়ার্ট ২ লক্ষ টাকা, ওয়ারেন হেস্টিংস ৩ লক্ষ টাকা (নবকৃষ্ণ মুন্সীর নিকট) উৎকোচ স্বরূপ পেয়েছিলেন। মহারানি বিষণকুমারীর নিকট হেস্টিংস ১৫ হাজার টাকা ও কলিকাতার কাউন্সিলের সদস্যগণ ২ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত হেস্টিংসের মনোনীত ১ হাজার টাকা মাস মাহিনার দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ১১ লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করেছিলেন বলে মহারানির অভিযোগ ছিল এবং ঐ অর্থের সিংহভাগ হেস্টিংস ও জন গ্রাহাম লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন[৫০]—**"Even if specific allegations about presents cannot usually be substantiated and many of them may well have been exaggerated or even**

fictitious, it is not difficult to say why Burdwan had the reputation of being a lucrative station for any Company servant with its revenue. The stakes may have been higher in Burdwan than elsewhere।" হেস্টিংস-এর জীবনীকার জি. আর. গ্লেইগ তাঁকে নিরাপরাধ প্রমাণের চেষ্টা করলেও 'হাউস অব কমনস্'-এর নিকট এসকল যুক্তিগ্রাহ্য হয় নাই।

যৌথ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রায়তগণ সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও নবাবের নিষ্ক্রিয়তার জন্য তারা ছিল নিরুপায় এবং চতুর্গুণ রাজস্বের প্রকৃত বোঝা কৃষককেই বহন করতে হত। যে ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম বৃহৎ জমিদার রায়ত ও কৃষকের স্বার্থরক্ষা করতে অসমর্থ ছিল, সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের অধীনস্থ রায়ত ও কৃষকদের প্রতি ইংরাজ কর্মচারী, রেজা খাঁ ও গঙ্গাগোবিন্দের আদায়কারীদের অত্যাচার ও শোষণ সহজেই অনুমেয়। বর্ধমান জমিদারীর উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ছিল; নাবালক তেজচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁর গৃহে উপস্থিত না হওয়ায় কোম্পানির কর্মচারীগণকে তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির ইন্ধন যোগান।[৫১] বর্ধমানের মহারানি দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধের সময় মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ১০।১২ নৌকা বোঝাই করে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সকল দ্রব্য যথাসময়ে না পৌঁছানোর জন্য সমুদয় দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নানাভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।[৫২]

১১৭৬ সালে দেশব্যাপী মন্বন্তরের ফলে বর্ধমান জেলার জনসাধারণ যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছিল সেটা অবর্ণনীয়। একদিকে অনাবৃষ্টিজনিত খাদ্যাভাব, অপরদিকে কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দের রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচারে বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানবাসীগণও জর্জরিত ছিল। এই উভয় সঙ্কট হতে পরিত্রাণের জন্য ত্রিলোকচাঁদ কোষাগারের শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করেন এবং এই দুর্দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর কোম্পানির নিকট অর্থ কর্জ করে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।[৫৩]

ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর মহারানি বিষণকুমারীর তত্ত্বাবধানে তাঁর নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের নামে জমিদারী পরিচালিত হয়। হেস্টিংস প্রথমে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে জমিদার ও তালুকদারগণের সঙ্গে "পাঁচশালা বন্দোবস্ত" করেন।[৫৪] প্রাচীন জমিদারবংশকে উৎখাত করা সম্ভবপর হলে নূতন জমিদারের নিকট হতে অতিরিক্ত রাজস্ব ও উৎকোচ পাওয়ার আশায় বর্তমান জমিদারকে পরোক্ষভাবে উৎখাতের চেষ্টায় পাঁচশালা বন্দোবস্তের (১৭৭২-৭৭) মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করা হয়। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁদের দেশীয় অনুচরবৃন্দের স্বনামে ও বেনামীতে বহু জমিদারী ক্রয় করেন। গ্রামবাংলার আসল জমার সঙ্গে ভূমি আয়তনের হিসাব স্থির করার জন্য ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমিনি কমিশনের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টরবর্গের নির্দেশে ১৭৭৭

খ্রীস্টাব্দের আসল জমার উপর রাজস্ব স্থির করে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ হতে একশালা বন্দোবস্ত বলবৎ করা হয়। এই সময়ে বাংলার বহু প্রাচীন জমিদারবংশ উৎখাত হলেও মহারানি বিষণকুমারী স্বীয় বিচক্ষণতায় পুত্রের জমিদারী রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেওয়ানী লাভের পাঁচ বৎসর পরে অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভূত হয় যে, একজন রেসিডেন্টের পক্ষে এই বিশাল জেলার রাজস্ব আদায়ের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে রেসিডেন্টের অধীনে একজন অতিরিক্ত সহকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি রেসিডেন্টের অধীনে বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে সুপারভাইজার বা রেসিডেন্টের পরিবর্তে 'কালেক্টর' নামক ইংরাজ কর্মচারীকে এই জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল বর্ধমানের রাজার উপর। কালেক্টরের অধীনে 'দেওয়ান' নামক দেশীয় কর্মচারী রাজস্ব বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন। গভর্ণর জেনারেল কাউনসিলের সভায় (১৩ই অক্টোবর, ১৭৭২ এবং ২৩শে নভেম্বর, ১৭৭৩) উক্ত নিয়োগ অনুমোদিত হয়। পাঁচেৎ ও বিষ্ণুপুরকে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর এক আদেশানুসারে ঐ দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক কালেক্টরির সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঐ বৎসর ২৮শে মে পুনরায় দু'টি অঞ্চলকে বীরভুমের কালেক্টরের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল। উক্ত দুই অঞ্চলের রায়ত ও কৃষক স্ব-ইচ্ছায় কলিকাতাতে রাজস্ব জমা দিতে পারত এবং এই সময় হতে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলিকাতায় রাজস্ব জমা দেওয়ার আদেশ জরী হয়।[৫৫]

সুষ্ঠুরূপে রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্যে সুবিধার জন্য বাংলাসুবাকে ৫টি বৃহৎ আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করার ফলে এক একটি অঞ্চল 'বিভাগ' নামে পরিচিত হয়। বর্ধমান বিভাগ সৃষ্টির সময় এর অধীনস্থ ৪টি জেলা ছিল, যথা—১। বর্ধমান (বর্তমান বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া) ২। মেদিনীপুর ৩। বিষ্ণুপুরসহ বাঁকুড়া ও পাঁচেৎ ও ৪। রামগড়সহ বীরভূম জেলা। এইরূপে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ২৮টি জেলার সৃষ্টি হয়েছিল। জেলাগুলির মধ্যে বৃহদায়তনের জন্য মেদিনীপুর, বর্ধমান, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামকে প্রদেশ নামে অভিহিত করা হত।[৫৬] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কয়েকটি জেলা ব্যতীত অধিকাংশ জেলার সীমানা পরিবর্তিত হলেও বর্ধমান জেলার আয়তন দীর্ঘদিন পূর্বাবস্থায় ছিল।

বর্ধমান ও জলেশ্বরের জমিদারীকে ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে 'হুজুরীমহল' বা 'খাসমহল'-রূপে ঘোষণা করে ঐ বৎসর ৭ই এপ্রিল গভর্ণর জেনারেলের এক আদেশ বলে হুজুরী-মহলের জন্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ঐ মাসের ১৮ই তারিখে 'রেভিনিউ কমিটি' বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর ও বাহারবন্দসহ ইদ্রাক-পুরের জন্য পৃথক পৃথক কালেক্টর নিযুক্ত করে এবং এ মাসেই জন কিনলোচ

(John Kinloch—Collector, Magistrate and Judge of the Dwani Adalat) কালেক্টররূপে বর্ধমানে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ও দেওয়ানী আদালতের বিচারকের পদেও নিযুক্ত হন।[৫৭]

হুজুরীমহলের জমিদারী এরূপভাবে বিভক্ত করা হয়, যাতে একজন কালেক্টরের অধীনে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকার অধিক না হয়। কিন্তু কোন খাসমহল বা হুজুরীমহল একজন জমিদারের অধীনস্থ হলে উক্ত মহল বা জমিদারী একজন কালেক্টরের অধীনের রাখার নির্দেশ ছিল এবং ঐ তারিখে রেভিনিউ কমিটি স্থির করে যে, বর্ধমানের জমিদারীর বিশাল আয়তন সত্ত্বেও এই জেলাকে একজন কালেক্টরের অধীনেই রাখা হবে।[৫৮]

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর গভর্ণর জেনারেলরূপে লর্ড মারকুইস অব কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। চতুর্দিকে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রচণ্ড অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের উপায় নির্ধারণের নিমিত্ত জেমস্ গ্রাণ্ট ও জনশোর-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন, যা পরবর্তীকালে গ্রাণ্ট-শোর বিতর্ক নামে রাজস্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস হঠাৎ কোন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রথমে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একশালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী দশশালা বন্দোবস্তের কথা ঘোষণা করেন। বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব ধার্যের জন্য ফসল উৎপাদনযোগ্য সমস্ত জমির আসল জমাকে মোট ১১ ভাগ করে, তম্মধ্যে ১০ ভাগ ধরা হয় রাজশক্তির স্বাধিকারসম্মত প্রাপ্ত রাজস্ব এবং ১ ভাগ জমিদারের লভ্যাংশ।[৫৯]

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে জেমস্ গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব স্থির হয়েছিল ৪৩,৩০,০০০, তম্মধ্যে কোম্পানির পাওনা ছিল ৪০,০০,০০০ সিক্কা টাকা এবং রাজস্ব আদায়ের পারিশ্রমিক বাবদ ৩,৩০,০০০ সিক্কা টাকা রাজার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু বাঁধ মেরামত (পুলবন্দী) বাবদ রাজার দেয় বাৎসরিক অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ সিক্কা টাকা। তেজচন্দ্র জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে একে অনভিজ্ঞ ও তার উপর কুসঙ্গে পড়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় বিষণকুমারীর আনুকুল্যে জমিদারী পরিচালনার ভারপ্রদান ও তাঁর মাসোহারার জন্য আবেদন করায় কলিকাতার কাউন্সিল ডিরেক্টরবর্গকে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বরের এক পত্রে জানান যে, মহারানিকে জমিদারী পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত নয় এবং তৎপরিবর্তে রাজা তাঁকে ৪০০০ টাকা হিসাবে মাসোহারা দেবেন।[৬০]

কর্ণওয়ালিস ছিলেন ইংলণ্ডের অভিজাত জমিদারবংশের সন্তান। তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজদের অনুগত এক শ্রেণীর অভিজাত জমিদারগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে কোম্পানির শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রয়াস লাভের চেষ্টা করেন। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ, ইংলণ্ডের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তা হতে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রেখে রাজস্ব

আদায়ের সুনিশ্চিত আশায় ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী দশশালা বন্দোবস্তের আদেশ জারী করা হলেও কোম্পানির ডিরেক্টরগণকে তিনি জমিদারগণের সঙ্গে স্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ডিরেকটরগণ কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ায় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Reg. 1 of 1793) কার্যকরী হয়। উক্ত রেগুলেশনের ২নং ধারা বলে—যে সকল ভূস্বামীদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত পূর্বেই সম্পাদিত হয়েছিল, ভূমির উপর ধার্য জমা দশ বছরের মেয়াদ অন্তেও বজায় রাখা হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় থাকবে।[৬১] ১ নং রেগুলেশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল—এখন সমস্ত জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও অন্যান্য প্রকৃত ভুস্বামীদের জানান যায় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মহামান্য পরিচালকগণের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের জমির উপর উক্ত রেগুলেশন্ অনুযায়ী ধার্য বা ভবিষ্যতে ধার্য হবে এরূপ জমা চিরস্থায়ী করা হল। এক কথায় ভূমির উপর রায়ত ও কৃষকের সমস্ত অধিকার নাকচ হয়ে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হওয়ার সময় আশা করা হয়েছিল যে, একদিকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব কোষাগারে জমা হবে এবং অপরপক্ষে শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী ইংরাজদের রাজ্যশাসনে সহায়তা করবে। কিন্তু প্রথম হতেই বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদার বর্ধমানের রাজা রাজস্ব দিতে অক্ষম হন এবং এর প্রধান কারণ ছিল, উক্ত বন্দোবস্তের সময় এত উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল যে, জমিদার তেজচন্দ্র রায়ত বা প্রজার নিকট হতে রাজস্ব আদায় করতে পারেন নাই। অবশ্য জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে তিনি ছিলেন অপদার্থ। বাংলার অন্যান্য জমিদারগণও এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বহু জমিদারবংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তেজচন্দ্র রাজস্ব উসুল দিতে অক্ষম হওয়ায় তিন বছরের জন্য এই বিশাল জমিদারী খাসদখলে রাখা হলেও অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে এটি পরিচালনা করার যোগ্যতাও ছিল না। মণ্ডলঘাট পরগণার অধিকার নিয়ে কোম্পানি ও রাজার বিরোধ চরম পর্যায়ে পেঁছায়। প্রতিরক্ষা ও লবণ উৎপাদনের জন্য মণ্ডলঘাট পরগণার গুরুত্ব ছিল অত্যধিক।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুসারে বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা টাকা এবং এর সঙ্গে বাঁধ মেরামত বাবদ ১,৯৩,৭২১ সিক্কা টাকা অতিরিক্ত আদায় সহ মোট দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪২,০৮,৮৩০ সিক্কা টাকা। পূর্বোক্ত চুক্তির ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সমপরিমাণ অর্থ বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার 'প্রকৃত ভু-স্বামী'র অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় অধঃস্তন তালুকদার, রায়ত ও কৃষকের ভুমির উপর সমস্ত অধিকার খর্ব হয় এবং যে কোন সময় খাজনা বৃদ্ধি ও জমির অধিকার হতে প্রকৃত ভোগদখলকারীকে বঞ্চিত করা হলে আইনের কোন বিধি কৃষকের পক্ষে ছিল না। বর্ধমান জেলায় উচ্চহারে

ভূমিরাজস্ব ও সেলামীর বিনিময়ে ভূমি বণ্টন শুরু হলে সমগ্র কৃষিযোগ্যভূমি বণ্টন করাও সম্ভবপর হয় নাই। এছাড়া উচ্চহারে রাজস্ব বর্ধিত হওয়ায় রায়ত ও কৃষক নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতেও অক্ষম ছিল। জমিদারও কোম্পানিকে রাজস্ব উসুল দিতে সক্ষম না হওয়ায় বাকী খাজনার দায়ে একের পর এক পরগণা নিলামে উঠতে থাকে। তবে কোন কোন পরগণা অংশতঃ বিক্রয় ও কর্মচারীগণের নামে বেনামীতে ক্রয় করা শুরু হয়। বর্ধমানরাজ বহু রায়ত ও কৃষককে বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ করেন এবং কালেক্‌টরের আদালতে প্রচুর মামলা দায়ের করা হয়।

প্রজাপীড়ন করেও যখন রাজস্ব আদায় সম্ভবপর হল না, তখন জমিদার অন্য পন্থার কথা বিবেচনা করেন। কারণ আইনের রক্ষাকবচ জমিদারের অনুকূলে থাকায় অর্থোপার্জনের সহজতম উপায় হিসাবে ভূমির উপর ক্রমান্বয়ে প্রজাস্বত্ব হতে লাগল। এই সময়ে জমিদারী রক্ষাকল্পে মহারানি বিষণকুমারী পুত্রের হাত হতে অর্ধেক জমিদারীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

মাতা ও পুত্রের যৌথ পরিচালনায় বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এক নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। বর্ধমান রাজএস্টেটের অধীনে ছোট ছোট তালুক পত্তনের সৃষ্টি করে, ঐগুলি উচ্চহারে সেলামী ও জামানতসহ বিলি ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হয়। কোম্পানিকে দেয় খাজনার হার চিরস্থায়ী হওয়ায় এগুলি 'মোকরারী পত্তনি' এবং একই সঙ্গে উত্তরাধিকারযোগ্য হওয়ায় 'ইস্তিমকারী পত্তনি'র রূপ নেয়। রেভিনিউ বোর্ড প্রথমে আপত্তি জানালেও এই বিশাল জমিদারীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে নীতিহীন পরিকল্পনাটি মানতে বাধ্য হয়। পত্তনি ব্যবস্থার বন্দোবস্তের জন্য এইচ. টি. প্রিন্সেপকে বর্ধমানে পাঠান হয় এবং তাঁর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে 'পত্তনি আইন' বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৬২] বর্ধমানের সন্নিকটে নাড়ীগ্রামের অধিবাসী দেওয়ান মানগোবিন্দ ভঞ্জ তেজচন্দ্রকে পত্তনি ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৬৩] বর্ধমান জমিদারীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে 'পত্তনি আইন' বলবৎ হয়েছিল, সেকথা মুখবন্ধে পরিষ্কার উল্লেখ আছে—"Furthermore, in the exercise of the privilege thus conceded to Zamindars under direct engagements with Government, there has been created a tenure which had its origin on the estates of the Raja of Burdwan, but has since been extended to other zamindaris ; the character of which tenure is that it is a taluk created by the zamindar, to be held at a rent fixed in perpetuity by the lessee and his heirs for ever ; the tenant is called upon to furnish collateral security for t e rent, and for his conduct generally, or he is excused from this obligation at the zamindar's discretion ; but even if the original tenant be excused, still, in case of sale, for arrears, or other operation leading

to the introduction of another tenant, such new incumbent has always in practice been liable to be so called upon at the option of the zamindar." (Patni Taluks Regulations: Reg. VIII of 1819—Preamble.)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 'লিজ' দেওয়ার বিধি না থাকলেও সাত বছরের মধ্যে তাঁরা 'Classical Fudal System'-এর অনুরূপ ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। মহারানি বিষণকুমারী, মহারাজা তেজচন্দ্র, দেওয়ান পরানচাঁদ ও দেওয়ান মানগোবিন্দ ভঞ্জ ছিলেন—'Burdwan Model of Revenue Administration'-এর আদি স্রষ্টা, যা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্য জমিদারগণের নিকট আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(৩)

ভারতবর্ষে ছ'শ বছর মুসলমান শাসনে প্রজা, রায়ত ও কৃষকের যে ক্ষতি করতে পারে নাই, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের আইনের একটি মাত্র ধারার বলে প্রজাকে ভূমির উপর সকল ক্ষমতা হতে অধিকারচ্যুত করা হয়। আকবরের আমলে প্রদত্ত কৃষকের সকল অধিকার আইনের এক কথায় নাকচ হয়ে গেল। পূর্বে জমিদার ছিল রাজস্ব আদায়-কারী কর্মচারী মাত্র। কিন্তু কোম্পানির আইনে জমিদার হল প্রকৃত জমির মালিক এবং বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে প্রজা এক বছরের জন্য ভূমি চাষের অধিকার পেয়েছিল। এই ব্যবস্থার দ্বিবিধ কুফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, (১) কৃষিযোগ্য ভূমির উপর প্রজার কোন স্বত্ব না থাকায় উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে কমে গেল ও (২) ১নং রেগুলেশন বলে জমিদার রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম হলে নিলাম প্রথায় তালুক বা পরগণা খাস অথবা বিক্রয় করে রাজস্ব-দেনা শোধের নিমিত্ত কোম্পানির কালেক্টরদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল। কিন্তু প্রজা বা রায়ত নির্দিষ্ট সময়ে জমিদারকে খাজনা না দিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আইন উক্ত রেগুলেশনে ছিল না। ফলে তালুকদার বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার বিরোধ নিত্যকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারের ক্ষমতা বর্ধিত হলেও ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান আদালতের এক রায়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আদালতের বিনা অনুমতিতে মহারাজা কোন প্রজাকে আটক করতে পারবেন না।[৬৩] ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৫নং রেগুলেশন বলে ঘোষণা করা হয় যে, কৃষককে জমির উপর অধিকার দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা জমিদারের ইচ্ছাধীন। ফলে জমির উপর কৃষকের দরদ হ্রাস পায়। জমিদার ও কৃষক উভয়েই কৃষিযোগ্য ভূমির উন্নতি বিধান সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিল না। কৃষক অধিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হলে, তবেই জমি তাকে বিলি করা হবে। বঙ্গদেশে কৃষকের কাছ হতে একর পিছু তিন টাকা রাজস্ব আদায় হলেও ঐ জমির জন্য জমিদারের নিকট হতে কোম্পানির গড় পাওনা ছিল দশ আনা আট পাই।[৬৫] কৃষকের

কোন উপকার সাধিত না হলেও ইংরাজদের মূখ্য উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের এক পত্রে কর্ণওয়ালিস কোম্পানির ডিরেক্টরদের জানান যে, দেশীয় সঞ্চিত পুঁজির এক বিরাট অংশ ভূ-সম্পত্তিতে ব্যয় করার সম্ভাবনা আছে।[৬৬] দেশীয় ধনীব্যক্তিগণ শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের পরিবর্তে জমিতে বিনিয়োগ করবে। ইংরাজদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, দেশীয় ধনিকশ্রেণী যেন তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা হতে বিরত থাকে।

পত্তনিতালুকের জন্য কোন আইন না থাকায় জমিদার ও পত্তনিদার উভয়েই নানা অসুবিধা ভোগ করত। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ৮নং রেগুলেশন বলে 'পত্তনি তালুক রেগুলেশন',-এ পূর্বেকার পত্তনিদারগণের সকল প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকৃত হয়। উক্ত আইনের ৩নং ধারায় দার-পত্তনি, সে-পত্তনি ও চৌ-পত্তনি বা চৌবার-পত্তনি সৃষ্টি করার অধিকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় রাজপরিবার অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পেলেও রায়ত এবং প্রকৃত কৃষকের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। পত্তনিদারগণ যেকোন সময়ে কৃষককে ভূমি হতে উৎখাত করার ক্ষমতা লাভ করেছিল। পত্তনি আইনটি ৮নং রেগুলেশনের দ্বারা সৃষ্ট এবং ঐ রেগুলেশন বলে পত্তনিদারের তালুক নিলাম করার বিধি ছিল বলে চৈত্র মাসে খাজনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখটি 'অষ্টম' নামে কুখ্যাত ছিল।[৬৭] ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক পত্তনিপ্রথার প্রাথমিকপর্ব সম্পন্ন হয়ে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে এটি আইনে পরিণত হয়। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমানরাজের সমগ্র জমিদারী পত্তনিপ্রথার মাধ্যমে বিলি করে এই রাজপরিবার প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। জমিদারীর কোন অংশে রাজা সরাসরি রাজস্ব আদায় করতেন না।

মহারাজা তেজচন্দ্রের দেওয়ান, শ্যালক ও শ্বশুর পরানচন্দ্র কাপুর 'হরিহর মঙ্গল সংগীত' নামক একখানি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে মহারাজা তেজচন্দ্রের বর্ধমান জমিদারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে অধীনস্থ পরগণাগুলির নাম জানা যায়[৬৮] :—

'জমিদারী বর্দ্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজচন্দ্র যার পতি।
মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥
বর্দ্ধমান চাকলার যতদূর অধিকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার।
দক্ষিণের সীমা তার কাঁসাই নদীর ধার পূর্ব্বসীমা পশ্চিমে গঙ্গার॥
উত্তরে রাজ্যের সংখ্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে।
পশ্চিমে গণনা এই পঞ্চকুট পূর্ব্ব যেই এই চতুঃসীমার গণনে॥
ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অন্ডয়া আপনি অধিষ্ঠান।
শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরূপার গড় বাড়ী শ্রীযুত ধীরাজে কৃপাবান॥
বাঘা মুজঃফরশাহী হাবেলী আজমতশাহী গোপভূম চম্পাই নগরী।
স্বয়ম্ভুরে সর্ব্বক্ষণে পূজে যথা চাঁদবেণে চাঁদসহ দ্বন্দ্ব বিষহরি॥

বায়ড়া মনোহরশাহী নলহি সমরশাহী ইন্দ্রানী পাটুলী জাঙ্গিরাবাদ।
রানীহাটী রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগড়ি চেতো শাহাবাদ॥
আরসা আর অম্বুয়া বামুনভূম বালিয়া চন্দ্রকোণা চৌমহা ঘাটাল।
খণ্ডঘোষ খরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বারহাজারি পাণ্ডুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল॥
জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দুরাদুর ভুরশিট আদি মণ্ডলঘাট।
অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধেঞা যথা যুগাদ্যার পাট॥
বর্দ্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্ব্বমঙ্গলা যেই পুরে।
রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ যার ঘরে॥'

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরানচাঁদ কাপুর ও মহারানি কমলকুমারীর যৌথ পরিচালনায় জমিদারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেলেও এই জেলাস্থ রায়ত ও কৃষকের অবস্থা ছিল সঙ্গীন। ত্রিলোকচাঁদ, বিষণকুমারী ও তেজচন্দ্রের আমলে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক বিশেষ খারাপ ছিল না। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বর্ধমানে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে অতিরিক্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু পরানচাঁদের পরামর্শে মহতাবচাঁদের সময় বহু মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। একদিকে রায়ত ও কৃষকের জমিতে কোন অধিকার ছিল না এবং অপরপক্ষে পত্তনিদারগণের অত্যাচারে প্রজাবর্গ ছিল সদাশঙ্কিত। স্বাভাবিক কারণে জমিদার পত্তনিদারের পক্ষ অবলম্বন করার ফলে 'প্রকৃত-প্রজা' এবং 'প্রকৃত-জমিদার' উভয়েই দুস্তর বাধার আড়ালে ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের মধ্যে বর্ধমান ও বিষ্ণুপুরের জমিদারেরা বহিরাগতদের (দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে) পত্তনি বিলি করেন নাই; ফলে প্রজাদের কোন অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় নাই। অবশ্য উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মহতাবচাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্যের সংবাদ জানা যায়। আবার এক শ্রেণীর প্রজার চরিত্র এমন ছিল যে, তাঁরা পীড়ন বা আদালতে নালিশ ব্যতীত জমিদারের পাওনা মেটাতে অনীহা প্রকাশ করত। বাংলার জমিদারশ্রেণী, সর্বোচ্চ জমিদার পরিবারটির আদর্শ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করতেন; নিজেরা অত্যাচার না করলেও পত্তনিদার ও দরপত্তনিদারগণের হাত হতে প্রজাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই বৃহৎ জমিদারবংশটি মোঘল যুগে সম্রাট ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের আনুকূল্যে সামান্য রাজস্ব আদায়কারী হতে প্রায় সামন্তরাজ পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং কোম্পানির আমলে উৎকোচ ও পূর্ব প্রভাব বলে বহু ছোট ছোট জমিদারকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হল। এই বংশের প্রভাবশালী জমিদারগণ একদিকে প্রজার মঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে জমিদারীর স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নানাপ্রকার বৃত্তির সৃষ্টি করে দয়া ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

পত্তনি আইনে রায়ত ও কৃষকের অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব নিষ্পত্তি আইনে'র দ্বারা প্রজার স্বার্থ কিছুটা রক্ষিত হয়।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জেলার দেওয়ানী বিচার ও ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য কয়েকটি প্রশাসনিক পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'রেন্ট এ্যাক্ট' বা 'দশ আইন' প্রবর্তিত হলে প্রজা-স্বার্থ রক্ষার জন্য ভূমি সংক্রান্ত আইনের শুভ সূচনা হয়েছিল। 'খাজনা দেওয়া ও নেওয়াকে কেন্দ্র করে জমিদার আর প্রজার অধিকার ও সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়। পাট্টা ও কবুলিয়ৎ প্রথা বাধ্যতামূলকভাবে প্রচলিত করা হয়। এই আইন বলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হতে যে সকল ব্যক্তি প্রজাবিলি পাট্টায় মোকররী স্বত্বে হস্তান্তরের অধিকারসহ জমি ভোগ দখল করছিল তাদের পাট্টা প্রদানে জমিদারদের বাধ্য করা হয় এবং খাজনা বৃদ্ধি রহিত করা হয়।'[৬৯] এমনকি যেসকল প্রজার জমি হস্তান্তরের অধিকার ছিল না, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে জমি ভোগ-দখল করছিল, তাদের ওপর দখলী স্বত্ব প্রদান করে এবং খাজনা বৃদ্ধি ও উচ্ছেদের ওপর নানা প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা রাজস্ব আদালতের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

'রেন্ট এ্যাক্ট' পাশ হলেও প্রজা পীড়ন করে রাজস্ব ও অন্যান্য 'কাছারী আদায়' বন্ধ না হওয়ায় অসন্তোষের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারানির ঘোষণায় কৃষির উন্নতির জন্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই 'সমস্ত প্রজাস্বত্বে অর্থাৎ জমিদার থেকে রায়ত পর্যন্ত সর্বস্তরে মধ্যবর্তী স্বত্বের সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।' জমিদার ও পত্তনিদারের ন্যায় দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত প্রজারাও জমিদারের বিনা অনুমতিতে ক্রয়-বিক্রয়-হস্তান্তরযোগ্য 'অধস্তন স্বত্ব' তৈরী করতে উৎসাহী হয়ে পড়ে।[৭০]

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অধিনিয়ম' চালু হবার পর রায়ত, চাষী ও প্রজার অধিকারের কথা বলা হলেও আধিয়ার বর্গাদার ও ভাগচাষীর ক্ষেত্রে জমির মালিক লিখিতভাবে প্রজাবলে স্বীকার করলে বা দেওয়ানী আদালতের রায়ে প্রজারূপে ঘোষিত হলে তবেই প্রজা হিসাবে গণ্য করা হবে, নচেৎ নয়।[৭১] খাজনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইনের ধারা ব্যতিরেকে কোনভাবেই এই হার বৃদ্ধি করা চলত না। এই আইনের দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও আদালতের রায়ের দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি করা চলত। কোন ক্ষেত্রেই এই চুক্তির দ্বারা টাকায় দু'আনার বেশী বৃদ্ধি করা যেত না এবং ১৫ বছরের মধ্যে পুনরায় বৃদ্ধি না করার আদেশ ছিল। কিন্তু জমিদার, পত্তনিদার ও প্রজা—এই সকল শর্ত মেনে না চলায় বর্ধমানের সদর আদালত ও মহকুমা আদালতগুলিতে 'নিরিখ বৃদ্ধি'র মামলার পাহাড় জমে যায়। পত্তনিদারদের সঙ্গে বিরোধের ফলে বহু প্রজা সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তেমনি অন্যদিক নিলামকৃতজমির স্বত্ব পেয়ে একশ্রেণীর রায়তের সৃষ্টি হয়, যারা ভাগ বিলি দ্বারা সম্পদশালী হয়ে উঠে।

প্রজার অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার স্বত্বলিপি প্রণয়ন বা খতিয়ান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কে. এ. এল. হিল-এর পরিচালনাধীনে

বর্ধমান জেলার সমস্ত কৃষি ও অকৃষি জমি জরীপ করে জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারীর নাম বিধিবদ্ধ হয় এবং হিল সাহেবের (অক্টোবর, ১৯২৭ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) পর এস. এন. রায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ হতে এপ্রিল, ১৯৩৪) বর্ধমান জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই সময়ে সর্বপ্রথম জমাবন্দী খতিয়ান প্রস্তুত করে রায়ত ও প্রজাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ভাগচাষ ও তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত ঘটানোর জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন শুরু হলে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ভুমিসংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল রাজস্ব দপ্তরের ৬৪১৪ নং প্রস্তাব অনুসারে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড সহ ১৫ জন সদস্যের একটি কমিশন ভুমিরাজস্ব ও সংস্কারের জন্য গঠিত হয়। বর্ধমানের রাজার পক্ষে তাঁর অতিরিক্ত ম্যানেজার জমিদারী প্রথার স্বপক্ষে ৯৩ দফা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উত্তর প্রদান-কালে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, বিগত ৮০ বছরে বর্ধমানরাজ কৃষির উন্নতির জন্য ৫৯,১২,৫০০ টাকা, রাস্তাঘাটের জন্য ৬,৪৪,২০০ টাকা, শিক্ষাখাতে ২৪,৯৮,৮০০ টাকা ও অন্যান্য খাতে ৬০,২৯৯ টাকা ব্যয় করেছেন।[৭২] কিন্তু এই সময়ে বর্ধমানরাজ ভুমিরাজস্ব, রোড সেস ও শিক্ষা সেস বাবদ কত কোটি টাকা আদায় করেছেন তার হিসাব কিন্তু দাখিল করা হয় নাই।

দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে 'ফ্লাউড কমিশন' ঘোষণা করে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদারী প্রথা ও তৎসহ মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্রমপর্যায়ভুক্ত শ্রেণীগত ধাপ এ যুগে অচল। সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্ব বিলোপের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষক ও প্রজাকে সরকারের অধীনে আনা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকটি চাষী পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কৃষিযোগ্য ভুমির সর্বোচ্চ সীমা ১০ একর পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া উচিত। 'ফ্লাউড কমিশন' আরও ঘোষণা করে যে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত না হলে কৃষিসংস্কার বা কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নয়। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকাল, সেকারণে কমিশনের রায় কার্যকারী হয় নাই। বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে গঠিত 'রোল্যাণ্ড্স্ কমিটি' অভিমত প্রকাশ করে যে, জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতালোপ এবং জমিদারী অধিগ্রহণের মাধ্যমে 'প্রোপাইটারী রাইট' রাষ্ট্রের উপর বর্তান উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১৬০ বছর পরে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন, ১৯৫৩' 'বিল পেশ করা হলেও আইনে পরিণত হতে আরও এক বছর কেটে যায়। বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ হতে আইনটি কার্যকরী করা হয়। এই আইনের বলে—(১) জমিদারী অধিগ্রহণ করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী স্বত্ব ও মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন, (২) মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাস-জমি দিয়ে বাকী অংশের মালিককে সরকারী প্রজারূপে ঘোষণা (৩) খনির অধিকার হতে বঞ্চিত করা। ফ্লাউড কমিশনে জমির উর্ধ্বসীমা ১০ একর রাখা হলেও বর্তমান

আইনে ঊর্ধ্বসীমা ২৫ একর করা হয়। ১৯৭১ সালে জমির ঊর্ধ্বসীমা সেচ ও অসেচ এলাকায় শ্রেণী বিভাগ করে যথাক্রমে পরিবার পিছু ৫ হেক্টর ও ৯·৮০ হেক্টর করা হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী কর্মচারী গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা যায় যা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন জমিদারীতে প্রচলিত ছিল না। বর্ধমানের রাজাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তিনটি পরিবার উচ্চপদসমূহে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা মাসিক তংখা পাবার অধিকারী ছিলেন। এটির উত্তরাধিকারী স্বত্ব ছিল এবং এর যে কোন অংশ বিক্রয়যোগ্য ছিল। ১০০০ টাকা মাসিক তংখা ছিল সে সময়ে সর্বোচ্চ সম্মানের পদ এবং তংখার পরিমাণ অনুসারে সামাজিক মান-মর্যাদা নির্ভরশীল ছিল। জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির পর তংখাওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করে। কিন্তু ওড়িশা সরকার দাবী নামঞ্জুর করায় তাঁরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন এবং ওড়িশা হাইকোর্ট, সরকারের আনুকূল্যে রায় দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তংখার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের দাবী বাতিল করেছিলেন।

কৃষির উন্নতি বিধানের নিমিত্ত 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫' পাশ হওয়ার পর চারটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভূমি সংস্কার আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য—(১) পারিবারিক ভূমির সর্বোচ্চ সীমা, (২) উত্তরাধিকারসূত্রে বর্গা করার অধিকার, (৩) বর্গাদার প্রথা উচ্ছেদ রহিত ও (৪) রাজস্বের পুনর্বিন্যাস। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আদালতের মামলা দায়ের করার ফলে ভূমি সংস্কার আইনকে আজও পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও ট্রাস্ট গঠনের ফলে বহুক্ষেত্রে আইনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে জমির ঊর্ধ্বসীমা ১০ একরে নেমে এলেও পুষ্করিণীকে এর আওতাভুক্ত করায় মাছ চাষ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। চাকরান জমির স্বত্ব ভোগ-দখলকারীর অধিকারে আসায় 'বেগার খাটানোর' ন্যায় সামাজিক ব্যাধি দূর হয়েছে। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি বিলোপ হওয়ায় বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে দেবসেবা ও মন্দির-মসজিদের পরিচালন-ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় পেঁছেছে।

ভাগচাষপ্রথা বহুকাল হতে প্রচলিত থাকলেও বর্গাদার বা ভাগদারগণের বিষয়ে আইনের কোন রক্ষাকবচ ছিল না। বর্ধমানের প্রাক্তন সেটেলমেণ্ট অফিসার কে· এ· এল· হিল (আই· সি· এস·)-এর মতে সমগ্র জেলার কৃষিযোগ্য জমির এক-চতুর্থাংশ ভাগচাষের মাধ্যমে চাষবাস হত। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও ভূমি সংস্কারমূলক আইনগুলিতে ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার কথা বিবেচিত হলেও ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সাধারণভাবে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই ভাগচাষে নিয়োজিত থাকত এবং এই সামাজিক কারণে তারা বর্গা-জমি নথিভুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করে নাই বা আইনগত ও অন্যান্য নানা কারণে এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই রেভিনিউ বোর্ডের এক আদেশ বলে 'অপারেশন বর্গা'

সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যতীত পঞ্চায়েতের সাহায্যে বর্গাদার বা ভাগদার জমির নথিভুক্ত করার কাজ শুরু করে। ১৯৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ স্থানীয়ভাবে আলাপ আলোচনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপারেশন-বর্গার গতিশীলতাকে বজায় রাখে এবং এই পদ্ধতি এখনও বলবৎ আছে। আবার অনেক সময় অহেতুক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও আদালতে মামলা দায়ের করার ফলে একাজের অগ্রগতি মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হচ্ছে। বর্গাদারগণ যাতে চাষবাসের জন্য আর্থিক সঙ্কটে না পড়েন তার জন্য সরকারের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সরকারী অনুদানের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রচেষ্টা ছিল অপারেশন বর্গায়। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক হিসাবে দেখা যায় যে, 'অপারেশন বর্গা'র পূর্বে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ২৭,২৪২ এবং এর আওতাভুক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ১৭,৩১২ একর। কিন্তু অপারেশন-বর্গার ফলে ৭৬,৬৫৫টি বর্গাদার ও ৭২,৩৬৭ একর জমি নথিভুক্ত হয়। এ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় নথিভুক্ত বর্গাদার ও ভূমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,০৩,৮৯৯ জন ও ৮৯,৬৭৯ একর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের চাষীদের ৪ একর পর্যন্ত জমির ভূমিরাজস্ব মকুব হওয়ায় কৃষি-উন্নতির ক্ষেত্রে সাময়িক অনুদান হিসাবে গণ্য করা হলেও, ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় ও ভূমি সংস্কারের কাজ ব্যাহত হবে।

কৃষিকার্য ও কৃষিজদ্রব্য উৎপাদন হল বর্ধমানের অর্থনীতি বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। সেকারণে এ জেলায়, ভূমি-সংস্কার ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত আইনগুলি সংশোধন করে তাকে উৎপাদনমুখী করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষির উন্নতির দিকে মূল লক্ষ্য রেখে ভূমি-সংস্কারের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। তবে অনেক সময় আইনগত ত্রুটির জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু বাধা এসে উপস্থিত হয়। রাজ্য প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ঃ—

১। আদালতের মামালাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি।

২। দ্ব্যর্থবোধক আইনের সংশোধন ও প্রয়োগ।

৩। এক মালিক বা জোতের এক খতিয়ান প্রস্তুতের কাজকে ত্বরান্বিত করা।

৪। সিলিং-এর উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে কৃষি-উৎপাদক সমবায় গঠন।

৫। গ্রামভিত্তিক বর্গাদার সমবায় গঠন।

৬। ৫০ একরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট পুষ্করিণী ও বিল অধিগ্রহণ করে সেচ ও মৎস্যচাষের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ।

৭। এ জেলায় ব্যাপকভাবে গোচারণক্ষেত্র নষ্ট করে কৃষি-জমিতে পরিণত করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে অদূরে ভবিষ্যতে গবাদি পশুর বিচরণ ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গোচারণক্ষেত্র ও বন সংরক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ।

৮। জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে মজা খাল বা বিলগুলির সংস্কার করে জলসেচ ও মৎস্যচাষের পরিকল্পনা গ্রহণ।

৯। আবাসন প্রকল্প ও ব্যক্তিগতভাবে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে শহরের উপকণ্ঠবর্তী স্থানের কৃষিজমি সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। শিল্পোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কৃষিযোগ্য জমি ও বনভূমি ধ্বংস রোধের জন্য আইন সংশোধন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্ধমান জেলার অর্থনীতি মুখ্যত কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান ভূমির ব্যবহার, মালিকানা, রাজস্ব ও সামাজিক বণ্টনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমি সংস্কারের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর উপযোগিতা যাচাই করা সম্ভবপর।

প্রাচীনকাল হতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানেও জমির মালিকানা স্বত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হত। পূর্ব মালিকানা স্বত্ব নিয়ে রাজা ও প্রজার কোন বিরোধ ছিল না (অবশ্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বর্ধমানের প্রকৃত ভূমি-ব্যবহারকারীর কোন মালিকানা স্বত্ব ছিল না)। মোঘল আমলে যেরূপ খাসমহলের উপর বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের পর রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

যে কোন দেশে ভূমি সংস্কারের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে যে, ভূমি সংস্কারকে বাস্তবে এরূপভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা উচিত যদ্দ্বারা সুষ্ঠু সামাজিক বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিরাজস্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ভূমির উপর আদায়ীকৃত কর হতে ভূমি সংস্কার তথা ভূমির উন্নতিবিধানের চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা অনুদানের উপর নির্ভর করে এ কাজের প্রচেষ্টা স্বল্পকালীন মেয়াদে কৃতকার্য হলেও অদূর ভবিষ্যতে অর্থনীতির ধারা ব্যাহত হবে। কিন্তু ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ হতে যে সকল রায়তের জমির পরিমাণ ঊর্ধ্বতন পক্ষে সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত হলে রাজস্ব মকুব করা হবে এবং অপরাপর ক্ষেত্রে রাজস্ব দেড় গুণ বর্ধিত করা হবে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা গেলেও সামগ্রিকভাবে অর্থের জন্য ভূমিসংস্কার ও ভূমির উন্নতি বিষয়ক কার্য ব্যাহত হবে। বর্ধমানের মোট কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ কৃষক ভূমিরাজস্ব প্রদান করা হতে অব্যাহতি লাভ করেছে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জেলার রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে।

মোট কৃষিযোগ্য-ভূমির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, নূতন আবাদী জমি হাসিলের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা স্বল্প হওয়ায় বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতার অভাব ঘটে এবং ভূমিস্বত্ব নিয়ে প্রচুর বিরোধ দেখা দেয়। অন্ততঃপক্ষে ২০০ বছর পূর্বেও বর্ধমানের কৃষিযোগ্যভূমি বর্তমানের তুলনায় অধিক না

হলেও মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল না এবং রাজস্ব যথাসময়ে দাখিল হলে ভূমিস্বত্ব নিয়ে বিরোধও অল্প ছিল। বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত ন্যূন ছিল না। এজেলার কৃষিযোগ্য ভূমির প্রায় ৯৫ শতাংশ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মোট ১৭.৩১ লক্ষ একর ভূমিভাগের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ একর পরিমাণ জমি কৃষিকার্যের জন্য বিগত ৪০ বছর ধরে নির্দিষ্ট আছে। একালে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান ভূমির ব্যবহার প্রায় প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে গেছে। মোট তিন লক্ষাধিক জোতের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ জোতের ভূমির পরিমাণ প্রান্তিক সীমার নীচে। গোচারণ ক্ষেত্রগুলিকে আবাদযোগ্য করে মোট জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হলেও আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় খনি ও শিল্প কারখানার জন্য বন ও কৃষিযোগ্য ভূমির রূপান্তর ঘটিয়ে মোট পরিমাণ বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সময়	কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ	মোট লোকসংখ্যা
১৯১০-১১	৯ ০৫ লক্ষ একর	১৫.৩৩ লক্ষ
১৯৫০-৫১	১১.৮০ লক্ষ একর	২১.৯১ লক্ষ
১৯৮০-৮১	১১.২৫ লক্ষ একর	৪৮.৩৫ লক্ষ
১৯৯০-৯১	আনুঃ ১১.২৫ লক্ষ একর	৫৯.৭৯ লক্ষ

বর্ধমান জেলা প্রসঙ্গে ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কারের প্রবক্তাদের কৃষি ও কৃষকের উন্নতিবিধানের লক্ষ্য থাকলেও এই উদ্দেশ্য কিন্তু প্রত্যাশিত ফল দিতে পারে নাই। কারণ প্রায় ৫ লক্ষ কৃষি-শ্রমিকের জন্য গঠনমূলক কিছু করা হয় নাই। অপরপক্ষে কৃষিকার্য যৌথউদ্যোগের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মূলধনের অভাবে সামগ্রিক কৃষির উন্নতির হার ভবিষ্যতে (growth rate) সন্তোষজনক না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ জেলায় কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনও প্রায় ব্যর্থ।

আইনের বিধি বলবৎ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানেও 'চকবন্দীপ্রথা' অর্থাৎ আবাদযোগ্য ভূমি একত্রীকরণের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। অথচ উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে 'চকবন্দীপ্রথা' প্রচলিত হওয়ায় প্রান্তিক চাষীদের বহু সুবিধা হয়েছে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও 'এক পরিবার এক খতিয়ান' আজও তৈরী হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে 'দায়ভাগবিধি' বলবৎ থাকায় এগুলি কার্যে পরিণত করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাও আছে।

ভূমি সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব ভোগীর স্বত্বের বিলোপ ঘটিয়ে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে স্বত্বযুক্ত প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটান। এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। শিলিং-এর উর্ধ্বতন জমি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা না গেলেও এর অধিকাংশই সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে আনা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু ভূমি বণ্টন ও পুনরায় কৃষিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি থাকায় অলাভজনক কৃষিকার্যে পরিণত হতে চলেছে। অতীতে সার্ব-

ভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে রাষ্ট্র ভূমির উপর কর আদায় করত এবং ঐ ব্যবস্থায় ভূমি সংস্কারের চিন্তাধারা ছিল গৌণ। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় কল্যাণকারী রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি আর্থ-সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকারণে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান আর সেই সঙ্গে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে সীমিত পরিমাণ ভূমিভাগকে সম্বল করেই গ্রামবাংলার আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

পাদটীকা:

১। প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি—রাধাগোবিন্দ বসাক, পৃঃ ৫৩।
২। *Report of the Land Revenue commission, Bengal*, Vol. II, p. 129.
৩। *Ibid.*, Vol. II, p. 132.
৪। অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪০।
৫। *Report of the Land Revenue commission, Bengal*, Vol. II, p. 132.
৬। *Economics in Kautilya*—B. C. Sen, p. 14.
৭। Economics in Kautilya, p. 15.
৮। নারদস্মৃতি, পৃঃ ১৩৭।
H. C. I. P. (*The classical Age*)—Dr. R. C. Majumder, p. 592-93.
৯। *History of Ancient Bengal*— R. C. Majumder, p. 322.
১০। *Corpus of Bengal Inscriptions*—Mukherji & Maity, p. 362.
১১। *Epigraphia Indica*, Vol. XXIII, p. 159.
১২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮৭তম বর্ষ, পৃঃ ২-৩; J. A. S. B., 1945, p. 5-9.
১৩। *Epigraphia Indica*, Vol. IV, p. 246.
১৪। বাঙালীর ইতিহাস—নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৩৬।
১৫। *Inscriptions of Bengal*—N. G. Majumder, Vol. III, p. 97-98.
'...according to the standard Nala consisting of 56 cubits, prevalent in that region, and yielding annually 900 Puranas,' at the rate of 15 Puranas to the drona, along with forest and branches, land and water, pits and barren land, betelnut and cocoanut trees, toleration of Ten sins, exempt from all forced

labour, not to be entered by Chattas and Bhattas, exempt from all dues.'

১৬। *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, p. 141.

১৭। *Indian Land System*—Radha Kumud Mukherjee, p. 23.

১৮। বঙ্গদেশের ইতিহাস—সুশীলা মণ্ডল, পৃঃ ২৪।

১৯। ঐ পৃঃ ২৬০-৬১।

২০। ঐ পৃঃ ১৯৫।

২১। *Indian Land System*, p. 23.

২২। *Indian Land System*, p. 24.

২৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯।

২৪। *Ain-i-Akbari*, p. 128 ; *Cont. to the Geo. & Hist. of Bengal*, p. 10 ; বঙ্গদেশের ইতিহাস, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৭ ; স্যার যদুনাথ সরকারের মতে 'বর্ধমান জেলার মধ্যাংশে সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান হুগলী জেলার মধ্য ও উত্তরাংশের পশ্চিমভাগ, বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চল (ইন্দ্রানী পরগণাসহ) এবং সরকার মদারনের বিস্তৃতি ছিল হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, বিষ্ণুপুর রাজ্য বাদে বাঁকুড়া জেলা, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ।' অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে অজয়নদের উত্তর তীরস্থ ভূভাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরগণা সরিফাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৫। *Ain-i-Akbari*, Vol. II, p. 153.

২৬। *Ibid.*, p. 153.

২৭। *Ibid.*, p. 155.

২৮। *Report of the Land Revenue commission, Bengal*, Vol. II, p. 207.

২৯। *Ibid.*, p. 167.

৩০। চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য আকাদেমী সংস্ক.)—সুকুমার সেন সং, পৃঃ ৩,

'মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহারি।'

অথবা,

'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি।'

৩১। *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the Dist. of Burdwan*—K. A. L. Hill., p. 18.

৩২। *Ibid.*, p. 21.

৩৩। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক (পুস্তক বিপণি সং), পৃঃ ৩০।

৩৪। *A Narrative of the Transaction in Bengal*, Vol. I, Henry Vansittart, p. 102 & 128.
৩৫। *India Records Series : Fort William—India House Correspondence*—Ed. R. R. Sethi, p. 290-92. 'Letter dated, Fort William, 16th January, 1761, para 69, 73 & 74.
৩৬। *Historical Introduction to the Bengal portion of the Fifth Report*—W. K. Firminger, p. 150.
৩৭। *Ibid.*, p. 147.
৩৮। *Ibid.*, p. 151 ; *Fort William—India House Correspondence*, Vol. VII, p. 472.
৩৯। *Fort William—Indian House Correspondence*—Ed. C. S. Srinivasachari, Vol. IV, p. 21.
৪০। *Hist. Intro. to the Bengal Portion of the Fifth Report*, p. 158
৪১। *India Record Series*, Vol. II, C. R. Wilson, p. 175.
৪২। *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Dist. of Burdwan* (1927-34)—K. A. L. Hill, p. 21.
৪৩। *Selections from unpublished Records of Government*—Rev. J. Long. No. 491, 492 & 499.
৪৪। *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report*, p. 144-45.
৪৫। নদীয়া কাহিনী, পৃ: ৩৫।
৪৬। *Selection from unpublished Records from Government*, No. 501 & No. 504 ; *Riyaju-S-Salatin*—Ghulam Hussain Salim, p. 390.
৪৭। *Hist. Intro. to the Bengal Portion of the Fifth Report*, p. 144-45.
৪৮। *Interesting Historical Events*—J. Z. Halwell, p. 112.
৪৯। *Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan Dist.—W. B. Oldham*, p. 4 ; বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৭।
৫০। *East Indian Fortunes*—P. J. Marshall, p. 196.
৫১। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃ: ১০৪।
৫২। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, পৃ: ৩৩৭।
৫৩। *Bengal District Gazetteers, Burdwan*—J. C. K. Paterson, p. 34.
৫৪। *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report*—F. D. Ascali, p. 82.
৫৫। *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal* (1757-1916)—Monmohan Chakrabatti, p. 9-11.

৫৬। *Ibid.*, p. 11.

৫৭। *Bengal Past & Present.* p. 1910, Vol. VI, p. 229.

৫৮। *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal* (1757-1916), p. 12.

৫৯। পশ্চিমবাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব—তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২।

৬০। *Fort William—India House Correspondence*, Vol. X, p. 550.

৬১। পশ্চিমবাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব, পৃঃ ২১ ; *Regulation No. I of the Parmanent Settlement*, 1793.

৬২। *Calcutta Review*, 1846, p. 320.

৬৩। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, পৃঃ ১১১।

৬৪। *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Burdwan* (1927-34)—K. A. L. Hill, p. 20.

৬৫। *Land Revenue Policy*, Govt. of India, 1902, p. 51.

৬৬। *Ibid.*, p. 36.

৬৭। *Imperial Gazetteer*, Vol. IX, p. 102.

৬৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০-২১।

৬৯। ভূমি-রাজস্ব ও জরীপ—টোডরমল, পৃঃ ৬৭।

৭০। পশ্চিমবাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব, পৃঃ ৪১।

৭১। ঐ পৃঃ ৪৬।

৭২। *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. IV, p. 477.

পরিশিষ্ট—১

বর্ধমান রাজ-এস্টেটভুক্ত পরগণা তালিকা ঃ

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বর্ধমান জমিদারীর অধীনস্থ পরগণাসমূহের প্রাপ্ত তালিকা* :—

জেলা বর্ধমান : পরগণার সংখ্যা ২১টি

আজমৎশাহী	মজঃফরশাহী	বাঘা	বর্ধমান
অম্বিকা রায়পুর	চম্পানগরী	দেঞা	গোপভূম
হাভেলী	ইন্দ্রাণী	পাটুলি	জাহাঙ্গীরাবাদ
খণ্ডঘোষ	মনোহরশাহী	নলহি	রানিহাটী
শিলামপুর	সেনপাহাড়ী	সাহাবাদ	সেরগড়
সমরশাহী			

জেলা হুগলী : পরগণার সংখ্যা ১৩টি

আরসা	বালিয়া	বালিগড়ী	বরড়া
বনপুর	ভুরশুট	চৌমহা	জাহানাবাদ
খালোর	মণ্ডলঘাট	পাণ্ডুয়া	পৌনান
রায়পুর			

বর্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলা নিয়ে ঐ সময়ে 'হুগলী জেলা' গঠিত ছিল।

জেলা মেদিনীপুর : পরগণার সংখ্যা ৪টি

বরদা	চিতুয়া	চন্দ্রকোনা	ব্রাহ্মণভূমি

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে বর্ধমান রাজ-এস্টেটের পক্ষে সরকারকে দেয় ভূমিরাজস্ব ও সেস জমার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১.৭ লক্ষ টাকা ও ৩.৩ লক্ষ টাকা।

* *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Burdwan* (1927-34)—K. A. L. Hill, I. C. S, Appendix-XI, P. 89.

Note : *Imperial Gazetteers*—W. W. Hunter, Vol. IX, p. 102

The Maharaja of Burdwan is the largest revenue payer in India, the present demand from the estate on account of land revenue and cess being 31·7 lacks and 3·3 lacks respectivly.

কেবলমাত্র বর্ধমান জেলার রাজস্ব জানা গেছে ; মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার তথ্য অজ্ঞাত।

পরিশিষ্ট—২

বর্ধমান জমিদারীর ভূমিরাজস্ব

(১৮২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চাকলা বর্ধমানের হিসাব ও ১৮২১ খ্রীস্টাব্দ হতে বর্ধমান জেলার হিসাব প্রদত্ত হল)

মোট ভূমির পরিমাণ—১৭৩১৪০০ একর = ৭০২৪ বর্গকিলোমিটার

কৃষিযোগ্য ভূমি—১৪·১৭ লক্ষ একর : অকৃষিযোগ্যভূমি—৩·১৪ লক্ষ একর

বনভূমি—২৮৫ বর্গকিলোমিটার

জনসংখ্যা—৫৯,১৯,০৫০ : গ্রামবাসী—৪০·২৯ লক্ষ : শহরবাসী—১৯·৫০ লক্ষ

গ্রামসংখ্যা—২৫৭০ : শহরের সংখ্যা—৪৯ ।

সাল	রাজস্বের পরিমাণ	সাল	রাজস্বের পরিমাণ
১৭২১-২২ খ্রীস্টাব্দ	২২, ৪৪, ৮১২	১৭৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দ	৪০, ৮০, ৯৫৮
১৭৫১-৫২ „	২৬, ৩৭, ৯৩৭	১৭৭৯-৮০ „	৩৮, ২৩, ৫৬০
১৭৫৬-৫৭ „	২২, ৫১, ৩০৬	১৭৮০-৮১ „	৩৮, ৫৮, ২৫২
১৭৬০-৬১ „	৩১, ৭৫, ৩৯১	১৭৮১-৮২ „	৪১, ৭৪, ৫২৪
১৭৬১-৬২ „	৩৮, ৪১, ৯৮৭	১৭৮২-৮৩ „	৪২, ৯২, ৭৯০
১৭৬২-৬৩ „	৩৯, ৪৯, ১৬৭	১৭৮৩-৮৪ „	৪২, ৮৯, ১৭২
১৭৬৩-৬৪ „	৩৯, ৮৬, ১০১	১৭৮৪-৮৫ „	৪৩, ৫৮, ০২৭
১৭৬৪-৬৫ „	৩৬, ২৯, ৭৮৯	১৭৮৫-৮৬ „	৪৩, ৫৮, ০২৭
১৭৬৫-৬৬ „	৩৫, ৬৭, ৮৫৪	১৭৮৬-৮৭ „	৪৩, ৫৮, ০২৭
১৭৬৬-৬৭ „	৪২, ৮৮, ১৭১	১৭৮৭-৮৮ „	৪৩, ৮৬, ৪৬৩
১৭৬৭-৬৮ „	৪১, ৪৯, ৪৭১	১৭৮৮-৮৯ „	৪২, ০৮, ৮৩০
		(দশশালা বন্দোবস্ত)	
১৭৬৮-৬৯ „	৩৯, ৪৮, ০৩৭	১৭৯২-৯৩ „	৪২, ০৮, ৮৩০
১৭৬৯-৭০ „	তথ্য অজ্ঞাত	(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)	
১৭৭০-৭১ „	৪৩, ২৮, ৫০৯	১৮১৯-২০ „	৪৫, ৩৩, ২১৪
১৭৭১-৭২ „	৪৩, ২৪, ১৪৯	১৮৫০-৫১ „	৩২, ২২, ১৮১
১৭৭২-৭৩ „	৩৯, ৫২, ৫৬৮	১৮৬০-৬১ „	৩১, ৯২, ২৩৩
১৭৭৩-৭৪ „	৩৮, ৮০, ৪৯৪	১৮৭০-৭১ „	৩৮, ৮৭, ৭২০
১৭৭৪-৭৫ „	৪০, ০২, ৪০১	১৮৭১-৭২ „	৩০, ৫৯, ৮০০
১৭৭৫-৭৬ „	৩৯, ৯৮, ৪৭১	১৯০৮-০৯ „	৩০, ৫৮, ৭৭২
১৭৭৬-৭৭ „	৩৯, ০৭, ২২০	১৯৬৫-৬৬ „	৫৫, ৯৬, ৯৬৭
১৭৭৭-৭৮ „	৩৯, ০৭, ২২০	১৯৭০-৭১ „	২৫, ০০, ৩৬১

অষ্টম অধ্যায়

সংস্কৃতির রূপরেখা

সংস্কৃতির স্বরূপ ঃ

আচার্য সুনীতিকুমার, 'culture' বা 'সংস্কৃতি' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, 'civilization' বা সভ্যতা বলতে ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের বহিরঙ্গ—তার উন্নত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, তার সামাজিক রীতিনীতি, তার রাষ্ট্রনীতি, তার রূপশিল্প, বস্তুশিল্প, পূর্ত, সাহিত্য ও ধর্ম এসকলকে বোঝায় ; এবং culture বা সংস্কৃতি অর্থে উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি যথা, তার আধিমানবিক, তার আধ্যাত্মিক জীবন, তার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশভঙ্গী, তার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ—তার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ প্রাণ-বস্তু, মুখ্যতঃ তাই বোঝা যায়। এককথায় সভ্যতা তরুর পুষ্প এই সংস্কৃতি।[১] টেলার বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বুঝিয়েছেন, তাঁর মতে[২]—

"Culture or civilization is that complex whole which includes knowledge belief art morals law customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারা হবে নিরবচ্ছিন্ন এবং এই নিরবচ্ছিন্নতাকে যাচাই করতে হলে সংস্কৃতির পর্যালোচনারও একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতির মৃত্যু নাই—মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত অধ্যায়কে স্মরণ রেখে আরও উন্নততর পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ক্রোয়েবার মন্তব্য করেছেন[৩]—

"This unlimited receptivity and assimilativeness of culture make the totality of culture a continuum ; the parts merge into each other without definite breaks. It is generally assumed that all life is also a continuum ; but the continuity of life is traceable only by going back in its history and then reascending other branches."

সংস্কৃতি বা culture শব্দ কি কেবলমাত্র সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর পক্ষেই প্রযোজ্য অথবা আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণ কি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে ? রালফ্ লিনটন সংস্কৃতি শব্দকে 'social heredity' বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে এক্ষেত্রে নিচুস্তরের মানবগোষ্ঠীও যে বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী তার আলোচনা লুইস মর্গন করে গেছেন।[৪]

বঙ্গদেশের সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতিকে বোঝায় না। আর্যগণ বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বেই অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতি / গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি যে ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। সুতরাং বঙ্গ সংস্কৃতির

হল, সমগ্র বাঙালী জাতির ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক সমন্বয়ের অখন্ড রূপ। বাঙালী জাতির বাহ্যিক উন্নতি হল তার সভ্যতার নিদর্শন ; আর বাহ্যিক উন্নতির সঙ্গে এই জাতির ঐতিহ্যগত যে ভাবনা-চিন্তা এবং সেই সঙ্গে অবচেতন মনের পরিব্যাপ্তিকে বঙ্গ সংস্কৃতিরূপে আখ্যা দেওয়া যায়। এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘদিনের শিক্ষা এবং অনুশীলন বা চর্চার দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বিধানের ফলে।

বর্তমানকালে সংস্কৃতি শব্দের পরিবর্তে লোকসংস্কৃতি শব্দ ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন দেখা যাচ্ছে। ইংরাজী Folk-Lore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে এবং সাধারণভাবে Folk-Lore-এর পরিবর্তে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গৃহীত ও বিশেষভাবে প্রচলিত। লোকসংস্কৃতি অর্থে অন্ত্যজজনের সংস্কৃতি নয় ; এ সংস্কৃতি লোকায়ত সমাজের জীবনচর্চার সমগ্র ধারার মধ্যে প্রবহমান। বস্তুত সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতিকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, এর প্রকৃত তাৎপর্য হল লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সমাজচিত্রকে তুলে ধরা। ধনোৎপাদনের প্রণালী ও তার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তির উপরই বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ সংস্থান ও সংস্কৃতি নির্ভরশীল। তাই লোকসংস্কৃতির ধারা বেয়েই মানুষ পৌঁছেছিল সংস্কৃতির তোরণদ্বারে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, সংস্কৃতি যদি সভ্যতা বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখা হয়, তা'হলে লোকসংস্কৃতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাটির নীচে আশ্রয় লাভ করে আছে এবং যে মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ফুলে সজ্জিত করে শোভা বৃদ্ধি করাচ্ছে। যেকোন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ বিন্যাস, ধর্ম, অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যের উপর অঞ্চল বিশেষের লোকসংস্কৃতি সম্যকভাবে আত্মবিকাশলাভ করে এবং তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়।

বর্ধমানের সংস্কৃতি ঃ

'বঙ্গ' জনপদের একাংশ নিয়ে গঠিত রাঢ় এবং সেই রাঢ়ের মধ্য ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বর্ধমান জনপদের অবস্থিতি। বর্ধমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বর্ধমানের সংস্কৃতিকে বঙ্গ-সংস্কৃতি হতে পৃথক করা সম্ভবপর নয়। তবে রাঢ়ের মধ্যভাগে অবস্থিতির দরুন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমান জনপদের মানবসমাজকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়ে তুলতে হয়েছে। আবার এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েও পৃথক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে (ক্ষুদ্র অর্থে) অবস্থিতির জন্য কেতুগ্রাম, সালানপুর, চিত্তরঞ্জন, কুলটি প্রভৃতি থানা এলাকার সঙ্গে বীরভুম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া ও মানভুমের সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার নবদ্বীপ ও আরামবাগের সঙ্গে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নদীয়া ও হুগলী জেলা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।

বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই জেলার কোন পৃথক সত্তা অতীতে ছিল না। রাঢ়-বঙ্গের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে কোন একটা জেলার পৃথক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্মপাল ব্যতীত বাংলার নৃপতিকুল কোনদিনই উত্তরাপথের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন নাই, যার ফলে বঙ্গ সংস্কৃতি রাজনৈতিক কারণে পার্শ্ববর্তী জনপদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নাই।

দেখা যায়, বর্ধমানের মানবসমাজ, গ্রহণের পরিবর্তে বিতরণ করেছে অধিক এবং সকলকে গ্রহণ করার গুণগত উৎকর্ষই তাকে করেছে শ্রেষ্ঠ ও মহান, প্রকারান্তরে যাকে আদর্শস্থানীয় বলা যেতে পারে। আবার ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলার পশ্চিম-অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন বিহার রাজ্যের আদিবাসীদের ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে। এমন একদিন ছিল যে দিন এর আদিম অধিবাসীরাই সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশীদার। বিদেশাগত মুসলমানগণ প্রথমে বিজেতারূপে আবির্ভূত হলেও বর্ধমানের সরস মাটিতে তারাও জনজীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। আবার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধ, রুচিবোধ, শিল্পচেতনা, ধর্ম, সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনধারার ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হওয়ায বর্ধমানের সংস্কৃতিকে রাঢ় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বললেও অত্যুক্তি হয় না। এটা সম্ভবপর হয়েছে, পূর্বতন বর্ধমান জেলার আয়তনের বিশালতার জন্যেই।

বর্ধমানের কবি 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তীর রচনাতে আছে—

"বর্ধমান দেশ ভাই সভাকার নাভি।"

ঘনরামের উদ্ধৃতিটির বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিনয় ঘোষ। তাঁর মতেঃ "বর্ধমানকে সমগ্র রাঢ়ের মধ্যমণি বলা যায়।" বর্ধমান রাঢ়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ার জন্যই কি রাঢ়ের মধ্যমণি বলা হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে কিন্তু 'মধ্যমণি' শব্দের ব্যবহার করা হয় নাই বা ঘনরামও স্থূল অর্থে 'সভাকার নাভি'র উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় না। স্থাননামবাচক সংস্কৃত 'বর্ধমান' শব্দটির মূলে রয়েছে পার্থিব ও অপার্থিব শ্রীবৃদ্ধি এবং এই উভয় প্রকার গুণের জন্যই বর্ধমান শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। সুদূর অতীতে এই জেলার আদিম মানবগোষ্ঠী প্রয়োজনের তাগিদে স্থায়ী অধিবসতি গড়ে তুলেছিল এবং সেই সঙ্গে কৃষির কলাকৌশল আবিষ্কার, মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুর ব্যবহার ও অন্যান্য শিল্পকলাবিদ্যা তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছিল।

আর্য সভ্যতা বর্ধমানে প্রবেশ করেছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে। বর্ধমানের সীমা হতে 'সমেত শিখর' (পরেশনাথ পাহাড়) ও রাজগীরের দূরত্ব অধিক নয়। পার্শ্বনাথ, বর্ধমান মহাবীর ও বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ় পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে গুপ্ত আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এখানে স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে সুফীদের ও সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ইসলাম ধর্ম

প্রসার লাভ করলেও আরও পরবর্তীকালে মুসলমানগণ বিজেতার পরিবর্তে বর্ধমানের সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও বর্ধমানের জনজীবনের ধারায় তারাও শেষ অবধি মিশে যায়। বর্ধমান-সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বর্ধমানের সন্তান প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মধুর স্বরে, সরল ছন্দে গেঁথে রেখেছেন। সত্যনারায়ণের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে অতীতের সেই "বর্ধমান"—

"বর্ধমানের ওলা খাজা গেছে সীতাভোগ মিহিদানা।
এখনো তত্ত্বে রয়েছে বর্ত্তে' দেশে ও বিদেশে জানা॥
গোলাপবাগ ও কৃষ্ণসায়র আছে মহারাজ বাটী।
তার পরে কোর্ট কাছারির মেলা এখনো রয়েছে খাঁটি॥
এ ত' গেল সব সদরের কথা আছে যে মফঃস্বল।
ছিন্ন বাংলা মাগে যার কাছে ক্ষুধার অন্নজল॥
পঞ্জরে লোহা-কাঁকর-কয়লা নিটল কাঠামো-পারা।
পেশল সে বুক চিরে বয় পূবে স্নেহের পঞ্চধারা॥
খ্যাপা দামোদর দামাল অজয় লাগায় আতান্তর।
তপ্ত হৃদয়-মায়ের উতল সে যে লোহু নির্ঝর॥
ভয় করে না কি সোনার রঙের আঠালো মাটিকে এর ?
সে যে গোলাভরা সোণার কণার খনি এই বঙ্গের॥
মোটা চাল খায় মেটে রং গায়, বর্ধমানের লোক।
জোয়ান সেথায় বসে দৃঢ় দেহ কঠোর তাদের ঠোক॥
ঠোক আছে বটে ঠক নয় তারা সবল সরল মন।
রুক্ষ কথার সহিত জমায় হাস্যের রসায়ন॥
বর্ধমান সে সয়েছে ঝঞ্ঝা মোগল মারাঠাদের।
ভুবন ভুলানো রতন রেখেছে মন্দিরে হৃদয়ের॥
শ্যাম ও কৃষ্ণ তাহারি কীর্ত্তি বিজয় তিলক সে যে।
বাংলার দেব-দ্বিজে রক্ষিল বিদ্রোহ রুখি তেজে॥
ঝড়ঝঞ্ঝার পশ্চিমে হাওয়া নাহি চলে' যেতে যেতে।
পূব হতে এল প্লাবনবন্যা প্রেমনদী গেল মেতে॥
কাটোয়ার ঘাটে কেশবের পাটে মুড়ায়ে চিকুর শোভা।
দীন দয়াময় নদের নিমাই এল জগমন লোভা॥
বৃন্দাবনের গতি হ'ল থির দেনুড়ের তরুতলে।
লোচনের দুই লোচন ঝরিল অথির অজস্র জলে॥
ঝামটপুরের কবিরাজ ধীর কাঁদড়ায় জ্ঞানদাস।
গোবিন্দ নরহরি শ্রীখণ্ডে জাগাইল উল্লাস॥

সিঙিগ্রামে বসি কাশীরামদাস শুনাল ভারতগাথা।
ঘনরাম গায় ধর্ম্মকাহিনী ভক্ত লুটায় মাথা॥
রঘুনন্দন রামরসায়নে মাতাল সবার হিয়া।
ফুলিয়ার কবি এল যেন ফিরে নবকলেবর নিয়া।
শক্তিপূজারী রামানন্দের গীত 'ওমা দিগম্বরী'।
চুপীর দেওয়ানা গান সাথে মিলে আনে সুখ বিভাবরী॥
ছন্দের রাজা ভারতচন্দ্র আমাদের প্রতিবাসী।
স্বভাবকবিতা দাশু রায় রচি প্রাণ দেছে উল্লাসি'॥
রাধাশ্যামের প্রেম লীলা গাহে আমাদের নীলকণ্ঠ।
নাটক গীতেতে মতিরায় দিল রাঢ় দেশে কবিকণ্ঠ॥
পুন নবযুগে শুনেছি সবাই লালবিহারীর হাসি।
মন্ত্র পড়েছে রাসবিহারীরা মার-ফাঁস গেছে ফাঁসি॥
প্রাণাধিক মা'র শ্যামাদাস-বিধু ভিষক্ ব্রহ্মচারী।
ধনগণপতি তারা আর্ত্তের যোগান শান্তিবারি॥
তাঁরি পাঁচকড়ি, যোগেন, ইন্দ্র নায়ক বঙ্গবাসী।
বর্ধমানের ভারতী যেন গো আকাশে বাতাসে ভাসি॥
রঙ্গলালের স্বাধীনতা বাণী নববলে বলীয়ান্।
সিংহশাবক-নজরুল গানে আনে প্রলয়ের বান॥
পল্লীর গীতে কুমুদ ফুটিছে পাশে বসি' কালিদাস।
অক্ষয়-বট-তরু-শিরে আজি জ্ঞানচন্দ্রের ভাস॥
হেথা সুকুমার, কালীপ্রসন্ন অনাথ ও রসময়।
যাদবেন্দ্রের বিজয়ভূমি এ প্রমথনাথ-মিলয়॥
হোথা কল্যাণী জাগে মঙ্গলা যোগাদ্যা ফুল্লরা।
অতীতের ধূপদান হ'তে যেন ধূপ সে সুরভি-ভরা॥
আজি তাই তোমা নমো নমো নমঃ পুণ্য বর্ধমান।
মহাবীর-ভূমি, তব পদ চুমি' অক্ষয় সম্মান॥"

অধিবাসী ও আদিবাসী :

আর্যীকরণের পূর্বে রাঢ় অঞ্চলকে বৈদিক আর্যগণ অনার্য দেশ রূপে অভিহিত করত। যজ্ঞাগ্নির কোন কদর এখানে ছিল না। রাঢ়ের নদীতীরবর্তী গভীর অরণ্যে প্রাচীন অধিবাসীগণ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করত, তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও মিলেছে। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' আছে যে, বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরপাদ গোষ্ঠী হল যাযাবর অর্থাৎ পূর্বভারতের এই তিন গোষ্ঠী আর্যদের অধীনতা স্বীকার না করায় বৈদিক সাহিত্যে তাদের হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে তিনজন

গোষ্ঠী তাদের পৃথক সত্তা নিয়ে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে বিলুপ্ত হয় নাই, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য-ঋষিদের নিকট ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়েছিল। অথচ এরাই যে যুগে তাম্রাশ্বীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ ও লোহ আবিষ্কারে পারদর্শী হয়ে গাঙ্গেয় সভ্যতার অংশীদার হতে সক্ষম হয়েছিল—সেই যুগে বৈদিক আর্যগণ ছিল একান্তভাবে যাযাবর।

বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত সুহ্ম/রাঢ় জনপদের অবস্থিতি ছিল ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাঞ্চলে। 'সুহ্ম' শব্দের অর্থ দুর্ধর্ষ বা বলবান এবং রাঢ় শব্দের অর্থ দুর্ধর্ষ বা নিষ্ঠুর। জৈনশাস্ত্রে এখানকার আদিম অধিবাসীদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে চারি বেদের সঙ্কলন কার্য সমাপ্ত হয় নাই, তার পূর্বেই রাঢ়ের অধিবাসীগণ গ্রাম ও নগরপত্তনসহ কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে রাঢ়ের অধিকাংশ গোষ্ঠীই ছিল আদি-অস্ট্রেলয়েড, মোনখোমর ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত, যাদের বংশধারা আজও বাংলার নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সুচিহ্নিত। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা আর্যভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করলেও, তাদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, বৃক্ষপূজা, শিলাপূজা, পাহাড়-নদী-পশু-পাখির পূজা প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার ও গ্রহণ করতে উচ্চতর হিন্দুসমাজ বাধ্য হয়েছে। বস্তুতঃ এগুলি প্রাক-আর্য-সভ্য গোষ্ঠী মানুষের দান। বাংলার কৃষি সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের ধারাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাক-আর্যগোষ্ঠী ও আর্যগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ রূপটি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও তার ক্ষীণ সূত্র আজও এখানে দেখা যায়। বর্ধমনের বহু গ্রামে অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, বানড়া, কাঁদড়া, বামড়া, আড়া, শাঁকড়া, বেলেড়া, কামনাড়া, মালীয়াড়া ইত্যাদি গ্রামনামের পরিচিতি থেকে।

বাঙালীর রক্তে আদি অস্ট্রালীয়ড প্রবাহ অধিক হলেও উত্তর ভারতের আদি-নর্ডিকদের প্রভাবে সংঘাত ও সমন্বয়ের পথে মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। মিলন ও মিশ্রণের পথেই সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়[৬] এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি। রাঢ়ের উচ্চবর্ণের লোকেরা আর্যত্বের দাবী করলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিবাহ পদ্ধতি ও আচার ব্যবহারে অস্ট্রিক সংস্কৃতির অবদানকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। বর্ধমানের উচ্চবর্ণের অধিবাসী-গণের জীবনে অস্ট্রিক সংস্কৃতির অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্রাহ্মণ্য তথা পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা অর্চনা বাদে তারা যেসব গ্রাম দেবতা বা লৌকিক দেবতার পূজা করে থাকেন, সেগুলি আদিতে ছিল কোল-মুণ্ডা-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দেবতা। আজও এই জেলার কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা উচ্চবর্ণের লোকেদের নিকট যথেষ্ট আদরণীয়।

কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজেই লোক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। "বঙ্গদেশে আদিম জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাসে অস্ট্রালয়েডদের এই ব্যাপক অবস্থান বাংলার লোকসংস্কৃতি বিকাশের কৃষিভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক সংহত সমাজের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয় কেন্দ্র থেকেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্ভবত আদিম অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত রিক্থকেই রক্ষা করেছিল এবং তাই বাংলায় কখনো নগরের প্রাধান্য ছিল না।"[৭] বর্ধমানের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, একই ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে উচ্চতর বর্ণের সংস্কৃতি ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পাশাপাশি পরিবর্ধিত হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে মূল অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ধারা আজও বলবৎ আছে। আর্য-সংস্কৃতি, এর মৌলিক ধারাকে অবদমিত করতে সক্ষম তো হয় নাই, বরং জনসমাজে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। আবার ভূমিজ গোষ্ঠী হিন্দুধর্ম এবং দেবদেবীর উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করলেও, সেই সঙ্গে তারা কৌমজীবনের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয় নাই।[৮]

একথা সত্য যে, বর্ধমানের জনজীবনের কোন ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস নাই। কিংবদন্তী, সাহিত্য ও তাম্রশাসন হতে এই জেলার বর্ণবিন্যাসের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্ধমান মহাবীরের আগমনকালে যে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তারা ছিল রূক্ষ প্রকৃতির। সম্ভবতঃ তাদের টোটেম ছিল কুকুর। জেলার পশ্চিমাংশে বাউড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুকুর অত্যন্ত আদরণীয় জন্তু। মেগাস্থিনিসের বিবরণে বাগদী, রাজবংশী, মালপাহাড়ী, বাউরী ডোম প্রভৃতি জাতির বসবাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওল্ডহামের মতে বাগদী সম্প্রদায় হ'ল দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত।[৯]

আর্যসভ্যতা গাঙ্গেয় উপত্যকা হতে ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করলেও চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানে কিন্তু কোনদিনই ছিল না। এ প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের উদ্ধৃতি হতে রমাপ্রসাদ চন্দ মন্তব্য করেছেন—[১০]

"Raghunandana a Bengali writer who flourished in the sixteenth century, writes in his Suddhitattva : "The Ksatriyas of modern times have been degraded to the status of Surdas. On account of the abandonment of rites the Vaisyas and the Ambasthas also have degenerated (into Sudras)."

সর্বপ্রথম গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও ক্ষত্রিয় জাতির কোন উল্লেখ নাই। শশাঙ্কের পর সুদীর্ঘ সাড়ে চারশো বছর ধরে পাল রাজত্বে বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে বর্ধমানের বর্ণবিন্যাস একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেন-রাজত্বে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মল্লসারুল ও নৈহাটী তাম্রশাসনে বেদজ্ঞ আর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া গেলেও কৌলিন্য মর্যাদা লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ, আদিশূর কর্তৃক

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়নের এক কাহিনী গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যাঁকে ঘিরে কৌলিন্য দানের কাহিনী গড়ে উঠেছিল, সেই সেনরাজা বল্লালসেন রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগরে' এর কোন উল্লেখ নাই। বল্লালসেন বা লক্ষ্মণসেনের সময়ে সম্পাদিত কোন তাম্রশাসনে কৌলিন্যপ্রথার ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না।[১১]

সুদীর্ঘ পালরাজত্বে বাংলার ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বর্ণবিন্যাস বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলে রাঢ় নিবাসী ভট্টভবদেব, জীমূতবাহন, শূলপানি, রঘুনন্দন প্রমুখের আবির্ভাব ঘটায় বিধ্বস্ত সমাজব্যবস্থাকে পুনরায় গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্কর বর্ণের স্বীকৃতি মনুসংহিতায় (১০।৫-৪০) আছে। কিন্তু পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় 'মনুসংহিতা'র নির্দেশ যথেষ্ট না হওয়ায় মধ্যযুগের প্রথম ভাগে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' পুনরায় সঙ্কর বর্ণগুলিকে উপশ্রেণী বিভাগে ভাগ করে জাতিভেদ প্রথাকে সজীব রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ ব্যবস্থা আজও বলবৎ আছে। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণের উল্লেখ আছে, যারা মূলত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) উত্তম সঙ্কর (২) মধ্যম সঙ্কর (৩) নিম্ন সঙ্কর। উক্ত পুরাণে ছত্রিশ জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্মেরও উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকে রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের আবির্ভাবকালে ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিধি সমাজজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নব্যব্যবস্থার ছাপ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এককথায় এই সময়টাকে বাংলার রেনেশাঁসের যুগ বলা যেতে পারে। কুলশাস্ত্রে বর্ণিত আছে নবগুণের অধিকারী হবেন কুলীন, যথা—

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥'

নববিধগুণের অধিকারীরা পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ের ৫৬ খানি গ্রাম দানস্বরূপ লাভ করেন এবং গাঞীর নামানুসারে তাদের পদবী স্থিরীকৃত হয়। সমগ্র রাঢ়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণ বসবাস করত বর্ধমানে এবং সে হিসাবে এই জেলায় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বসবাস ছিল ২৪ খানি গ্রামে।[১২] অন্যদিকে রাঢ়ের কায়স্থগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—(১) উত্তর রাঢ়ী ও (২) দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। অজয়নদের উত্তরতীর হতে রাজমহলের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত উত্তর রাঢ়ীয়দের বসতি। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, খড়ীনদীর উত্তরতীর হতে উত্তর রাঢ় জনপদের শুরু। ব্রাহ্মণগণের পরে বর্ধমান জেলায় উত্তম সঙ্কর বর্ণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি জাতি। উগ্রক্ষত্রিয়গণ এই জেলায় যে কতকাল বসবাস করছে তার সঠিক কোন নির্দেশ নাই। তবে 'বেশান্তর জাতকে' উল্লেখিত উগগ (উগ্র) জাতিকে E. B. Cowell উগ্রক্ষত্রিয় বলে নির্দেশ করেছেন।[১৩] এই জেলার ধর্ম-সংস্কৃতিতে উগ্রক্ষত্রিয়গণ বিশেষ ঐতিহ্যের দাবী করে থাকেন। উত্তম সঙ্কর বর্ণের জাতিগুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার, শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈদ্যগণ বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করে আছেন। সংখ্যাধিক্যের দিক হতে বিচার করলে গোপ ও সদগোপ গোষ্ঠীর সংখ্যা এ জেলায় নগণ্য নয়।

ছত্রিশ জাতি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তাদের পেশা বা বৃত্তিও, কিন্তু নির্ধারিত হয়েছিল। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমাজকে চালিত করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণীর কুশলী কর্মী, শিল্পী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি প্রয়োজন হয় এবং সামাজিক প্রয়োজনে প্রাচীন চতুর্বর্ণ প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে নূতন সমাজপদ্ধতির বিকাশ লাভের জন্য বাংলায় সঙ্কর বর্ণের স্বীকৃতিকে মেনে নেওয়া হয়। সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে J. H. Hutton মন্তব্য করেছেন—[১৪] "A caste has been described as a social unit, and it is in accordance with its character as such that it is, generally speaking, the guardian of its own rules, that it disciplines its members, expels them from the community, or readmits them after penalties imposed and satisfaction exacted."

১৮৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম জনগণনা কার্য অনুষ্ঠিত হবার পর সি. এফ. ম্যাগরাথ-এর প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে যে, এই জেলায় সর্বসাকুল্যে মোট ৮২টি জাতির অস্তিত্ব ছিল, যথা[১৫]—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা ক্ষেত্রী, রাজপুত, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদগোপ, বৈদ্য, ঘাটোয়াল, ভাট, আগরওয়াল ও মাড়োয়াড়ী, নাপিত, কামার, তেলী বা তিলি, তাম্বুলি, বাউরী, মালি, গন্ধবণিক, শাঁকারী, কাঁসারী, কুমার, মদক, গরেরী, গোয়ালা, গানরার, কৈবর্ত্ত, চাষা, ধোবা, কোয়েরী, কুমরী, বৈষ্ণব, তাঁতী, ঢোল, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, ভাস্কর, সুকলি, যোগী ও পটুয়া, কপালী, লাহেরী, শুঁড়ী, সূত্রধর, কলু, ধোবা, মালা, জেলে, পাটনী, পোদ, তিয়র, ধনুক, ধাওয়া, কাহার, বেলদার, ঢুনুরী, মাঝি, মাটিয়া, নুনিয়া, কোরা, নায়েক, বাগদী, বেহারা ও ভুলিয়া, চাঁড়াল, কবঙ্গা, মাল, মাহিলী, পাসি, শিকারী, বাইতি, কান, বাহেলিয়া, বেদিয়া, ভুইয়া, ডোম, কাওড়া, বারুই, তুরি, দোসধ, মুচি ও চামার, বিন্দ, বুনা, জইন, হাড়ি ও মেথর। বিগত শতকে প্রচুর সংখ্যাক বর্ণ বা জাতিবিভাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও বর্তমানে বেশ কয়েকটা জাতি হয়েছে অবলুপ্ত অথবা অন্যত্র চলে গেছে। পূর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি বিভাগ ছিল কর্মভিত্তিক যা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য হয়েছে অর্থাৎ সোজা কথায় এ যুগে সেকালের শাস্ত্রীয় বিধান পুরোপুরি অচল। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, এ জেলার তফশিলি সম্প্রদায় ও উপজাতির হার হল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০'৮৪ (২৫'০৯ + ৫ ৭৫) ভাগ।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ জেলায় সাঁওতালেরা হল সংখ্যাধিক। তাছাড়া ভূমিজ, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজাং, হো, কোরা, লোধা, মগ, মহালি, মালপাহাড়িয়া, মুণ্ড, মুণ্ডা, নাগেসিয়া, ওরাং ও রভা গোষ্ঠীর লোকেরা প্রধানতঃ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে।[১৬] বর্তমানে সাঁওতাল গোষ্ঠী মূল বাসভূমি ছেড়ে জেলার পূর্ব ও

দক্ষিণ অঞ্চলে বড় বড় গ্রামের সন্নিকটে পৃথক পল্লীর সৃষ্টি করে বসবাস করছে। এরূপ বসবাসের ভিত্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কৃষিকার্যের প্রয়োজনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে একদা এভাবে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং তারাও জীবিকানির্বাহের অনিশ্চয়তা হতে পরিত্রাণ লাভের আশায় কৃষিশ্রমিক হিসাবে গ্রাম-পার্শ্বের পতিত ভূমিতে তাদের বাসস্থান বেছে নিয়েছিল।

সেন রাজত্বের পতন ও বখতিয়ার খলজি কর্তৃক রাঢ়-বরেন্দ্র বিজিত হওয়ার পর বাঙলার সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। বিজয়ী মুসলমানগণ কর্তৃক একদা বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ইতিহাসের স্বীকৃত ঘটনা। ফলতঃ বৌদ্ধদের অধিকাংশই প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন অথবা জোর করে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে অবহেলিত সমাজের জাতিসমূহ এইভাবে স্বেচ্ছায় যেমন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে আবার অনেকে ইসলাম ধর্মের সাম্য নীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল। এছাড়া সামান্যতম পদস্খলনের জন্য যেসব নারী হিন্দু-সমাজ হতে বিতাড়িত হয়েছিল, তারাও ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান উপপতির গৃহে স্থান লাভ করেছিল। এককথায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভের ফলে বাঙালী সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, যার মধ্যে একটি হিন্দু সমাজ ও অন্যটি মুসলমান সমাজ।[১৭]

হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের জাতিভেদ প্রথা প্রবল না হলেও বর্ধমানের মুসলমানগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা সুন্নী ও সিয়া। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা এই জেলায় নগণ্য। সম্ভ্রান্তশালী মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, সৈয়াদ, শেখ, মির্জা ও খান। এঁদের বিস্তারিত পরিচয়টি নিজস্ব দাবী অনুযায়ী হল নিম্নরূপ ঃ[১৮]

(১) সৈয়াদ—আলির বংশধর বলে দাবী করেন ; (২) শেখ—খলিফা আবুবকরের বংশধর ; (৩) মির্জা—মোঘল বংশোদ্ভূত ; (৪) খান—পাঠান বংশোদ্ভূত আফগানিস্থান হতে আগত।

এছাড়া জেলার মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেন্সাস বিভাগের অধিকর্তা Hutton-এর মন্তব্য থেকে জানা যায়[১৯]—"The bulk of the Muslim population are of no doubt of more or less aboriginal extraction converted to Islam, but the aristocracy includes a number of ancient families of Arabic or Mughal lineage." বর্ধমানের মুসলমান অধিবাসীরা উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় ধর্মোন্মাদ নন। এ বিষয়ে হাণ্টারের এক মন্তব্য জানা যায়[২০]—"The Muhammadans of Bardwan are not actively fanatical, although a number of them profess the tenents of the reformed sect known as Faraiza's." অবশ্য এ মন্তব্যটি ঊনবিংশ শতকের।

ষোড়শ শতকে বর্ধমানের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বর্ণনায় মুসলমানদের শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগের মূলে ছিল জীবিকা উপার্জনের পন্থা এবং এই বিভিন্ন বৃত্তির অন্তরালে নাম ও শ্রেণী বৈষম্য লুকিয়ে আছে। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

'রোজ নামাজ করি কেহ হইল গোলা। তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা ॥
বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি। পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি ॥
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল কাবাড়ি। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল। নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল ॥
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকর। জীবন উপায় তার পেয়ে তাঁতি ঘর ॥
পট পাড়িয়া বুলে কেহ নগরে নগর। তীরকর হয়ে কেহ নিরাময় শর ॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগচী। কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি ॥
বসন রঙ্গায়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ। লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ ॥
সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম। সহরে সহরে ফিরে না করে বিশ্রাম ॥
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা। নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা ॥
নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান। সাবধান হয়ে শুন হিন্দুর বাখান ॥'

মঙ্গলকোট থানার নিগন গ্রামের সন্নিকটে এক শ্রেণীর পটুয়াদের বসবাস আছে, যারা না হিন্দু, না মুসলমান। জামালপুর থানায় মোশাগ্রামের সন্নিকটে এক শ্রেণীর পটুয়া বাস করে যারা প্রধানত সাঁওতালী পটের গান করে থাকে। ২৪ পরগণা জেলার আখড়াপুঞ্জীর পটুয়াদের মত কিংবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মত এরা রাম, লক্ষ্মণ, কানাই, বলাই প্রভৃতি হিন্দু নামসহ রহিম, করিম, মুশা, হোসেন প্রভৃতি মুসলমান নামও ব্যবহার করে। মুসলমানদের মত এদের দিনে বিবাহ হয়, ৪১ দিনে অশৌচান্ত হয় এবং তালাক দেওয়ার বিধিও আছে। পটুয়াদের মেয়েরা হিন্দুদের মত শাঁখা, সিন্দুর ব্যবহার করে এবং শীতলা, মনসা ও ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে মানসিক দেয়। আবার মুসলমানদের মত মৃতদেহকে কবর দেয়। তবে মশাগ্রামের পটুয়াদের হিন্দুত্বের অধিক প্রাধান্য দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের এটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেও এদের মুসলমান ভাবাপন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতিই যেন বেশ আধিক্য।

পাণ্ডুরাজারঢিবিতে প্রাপ্ত নরকঙ্কালের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল হতে বর্ধমানে এক বিশেষ জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। অতি সম্প্রতিকালে রেডিও-কারবন পদ্ধতি বিশ্লেষণের দ্বারা জানা গেছে যে, মঙ্গলকোটে প্রাচীনতম অধিবসতিটি গড়ে উঠেছিল খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উত্তর ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এক নূতন সমাজ পত্তন শুরু হলেও এখানকার প্রাচীন অধিবাসীবৃন্দ এই জনপদেই বসবাস করছে। কালক্রমে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত নবাগতের দল প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে আসার দরুণ পরবর্তী

সময়ে এই জনপদের অংশীদার হয়ে গেছে। আবার রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুগে বিজেতার রূপ ধরে দলে দলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছিল এবং তারাও দীর্ঘকাল ধরে এই জনপদে বসবাস করে আসছে; ফলে তাদের বিজেতা সুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যক্ত হয়ে তারাও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। অন্যদিকে বর্ধমানের গন্ধবণিক সমাজের আদি উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে এমন তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে যা দিয়ে জানা যেতে পারে যে, এদেরও একাংশ এসেছিল গুজরাট বা আগ্রা হতে।

বর্ধমানের জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন বহিরাগতদের আগমনের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, অন্যদিকে অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে তারা বর্ধমান হতে অন্যত্র চলেও গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্গী হাঙ্গামার সময়ে ধন, প্রাণ ও মানের ভয়ে বহু উচ্চবিত্ত, সম্ভ্রান্ত ও শিল্পী যে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ইতিহাস সে কথাই বলে। এছাড়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রধান বাসস্থান ছিল বর্ধমানে। বর্গী হাঙ্গামার সময়ে তারা ভাগীরথীর পূর্বপারে, প্রধানতঃ বর্তমান বাংলাদেশ ও কলিকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলাদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বসবাস সম্পর্কে অনুসন্ধান থেকে এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, তাদের পিতৃপুরুষগণ এইসব আক্রমণজনিত কারণে রাঢ় অঞ্চল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে উগ্রক্ষত্রিয়, বাগদী, বাউরী ও মুসলমানগণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্ভবতঃ তারা এদেশ পরিত্যাগ করে নাই। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণের শিল্পকর্মে প্রস্তরশিল্পের ছাপ সুস্পষ্ট এবং মৃৎশিল্পীগণের অনেকে দাবী করেন যে, তাদের আদি বাসস্থান ছিল দাঁইহাট অঞ্চলে।

স্বাধীনতার পরে বর্ধমানের জনবিন্যাসে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠার দৌলতে জীবিকানির্বাহের তাগিদে দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে প্রায় সারা ভারত থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে। ১৯৫১ সালের পর বর্ধমান থেকে যত লোক অন্যত্র চলে গেছে তার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোক এখানে এসেছে। নবাগতদের এই জেলায় আগমনের প্রধান কারণ ছিল শিল্প ও কৃষিতে ক্রমোন্নতি বিকাশ। চাকরি ও ব্যবসায়ের সূত্রে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাট, কানাড়া, তামিল, তেলেগু, সিন্ধী, হিন্দী, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষাভাষি বহু লোক বর্তমানে এখানে বসবাস করছে। আবার প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাতদ্রব্য অল্প আয়াসে উৎপন্ন হওয়ায় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি হতেও বহুলোক বর্ধমানে চলে এসেছিল। সপ্তগ্রামে হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর বহু বণিক সম্প্রদায় শেষপর্যন্ত বর্ধমানে আশ্রয় লাভ করে, যার উল্লেখ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়।

সমন্বয় ও সহঅবস্থানের সঙ্গে শিল্প ও কৃষিজ অর্থনীতি বিকাশের জন্য একটা কৃষিপ্রধান জেলায় প্রায় সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা যে এখানে এসেছে তার একটা দৃষ্টান্ত পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য কৃষিজ অর্থনীতির সঙ্গে শিল্পোন্নতি ও শিল্পঅর্থনীতির বিকাশও এই জনসমাবেশকে যে ত্বরান্বিত করতে

যথেষ্ট সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তুলনামূলক জনসংখ্যা বৃদ্ধি তালিকা হতে জনবসতির ধারাকে বোঝা যাবে।

সময় / সাল			জনসংখ্যা	
১৭৮৪	খ্রীস্টাব্দ	—	১৩,৬০,০০০	(আনুমানিক, চাকলা বর্ধমান, রেনেলের সার্ভে রিপোর্ট)
১৭৮৯	"	—	৭,০০,০০০	(কালেক্টর মার্শারের আনুঃ গণনা)
১৮১৩-১৪	"	—	১৪,৪৪,৪৮৭	(আনুঃ কালেক্টর বেলীর গণনা)
১৮২৮-২৯	"	—	১৪,৮৭,২৬৩	(আনুমানিক গণনা)
১৮৭২	"	—	১৪,৮৬,৪০০	(জন গণনা দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য)
১৮৮১	"	—	১৩,৯৪,২২০	"
১৮৯১	"	—	১৩,৯১,৮৮০	"
১৯০১	"	—	১৫,২৮,২৯০	"
১৯১১	"	—	১৫,৩৩,৮৭৪	"
১৯২১	"	—	১৪,৩৪,৭৭১	"
১৯৩১	"	—	১৫,৭৫,৬৯৯	"
১৯৪১	"	—	১৮,৯০,৫৩২	"
১৯৫১	"	—	২১,৯১,৬৬৭	"
১৯৬১	"	—	৩০,৮৩,৫৬৪	"
১৯৭১	"	—	৩৯,১৬,১৭৪	"
১৯৮১	"	—	৪৮,৩৫,৩৮৮	"
১৯৯১	"	—	৫৯,৭৯,০৫০	(প্রাথমিক রিপোর্ট হতে প্রাপ্ত তথ্য)

জনগণনায় প্রাপ্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গবিভাগ, বহুমুখী-নদী-পরিকল্পনা, শিল্প ও কৃষিতে উন্নতি লাভের পর হতে বর্ধমানের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ধর্ম ঃ

আদিম মানব সমাজে প্রাধান্য ছিল জন্মদাত্রী মায়ের। কৃষিবিদ্যার কলাকৌশল মেয়েদেরই আবিষ্কার শুধু নয়, তাদের দ্বারাই বর্ধিত হয়েছে কৃষির নানাবিধ কারিগরি। সেকারণে আদি কৃষিজীবীদের কল্পনায় জীবনদায়িনী মানবী মাতা ও খাদ্যদায়িনী পৃথিবী বা বসুমাতা একাকার হয়ে গেছে।[২১] পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মের ব্যাপারে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মাতৃদেবীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয় নাই। পাণ্ডুরাজারঢিবি ও মঙ্গলকোটে আবিষ্কৃত মাতৃকামূর্তিগুলি দেখে অনুমান করা যায়, বর্ধমানে অন্ততঃপক্ষে খ্রীস্ট পূর্ব ১৫০০ বছর আগে মাতৃকাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল।

ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জাদু বিশ্বাসের সম্পর্কও অতি প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত। কিন্তু জাদু বিশ্বাস সর্বত্রই ধর্মের পূর্ববর্তী। অলৌকিক শক্তি ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একদা পুরোহিত বা সমশ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ছিলেন জাদু বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার ব্যাখ্যাকার ও নিয়ন্ত্রেতা। ফ্রেজারের মতে[২২]—

"This radical conflict of principle between magic and religion sufficiently explains the relentless hostility with which in history the priest has often persued the magician."

সেদিক থেকে বর্ধমানের লোকেরা মূলতঃ কৃষিজীবী হওয়ায় এদের জাদু বিশ্বাসও মূলতঃ কৃষিবিষয়ক। উদাহরণ সহকারে বলা যেতে পারে, বৃষ্টি না হওয়ার জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বরুণদেবের আরাধনা, ক্ষীরগ্রামে মাঘ মাসে ছাই-এর গাদায় 'চ্যাং-ব্যাঙ' ছেড়ে দিয়ে জমিতে ঐ ছাই ছড়িয়ে দিলে উত্তম শস্য প্রাপ্তির আশা, বৃষ্টির আশায় বোড়োবলরামে বলরামের ক্ষীরভোগ, বজ্র-বিদ্যুতের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য তেরই বৈশাখ ঘরের চালে সেওড়া গাছের ডাল স্থাপন, কার্তিক সংক্রান্তিতে আড়াই আটি ধান কেটে ঘরে তোলা, ক্ষেত্রের প্রথম ফসল বা নবপ্রসূত গাভীর দুধ গ্রাম-দেবতাকে নিবেদন করা, বৃষ্টির কামনায় পাথরকে জলে ডুবিয়ে রাখা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সেই ধর্মীয় জাদু বিশ্বাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃষ্টিপাতের জন্য পাথরকে জলে ডোবানোর বিশ্বাস অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে ; যথা—"Stones are often supposed to possess the property of bringing on rain, provided they be dipped in water or sprinkled with it or treated in some other appropriate manner."[২৩]

বর্ধমানের অধিবাসীদের জীবনধারায় এখনও কৌমবন্ধ সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, রাজবংশী, মালপাহাড়ীদের রীতিনীতি তথা ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্নাকারে অথবা সামান্য রূপান্তরিত অবস্থায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে আজও প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেকটি আদিম গোষ্ঠী টোটেমের নামে পরিচিত ছিল এবং প্রত্যেকটি টোটেমের মধ্যে প্রচলিত ছিল এক বা একাধিক ট্যাবু অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা। টোটেম অনুযায়ী নির্ধারিত হত এদের গোত্র, যা মূলতঃ অস্ট্রিক সমাজের অবদান। টোটেম সাধারণতঃ গাছ, পশু-পাখির নামেই হয়ে থাকত। ফলস্বরূপ কোন টোটেমের লোক সেই বৃক্ষ। পশুকে ছেদন বা হত্যা করবে না। সম্ভবতঃ তারা যে সমস্ত বৃক্ষের বাস্তব প্রয়োজন অধিক অনুভব করেছিল, সে সব বৃক্ষকে রক্ষা করার জন্য দেব-দেবীর প্রতীক জ্ঞানে পূজা করতো, যার ফলে বৃক্ষ ছেদন বন্ধ করা সম্ভব হয়। আজও গ্রামের প্রান্তে কোন বৃক্ষতলে পূজা দেওয়ার প্রথা আছে এবং ঐ বৃক্ষের ডালপালা ছেদন না করার রীতি আছে। বেল ও নিম বৃক্ষ বর্ধমান জেলায় অব্রাহ্মণেরা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে না। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে বট, অশ্বত্থ, সিজবৃক্ষ, শাল, পলাসের কাণ্ড ছেদনে বিধি নিষেধ আছে। অন্যান্য

অঞ্চলের ন্যায় এই জেলার উচ্চ বর্ণের লোকেরা কোন ঋষির গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিত বলে দাবী করে থাকলেও তাদের মধ্যে সকল গোত্রের সামাজিক মান সমান নয়। এর মূলে আছে একই জাতির মধ্যে ছোট, বড় টোটেমের প্রচলন হতে সামাজিক বিভেদ এবং উচ্চ-নীচ টোটেমের ধারণা, তা না হলে ঋষি গোত্রীয় সকল শ্রেণীর মানুষের সমান সামাজিক মর্যাদা পাবার অধিকার ছিল।

কৃষির উন্নততর কলাকৌশল আবিষ্কার ও ফসল বৃদ্ধির ভাবনাচিন্তাকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হল, সে দিন তাদের মনে রক্তের সঙ্গে কৃষি ফসলের সম্পর্কের জাদু বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পশুবলির সঙ্গে নরবলিরও ব্যবস্থা করেছিল। ধলভুমের অন্তর্গত যাদুগড়ায় মোলা > মহুলা > মহুয়া গাছের নীচে রঙ্কিনী দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি, জামালপুর থানার অন্তর্গত রক্ষিণী মহুলায় নরবলি ও মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রামে নরবলির যে ধর্মীয় কাহিনী গড়ে উঠেছে তার আদি বিশ্বাসের মূলে ছিল মাটির সঙ্গে নররক্তের (শ্রেষ্ঠ জীবের রক্ত) সংমিশ্রণে ক্ষেত্র উর্বর হয়ে উৎকৃষ্ট মানের শস্য উৎপাদিত হবে। হাণ্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ওড়িশায় খন্দ জাতি কর্তৃক তারিপেনু দেবীর উদ্দেশ্যে একসময়ে নরবলি দেওয়ার বিধি ছিল। প্রাচীন মিশরেও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলির দৃষ্টান্ত দেখা যায়,[২৪]— "The latter interpretation is supported by the tale that Isis placed the severed limbs of Osiris on a corn-sieve. Or more probably the legend may be a reminiscence of a custom of slaying a human victim, perhaps a representative of the corn-spirit and distributing his flesh or scattering his ashes over the fields to furtilise them." পরবর্তীকালে রাজার জীবন কামনা, সেতু নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, শত্রুবধ, জল-দেবতা ও মৃত আত্মার শান্তি বিধানের জন্যও নরবলি দেওয়ার প্রথা শেষঅবধি ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, শক্তি দেবীর নিকট বলিকৃত জীবগণের মধ্যে নরবলিই শ্রেষ্ঠ।

তাম্রাশ্মীয় যুগের মাতৃমূর্তি ও শিবলিঙ্গের মধ্যে আকৃতগত পার্থক্য বিশেষ নাই। সম্ভবতঃ পুরুষ ও প্রকৃতির পূজা পদ্ধতিতে এটিই প্রথম মূর্তিশিল্পের বিকাশ। মাতৃপূজা হতেই যোনি পূজার উদ্ভব হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীলের গর্ভদেশ থেকে নির্গত লতাকে শাকম্বরী বলে অনুমান করা হয়। মঙ্গলকোট থানার অধীনে মাঝিগ্রামে শাকম্বরী দেবীর পূজা হয় আষাঢ় নবমীতে এবং এই পূজা পদ্ধতি তন্ত্রাচারেই অনুষ্ঠিত হয়। যদিও তার সঙ্গে হর-পার্বতীর বিবাহ ঘটিত কিছু লোকাচারও বর্তমান। তন্ত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা সাক্ষাৎ ভগবতী এবং তাদের নৈতিক পদস্খালনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। কেতুগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, রক্ষিণীমহুলা, কাঞ্চননগর, দোনা, কালনা, বর্ধমান, কল্যাণেশ্বরী, চান্না, উজানী, শ্রীখণ্ড, বিল্বেশ্বর, উদ্ধারণপুর, চানক, সিঙ্গি, এরুয়ার,

আড়া, বোঁয়াই, মানকর, উষাগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গুহ্যভাবে তান্ত্রিক সাধনার পরিচয় মেলে। তবে কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রসাধনার নিমিত্ত আজও সাধকগণের আগমন ঘটে। তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতে মহাযানী বৌদ্ধদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও তন্ত্রকে প্রাচীন ধর্ম বলা যায়। তবে মহাযানী বৌদ্ধদের তন্ত্র সাধনার ধারা মধ্যযুগে হিন্দুতন্ত্র সাধনায় অনুপ্রবেশ ঘটে এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হলে তাদের তন্ত্রাচার পদ্ধতি হিন্দু তন্ত্র সাধনার সঙ্গে শেষ অবধি মিশে যায়। 'কুব্জিকা তন্ত্র' মতে বর্ধমান, অম্বিকা, ক্ষীরগ্রাম সিদ্ধপীঠরূপে প্রসিদ্ধ এবং মধ্যযুগের প্রথমভাগে রচিত তন্ত্রশাস্ত্র মতে ক্ষীরগ্রাম ও বহুলা (কেতুগ্রাম) শাক্তপীঠের মর্যাদা লাভ করেছে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশের পর বঙ্গদেশে তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রসাহিত্য রচনা বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভ করে এবং প্রাচীন সাধন পীঠগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে বিশেষভাবে কালীপূজার মাধ্যমে শাক্তধর্মের নূতন জোয়ার এসেছিল। মধ্যযুগের অপরার্ধে একদিকে যেমন গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, ঈশানকালী, রক্ষাকালী, জগদ্ধাত্রী সিদ্ধেশ্বরী, দুর্গা, বাসুলী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি মাতৃকাদেবীর তান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপাসনা শুরু হয়। অন্যদিকে মাতৃ নামমাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত শিব, কৃষ্ণ, দুর্গা, চণ্ডী, মনসা, কালী প্রভৃতি দেবীদের অবলম্বনে শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্য রচনা। বঙ্গভাষায় রচিত শাক্তগীতগুলিও তন্ত্র-সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত হয়েছিল। অম্বিকা কালনা নিবাসী সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (সাধনস্থল বর্ধমান শহরের অন্তর্গত বোরহাট) তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত শাক্ত-সঙ্গীতগুলিতে উচ্চ কবিমানসের ও দার্শনিকের পরিচয় মেলে।

বাংলায় বৈদিক আর্যধর্ম কোনদিন সমাদৃত হয় নাই। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তথা পঞ্চোপাসনার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এ সময়ে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতির পূজা সমাদৃত হলেও পৌরাণিকধর্ম বিশেষভাবে যে সমাদৃত হয়েছিল তেমন প্রমাণ বর্তমান ; বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত মূর্তি কয়েকটিতে এই প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। পালযুগে নির্মিত বিষ্ণু-বাসুদেব ও লোকেশ্বর বিষ্ণুর বেশ কিছু মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয়, বর্ধমানে ঐ সময়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব কিন্তু মোটেই হ্রাস পায় নাই। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে যে লৌকিক ধর্মের প্রচলন হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে ঐসব লৌকিক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি সারা বর্ধমানে একদা সমাদৃত হয়েছিল। এ বিষয়ে লৌকিক দেবতাদের মধ্যে এ জেলায় মনসা ও ধর্মরাজের পূজার ব্যাপকতা প্রচুর। পৌরাণিক চণ্ডীদেবী শেষ অবধি লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়ে ওলাইচণ্ডী, শাকম্বরী, মুড়াই-চণ্ডী, চামুণ্ডা, ঘাঘরাচণ্ডী, বোঁয়াইচণ্ডী, জয়দুর্গা, রঙ্কিণী, কঙ্কালেশ্বরী, গৌরচণ্ডী, যোগাদ্যা প্রভৃতি নামে পূজিত হন। শিব আর এখানে শুধু অনাদিলিঙ্গ শিবই নন,

কোথাও তিনি হয়েছেন বুড়োরাজ, কোথাও বা পঞ্চানন আবার কোথাও তিনি বুড়োশিব। পৌরাণিক বলরাম বর্ধমানের মাটিতে কৃষি দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে নারদীয় পঞ্চরাত্র বর্ণিত ব্যূহপূজার বিধানকেও ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

১৫১১ খ্রীস্টাব্দে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যদেব এক অভিনব প্রেমধর্মের সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল ভাবাবেগপূর্ণ ভক্তিবাদ ও ঈশ্বর প্রেম এবং এটি কিশোর কৃষ্ণ, তাঁর সঙ্গী ব্রজ-বালক ও গোপিণীগণ এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা, যাদের কেন্দ্র করে স্ফূর্ত হয়েছিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পুরী গমন করেন এবং সেখানে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদি পার্ষদগণ ও ভক্তজন সর্বসমক্ষে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন।[২৫] শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম হল গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, কুলিনগ্রাম, বাঘনাপাড়াকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে। উদ্ধারণ দত্ত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও গৌরী দাস যথাক্রমে উদ্ধারণপুর শীতলগ্রাম ও অম্বিকায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। নরহরি সরকার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের নেতৃত্বে বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে, রামানন্দ বসু দক্ষিণ বর্ধমানে ও রামচন্দ্র পূর্বাংশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একাজে জাহ্নবাদেবী, বীরচন্দ্র ও অভিরাম গোস্বামীর প্রভাব যে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নাই। এছাড়া, অগ্রদ্বীপ, কাঁদড়া, বেগুনকোলা, কুলাই, ঝামটপুর, বড়বেলন, কাঞ্চননগর, মানকর, পালশিট, নোতা, দক্ষিণখণ্ড প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতক হতে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্ধমান জেলায় সাড়ম্বরে পূজা পদ্ধতি প্রচলনের প্রমাণ মিলছে। নরহরির অনুপ্রেরণায় শ্রীখণ্ড, কাটোয়া ও কুলাই-এ সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও বড়-ডাঙ্গা, বৈরাগ্যতলা, অগ্রদ্বীপ, বাঘনাপাড়া ও কুলীনগ্রামে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত বৈষ্ণব সমবেত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, খেতুরীর মহোৎসবের পূর্বেই গৌরাঙ্গমূর্তিগুলির মধ্যে দুটি বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাহেবধনী নামক এক লোকধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্ধমানে দেখা যায়। "যাদের (সাহেব ধনীদের) সাধারণ আদর্শ ছিল পরিত্রাতা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর উদার বৈষ্ণব মত, যাদের ধর্ম সাধনায় কম বেশী প্রভাব পড়েছিল সুফীতত্ত্ব ও ইসলামী বিশ্বাসের, যাদের আচার ও শাস্ত্রদ্রোহে স্পষ্টত বাউলমতের সংক্রমণ ছিল।" প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে বারুণী মেলার সময় সাহেবধনীদের বিশাল সমাবেশ ও মহোৎসব হয়ে থাকে।[২৬] এছাড়া রায়না থানার অন্তর্গত জামদো গ্রামে 'নরেশপন্থী' ও উচালনে 'কেউড়দাস' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। বর্তমানে এদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ এরা কর্তাভজাদের কোন উপ-গোষ্ঠী ছিল।[২৭]

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বর্ধমানের অবদান,

অগ্রগণ্য এবং এ সম্পর্কিত আলোচনা সাহিত্য অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই সময়ে ভগবৎভক্তিবিষয়ক লীলাকীর্তনের প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়, যার শ্রেষ্ঠ ঘরনা-গুলির উদ্ভবস্থল ছিল বর্ধমান। লীলাকীর্তনে নিজস্ব ধারা ও শ্রেষ্ঠ ঘরানাগুলির মধ্যে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন ছিল শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশ এবং অন্যান্য ঘরানা হতে এর একটা পৃথক আভিজাত্য ছিল। আর কিছুটা হালকা ধরনের কীর্তনগান 'মনোহরশাহী' কীর্তন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ যার প্রচলন আজও দেখা যায়। সম্ভবতঃ শ্রীখণ্ডের উত্তরে মনোহরশাহী পরগণার (বর্তমান কেতুগ্রাম থানা) জ্ঞানদাস-কাঁদড়া ও কুলাই-এ এ ধরনের লীলাকীর্তনের উদ্ভবস্থল হিসাবে মনোহরশাহী ঘরানার নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও বীরভুমের পূর্বাংশে এই কীর্তনের ধারা আজও বলবৎ আছে। বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলে রানীহাটী পরগণার অন্তর্গত কুলীনগ্রামের সেন ও বসুপরিবারে লীলাকীর্তনের চর্চা ছিল, যা 'রেনেটি ঘরানা' নাম পরিচিত। দেবীপুর নিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেনেটি কীর্তনের প্রবর্তক। বাঙলাদেশের মধ্যে খেতুরী, গরাণহাটা ও মান্দারনী লীলা-কীর্তনের প্রচলন ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হলেও শ্রীখণ্ড ও মনোহরশাহী ঘরানা আজও টিকে আছে। উভয় ঘরানার সমন্বয় দেখা যায় কাটোয়ার কীর্তনের আখড়া-গুলিতে এবং এরও প্রসিদ্ধি বহুকালের।

শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচলে অবস্থানকালে লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধি বহু সূত্র হতে জানা যায়। নবদ্বীপে কীর্তনগানের সময় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন তা একটা কীর্তনগান হতে বোঝা যায়, (সহকর্মী গৌতম মল্লিকের নিকট প্রাপ্ত) যথা—

'দক্ষিণেতে নরহরি বামে গদাধর।
শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥'

লীলাকীর্তনে শ্রীখণ্ডের নরহরি সম্প্রদায় যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়ে নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, লোচনানন্দ দাস (চৈতন্য মঙ্গলের রচয়িতা) ও চিরঞ্জীব সেন কর্তৃক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়ে রথের অগ্রবর্তী ভাগে লীলাকীর্তনে অংশগ্রহণে অধিকার লাভের প্রসঙ্গ হতে। এ কথার সমর্থন মেলে 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে। এ যুগে বঙ্গদেশের সব কয়টি ঘরানার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়ক ছিলেন, 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীখণ্ডবাসী স্বর্গীয় গৌরগুনানন্দ ঠাকুর।[২৮]

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমপাদে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া জয়ের পূর্বে আরবের সুফী ও সাধুসন্তদের দৃষ্টি বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক স্তরে উচ্চবর্ণের অধিপত্য, ধর্মের নামে কুসংস্কারের অবিরত প্রশ্রয়ের ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘাত যেমন ধর্মীয় কলহের রূপ নিয়েছিল অনুরূপভাবে বর্ণবিন্যাসের নামে নিম্নবর্ণের লোকেরা

সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে সেনআমলে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা জীর্ণ হতে জীর্ণতর হওয়ায় সেই সুযোগে পীর ও সূফীগণ তাদের সেবাধর্মের প্রলেপ দ্বারা বাংলার জনগণকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শেখ শুভোদয়' গ্রন্থে বর্ণিত শেখের পুরো নাম জালালউদ্দিন মখদুম শাহ, তাব্রেজী। জালালউদ্দিন প্রচুর অর্থসহ গৌড়ে এসেছিলেন এবং লক্ষ্মণসেনের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। এই বিপুল অর্থের একাংশ দিয়ে বাইশ হাজার টাকার আয়ের এক জমিদারী ক্রয় করেন। জমিদারীটির মূল অংশ ছিল বর্ধমান জেলায়।[২৯] জালালউদ্দিন বা মখদুম পীর তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে বহু লোককে যে বশীভূত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা'হলে জালালউদ্দিনই ছিলেন বর্ধমানে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রচারক।

১২০২ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া জয়ের পর ইসলাম ধর্ম এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় গৌড়ের সুলতানদের সহায়তায়। মঙ্গলকোটের অষ্টাদশ গাজীর কাহিনী ও সুয়াতায় বহমন পীরের কাহিনী থেকে সমরাভিযানের কথাই সমর্থন করছে। মঙ্গলকোটে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন পীরের নামও জানা যায়, যথা—শাহ্ সুলতান আনসারী (মদিনা), শাহ্ আবদুল্লাহ গুজরাটী (গুজরাট) রাহী পীর (সমরখন্দ—প্রকৃত নাম হজরৎ মখদুম শাহ মহম্মদ গজনভী)। রাহী পীরের সময়ে রাজা বিক্রম কেশরী সম্পর্কিত এক কাহিনী গড়ে উঠেছে। বদরউদ্দিন বদরে আলম (বিহার) কালনায় এসে খানকা নির্মাণ করেন এবং তাঁর সহকারী শাহ্ মজলিস কালনায় ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত এসেছিলেন। কালনায় মজলিস দীঘি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি মজলিস শাহের সেই স্মৃতিকে আজও ধরে রেখেছে। মোঘল আমলে বর্ধমানে পীর বহরম সক্কা, খক্কর সাহেব, মঙ্গলকোটে দানেশ মন্দ বাঙালী ও কাটোয়ায় আলম শাহ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৩০] আজও তাঁদের মাজার ও মসজিদকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ অঞ্চলসমূহে মুসলমানগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যেসব স্থানে বসবাস শুরু করে, তার মধ্যে মঙ্গলকোট, সুয়াতা, চুরুলিয়া, কালনা, কাটোয়া, কুলুট, কেতুগ্রাম, মেমারী (মহম্মদপুর), বোহার, খণ্ডঘোষ, জামালপুর, সেলিমাবাদ, কুসুমগ্রাম, শাঁকাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহরম সক্কার উদার মতের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত একটি দেওয়ানাতে—

"বেহারামে কাঁহা বুহদে সুহুরা দারে মাকায়ে বি হাইলাহু য়ায়াকে
বুহুদা এলমে এলমে দীনে ওয়াদানি ইয়া নাখু নাদাহুস সাবাক
দ্বারনা সাদ ওফাওনাত বেরফাত আজ এলমে দ্বার কাশুরে ?
যা খায়ামাত উনসাবের ইয়াকত তাইয়া সাদ ওয়াসাল হাক্।"[৩১]

বর্ণহিন্দুগণ ইসলাম ধর্মকে প্রীতির চোখে না দেখলেও পীর ও সুফীরা সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে কিন্তু শ্রদ্ধা হারান নাই। আজও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পীর বহরাম, পীর পাঞ্জাতন, পীর গদাই সাহেব, খক্কর সাহেব,

মজলিস শাহ, বদরপীর, দানেশমন্দ বাঙালী, বহমন শাহ প্রভৃতি সাধুসন্তদের উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অর্ঘ নিবেদন করে থাকেন। আবার পীরতলা হতে জল-পড়া নিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোন আপত্তির কারণ থাকে না। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ এখানে এক ও অভিন্ন। যে কোন বর্ধিষ্ণু মুসলমান গ্রামের প্রান্তবর্তী অংশে কোন কোন বৃক্ষতল পীরতলা নামে খ্যাত এবং তথায় মানতের নিমিত্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে সমবেত হন এমন উদাহরণ বর্তমান।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হতে এই জেলায় খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার শুরু হয়েছিল জেলার সদর শহর বর্ধমানে। তারপর রেলপথ স্থাপনের পর বর্ধমান, রানিগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে দেশী ও বিদেশী খ্রীস্টানদের বসবাস শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বর্ধমান শহরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীস্টান ধর্মমত প্রচার শুরু করেন এবং তিনি বর্তমান সাধনপুরের সন্নিকটে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে একখণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে একটি গির্জা স্থাপন করেন। বর্ধমানের গির্জাটি 'Church of England'-এর অধীনস্থ ছিল। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও রেভাঃ ওয়েটব্রিক্‌-এর অদম্য উৎসাহে বর্ধমানে 'Church Missionary Society'-এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই কার্যে তাঁরা রেভাঃ জে. পেরিনকে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন। এই মিশনের কার্যক্রম অবশেষে কালনা, কাটোয়া ও রানিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলেও পাদ্রীগণ যীশুখ্রীস্টের বাণী ও ধর্মান্তরকরণের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করত এবং সময়ে সময়ে পাদ্রীদের নিগৃহীত হওয়ার কাহিনীও জানা যায়। শহরাঞ্চল ব্যতীত খণ্ডঘোষ, কোটালপুর, সাহেবগঞ্জ, সেলিমবাদ প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলেও মিশনারীদের কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও মিসেস পেরিন বর্ধমানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; কিন্তু বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার সময় পাদ্রীরা শহর ত্যাগ করায় অনাথ আশ্রমটি আগরপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এককথায় বর্ধমানের গির্জাটি ছিল, 'one of the best organised mission churches in Bengal'. ম্যালেরিয়া জ্বরের সময় বেশ কিছুকাল বর্ধমানে পাদ্রীদের কার্যকলাপ বন্ধ থাকার পরে ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে আসানসোলে সর্বপ্রথম রোমান ক্যাথলিক মিশনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ সময়ে মহারাজা মহতাব্‌ চাঁদের আনুকুল্যে কার্জন গেটের কাছে বর্ধমান শহরে গির্জা ও সেইসঙ্গে এক কিলোমিটার দূরে কবরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে 'Sacred Heart Church'-এর অধীনে বর্ধমান, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, সাহেবডাঙ্গা, কালনা, লুটো, অণ্ডাল, কুলটি, বার্ণপুর প্রভৃতি স্থানে গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে শহরাঞ্চল ব্যতীত ৩টি উপকেন্দ্র ও ৮টি মিনি কেন্দ্রের অধীনস্থ নব্বইটি গ্রামে মিশনারীদের কার্যপদ্ধতি চালু আছে এবং এই জেলার খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে অধিকাংশই সাঁওতাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যা।[৩২]

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের পূর্বে বর্ধমানে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল

সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। জাতক কাহিনী অনুসারে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচারের জন্য শ্বেতক ও দেশক নগরে এসেছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ঐ নগর দুটি ছিল বর্ধমানে এবং সম্ভবতঃ যা ছিল সুয়াতা ও দিয়াসা গ্রামের পূর্বনাম। তবে এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ডঃ পুষ্প নিয়োগীর মতে স্থান দুটির অবস্থান ছিল রাঢ়ে বা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে।[৩৩] ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপ, তুলাক্ষেত্র বর্ধমানস্তূপ ও ধর্মরাজিকস্তূপের অবস্থিতির বর্ণনা হতে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্ধমান জেলায় এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ৭ম শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অবস্থিতি ছিল পাশাপাশি। বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে গেলেও ধর্মপূজা, প্রজ্ঞাপারমিতার পূজো, দশহরা, রঙ্কিনী, কালারুদ্রদেব, কঙ্কালেশ্বরী, ভৈরব-শিব প্রভৃতি পূজার্চনায় বৌদ্ধধর্মের ইঙ্গিত বহন করছে। শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তিগুলিকে দেখে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগে বুদ্ধমূর্তি পূজিত হত। বর্ধমানে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে সেটি তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে বলে অনুমান।

পূর্বেই বলা হয়েছে বর্ধমান বা রাঢ়ে আর্যধর্ম প্রবেশ করেছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। প্রাচীনকালে জৈনধর্ম ছিল এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ধর্ম। 'আচারঙ্গসূত্র' ও 'কল্পসূত্র' থেকে প্রাক-জৈনধর্ম সম্পর্কে অনুমান করা যায় এবং হয়ত সেজন্যই জৈনধর্ম ও আর্য সভ্যতার বিস্তার প্রসঙ্গে পূর্বভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৈদিক ধর্ম ও আর্য সভ্যতার প্রভাব অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধে বিস্তার লাভে সক্ষম হয় নাই এবং এই অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্কর ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকরা সহজেই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। তাই লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্মের প্রভাব নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। "এই স্থানের অবৈদিক কৌমের লোকেরা নিজেদের নরতাত্ত্বিক ধর্ম (Anthropological Religion) অর্থাৎ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আদিম অবস্থা থেকে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতি বিবর্তিত হয়ে থাকে, তাকে ভিত্তি করে একটা লৌকিক ধর্ম ও আচার উদ্ভাবন করেছিল। তাদের এই নরতাত্ত্বিক অর্থাৎ জাতিগত ধর্মে আদিম অবস্থাসুলভ অর্থাৎ জন্তু, গাছকে পূর্বপুরুষ বলে বিশ্বাস, জাদু ও ডাইনীতে বিশ্বাস, গাছ বা সর্পপূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও তদানুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির অভিব্যক্তি ঘটেছিল।" অনেক ধর্মপূজা বা গাজন অনুষ্ঠানকে বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎপন্ন বলে মন্তব্য করলেও ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত এটাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নাই। তাঁর মতে এগুলি 'ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ান' হতেও উদ্ভূত হতে পারে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—"বৌদ্ধেরা আদিম জাতিগুলোর ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি 'লৌকিক ধর্ম' বলে স্বীয় পন্থাতির মধ্যে জীর্ণীভূত করে নিয়েছে।" এবং বৌদ্ধদের অনুকরণে ব্রাহ্মণেরাও লৌকিক ধর্মের প্রতি উদারতা দেখিয়েছে। লৌকিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার পিছনে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম দিকে দেখা যায়

যে, অভিজাত শ্রেণীরা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠে। যার ফলস্বরূপ শ্রেণী সংগ্রাম ধর্মসংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং মুসলমান যুগের প্রথমার্ধে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

জৈনধর্ম প্রসারের পর রাঢ়কে পুণ্যভূমিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বে গোসাল মঙ্খলীপুত্র এখানে আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। রাঢ়ের অন্তর্গত বজ্রভূমিতে (বা পনিত ভূমিতে) বর্ধমান ও গোসাল নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, যার ফলে এই প্রতিযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং সেই স্থলে জৈনধর্ম জয়ী হয় বলে মনে করা যেতে পারে। এইজন্যই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে এ দেশের বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে এমন নীরব এবং জৈন সাহিত্য এ দেশের আর্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এরূপ সচেতন।[৩৪]

ভগবান মহাবীরের কৈবল্য লাভ ঘটেছিল বর্ধমানের মাটিতে এবং সম্ভবতঃ বর্ধমান মহাবীরের নামেই জনপদটি বর্ধমান নামে পরিচিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়রা, তেলকুপী পাকবিরা ও বরাকরে একদা জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও পুরুলিয়া, বর্ধমান ও ধানবাদ অঞ্চলের সরাক জাতি জৈনধর্ম ও সরাক সংস্কৃতিকে তাদের নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বজায় রেখেছে। সরাকগণ ছিল কুশলী ভাস্কর এবং তারা এই অঞ্চলে কারুকার্য খচিত মন্দির ও সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি।[৩৫]

অম্বিকা-কালনার অম্বিকা সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে, আদিতে অম্বিকা ছিলেন জৈনদেবী এবং মনে হয় তাঁর নামানুসারেই স্থানটি 'অম্বিকা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে।[৩৬] সাতদেউলিয়ার বিখ্যাত দেউলটি আনুমানিক দশম শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর জৈন মূর্তি। বর্ধমান জেলায় প্রাচীন জৈনধর্মের নিদর্শনস্বরূপ পার্শ্বনাথের মূর্তি, শান্তিনাথের মূর্তি, বর্ধমান মহাবীরের মূর্তি, সিংহলাঞ্ছন, নৌপজ্জী মূর্তিও বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। বরাবনি থানার কেলেজোড়া গ্রামে দশম শতকের ঋষভনাথের প্রস্তর নির্মিত একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে (চিত্র প্রথম খণ্ডে)। রাঢ় অঞ্চলে এককালে প্রধান ধর্মরূপে পরিগণিত হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান ও সাড়ে চারশ বছরের পাল রাজত্ব ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের ফলে জৈনধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের মন্দির ও দেবদেবী সম্পর্কে অন্যতম গবেষক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—[৩৭]

'In spite of this early hold on the primitive peoples of Bengal whom it firmly placed on the Aryan road to progress and civilization Jainism through a curious stroke of destiny, disappeared completely from its erstwhile seat of influence and power and has not been heard to as a religious force in this part of the country since about the 12th century A. D.'

কিন্তু আক্ষরিক অর্থে জৈনধর্ম একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নাই অর্থাৎ তার সার অংশটুকু হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। কারণ আজও হিন্দুধর্মের দেব ভাবনার সঙ্গে আদিম মানবগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মিলিত রূপেই বহু হিন্দু দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। রায়না থানার একলাকী গ্রামে 'শান্তিনাথ' শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলকোট থানার বাবলাডিহি গ্রামে জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ 'ন্যাংটেশ্বর' শিবরূপে পূজা পাচ্ছেন।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার চলেছিল সে সময়ে বর্ধমানেও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সূত্রপাত ঘটে। তবে বর্ধমানের সাধারণ লোকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। মহারাজা মহতাব্ চাঁদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। মহর্ষির আত্মচরিতে আছে—'গত ৩০শে আষাঢ় (১৭৭৩ শক) রবিবার বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ চাঁদ নিজ বাটিতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।' অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই বর্ধমানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহতাব্ চাঁদ 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সদস্যও ছিলেন। আফতাব্ চাঁদ ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিজয়চাঁদও কিছু দিন বিজয়ানন্দ বিহারে উপাসনা করতেন। পরে রাজবাড়ীতে ব্রাহ্ম উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়।

উপাসনালয় ঃ

ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ধর্মস্থানগুলি জড়িত। দেবালয়, স্তূপ, দেউল, মসজিদ, মাজার, সমাধিগৃহ, মিনার, দেব-লাঞ্ছন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার একটা সুদূরপ্রসারী অথচ সুগভীর সুসম্পর্ক আছে। মন্দির বা মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যবোধের সমন্বয়সাধন করা সম্ভবপর হয়েছে। হিন্দুধর্মে দেবভাবনায় মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হলে দেবায়তন নির্মাণের প্রশ্ন দেখা দেয়। হিন্দুরা তাই মনে করেন,[৩৮]—'**There is no space which is not pervaded by God. Temples are the abode of wisdom, and are, therefore, the worthiest place of worship. Worshipping Gods in temples infuses into our mind a feeling of disunity.**' অনুরূপ উল্লেখ মসজিদ লিপিতেও পাওয়া যায়,—'আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলে তিনি নির্মাতার জন্য স্বর্গ বাসের ব্যবস্থা করবেন।' সমাজের বিবর্তন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবায়তন বা মন্দির গঠনের ক্ষেত্রে শিল্পনৈপুণ্য, গঠন, আকৃতি, অলঙ্করণ, উপযোগিতা ও সময় বা কাল নিরূপক তারিখ প্রভৃতি বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অনেকে মনে করেন যে, কেবলমাত্র শিল্পীরাই মন্দির নির্মাণকার্যের প্রকৃত স্রষ্টা। শিল্পীরা তো সকল কালেই স্রষ্টার আসন গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু মন্দির পরিকল্পনার রূপকার বা স্থপতিরা অধিক কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প

শাস্ত্রে মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির কলাকৌশল যে বর্ণিত হয়েছে, তেমন উদাহরণের অভাব নেই। 'মৎস্যপুরাণে, (২৫২-২৭০ অধ্যায়) বাস্তু, প্রাসাদ, মন্দির, মণ্ডপ ও পীঠিকা নির্মাণের কলাকৌশল সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। 'বৃহৎসংহিতায়' মন্দির নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে স্থান-নির্বাচন, পরিমাপ, অলঙ্করণ ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এইসব প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা থেকে দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণের কলাকৌশল বিষয়ে স্থপতিদের কুশলতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।

জেলার দেবায়তন প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে আলোচনায় এলে দেখা যায়, সম্ভবতঃ গুপ্ত-যুগে বর্ধমানে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কালের করাল গর্ভে মন্দিরগুলি বিলুপ্ত হলেও পাথরে খোদিত দেবমূর্তিগুলি সেসব প্রাচীন দেবায়তন প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ প্রমাণ। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল লিপিতে আবসথিকও দেবদ্রোণী উপাধিধারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ মন্দির, প্রাসাদ, বিশ্রামগৃহ, অফিসগৃহ ও বিশাল পুষ্করিণীর তত্ত্বাবধানে যে নিযুক্ত ছিল, এমন বর্ণনা রয়েছে।[৩৯] সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রাচীন শিখর দেউলের অস্তিত্ব আছে বর্ধমান জেলার বরাকরে (বেগুনিয়া)। পাথরের তৈরী বেগুনিয়ার ৪নং মন্দিরটি ৮ম শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং এটির নির্মাণকৌশল ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়।[৪০] এরপর ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ, সাতদেউলিয়ার পঞ্চরথাকৃতি শিখর দেউল প্রভৃতি জেলার প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একাদশ শতকে ইন্দ্রাণী পরগণায় (দাঁইহাটের সন্নিকটে) প্রস্তর নির্মিত ইন্দ্রেশ্বর শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখে অনুমান করা যায় যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এই মন্দিরটিও ছিল অতুলনীয়।[৪১] এছাড়া মধ্যযুগের প্রথমভাগে নির্মিত মন্দিরগুলিও ছিল প্রস্তর নির্মিত, যথা, গরোনির মন্দির, রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির, গরুই, খুদিকা, এথোরা, ছোট দিঘরী, কুমারডিহি, দেবীস্থান, পুঁচরা ইত্যাদি স্থানে। প্রতিষ্ঠা-তারিখ সমন্বিত ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এই জেলার সর্বপ্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বরাকরের ১, ২ ও ৩ নং মন্দিরগুলির। সরসী কুমার সরস্বতী ঐ মন্দিরগুলি ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়েছিল[৪২] বলে মন্তব্য করলেও মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠিত খোদিতলিপি হতে জানা যায়, ১৩৮৩ শকাব্দে (১৪৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) স্থানীয় ভুস্বামী হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। লিপিটি হল নিম্নরূপ ঃ[৪৩]

"ওঁ॥ শাকে নেত্র বসুত্রিচন্দ্র গণিতে
পুণ্যে বুধাহেতিথাবষ্টম্যাং
রুচিরং প্রতিষ্ঠাতাবতী পক্ষোসিতে ফাল্গুনে।
ঐশমূ দেবকুলমূ যথাবিধি
হরিশচন্দ্রস্য ভুরিশ্রিয়ো ভুশক্রস্য
হরিপ্রিয়া প্রিয়তমা উচ্চঃ ফল প্রাপ্তয়ে।"

মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ইঁটের তৈরী যে মন্দিরগুলি এখনও অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী হল, কুলিনগ্রামের মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খানের প্রতিষ্ঠিত চারচালা শিবমন্দিরটি। শিবমন্দির ও বৃষের গলদেশে খোদিত লিপি থেকে জানা যায়—[৪৪]

'শকে বিংশতি বেদৈকে মুক্ত্যর্থং শিবসন্নিধৌ।
খান শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং শিলা বৃষঃ॥
নেপালেন বিনির্ম্মিতঃ।'

অর্থাৎ এই মন্দির ও বৃষ প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪২০ শকাব্দ=১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে। দেনুড়ের প্রাচীন মন্দিরটি বৃন্দাবন দাসের সমকালীন বলে দাবি করা হয়। ষোড়শ শতকে নির্মিত অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে বৈদ্যপুরের দেউল (১৫৯৮ খ্রীঃ), আমাদপুরের গোপালমন্দির (১৫৭২ খ্রীঃ), মানকরের দেউলেশ্বর শিবমন্দির, দেবীপুরের কৃষ্ণমন্দির (১৫৯৮ খ্রীঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন যে কয়েকটি মন্দির দেখা যায় সেগুলির স্থাপত্য নিদর্শন বা গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে, এই মন্দিরগুলি ষোড়শ শতকের পরে নির্মিত হয় নাই এবং এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—এড়ুয়ারের মন্দির, এথুরার কালীমন্দির, পাণ্ডবেশ্বরের শিবমন্দির, ইছাইঘোষের দেউল, কল্যাণেশ্বরীর ত্রিরথাকৃতি পাথরের মন্দির। এছাড়া দেউলে, গণরুই, পিপলুন, বড়বেলুন, কাইতির মন্দির এবং দাঁইহাটের পরিত্যক্ত শিবমন্দির প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ষোড়শ শতকের শেষভাগ হতে বর্ধমানে দেবভাবনায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও পরম বৈষ্ণবজনেরা বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ ও কুলিনগ্রামের মন্দিরগুলি প্রাচীনত্বের দাবী করলেও শ্রীখণ্ড ও অগ্রদ্বীপে প্রাচীন কোন মন্দিরের অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। গোপাল মন্দির সম্ভবতঃ রামানন্দ বসু কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। নির্মাণকৌশল ও প্রাচীনত্বের দিকে বাঘনাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির (১৬১৬ খ্রীঃ), দোগাছিয়ার গোপীনাথ মন্দির (১৬৫৪ খ্রীঃ), গোতানের বিশালাক্ষী মন্দির (ভগ্ন), রাইগ্রামের বিষ্ণুমন্দির, উখরার শ্যামরায় মন্দির (১৬৮৬ খ্রীঃ), শাঁখারীর গোবিন্দ মন্দির (১৬৭৩ খ্রীঃ), রূপসার শ্রীধর মন্দির, জোগ্রামের রাধাকান্ত মন্দির, কুমারডিহির শিব মন্দির (১৬৬১ খ্রীঃ), শীতলপুরের শিবমন্দির (কুলটি থানা), বনপাসের বুড়োশিবের মন্দির, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরের সন্নিকটে পরিত্যক্ত বিষ্ণুমন্দির, মুলগ্রামের রাধাকান্ত মন্দির (১৬৯২ খ্রীঃ), মানকরের শিবমন্দির, পুটশুরির জোড়া শিবমন্দির, ওরগ্রামের জোড়া শিব মন্দির, সিঙ্গারকোনের রাধাকান্ত মন্দির, ছোটদিঘরীর (হিরাপুর) রঘুনাথ মন্দির, ভৈটার মদনগোপাল মন্দির, হাট গোবিন্দপুরের শ্রীধর মন্দির, বৈদ্যপুরের জোড়া শিবমন্দির, বাহাদুরপুরের রঘুনাথ মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান রাজবংশ কর্তৃক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনী জানা যায়। বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্রবধূ ব্রজকিশোরীর অনুপ্রেরণায় ১৬৮০ শকাব্দ বা বাংলা ১১৬৫ সালে (১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ), কালনায় গিরিধারী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালিপিতে কৃষ্ণরাম, জগৎরাম, কীর্তিচাঁদ, মিত্রসেন ও গৃহবধূ ব্রজকিশোরী ও ত্রিলোকচাঁদের নাম খোদিত আছে দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতক হল বর্ধমানের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ৬১টি পরগণার অধিকারী চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদ রায়ের (১৭০২-৪০ খ্রীঃ) স্থৈর্য, বিচারবুদ্ধি, সাহস ও কর্মদক্ষতার গুণে বর্ধমান সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এগার বছর ব্যাপী মারাঠা আক্রমণের ফলে বর্ধমান শ্মশানে পরিণত হলেও ত্রিলোকচাঁদ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের ন্যায় কর্মকুশলতার গুণে পুনরায় বর্ধমানের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর মীরকাশিম কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চাকলা বর্ধমানের জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করায় এই রাজবংশ ও জনপদ উভয়ই হতশ্রী হয়ে পড়ে। ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের করাল থাবা বর্ধমানের আর্থিক বনিয়াদকে পঙ্গু করে দিলেও ত্রিলোকচাঁদের পত্নী মহারানি বিষণকুমারীর যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার গুণে বর্ধমান তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

অষ্টদশ শতকে বিষ্ণুপুর ঘরানা ক্রমশঃ অবনতির দিকে এবং এই সময়ে কীর্তিচাঁদের ন্যায় সুদক্ষ জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের শিল্পীগণ বিভিন্ন ধরনের মন্দির নির্মাণে উৎসাহিত বোধ করেন। কীর্তিচাঁদের আমলে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল।[৪৫] বর্ধমান শহরে বাঁকা নদীর তীরে সর্বমঙ্গলার মন্দির কীর্তিচাঁদের অপর এক প্রধান কীর্তি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মন্দির প্রতিষ্ঠার কোন তারিখ নাই। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে মাতা ব্রজকুমারীর নামে তাঁর আরাধ্য দেবতা লালজীর পঁচিশ রত্নবিশিষ্ট মন্দিরটি কালনায় নির্মিত হয়েছিল। কীর্তিচাঁদের পর চিত্রসেন ও ত্রিলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার বর্ধমান ও কালনা শহরে দুটি মন্দির চত্বর (Temple Complex) গড়ে ওঠে। তুলনামূলকভাবে কালনার মন্দির চত্বরটি সুবিন্যস্ত এবং সেটির প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, রাজবাড়ী প্রাঙ্গণটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এই মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা।

অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বর্ধমানের মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—কালনার লালজী (১৭৩৯ খ্রীঃ), সিদ্ধেশ্বরী (১৭৪১ খ্রীঃ), অনন্তবাসুদেব (১৭৫৪ খ্রীঃ), কৃষ্ণচন্দ্র (১৭৫৩ খ্রীঃ), বর্ধমান শহরে সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে শিবমন্দির সমূহ, বৈদ্যপুরে শিবমন্দির (১৭৫৩ খ্রীঃ), বৈকুণ্ঠপুরে গোপেশ্বর শিব (১৭৩২ খ্রীঃ), রামগোপালপুরের লক্ষ্মীজনার্দন (১৭২৬ খ্রীঃ) ও বিশ্বেশ্বর শিব (১৭২৬ খ্রীঃ), উখরার সীতারাম (১৭৪০ খ্রীঃ), শাঁকারীর শিব (১৭৬১ খ্রীঃ) ও সিংহবাহিনী

(১৭৬২ খ্রীঃ), রায়পাড়া গ্রামের শিব (১৭৯৫ খ্রীঃ), গ্রাম কুলটির শিব (১৭৬০ খ্রীঃ), খণ্ডঘোষের শিব (১৭৯৫ খ্রীঃ), আবাপুরের শিব, সাদিপুরের মদনগোপাল, সীতাহাটীর শিবমন্দির (১৭৬০ খ্রীঃ), বাহাবপুরের শ্যামরায় (১৭৬৫ খ্রীঃ), গড়বাটিপাড়ার গোপীনাথ (১৭৭২ খ্রীঃ), জোগ্রামের শিব (১৭০৯ খ্রীঃ), গোতানের সিংহবাহিনী (১৭৬২ খ্রীঃ), জাবুই-এর হরগৌরী (১৭২৬ খ্রীঃ), কামারপাড়ার শিব (১৭১০ খ্রীঃ), খাঁদরার রাধামাধব (১৭২১ খ্রীঃ), পুতুণ্ডার দামোদর (১৭৪৯ খ্রীঃ), বামনপাড়ার রাধাগোবিন্দ (১৭৪৯ খ্রীঃ), বড়বৈনানের বিষ্ণু (১৭৩৮ খ্রীঃ), সগরডাঙ্গার ভৈরব শিব (১৭৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া জেলার বিভিন্ন অংশের অসংখ্য মন্দির এই শতকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরগুলির মধ্যে কাব্যাকারে চার পুরুষের বংশলতিকা খোদিত আছে কালনার অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে। লিপিটি এরূপ ঃ—

"রসাব্দি রস-চন্দ্রাঙ্ক গণিতে অব্দে শকাবধি।
চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মন্দিরম্ সুমনোহরম্ ॥
জগদ্রায়স্য মহিষী কৃত্তিচন্দ্র-নৃপপ্রসূঃ।
শ্রীশ্রীত্রিলোকচন্দ্রস্য নৃপতের্যা পিতামহী ॥"

তুলনামূলকভাবে বিচার করলে সংখ্যাধিক্যের মাপকাঠিতে শিবমন্দিরের স্থান সর্বপ্রথম। বর্ধমান জেলার দুটি শিবক্ষেত্রে ১০৯টি করে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, যার অস্তিত্ব সারা পশ্চিমবঙ্গে অপর কোন স্থানে নাই। রানি ভবানীর পর বঙ্গদেশে মহিলা জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত মহারানি বিষণকুমারী, যিনি বুদ্ধিবলে ওয়ারেন হেস্টিংস, নবকৃষ্ণ মুন্সী, গঙ্গগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষণকুমারী কর্তৃক বর্ধমান শহরের অনতিদূরে নবাবহাট পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ১০৯টি শিবমন্দিরের (যদিও ১০৮ শিবমন্দির ক্ষেত্ররূপে পরিচিত) শিলালিপিতে মহারাজা তেজচন্দ্রের জননীরূপে উল্লিখিত আছে ঃ—

'শাকে শূন্য-শশাঙ্ক-শৈল-কুমিতে নির্ম্মায় রাধাহরি—
প্রীত্যৈ পুন্যবতী নবাধিকশতং শ্রীমন্দিরাণি স্বয়ম্।
ধীর-শ্রীযুততেজচন্দ্র-ধরণী ধৌরেয় চূড়ামণে—
র্মাতা তৎসবিধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্থাপয়তু ॥'

১৭১০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীমন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শিবক্ষেত্রটি মহারাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে কালনা রাজবাড়ীর পশ্চিমভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, নবাবহাটের মন্দিরগুলি আয়তাকারে ও কালনার মন্দিরগুলি দ্বিস্তর বৃত্তাকারে সাজান।

অনেকে দূরদেশ হতে কার্যোপলক্ষে বর্ধমান জেলায় এসে বসবাস করার সময়ে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাজস্থান হতে আগত মেরুচন্দ্র রায় উখরায় প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করান।

'শকাব্দাঃ ১৬৬২।
ভুজতর্ক রসক্ষোণী মিতে অব্দে চ শিলাময়ম্
রাজন্য শ্রীমেরুচন্দ্র রায়োদাৎ বিষ্ণবে গৃহম্।'

খণ্ডঘোষ থানার শাঁকারী গ্রামে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি বাঞ্ছারামের পুত্র সাফল্যরাম নামক স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

'শ্রীশ্রীশিবো জয়তি॥ শকাব্দাঃ ১৬৮৩
শ্রীসাফল্যরাম বাঞ্ছারাম সুঃসৌধমন্দিরম্
ঈশায় আদান নেত্রবসুরসচন্দ্র যুতে শাকে।'

প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীহীনা নারীর দুঃখ একটি মন্দিরলিপিতে ফুটে উঠেছে। কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠালিপি খোদিত আছে। প্রতিষ্ঠালিপি দু'টি হল—

'সংসারার্ণবতারনৈক তটিনী তীরে মুরারয়েমুদে
শাকে ভেশানগাগভেশবিমিতে তারেশকায়াদদৎ।
শ্রীরাধেশ সুবেশ রাসরসিকানন্দস্য দাসী
মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী মঠম্॥'

'শাকে সপ্তদশ শত একাত্ত প্রমাণে অম্বিকায় অমর বাহিনী সন্নিধানে
শ্রীরাধাবল্লভ রাসরসিক সুন্দর শ্যামাঙ্গ ত্রিভঙ্গ অঙ্গ বিশ্বমনোহর।
তাঁহার কিঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা মহেন্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা
মহাস্থানে করি মহামন্দির নির্ম্মাণ হরিপ্রিতে হরসিতে হয়েদিলা দান॥
শকাব্দা ১৭৭১ ঃ সন ১২৫৬

এই দেউল 'সোনামুখী নিবাসী শ্রীরামহরি মিস্ত্রী নির্ম্মিত।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানের রাজাদের নির্মিত শিবমন্দিরগুলির প্রশস্তিলিপিতে কুলদেবতা বিষ্ণু বা শ্রীহরি উল্লেখ বহু ক্ষেত্রেই খোদিত আছে। মহারাজা ত্রিলোকচাঁদের আমলে গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-র মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূর্তি নির্মাণ বৃটিশ আমলে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে কুলিনগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খানের মূর্তিটি হল সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রমাণ। মালাধরের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের অভ্যন্তরভাগে গৌরীপট্টবিহীন শিবলিঙ্গ ও তৎপুত্র সত্যরাজ খানের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

'শ্রীসত্যরাজখানোহস্যাং প্রতি মায়ামধিষ্ঠিতঃ।
শিবপাদোদকাকাংক্ষী খান শ্রী গুণরাজজঃ।।'

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে দেখা যায়, মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে নির্মিত

হয়েছিল অসংখ্য মন্দির। এই সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিতে উৎকীর্ণ অলঙ্করণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির (১৮৪৯ খ্রীঃ) ও শ্রীবাটীর শিবমন্দির তিনটি (১৮৩৮ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মন্দির (১৮২৩ খ্রীঃ—নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সাল), বৈদ্যপুরের নবরত্ন শিব (১৮০২ খ্রীঃ), বৃন্দাবনচন্দ্র (১৮৪৫ খ্রীঃ), বর্ধমানে রামেশ্বর শিব (১৮১২ খ্রীঃ), শাঁকটীগড়ের রাধাবল্লভ (১৮৬০ খ্রীঃ), উখরার গোপীনাথ (১৮৯৭ খ্রীঃ), কুচুটের শিব (১৮৩১ খ্রীঃ) সিঙ্গির বুড়ো শিব (১৮২৮ খ্রীঃ) ও আনন্দময়ী কালী, খণ্ডঘোষের শিবমন্দির, খাঁদড়ার শিব (১৮৩৫ খ্রীঃ), নন্নার শিবমন্দির (১৮৫৫ খ্রীঃ) চুরপুনির শিব (১৮৭৪ খ্রীঃ) মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে গুসকরার সোমেশ্বর শিবমন্দিরের নাম করা যেতে পারে। ইঁট ছাড়া প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের মধ্যে জগদানন্দপুরের মন্দিরটির স্থাপত্য ও অনুপম কারুকার্যের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র।[৭৬]

প্রায় ৭000 বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট জেলার মন্দির বিবরণী দেওয়া আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্ভবপর যেমন নয়, তেমনি সংস্কৃতি আলোচনার দিক থেকে এর কোন প্রয়োজনও নেই। জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রায় দ্বিসহস্রাধিক মন্দিরের বিবরণের জন্য পুরাকীর্তি বিষয়ক পৃথক আলোচনা করা যেতে পারে।

ইসলামধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনালয়ের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বর্ধমানে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ মেলে না বা তার সপক্ষে ভগ্ন মসজিদের কোন শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। গৌড় বিজিত হলেও অজয়নদের দক্ষিণ তীর হতে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত ভূখণ্ডে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হতে যে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সুলতানী আমলে ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী অঞ্চলের বহির্ভাগে গৌড়ের সুলতানদের আধিপত্যের বিষয় বিশেষ অবগত হওয়া যায় না।

বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত মসজিদগুলির মধ্যে কালনার 'মজলিস সাহেব'-এর মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত একটি মসজিদের শিলালিপি প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। শিলালিপিটি ঐ স্থানে পাওয়া গেলেও মসজিদটি যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে স্থানটি সনাক্ত করা যায় নাই। খোদিত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৪৮৭-৯০ খ্রীস্টাব্দে) রাজত্বকালে উলুঘ আলি জাফর খাঁ কর্তৃক হিজরী ৮৯৫ অব্দে (১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দ) মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। কালনা শহরে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদটি হিজরী ৮৯৫ অব্দে (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ) দ্বিতীয় নাসির উদ্-দুনিয়া মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে হোসেন খাঁর পুত্র দৌলত খাঁ নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদের শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হলেও মসজিদের ধ্বংসাবশেষের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বর্ধমানের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সূচক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতক পর্যন্ত যে সকল মন্দির নির্মিত হয়েছিল তন্মধ্যে ৭।৮টি বাদে অন্যগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ধ্বংস করা হয়েছে। চারশ বছর মুসলমান শাসন ও শোষণের ফলে বাদশাহী সড়ক হতে দূরে অবস্থিতির কারণে মাত্র কয়েকটি মন্দির ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল। কাটোয়া, কালনা ও মঙ্গলকোটের ন্যায় প্রাচীন স্থানে একটিও পুরাতন মন্দিরের অস্তিত্ব নাই এবং সে আমলেও শাসনকার্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বর্ধমান শহরে কোন প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন দেখা যায় না, অথচ এই শহরে বহু প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

আওরঙ্গজেবের আমলে কোন মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি ছিল না এবং 'মসির-ই-আলমগিরি' নামক সম্রাটের জীবনী গ্রন্থে (ইংরাজী সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮১) পাওয়া যায় যে, ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে ৯ই এপ্রিল তারিখে তাঁর একটি আদেশনামায় আছে— **'The emperor ordered the Governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels and strongly put down their teaching and religious practices.'** মেদিনীপুরের অন্তর্গত তিলকুঠিতে নবনির্মিত মন্দিরটিও তাঁর আদেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এমনকি তাঁর অন্যান্য আদেশে হিন্দুদের মন্দির সংস্কারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল।[৭৭] মুর্শিদকুলী খাঁর আমলেও হিন্দুরা কোন মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করত না। কেবলমাত্র বড়নগরে বঙ্গাধিকারী (কানুনগো) বর্ধমান জেলার খাজুরডিহি নিবাসী হরিনারায়ণ রায়ের পুত্র দর্পনারায়ণের নির্মিত কিরিটেশ্বরী মন্দিরটি ধ্বংস করার মত তাঁর সাহস হয় নাই। তারিখ-ই-বাংলায় বর্ণিত আছে কাটরার মসজিদ নির্মাণের সময় মুর্শিদকুলী খাঁর নির্দেশে মুরাদ ফরাস নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করে (অনেকে অর্থ উৎকোচ দিয়ে নিজেদের মন্দির রক্ষা করেছিল) ঐ সকল উপাদানে কাটরার মসজিদের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন।[৪৮] মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দিন, মুরাদ ফরাসের অত্যাচারের জন্য তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[৪৯]

আলিবর্দীর আমলেও হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের পথে বহু বাধা থাকলেও জমিদারগণ নবাবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সুযোগে মন্দির নির্মাণের সুযোগ পেতেন। তবে এই সময়ে সাধারণ হিন্দুরা কোঠাবাড়ী নির্মাণের অনুমতি সাধারণত লাভ করত না, সেটা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পত্র হতে জানা যায়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাজনৈতিকভাবে কোন বাধা না থাকায় পুনরায় মন্দির নির্মাণের কার্য শুরু হয় এবং এই সময়ে নির্মিত মন্দিরগুলিই প্রধানতঃ বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের আলোচ্য বস্তু। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দুপ্রধান দেশে প্রাচীন মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন মসজিদের সংখ্যা অধিক। বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলের গভীর বন-জঙ্গল অধ্যুষিত স্থানের কয়েকটি মন্দির ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের এই বিস্তৃত অংশে কয়েকটি ব্যতীত

মধ্যযুগের প্রথম পর্বে নির্মিত কোন মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ভীতি ও এগুলির ধ্বংস সাধনের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা অনেকে আবদুল করিমের ন্যায় (**Murshid Quli Khan and his times**) ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুসারে নূতন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া না হলেও প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করার কোন শাস্ত্রীয় বিধান ছিল না। কিন্তু বাস্তবে এই বিধানকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

হোসেন শাহের আমলে এ জেলায় সর্বপ্রাচীন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুয়াতায় সৈয়াদ শাহ শাহিদ মহম্মদ বাহমনী সাহেবের সমাধিগৃহে প্রাপ্ত তিনটি খোদিত শিলালিপিতে হোসেন শাহ কর্তৃক মসজিদ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। ঐ শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, মসজিদটি সৈয়াদ আবুল মজফ্‌ফর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক হিজরী ৯০২ অব্দে (১৪৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং লেখক ছিলেন কাজি মিনাজী। একই সালে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় শিলালিপিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন কামরূপ ও কামতা বিজয়ী (এম. আর. তরফদারের মতে অভিযান শুরু হয়েছিল ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে)। সমাধিগৃহের উত্তর দেওয়ালে গাঁথা তৃতীয় শিলালিপিখানির তারিখ হল হিজরী ৯০৮ অব্দ (১৫০২ খ্রীস্টাব্দ) যার লেখক ছিলেন নাসির-উদ্‌-দিন। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে যে, এই জামির মসজিদ এবং সুন্দর তোরণদ্বার সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ঐ বছর বোনহারাতে (বিহার) হোসেন শাহ অপর একটি মসজিদও নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুয়াতায় প্রাপ্ত শিলালিপি কোন্ মসজিদ গাত্রে প্রথিত ছিল তার সন্ধান না মিললেও ভাল্কি ও সুয়াতার মধ্যবর্তী স্থলে একটা দীঘির পাড়ে তিনটি প্রস্তর স্তম্ভ দেখা যায় (বড়বাজারের মসজিদ স্তম্ভের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে) এবং স্থানীয় লোকে ঐ স্থানকে 'মসিদডাঙ্গা' বলে। সম্ভবতঃ মসজিদ বিলুপ্ত হলেও অপভ্রংশে পূর্বস্মৃতি স্বরূপ 'মসিদ ডাঙ্গা' নামটি আজও প্রচলিত থেকে গেছে।

নূতনহাট বাসস্ট্যাণ্ডের (বড়বাজার) সন্নিকটে হোসেন শাহের আমলে হিজরী ৯১৬ অব্দে (১৫১০ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত মসজিদের শিলালিপিখানি মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধিগৃহে রক্ষিত ছিল এবং সেখান থেকে কলিকাতার ভারতীয় যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সে শিলালিপিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, সুলতান মসজিদের সন্নিকটে একটি পুষ্করিণীও খনন করিয়েছিলেন। এখনও সেখানে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ও পুষ্করিণীর অস্তিত্ব রয়েছে। বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম মসজিদের অস্তিত্ব ও সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠালিপি প্রাপ্তির জন্য নূতনহাটের ধ্বংসপ্রায় মসজিদের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকায় বঙ্গাক্ষরে শিলালিপির পাঠ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আরবী অক্ষরে খোদিত শিলালিপির পাঠ হল নিম্নরূপ :[৫০]

"কলা আল্লাহু তায়ালা মানজায়া বিলহাসানাতে ফালাহু আসারা আন সালেহা বানি হাজাল মাসজিদা সুলতানুল আলেমুল আদেলুল মোয়াজ্জমুল মকরমা। উল ওয়াদ দুনিয়া ওয়াদিন আবুল মজ্জফর হুসাইন শাহ্ সুলতান এবনে সৈয়েদিন আসরাফুল হুসাইনি খালাদাল্লাহো মুলকাহু অসুলতানহ ফিসানাতিন সেত্তা আসারা ওয়া তেসা মেয়াতিন, কলা আল্লাহু তায়ালা মানজায়াবিল হাসানাতে ফালাহু আসারা। আম সালেহা বেনা হাজাস্ সাতাইয়াতুস সুলতালুল আলেমুল আদেলো লেয়াজামা মকরমা।

কলা আল্লাহু তায়ালা মানজায়াবিল হাসনাতে ফলাহু আসারা ফলাহু আসারা আনসালেহা হাজা হালসার্ফিয়াতো স্থলতানুল আলেমোল আদেলুল মোয়াজ্জমাল সকরমা।"

কেতুগ্রাম থানার বাদশাহী সড়কের ধারে রাইখা ও কুলুটগ্রামে হোসেন শাহের আমলে নির্মিত মসজিদ আছে। হিজরী ৯৩০ অব্দে (১৫২৩ খ্রীস্টাব্দ) নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের আমলে মুরাদ হাইদার খানের পুত্র মিঞা মোয়াজ্জম মঙ্গলকোটে যে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেটিও বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। হিজরী ৯৩৯ অব্দে পহেলা মহরম (১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ) নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দিন মজফ্ফর ফিরোজ শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজির উলুখ মসনদ খান মালিক কালনার খাসপুরে বিখ্যাত জামিয়া মসজিদটি নির্মাণ করান, যার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। স্থরবংশের রাজত্বকালে মহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র গিয়াস-উদ্দিন-আবুল বাহাদুর শাহ (হিজরী ৯৬২-৬৮ অব্দ) কর্তৃক নির্মিত কালনার মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। কালনা বাজারের অনতিদূরে জেলেপাড়া পল্লীতে হিজরী ১২৬১ অব্দে (১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ) শেখ খয়ের উল্লা ছ'মাসের মধ্যে সেখানকার মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে সেই মসজিদের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে।

বর্ধমান শহরে রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসিদ্ধ কালো-মসজিদটি হিজরী ৯৫০ অব্দে (১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দ) শেরশাহ কর্তৃক যে নির্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে খোদিত লিপিতে—"আফরিন সদ আফরিন বর শেরশাহ।" মোঘল যুগে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলায় নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের গুরু মৌলানা হামিদ দানেশমন্দ কর্তৃক হিজরী ১০৬৫ অব্দে (১৬৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দ) নির্মিত মসজিদটি উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সম্রাট শাহজাহানের নাম খোদিত আছে। মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মসজিদের ভিত্তির উপরে মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইলের যত্নে যে নূতন মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তার তোরণদ্বারের উপরে পুরাতন মসজিদের খোদিত লিপিটি হ'ল,[৫১]—

"কলা নবিত আলাইহে সালাতো ওয়াসালাম মানবানা মাসজিদাল্লাহো বায়তানার্ফিল জান্নাতে বানাহাজাল মাসজিদা ফির্ আহাদাস্ স্থলতানুল আজাম্ব অল খকানুল আকরাম ছাহেবা কোরানোসানি শাহবুদ্দিন মহাম্মাদা শাহাজাহান বাদশাহ্ গাজী এজা

সোয়েলাত আনতারিমে বানাওহু ফর্কুল হুয়াল বায়তেল আতেক সানাহু ১০৬৫ হিজরী।"

অনুবাদ—"ঈশ্বরের প্রেরিত দূত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন —যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্‌জিদ্‌ (উপাসনাস্থান) নিৰ্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন। এই মস্‌জিদ্‌ দ্বিতীয় সাহেব করান সম্রাট্‌ সাহেব-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহার নিৰ্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে বয়তুল আতিক বলিবে বলিয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬৫।"[৫২]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শান শোভাসিংহের সহযোগী রহিম খাঁকে দমনের সময় বর্ধমান শহরে তিন বৎসর বসবাসকালীন সময়ে হিজরী ১১১১ অব্দে (১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ) বর্তমান রাজবাড়ীর সন্নিকটে জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করান।[৫৩] এছাড়া আওরঙ্গজেবের সময়ে ইছলাবাদে হিজরী ১১১৫ অব্দে (১৭০৩ খ্রীস্টাব্দ), সম্রাট ফারুক সায়রের আমলে বর্ধমান শহরে বন-মসজিদ ও হিজরেপাড়ায় নূরানী মসজিদ ১১২৮ হিজরী অব্দে, আলম খান কর্তৃক হিজরী ১১২৭ অব্দে (১৭১৫ খ্রীস্টাব্দ) কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ এবং বোহার গ্রামে হিজরী ১১৮৭ অব্দে (১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ) নির্মিত মসজিদগুলি ছাড়াও এনায়েৎপুর, মসজিদপুর, সেলিমাবাদ, কাইতি, উচালন, রসুলপুর, শিলামপুর, কোটসিমুল, কুলাসুনা, পহলানপুর, জামালপুর, কেতুগ্রাম, খণ্ডঘোষ ও চুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে নির্মিত মসজিদগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বর্ধমান জেলায় বহু পীর ও সুফীর সমাধিগৃহ ও দরগাও নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর্ধমানে বহরাম সক্কার সমাধিগৃহ, খাজা আনোয়ারের সমাধিগৃহ, খোককর সাহেবের মাজার, বোহারে গদাই ফকির, রাইগ্রামে গোরাচাঁদ পীর, সারগাছিতে রঙ্গিলো ফকির, মঙ্গলকোটে পীর পাঞ্জাতন, রাহীপীর, মৌলানা হামিদ দানেশমন্দ, কাটোয়ায় আলম খান, সুয়াতায় পীর বহমন, দাঁইহাটে বদর সাহেবের সমাধি, শিলামপুরে বারাখাঁ, বড়র গ্রামে পীর গিয়াসউদ্দিন, উচালনে মকদুমপীর ও কালনায় মজলিস শাহরে মাজার। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সাধকদের সমাধি ও সমাধিগৃহগুলি পীর ও সুফীদের স্মৃতিচিহ্নকে আজও ধরে রেখেছে।[৫৪]

খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলায় কয়েকটি গির্জাও নির্মিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলায় ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টানদের উপাসনালয় তৈরী হয়েছিল শহর হতে দু'মাইল দূরে অর্থাৎ বর্তমান রেলস্টেশন ও সাধনপুরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে। কিন্তু ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ঐ গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। জেলায় দ্বিতীয় গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে কালনা শহরে এবং তৃতীয় গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাটোয়ার সাহেববাগানে। কালনা ও কাটোয়ায় নির্মিত গির্জা

দুটিরও কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বর্ধমান জরের সময়ে বন্ধ হয়ে গেলেও পরের দশক হতে ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রেভাঃ ট্রেসির সময় হতে বর্ধমানে দ্বিতীয় একটি গির্জা নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হলেও ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এই কার্য সমাধান হয় নাই। দীর্ঘ বাইশ বছরের প্রচেষ্টার পর বর্তমান পোস্ট অফিসের দক্ষিণে বাৎসরিক ১২·৫০ পয়সায় খাজনা বন্দোবস্ত পূর্বক ফাদার জ্যাকুইস এই গির্জা নির্মাণ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গির্জা নির্মাণ ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার কেবলমাত্র বর্ধমান শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে **Wesleyan Methodist Mission**-র উদ্যোগে রানিগঞ্জে একটি গির্জা নির্মিত হয়েছিল। ঠিক এর কয়েক বছর পরে এই স্থানে ইউরোপীয়দের জন্য একটি গির্জা ও দেশীয় খ্রীস্টানদের জন্য তিনটি চ্যাপেল নির্মাণ করা হয়। আসানসোল শহরে সর্বপ্রথম রোমান ক্যাথলিক মিশন ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে একটি গির্জা নির্মাণকার্য সম্পন্ন করে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে এই শহরে **Methodist Episcopal Church** প্রতিষ্ঠিত হয়। অণ্ডালের গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে।

বর্তমানে **Sacred Heart Church**-এর উদ্যোগে বর্ধমান শহরে (১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ), কালনায় (১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ), বার্ণপুরে (১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ), দুর্গাপুরে (১৯৭২ খ্রীস্টাব্দ) ও সাগরডাঙ্গায় গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে আসানসোলে সেণ্ট জন চার্চের নির্মাণকার্য সমাধা হয়েছে বলে জানা যায়। আউসগ্রাম ও ভাতাড় থানায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গুসকরার নিকট লোটো গ্রামে আট বিঘা জমি ক্রয় করে গির্জা, ছাত্রাবাস ও একটি মিশনারী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী আর্চ বিশপ হেনরী ডি'সুজা কর্তৃক সেটির শিলান্যাসকার্য অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসর ২৮শে আগস্ট গির্জাটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়।[৫৫]

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ

রাঢ়ের মানুষের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ও পদ্ধতিগতভাবে গৃহনির্মাণের কলাকৌশল আয়ত্তের যে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় তার সময়কাল আনুমানিক খ্রীস্ট-পূর্ব ১৩০০ অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। তারপর তারা তামা, লোহা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ও ব্যবহারের দ্বারা উন্নততর পর্যায়ের জীবনযাত্রা শুরু করে। ঐতিহাসিক যুগে নির্মিত মঙ্গলকোটের প্রাকার, বরাকরের মন্দির, ভরতপুরের স্তুপ, গোস্বামীখণ্ডের দেবায়তন ও সাতদেউলিয়ার দেউল প্রভৃতি দেখে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন যুগে ভারত-শিল্পের চর্চা বর্ধমানেও অব্যাহত ছিল। সম্ভবতঃ পাল-সেন আমলের পর হতে ভারত-শিল্পের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। এতদঞ্চলের প্রাচীন

যুগের স্থপতিরা একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত বাস্তুবিদ্যার অভিজ্ঞতা থেকে ও অপরদিকে পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও অন্যান্য শিল্পশাস্ত্র হতে স্থাপত্য-বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করেছিল। কাঠ, বাঁশ ও খড়ের তৈরী গৃহনির্মাণে পটু বাঙালীরা বাস্তুবিদ্যা পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে চালাঘরের আদলে অতিশীঘ্র বসবাসের গৃহ ও দেবায়তন নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিল।

বর্ধমানের প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত দেবালয়গুলি নিরীক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায়, সেগুলি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য রীতির দ্বারা একান্তই প্রভাবিত হয়েছিল। "উন্নত শীর্ষ দেউল-মন্দিরের গঠন বঙ্গদেশের আদিমতম দেবসৌধের আদলে নির্মিত হলেও এ শ্রেণীর দেবালয় যে প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে বর্তমান ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।"[৫৬] পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানের মন্দির স্থাপত্য রীতিকে প্রধানতঃ যে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল চালা মন্দির ও রত্ন মন্দির। এছাড়া বেশ কয়েকটা মন্দির দেখা যায় যেগুলি প্রচলিত স্থাপত্যরীতি হতে পৃথক। ঊনবিংশ শতকে কড়ি বরগার ব্যাপকহারে ব্যবহার চালু হলে সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির ও মসজিদ নির্মাণের প্রচলন দেখা দিলেও বর্ধমানে শতাধিক বৎসরের এরূপ প্রাচীন দেবালয়ের সংখ্যা অধিক নয়।

এই জেলায় চালা মন্দিরগুলি খড়োঘরের আদলে দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, আটচালা, পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। রত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চরত্ন রীতিতে নির্মিত হলেও নবরত্ন ও পঁচিশ রত্ন মন্দিরের সংখ্যাও নগণ্য নয়। ত্রয়োদশ, সপ্তদশ বা একবিংশ রত্নবিশিষ্ট মন্দির বর্ধমানে দেখা যায় না। চালা মন্দির গঠনের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল, লৌকিক কুটিরের প্রত্যক্ষ অনুকরণ এবং মধ্য-যুগে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন আমাদের নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করে ফেলেছিল। দোচালা মন্দিরের সংখ্যা এ জেলায় একেবারেই নগণ্য; কেবলমাত্র শ্রীবাটীর রঘুনাথ বাড়ীটি[৫৭] এবং কাঞ্চননগরের গুড়েহাটে পরিত্যক্ত শিবদুর্গার মন্দিরটি জোড়বাংলা মন্দিরের নিদর্শন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা বাটীর পূর্বভাগের তোরণদ্বারটি জোড়বাংলা ও পশ্চিমভাগের তোরণদ্বারটি একবাংলা স্থাপত্য রীতির অনুকরণে নির্মিত। কাইগ্রামের বিষ্ণুমন্দির, কালনার সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, সিঙ্গারকোন-এর রাধাকান্ত মন্দির, ছোটদিঘরির রঘুনাথ মন্দির ব্যতীত আমাদপুর, গ্রামকালনা, পাঁচথুপির মন্দিরগুলি জোড়বাংলা আদলে নির্মিত। বর্ধমানে চারচালা, আটচালা ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর এবং এগুলির তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে পালসিট স্টেশনের নিকটবর্তী ভৈটা গ্রামের মদনগোপালের ত্রিতল বিশিষ্ট আটচালা মন্দির ও কালনায় চিত্রসেনের আমলে আটচালা শিবমন্দির দুটি ও অনন্তবাসুদেব মন্দির একান্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য। নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে সিঙ্গির বুড়োশিব, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, কুচুটের লক্ষ্মীনারায়ণ, বৈদ্যপুরের বৃন্দাবন-চন্দ্র ও শিবমন্দির করন্দার শ্রীধর, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী ও গুসকরার সোমেশ্বর শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য।

রত্ন মন্দিরের মধ্যে পঁচিশ-রত্ন মন্দিরের আকৃতি বিশাল ও ব্যয়বহুল এবং এগুলি সাধারণতঃ ত্রিতল বিশিষ্ট। তবে প্রতিষ্ঠাতার আর্থিক সামর্থ্যের উপর মন্দিরের আকৃতি ও গঠননৈপুণ্য নির্ভর করে। নামে পঁচিশ-রত্ন হলেও সোনামুখার শ্রীধর মন্দিরটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি হতে বেশ পার্থক্য সূচিত হয়। পঁচিশ-রত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে কালনার লালজি, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল মন্দির স্থাপত্যশিল্পের সার্থক সৃষ্টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পাঁচটি এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে তিনটিই বর্ধমানে অবস্থিত।

এছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধরনের স্থাপত্য রীতির নিদর্শন এ জেলায় দেখা যায় ; যথা, বোড়ো গ্রামে বলরামের পীড়া-দেউল, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মন্দির, খুদিকের শিবমন্দির, জৌগ্রামের জলেশ্বরনাথের মন্দির। এছাড়া ওড়িশা শৈলীর রেখদেউলের নিদর্শন যে এ জেলায় নাই এমন নয়। এই ধরনের রেখদেউলের যা সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে শ্রীবাটী, বনপাস, বলাগড়, মানকর, রূপসা, উখরা, নন্দী, কালনা (প্রতাপেশ্বর, রামেশ্বর,), বর্ধমান (কমলেশ্বর শিবমন্দির), খণ্ডঘোষ, সীতাহাটি (ছ'কোণা শিখর মন্দির), খটনগর, সাদিপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য। রথাকৃতি মন্দিরস্থাপত্য পরিলক্ষিত হয় ক্ষীরগ্রাম, নাসিগ্রাম, কামারপাড়া প্রভৃতি গ্রামে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত জগদানন্দপুরের প্রস্তর দেউলটি এক অভিনব স্থাপত্যের নিদর্শন।

স্বাধীন সুলতানী আমলের পূর্বে বর্ধমান জেলায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত কোন প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। রুকুনুদ্দিন বরবাক শাহ, সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ ও নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহের আমলে বর্ধমান ছিল গৌড়ের শাসনাধীন। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে এই অঞ্চলে যে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সেগুলিতে লৌকিক চালাঘর স্থাপত্যের প্রভাব যে যুক্ত ছিল না এমন নয়। অথচ মুসলমানগণ পারস্য স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হজরৎ পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের প্রাচীন মসজিদগুলিতে পারস্যদেশের স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রকৃত খিলান নির্মাণ পদ্ধতি ও গাঁথুনিতে চুন-সুরকীর ব্যবহার কৌশল বাংলায় আমদানী করেছিল।[৫৮] বর্ধমান শহরে বেড়অঞ্চলের নবাববাড়ীর মসজিদ ও রাজবাড়ীর সন্নিকটে স্থাপিত জুম্মা মসজিদের কার্নিশে ইসলামী স্থাপত্যের সঙ্গে চালা-মন্দিরের সাদৃশ্য রয়েছে। কালনার প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জামি মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ছিল দশটি এবং কাটোয়ার আলম খানের মসজিদটি ছিল ছ'টি গম্বুজযুক্ত। তবে অধিকাংশ মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা তিনটি। মঙ্গলকোটের হোসেনশাহী মসজিদে ও কালনার জামি মসজিদে টেরাকোটা শিল্পকার্যের নিদর্শন দেখা যায়। মজলিস দীঘির দক্ষিণে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি সম্ভবতঃ কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সংগৃহীত মালমসলা দিয়ে সেটি নির্মিত হয়েছিল। প্রস্তর খোদিত স্তম্ভের উপর গণেশ মূর্তি, ঘণ্টা ইত্যাদি চিহ্ন

এর পরোক্ষ প্রমাণ। কাটোয়ার আলম খানের মসজিদের তোরণদ্বার ও দাঁইহাটে বদরশাহ আউলিয়ার মাজারে হিন্দু মন্দিরের উপাদান যে ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ উক্ত সৌধে বর্তমান। নূতনহাটের বড়বাজারের মসজিদে চন্দ্রসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত কয়েক খণ্ড প্রস্তরফলকের প্রতি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উক্ত হোসেনশাহী মসজিদে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে খোদিতলিপি হতে জানা যায়, চন্দ্রসেন নামক কোন হিন্দুরাজার (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) মন্দির ধ্বংসসাধনের পর সেসব উপাদান দিয়ে উক্ত মসজিদটি গ্রথিত করা হয়েছিল। লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ[৫৯]

"(ক) ১। ...... শ্রীচন্দ্রসেন নৃপ ৩ (?) রনসেন ... নাম্না

২। ...... শ্রী বি ......

(খ) ১। ... গ ... ন্যয়সঃ (?) ি ... বাগ ... ... তে ম ...

২। ... স্থ ... ম্যান্তিথো যাব ৩। স্রী ... করকে ঠী

খোদিতলিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(গ) ১। ... য্য নি ... ২। ... ষাং গমি ... ৩। চর্য্য সহি ...

(ঘ) ১। ... মণ্ডলপদ্ধতি ... ২। ... মায়াব (?) হেতুম ...

খোদিতলিপির অক্ষরগুলি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ।"

মন্দিরে স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িত থাকে তার ভাস্কর্য ও অলঙ্করণ। এক্ষেত্রে মন্দির অলঙ্করণে কোথাও স্টাকো পদ্ধতি আবার কোথাও 'টেরাকোটা' ফলকে খোদিত ভাস্কর্য ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়ালে নানা অলঙ্করণের চিহ্ন পাওয়া যায়। কাদামাটিকে ছাঁচে ফেলে রোদে শুকিয়ে তারপর কাঠের আগুনে পুড়িয়ে যে বস্তু পাওয়া যায়, মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তা টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক নামে খ্যাত। বর্ধমানের শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মন্দিরে নিবন্ধ পোড়ামাটির এই অলংকরণ-সজ্জা মন্দিরগুলির শোভা বর্ধিত হয়েছে। পোড়ামাটির অলঙ্করণের মধ্যে লতাপাতা, পশুপক্ষী, সমসাময়িককালের সমাজচিত্র, দেবদেবীর মূর্তি, যক্ষ-যক্ষিণী, সাহেব-মেম, দশাবতার, শিকার দৃশ্য প্রভৃতি অসংখ্য রকমের চিত্রাবলী শিল্পী ও প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে দেবমন্দিরে নিবন্ধ হয়েছে। বেশ কিছু মন্দিরের সম্মুখভাগের কৌণিক শীর্ষবিন্দুতে যে তন্ত্রাচারের চিহ্নও বর্তমান, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ধমান জেলায় পোড়ামাটির অলঙ্করণে সজ্জিত যে প্রাচীনতম উপাসনালয়টি বর্তমান সেটি কোন হিন্দু মন্দির নয়। উক্ত উপাসনালয়টি হল কুলুটগ্রামে (থানা কেতুগ্রাম) অবস্থিত একটি জীর্ণ হোসেনশাহী আমলের মসজিদ। গৌড় ও হজরৎ পাণ্ডুয়ার মসজিদ অলঙ্করণের ন্যায় কুলুটের মসজিদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির পোড়ামাটির অলঙ্করণ খুব স্বচ্ছ বা বলিষ্ঠ নয়। এবিষয়ে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। কালনার লালজি, কৃষ্ণচন্দ্র, সাতগাছিয়ার সিংহবাহিনী, সাদিপুরের মদনগোপাল (ধ্বংসপ্রাপ্ত), দোগাছিয়া, সিঙ্গারকোন-এর রাধাকান্ত, কালনার অনন্ত-বাসুদেব, শাঁকারির শিবমন্দির, কাঁটারিয়ার শিবমন্দির, বাহাদুরপুরের রঘুনাথ প্রভৃতি মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটার শিল্পকাজ একান্তই বিস্ময়কর। অষ্টাদশ শতকের মন্দিরগুলির মধ্যে কালনার প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যসমূহ সর্বকালের শিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন।

মন্দির অলঙ্করণ, টেরাকোটা, মৃৎপাত্র ও পটশিল্পের জন্য রং-এর ব্যবহার বহুকাল ধরে চলে আসছে। রং তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরার এক প্রবন্ধ হতে জানা যায় যে, রাসায়নিক রং-এর ব্যবহারের পূর্বে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ থেকে রং-এর উপাদান সংগ্রহ করা হত এবং স্বভাবতই তার প্রস্তুতপ্রণালী ছিল খুবই পরিশ্রমসাধ্য। মাটির নীচে এক ধরনের মৃত্তিকা পাওয়া যায়। যেগুলি মেটে, ঈষৎ হলুদে ও লাল রং-এর। মাটির দেওয়াল অলংকরণে এই সব রং-এর যে ব্যবহার হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার 'রং-মাটি'র সঙ্গে তেঁতুল বীজ সিদ্ধ করে নিষ্কাশিত আঠাল পদার্থ মিশিয়ে পাকা বর্ণক রং প্রস্তুত হয়, যা মৃৎপাত্রে আজও ব্যবহার করা হয়।[৬০] প্রাচীনকালের মৃৎপাত্রেও যে রং-এর ব্যবহার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে রঙের প্রলেপে।

দেবায়তন নির্মাণের বহু পূর্বেই ধর্মীয় অণুপ্রেরণায় আদিম মানবসমাজ মূর্তি গঠন করতে শিখেছিল। মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজারঢিবি ও বেড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা মাতৃকা মূর্তিসমূহ সে যুগের মানুষের ধ্যানধারণার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উন্নততর সভ্যতার যুগে উত্তর ভারতের মূর্তি শিল্পের অনুকরণে এখানেও প্রস্তর মূর্তি নির্মাণের প্রচলন হয়, যার প্রভাব রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধ মূর্তিগুলিতে। ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত চৈতন্যপুরের আভিচারিক বিষ্ণুমূর্তি, বাঘনাপাড়ার একমুখলিঙ্গ শিবের সদাশিব মূর্তি, মতিবাগে (বর্ধমান) প্রাপ্ত সপ্তম শতকের অষ্টমুখলিঙ্গ শিব, কাঞ্চননগরে প্রাপ্ত বৈশ্রবন মূর্তি, মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত একমুখলিঙ্গ শিব, কুড়মুনের ইন্দ্রাণী, ক্ষীরগ্রামে প্রাপ্ত শিবের ভৈরব মূর্তি, নৈহাটির কালরুদ্রদেব, নিরোলের অষ্টভুজ গণেশমূর্তি, বাবলাডিহির শান্তিনাথ, জামগ্রামের সিংহলাঞ্ছন, বর্ধমানেশ্বর শিব ও বৃষ, কসবা-চম্পাইনগরের শিবলিঙ্গ, পাণ্ডুকগ্রামের বিষ্ণুমূর্তি, রাইগ্রামের বরাহমূর্তি, রায়নার যুগল তীর্থঙ্করমূর্তি, মীর্জাপুরের লক্ষ্মীমূর্তি, সিজনার বিষ্ণুমূর্তি, নবগ্রহমূর্তি, মণ্ডলগ্রামের জগৎগৌরী ও বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি মূর্তিসমূহ বাংলার ভাকর্ষশিল্পের চরম উন্নতির নিদর্শন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিকযুগে নির্মিত মন্দিরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের এক উন্নত পর্যায় লক্ষ্য করা যায় সাতদেউলিয়া ও বরাকর (৪নং মন্দির), বরাকর (১, ২, ৩ নং মন্দির) ও পরবর্তীকালে নির্মিত

জগদানন্দপুরের প্রস্তর নির্মিত মন্দিরে। এই মন্দিরগুলির অপূর্ব শিল্পকলা দেখে সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। পাল-সেন আমলে নির্মিত মূর্তিগুলির মধ্যে অসংখ্য লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি ও বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তি বর্ধমানের যত্রতত্র পাওয়া গেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ুই গ্রামের দশবাহু সমন্বিত এক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ করেছেন। লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিগুলির মধ্যে সাঁচড়া ও চান্ডুলীগ্রামে প্রাপ্ত মূর্তির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ভাস্কর্যশিল্প অতি অনুপম বলে গণ্য হতে পারে। সাঁচড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির মাথায় সর্পছত্র এবং দ্বাদশভুজ মূর্তিটি দশম শতকের বলে অনুমান করা হয়।[৬১]

ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের মূলে বর্ধমানের শিল্পী / ভাস্করদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নাই ; কারণ এই জেলার অসংখ্য মূর্তি ও মন্দিরগুলি কেবলমাত্র বহিরাগতদের দ্বারা নির্মিত নয়, মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাস্কর্য রীতির উদ্ভাবন ও ব্যবহারে বর্ধমানের শিল্পীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। মনে হয় এককালে সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রয়োজনের তাগিদে ও শিল্পীদের জীবিকানির্বাহের জন্য গিল্ড বা থাকের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে শিল্পীদের থাকগুলি উপাধিতে পরিবর্তিত হয় এবং সেগুলি বিশেষ গ্রামনামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অনেকের মতে জৈন সরাক বা শ্রাবক গোষ্ঠীর শিল্পীরা পাথরের কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, যাঁরা এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে ও পাথরের কাজে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে অধিকাংশ শরাকের বসবাস পুরুলিয়া জেলায়। মধ্যযুগে দাঁইহাট, পাতুন, পাঁচুন্ডি, দেবকুন্ড প্রভৃতি স্থানে ভাস্করদের অধিবসতি গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতকে নির্মিত জগদানন্দপুরের পাথরের মন্দিরের জন্য কারুকার্যখচিত কিছু পাথর বারানসী হতে সংগ্রহ করা হলেও, মন্দির নির্মাণকার্য সুষ্ঠুরূপে নির্বাহ করতে দাঁইহাটের ভাস্করদের অবদান ছিল প্রধান। বিগত শতকে দাঁইহাটের নবীন ভাস্করকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান দেওয়া হয়। নবীন ভাস্কর, তাঁর পুত্রদের সহযোগিতায় ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, জেমো রাজবাড়ীর কালী, বর্ধমানের গোপাল, সৈদাবাদ ও নাটোরের কালী প্রভৃতি প্রস্তরমূর্তির স্রষ্টা ছিলেন। ঐ যুগে নবীন ভাস্কর জয়পুরের শিল্পীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিনাজপুরের মহারানি শ্যামমোহিনী, কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তির অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের জন্য তাঁকে সোনার বাঁটালি উপহার দিয়েছিলেন।[৬২] কলিকাতাস্থ নিমতলার বিশালাকৃতি শিবলিঙ্গটি কাটোয়ার গদাধর ভাস্করের নির্মিত।

বর্ধমানের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, সেকালের স্থপতি ও ভাস্কর উভয়েই উপেক্ষিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এই জেলার মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জেলার শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন

ইটের তৈরী কুলিনগ্রামের গোপেশ্বর শিব মন্দিরে রক্ষিত বৃষটির নির্মাতা ছিলেন নেপাল নামে (নেপালেন বিনির্মিত) জনৈক ভাস্কর। এছাড়া অন্যান্য স্থপতিদের মধ্যে বনপাসের বদন মিস্ত্রী কর্তৃক শ্রীবাটীর মন্দির ও সোনামুখীর (বাঁকুড়া জেলা) রামহরি মিস্ত্রী কর্তৃক কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির যে নির্মিত হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। এছাড়া বর্ধমান জেলার বিখ্যাত স্থপতিদের মধ্যে বনপাসের গোলোকনাথ রাজ, কেতুগ্রামের বংশীধর রাজ ও মেগারাম রাজ, সাতগাছিয়ার রাধামোহন পাল, পিলশোঁয়ার পিতাম্বর মিস্ত্রী, শোচান্দের সুধাকৃষ্ণ প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিফলকে।[৬৩] কাটোয়া থানার দেবকুণ্ড গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটি ব্যতীত আরও প্রচুর মূর্তি ঐ স্থানে দেখা গিয়েছিল ; মনে হয় অতীতে এখানে মূর্তি নির্মাতা অর্থাৎ ভাস্করগণের বসবাস ছিল।

মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে লিপি প্রতিষ্ঠার নজির রয়েছে। ঐ লিপিসমূহ প্রস্তরের উপর খোদাই করে অথবা টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ করে মন্দির-গাত্রের সম্মুখভাগে প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল। পঞ্চদশ শতক হতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়ে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মন্দির লিপির প্রচলন দেখা যায়। ঊনবিংশ শতক হতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মন্দির লিপি উৎকীর্ণ করা হত। পালসিট গ্রামের এক শিব মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে ও ইংরাজী ভাষার উৎকীর্ণ লিপির ব্যবহার দেখা যায়। বর্ধমানের মন্দির গাত্রে ছন্দোবদ্ধ প্রতিষ্ঠা লিপির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় ত্রিলোকচাঁদ ও তেজচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠালিপির রচয়িতাগণ ছিলেন রাজানুগৃহীত রাজবাড়ীর টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমন্ডলী। তেজচন্দ্র ও ও মহতাব্ চাঁদের সমাধিলিপিতেও অনুরূপ কাব্য চর্চার নিদর্শন রয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ঃ

বর্ধমানের সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ের কয়েকটি বিশেষ দিক প্রথম-দিকে আলোচনা করা হয়েছে। আবার সংস্কৃতির লৌকিক উপাদানগুলিও সামগ্রিক-ভাবে এ জেলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এবং লৌকিক উপাদানগুলি জনজীবনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আধুনিক ও প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় 'সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে'র পথ ধরে লৌকিক উপাদানগুলি সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়ে আছে। তাই বহিরাবণের দিকগুলো তুলে ধরার পর অন্তঃসলিলা প্রবাহগুলির উপর কিছু আলোকপাত করলে সামগ্রিকভাবে এ জেলার সংস্কৃতিকে বোঝা যাবে।

মেলা ও উৎসব ঃ

মহামিলনের সাগরতীরের ক্ষুদ্র সংস্করণ 'মেলা' হল একটা সামাজিক মিলনক্ষেত্র। কৃষিজ অর্থনীতির লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও ধর্মীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে

মেলাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষির উন্নতি বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পজাত সামগ্রীর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এগুলি সকল অঞ্চলে তৈরীও হয় না বা যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে যে কোন সময়ে কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হত না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ; তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষেরা জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে অবসর বিনোদন ও পরস্পরের সান্নিধ্য কামনায় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় স্থান-কাল খুঁজে নিয়েছে। নদীবহুল বর্ধমান জেলায় (বর্তমান চিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না) বর্ষায় গমনাগনের নানা অসুবিধা, বর্ষাঅন্তে শস্য ঘরে তোলার ব্যস্ততার পর মানুষ সাময়িকভাবে সামান্য কর্মব্যস্ততার মাঝে উন্মুখ হয়ে থাকত প্রিয়জনের সংগে মেলামেশার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষির উপর ভিত্তি করে মেলাগুলির সৃষ্টি হলেও পরবর্তীকালে ধর্মের বন্ধন যুক্ত হওয়ায় এর ভিত্তির স্তর আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

মেলা ও উৎসবের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার কোন মৌলিকত্ব না থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যদি সমগ্র জেলার সামাজিক ও ধর্মীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রাচীন সভ্যতা, আদিবাসী ও উপজাতীয় বিশ্বাস, মধ্যযুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা, গ্রামীণ মূল্যবোধ, নগরজীবনের প্রভাব, পরিবহণের দ্রুততা ও শিল্প অর্থনীতির বিকাশ বিভিন্ন স্থানের উৎসব, পুজা-পার্বণ ও মেলার পুরাতন রূপকে বেশ কিছুটা পরিমাণে প্রভাবিত করতে পেরেছে। অপরপক্ষে গবেষকের ভাষায়,—"জেলার মেলাগুলি এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। জেলাটির মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে।"[৬৪]

কতকগুলি দোকান পসারী এক জায়গায় চালা বেঁধে বসলেই মেলা হয় না। গঞ্জ, হাট ও মেলার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ পার্থক্য আছে। মেলার প্রাণকেন্দ্র হল উৎসব। শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, বৈষ্ণব, মুসলমান ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ে পুজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বারো মাসে তের পার্বণ কথাটির বিশ্লেষণ করলে মেলার উৎস ও প্রচলনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও লৌকিক দেব-দেবী, মুসলমানদের মধ্যে পীর-সুফীর উরস উৎসব, বৈষ্ণবদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ ও মহান্তদের আবির্ভাব-তিরোভাব উপলক্ষে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আদিবাসীদের প্রধান উৎসব হল বাঁধনা ও ছাতার পরব। দেবতা ও দোকানপত্রের হিসাব বাদ দিলেও খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক, জুয়া-লটারী, লোটো, কাওয়ালী, কবিগান, জলসা, কীর্তন, কথকথা, রামায়ণ, ভাগবত পাঠ ইত্যাদির জন্য মেলাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বর্ধমান জেলার প্রধান মেলাগুলি শিব, ধর্মরাজ, মনসা, রাধাকৃষ্ণ,

গোপীনাথ, যোগাদ্যা, বলরাম, চণ্ডী, কালী, ক্ষেত্রপাল, রুক্মিণী, জয়দুর্গা, দিদি-ঠাকরুণ, যাগড়বুড়ী প্রভৃতি দেব-দেবীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলাগুলির মধ্যে শাহ সাহেব, খাদিম বিবির তিরোধান, পীর সাহেব, গোরাচাঁদ, রঙ্গিলা ফকির, পীর আউলিয়া সাহেব, মকদুম পীর, ফকির সাহেব, মজলিস সাহেব, রহমন সাহেব প্রভৃতি পীরের উরস (তিরোভাব) উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলার সর্ববৃহৎ মেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দধিয়া বৈরাগ্যতলায় এবং বৈষ্ণব (গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব দিবস) উৎসবকে উপলক্ষ করে মেলাটির পত্তন হয়েছে। এছাড়া অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের প্রত্যাবর্তন ও বারুণী উৎসব, নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব, কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব, জন্মাষ্টমী, রাধাগোবিন্দ, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি বৈষ্ণব মেলাগুলি জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। আবার বিশেষ উৎসবে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যথা—উত্তরায়ণ, দশহরা, গঙ্গাপুজা, মহোৎসব, পৌষ-পার্বণ, রথযাত্রা, কার্তিক পুজা, চড়ক-গাজন, বিশ্বকর্মা পুজা, সরস্বতী পুজা, মনসা পুজা, ধর্মরাজের পুজা প্রভৃতি উপলক্ষে।

পশ্চিমবঙ্গের 'শস্যভাণ্ডারের' অধিকারী বর্ধমানের মানুষ আউসধান ঘরে তুলে মধু সংক্রান্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। মাসের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে নূতন ধান ঘরে তোলার সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নবান্ন উৎসব প্রতিপালিত করে। নবান্ন উৎসব অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠিত হলেও বর্ধমানে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় উৎসব ব্যতীত যুবমেলার প্রচলন দেখা দিয়েছে এবং এই মেলাগুলিতে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্কমূলক আলোচনা সভা ও অন্যান্য বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও সরকারী ও রাজনৈতিক দলের অধিকতর হস্তক্ষেপের কারণে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নাই। অতি সাম্প্রতিককালে সরকারী অনুদানে জেলার শহরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত বইমেলাগুলি শিক্ষিত মানুষের নিকট বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

বর্ধমানের মেলাগুলি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অবদান যথেষ্ট এবং এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। স্থানীয় কামার, কুমোর, ছুতোর, পটুয়া, ডোম, জেলে প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কারুশিল্পের উদ্ভাবনী কৌশল আয়ত্ত করে একদিকে যেমন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন কৌশল প্রদর্শন করে থাকে, অপরদিকে বিক্রয়জাত দ্রব্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত মূল্য তাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাবলীল করে তুলতে সহায়তা করে।

জেলার মেলাগুলির মধ্যে দধিয়া, জামালপুর, অগ্রদ্বীপ ও ক্ষীরগ্রামের স্থান অগ্রগণ্য। এছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান মেলাগুলির মধ্যে বৈদ্যনাথপুর, আমগড়িয়া, আইয়াপুর, ঝাজটপুর, কল্যাণপুর, নৈহাটি, উদ্ধারণপুর, ঝিলেরা, বাবলাডিহি,

ভাণ্ডারটিকুরী, মেদগাছী, মণ্ডলগ্রাম, কেজা, নবাবহাট, হাটগোবিন্দপুর, বরাকর, কল্যাণেশ্বরী, দামোদরপুর প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমান জেলার মোট ৪৬২টি মেলার মধ্যে মেমারী (৫৩টি), জামালপুর (৪৭টি), বর্ধমান (৪৬টি), কালনা (৩৮টি) ও ভাতাড় (৩৩টি) থানার অনুষ্ঠিত মেলাগুলি অগ্রগণ্য স্থান গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে মাস হিসাবে দেখা যায় ফাল্গুন (৯০টি), মাঘ (৭৯টি), চৈত্র (৬০টি), আষাঢ় মাসে (৫১টি) মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫]

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় (কৃষিকার্যের পূর্বে)	১১৫টি মেলা
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ (কৃষিকার্যের সময়ে)	৮৮টি মেলা
পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র (কৃষিকার্যের পরে)	২৫৯টি মেলা
সারা বছরে মোট মেলার সংখ্যা	৪৬২টি মেলা

আহার্যদ্রব্য :

বাংলার মানুষ শ্লেষের সঙ্গে বলে থাকেন যে, বর্ধমানের লোকেরা কেবলমাত্র পোস্ত, কলাই-এর ডাল আর অম্বল খেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বিস্মৃত হয়ে যান যে, বর্ধমান হল 'Granarry of West Bengal'। সরু ও মোটা উভয়শ্রেণীর চাউলের এত অধিক হারে উৎপাদন আর কোথাও হয় না। এ জেলায় প্রচুর কাঁচা শাকসব্জী উৎপাদিত হওয়ায় নানাবিধ তরিতরকারি রাঁধার প্রচলন বহুকাল ধরে চলে আসছে। নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে শাক, চচ্চড়ি, শুক্ত, মোচাঘণ্ট, আলমপুরের ডাঁটা, ছানার ডালনা, বিভিন্ন প্রকারের বড়ি, পটল, বেগুন, কুষ্মাণ্ড, কচু, মানকচু, আমড়া, চালকুমড়া প্রভৃতি সহযোগে নানা প্রকারের আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। আমিষ আহারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য, মাংস ও ডিমের প্রচলন আছে। নদীগুলির অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় পুকুরের মাছ ও চালানীকৃত মাছের উপর জেলার শহরগুলি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আসকে, সরুচাকলি, ভাজাপিঠা, দুধ পিঠা, সাদা পিঠা প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য বিভিন্ন পাল-পার্বণে প্রস্তুত করা হয়। বর্ধমানে একটা প্রবাদ আছে—

'শক্তিগড়ের ল্যাংচা খাবেন
রস গড়াবে বুকে।
বর্ধমানের মিহিদানা
লেগে থাকবে মুখে॥'

এই জেলার মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে মানকরের খাজা ও কদমা, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, সাতগাছিয়ার মাখাসন্দেশ, মেমারীর রসগোল্লা ও দই মানুষের রসনা তৃপ্ত করতে বিশেষ পারদর্শী। জেলার পূর্বাঞ্চলে গোপজাতির বসবাস বহুকাল ধরে চলে আসছে ; সেজন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন হয় ও সেগুলি বিভিন্ন স্থানে চালানও যায়। বর্ধমান হতে সারা বছর ধরে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ছানা, দই ও খোয়াক্ষীর কলকাতায় চালান আসে। শহরাঞ্চলে ক্ষীর ও সন্দেশ থেকে নানাপ্রকারের ফল, পশু-পাখি, বর-কনে, লতাপাতা

প্রভৃতি আকারের মিষ্টান্ন মোদকরা সুন্দরভাবে তৈরী করেন। কাঠ বা পাথরের চাপে তৈরী মিষ্টান্নগুলি অপূর্ব কারুশিল্পের নিদর্শন। অবশ্য বর্ধমানের জলহাওয়ার জন্য বিশেষ খাবারের ক্ষেত্রে বিশেষ নাম-ডাক আছে। মিষ্টান্ন শিল্পের প্রচলন বহুকালের। খেজুর ও তালের রস দিয়ে নানাপ্রকারের খাবার ও পাটালি প্রস্তুত হয়ে থাকে। মিষ্টান্ন ব্যতীত ভাজা খাবারের মধ্যে বেগুনি, আলুর চপ, মোচার চপ, পেঁয়াজি প্রভৃতি তেলেভাজা খাবার গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে প্রস্তুত ও বিক্রিত হয় প্রচুর পরিমাণে। মিষ্টান্ন শিল্পের এত জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহ দেখা দিলেও প্রকৃত মিষ্টান্ন কারিগররা স্বল্প বেতনে এ শিল্পে নিয়োজিত হতে বাধ্য হওয়ায় তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

আহার্যবস্তুসমূহ সকল সময়ে বাণিজ্যিক মূল্যানুসারে বিচার করা যায় না। চিনি বা গুড় সহযোগে নারিকেল নাড়ু, বেসমের তৈরী গুড়ের সহযোগে সিড়িভাজা, আন্দমা, তিলের নাড়ু, কলার বড়া ইত্যাদি গৃহের তৈরী আহার্যবস্তু স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। এ জেলায় পিঠা তৈরী হয় নানা ধরনের। পিঠার ভিতর ক্ষীর বা অন্যান্য পুর ভরে জল বা দুধে সিদ্ধ করে খেজুরগুড় সহযোগে তৈরী হয় যা এক অপূর্ব আহার্যবস্তু। আবার ডাল, আলুসিদ্ধ ও গুড়, চালের গুঁড়ির সঙ্গে মেখে পিঠা প্রস্তুত করে তেলে ভেজে তৈরী হয় ভাজা-পিঠা। পৌষ-পার্বণের সময় পিঠা, সরু-চাকলি ও আসকে তৈরী হয় প্রতি ঘরে ঘরে। নবান্নের সময় বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-দ্রব্য তৈরীতে বর্ধমানের যথেষ্ট খ্যাতি আছে ; তবে তেলেভাজা খাবারই প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে যা ছেলে-বুড়ো সকলের কাছে উপাদেয়।

কেবলমাত্র একালেই নয়। সেকালের আহার্যবস্তুর তালিকা পাওয়া যায় কবিদের রচনায়। মধ্যযুগে খাদ্য তালিকার মধ্যে তরকারী, মশলা, মাছ, মাংসের প্রচলন ছিল। উক্ত খাদ্য-তালিকার সঙ্গে বর্তমানকালে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের কোন পার্থক্য টানা যায় না। মুকুন্দরাম বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর বিবরণে প্রদত্ত খাদ্য-তালিকা হতে ঐ যুগে বর্ধমানের অধিবাসীগণের খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আবার ধনী ব্যক্তিরা হাটে-বাজারে এসে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করলেও মূল্য দেবার সময় যথার্থ মূল্যও দিতেন না। সেকারণে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের বাজার সরকার বা সমজাতীয় কোন ব্যক্তি হাটে-বাজারে এলে উৎকৃষ্ট দ্রব্য গোপনে লুকিয়ে রাখার রীতি ছিল। বর্ধমানের হাটে-বাজারে বিক্রিত দ্রব্য হতে খাদ্য-তালিকার উপকরণগুলি সহজেই অনুমান করা যায় এবং তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

'দুর্বলা বাজারে যায় পাছে দশ ভারী ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পান মুখে গুয়া
পরিধান তসরের সাড়ী ॥

দুর্ব্বলা হাটেতে যায়　　উভমুখে লোক চায়
ঐ আইসে সাধু-ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমত কাজ　　যার আছে ভয় লাজ
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥
আলু কিনে কচু কুমড়া　　সের মূলে পলাকড়া
পাকা আম্র কিনে ঝুড়ি মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি　　কিনিল নবাৎ চিনি
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে॥
মূল্য দিয়া পণ দশ　　কিনিল জীয়ন্ত শশ
জরঠ কমঠ কিনে রুই।
খরসুলা কিনে কই　　কিনিল মহিষা দই
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান　　সরস গুবাক পান
কিনিলেক কর্পূর চন্দন।
শাক বেগুন সার কচু　　খামআলু কিনে কিছু
বিশা দুই কিনিল লবণ॥
বাছি কিনে তালশাঁস　　হিঙ্গ জীরা রস বাস
চই মেথি জোয়ানি মহুরী।
মুগ মাষ বরবটি　　কিনিল সরল পুঁটি
সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি॥
রন্ধন সন্ধান জানে　　চিতল বোয়ালি কিনে
শোলপোনা কিনিল চিংগড়ী।
চতুর সাধুর দাসী　　আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥
কড়ি মূলে নারিকেল　　কুলকরঞ্জা পানীফল
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুলগাভা　　করুণা কমলা ঠাবা
সেরে জুখে কিনে ফুলবড়ি॥
তোলা মূলে তেজপতি　　ক্ষীর কিনে বিশা সাত
আদা বিশা দরে দশ বুড়ি।
মান ওল কিনে সারি　　দুগ্ধ কিনে ভার চারি
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ি॥'

এদেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

'রাঢ়ের রাঁধুনি ভালো বদ্যিদের পৈতে
নদীয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে?'

অর্থাৎ বহুকাল হতে রাঢ়ের রাঁধুনীদের খ্যাতি ছিল। বর্ধমানের লোকে কেবলমাত্র—

"পুঁই আমড়া ধান (চাল)
তিন নিয়ে বর্ধমান।"—আহার্য হিসাবে ব্যবহার করে না।

সাধারণ আহার্যবস্তুর সঙ্গে রাজসিক আহার্যদ্রব্য রন্ধনের প্রচলনও ছিল। সাধারণ রন্ধন প্রণালী, শাক্তদের রন্ধন প্রণালী ও এ যুগের রন্ধন প্রণালীর সঙ্গে মধ্যযুগের রন্ধন প্রণালীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে ঝামটপুরের (থানা কেতুগ্রাম) অধিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিরামিষ আহার্যদ্রব্যের যে তালিকা দিয়েছেন সেগুলি আজও অতীব উপাদেয়। কৃষ্ণদাসের বর্ণনায় আছে,—

'বত্রিশা আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদগসূপ॥
সার্দ্রক বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানচাকি আর॥
চই মরীচ সুক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্‌গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥
বত্রিশ আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ়॥ (চৈতন্যচরিতামৃত ঃ মধ্যলীলা)

সেকালে জলপানের আয়োজন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাওয়া যায় (মধ্যলীলা ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য প্রতি বছর রথের সময় বহুবিধ আচার যেত। আচারের সংগ্রাহক ও বাহকের নামানুসারে—'রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার॥' চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্তলীলা ঃ দশম পরিচ্ছেদ) বিবিধ প্রকার আচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা,—

'আম্র-কাসন্দি আদা ঝাল-কাসন্দি নাম।
নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ বিধান॥

আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা ॥'

যদিও রাঘব বর্ধমানের অধিবাসী নন, কিন্তু কৃষ্ণদাসের রচনাতে বর্ধমানের প্রভাব পড়েছে বলে ধরা যায়। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার রন্ধন ও সাধভক্ষণ আখ্যানে রন্ধন প্রণালীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রচলন আজও আছে,—

'কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুঠে নিঙোড়িয়া তাহে দিল আদার রস ।।'

অথবা, 'আমড়া নেয়াড়ি পাকা চালিতা। আমসী কাসন্দি কুল করঞ্জা ।।
থোড় ডুমুর ইলেচা মাছে। খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে।'

লোকসাহিত্য ঃ

লোকসাহিত্য লোকমুখ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রচনা প্রধানতঃ একজনের হলেও সমগ্র সমাজের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এটিকে নিজের মত করে নেয়। আমাদের সমাজজীবনের উপর লোকসাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। শিশুকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখা যায় লোকসাহিত্যে। কালক্রমে রচয়িতাগণের নামে হারিয়ে গেছে ; কিন্তু রচনাগুলি নিজেদের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন জেলায় নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোকশ্রুতির সকল বিষয়ই মূলতঃ ব্যক্তি বিশেষরই সৃষ্টি, তারপর সেখান থেকে জনসাধারণ তা গ্রহণ করে এবং ক্রমাগত কথনের ফলে সেটি নূতন করে পুনর্গঠিত হয়। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা পরিণামে এক সামগ্রিক রূপ লাভ করে।

ছড়া ঃ

আমাদের জীবন যেমন শিশুকাল হ'তে শুরু হয়, তেমনই মনের খোরাক যোগানোর সূত্রপাতও এই শিশুদের নিয়ে। শিশুদের গ্রহণযোগ্য শব্দসমষ্টি ছন্দের তালে তালে শিশুর বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছন্দোবদ্ধ শব্দগুচ্ছ আবৃত্তি করে শিশুর কান ও মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়। শিশুদের ভুলানোর ছড়াগুলিই 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে সংজ্ঞা লাভ করেছে। 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্য-কর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ জল আতর ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম

সৌকুমার্য আছে ; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।"

বর্ধমানের ছড়াগুলি আবার এক এক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, তাই সেগুলি কিছুটা আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট। তবে অধিকাংশ ছড়া ঐ দোষে দুষ্ট না হলেও উচ্চারণ ভঙ্গীর জন্য একটা বিশেষ অঞ্চলকে মনে করিয়ে দেয়। এই জেলায় প্রচলিত কিছু ছড়া রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় এবং বাংলার কয়েকটি স্থানে যে ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণ বিদ্যমান। বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থগুলি ও গ্রামগঞ্জে সন্ধান করলে যেমন জানা যাবে এর সত্যাসত্যতা তেমনি এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতেও বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে এর যথার্থ ভূমিকা।

ছেলে ভুলানো ছড়া :

ছেলে ভুলানো ছড়া বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ঠাকুরমা, দিদিমা, মা, কাকীমা, জেঠিমা, মাসীমা, পিসিমা ও দিদিদের মুখে মুখে এই সকল ছড়ার সৃষ্টি ও প্রচার হয়ে লোক-সমাজে প্রচলিত হয়েছে। বাংলার প্রায় সব জেলাতেই ছড়ার প্রচলন আছে এবং প্রত্যেক স্থানে রচিত ছড়াগুলি তার নিজস্ব গুণে বিকশিত হয়েছে। ছন্দোবন্ধ হওয়ায় ছড়ার শ্রুতিমাধুর্য লক্ষিত হয়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলির তারতম্য দেখা যায়।

বর্ধমান জেলায় রচিত ও প্রচলিত ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে প্রাচীন যে ছড়াটির সন্ধান পাওয়া যায়, তা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পরিবেশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সমগ্র বাংলার মধ্যে এটিই সর্বপ্রাচীন ছেলে ভুলানো ছড়া। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ আছে—ধনপতি সদাগর সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়ে যে সময়ে রাজাদেশে বন্দী হন, সেই সময়ে মঙ্গলকোটের কাছে উজানীতে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্তের জন্ম হয়। বণিক পত্নী খুল্লনা তাঁর সাত রাজার ধন এক মানিক শিশু শ্রীমন্তকে যে ভাষায় আদর করেছেন সেটি কেবলমাত্র বর্ধমানেই নয়, সারা বাংলার মধ্যে প্রাচীনতম ছেলে ভুলানো ছড়া। ছড়াটি হল,—

'আয় আয়রে বাছা আয়। কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায় ॥
আনিব তুলিয়ে গগনফুল। ঐকেক ফুলের লক্ষেক মুল ॥
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার। সোনার বাছা কেঁদনা আর ॥
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া। কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া ॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া। রাজার দুহিতা করাব বিয়া ॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়। কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায় ॥
পালঙ্কে নিদ্রা যাবে চামর বায়। শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায় ॥'

শীতকালের সকালে কোলের শিশুটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চোখে কাজল দিয়ে, দুধ পান করিয়ে সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত হবার পূর্বে মা শিশুটিকে ঘুম পাড়াতে

চান। ছন্দের তালে তালে মায়ের মুখের আবৃত্তি শিশুর কানে এক সম্মোহনী শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে ছোট্ট শিশু মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে।

'রোদ আয়রে হেনে। ছাগল দেব মেনে॥
ছাগলীর মা বুড়ী। কাট কুড়ুতে গেলি॥
ছ'খানা কাপড় পেলি। ছ'বউকে দিলি॥
আপনি মরিস জাড়ে। কলাগাছের আড়ে॥
কলা পড়ে দুপ্ দাপ্। বুড়ী ধায় কুপ কাপ॥
যা বুড়ী তুই ষষ্টিতলা। সেথা পাবি খই কলা॥
যা বুড়ী তুই সিংটী। সেথা পাবি আংটী॥
যা বুড়ী তুই কোলকাতা। সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা॥
যা বুড়ি তুই বদ্দমান। সেথা পাবি জলপান॥
বদ্দমানের রাঙা মাটি। বুড়ীকে ধরে ছ্যাড়াং কাটি॥'

আবার এ ছড়াটি একটু বড় বয়সের শিশুরা গোল হয়ে খেলা করে। সমস্বরে আবৃত্তি করতে করতে খেলা করে। নিজেদের মধ্যে একজনকে বুড়ি ঠিক করে নেয়। ছড়াটি আবৃত্তি করার পর সবশেষে অন্যান্য সকলে বুড়িকে চ্যাংদোলা করে (এক এক জন হাতপাগুলি ধরে) তুলে নিয়ে কিছুদূরে ছেড়ে দেয়।

সাধারণতঃ সাত-আট বছরের মেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে সুর করে এই ছড়াটি আবৃত্তি করতে থাকে ঃ

'উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশি। নল ভেঙ্গেছে একাদশী॥
একানল পঞ্চদল। কে যাবি রে কামারশাল॥
কামারনী খাঁড় ভাঙ্গানি। খাঁড়ার উপর তোলে পানি।
অর্পণ দর্পণ। কুড়ি কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ॥'

ছোট শিশুদের ঘুম পাড়ানির ছড়া রূপে ব্যবহৃত একটি ছড়ায় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে এবং পাঠান্তরিত হয়ে ছড়াটি প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিভীষিকার ন্যায় বর্গী হাঙ্গামার ভয়ে ভীত পিতামাতারা ক্রন্দনরত শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য ছড়াটি আবৃত্তি করত। সেই সময় হতে বর্ধমানে প্রচলিত ছড়াটি হল,—

'ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে॥
ধান ফুড়লো পান ফুড়লো এখন উপায় কি।
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেচি॥'

মেয়েলী ব্রত-এর ছড়া ঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমান জেলায় মেয়েলী ব্রত পালনের প্রচলন

আছে। কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল এই জেলার অধিবাসীগণ তাদের কিছু নিজস্ব ধ্যানধারণার ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকে ব্রতগুলি পালন করে বা সেভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির ন্যায় বর্ধমানের সংস্কৃতি বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদান এবং চেতনার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে গঠিত। বাঙালী হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে পৌরাণিকধর্ম অপেক্ষা লোকধর্মের প্রাধান্যই অধিক। লোকধর্মকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়। অশাস্ত্রীয় লোকধর্ম কিন্তু অপাংক্তেয় নয়। অশাস্ত্রীয় ব্রত পালন অসামাজিক নয়। বরং সেটি শাস্ত্রীয় ছত্রছায়ায় পালিত হয়ে এসেছে। প্রচলিত ব্রত পালনে ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মেয়েলী ব্রত অধিকাংশ অশাস্ত্রীয় পর্যায়ভুক্ত এবং এটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা কুমারীব্রত, সধবা-ব্রত ও বিধবাব্রত। আমাদের বর্তমান আলোচনা কুমারী ব্রত প্রসঙ্গে। এই ব্রতে তন্ত্রমন্ত্রের স্থান নাই—স্থান নাই জ্ঞান মার্গের আর ভয় নাই পরকালের। পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাস কুমারীব্রত অনুষ্ঠানের একমাত্র কামনা-বাসনা। ব্রত অনুষ্ঠানের সময় তন্ত্রমন্ত্রের পরিবর্তে কিছু মন্ত্র বলার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে 'মেয়েলী ব্রতের ছড়া' নামে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

মেয়েলী ব্রতের অধিকাংশই কৃষিভিত্তিক অর্থাৎ যা কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বর্ধমান জেলায় কুমারী মেয়েদের প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পুণ্যিপুকুর, পদ্মপাতা, দশ পুতুল, হরিচরণ, যমপুকুর, সাঁজপুজনী, তোষলী, ইতু পুজার ব্রতই প্রধান। গোকালব্রত, দশ পুতুল ও হরিচরণ ব্রত তিনটি ছাড়া বাকিগুলি কৃষিদেবতার পুজা। ঐ পুজায় ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ কৃষিজাতদ্রব্য ; যা মানুষের আহার বা ঔষধি। ছোটদের পুজার সামগ্রী দেখে পরিহাস করার কিছু নেই। কারণ প্রাপ্তবয়স্কেরা যখন নবপত্রিকার পুজা করেন, তখন নবপত্রিকার জন্য সংগৃহীত পল্লবরাজি মানুষের খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে,—

'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িম্বৌ।
অশোক-মানকশ্চৈব ধান্য চ—নবপত্রিকা ।।'

অর্থাৎ কলাগাছ, কচুগাছ, হরিদ্রাগাছ, জয়ন্তী (জায়ফল) গাছ, বেলগাছের ডাল ও ফল, অশোক ডাল, মানগাছ, ধানগাছ, শ্বেত-অপরাজিতা-লতা একত্র বেঁধে দিলে নবপত্রিকা রচিত হয়। পণ্ডিতেরা এই নবপত্রিকাকে কৃষি-সম্পদের প্রতীক বলেছেন। যমপুকুরে ব্যবহৃত শাকের লতাও দেবীর শাকম্ভরীর প্রতীক। চণ্ডীতে আছে দেবী শক্তির দ্বারা শাক অর্থাৎ উদ্ভিদ উৎপন্ন করে জীবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই তিনি শাকম্ভরী। সাঁজপুজনীব্রতের সময় যত রাজ্যের ফল ফুলের প্রয়োজন হয়। মেয়েদের যতগুলি ব্রত আছে তার মধ্যে সাঁজপুজনী ব্রতের যোগাড়ের আধিক্য এবং সমারোহ অধিক। ব্রতের দিন মেয়েটির সকাল হতে ব্যস্ততা দেখে মনে হয় যে, ঐ দিনটিতে সে একজন বেশ উঁচুদরের গৃহিণী। সকাল হতে ব্রতের ঘট-বিসর্জন পর্যন্ত তার নাওয়া

খাওয়ার সময় মেলেনা—সকাল দুপুর বিকাল সকল সময়ে যোগাড়ে ব্যস্ত। কিন্তু হরিচরণ ব্রতে পূজার সমারোহ বিশেষ নাই—একটু মাটি, খান কয়েক তুলসীপাতা আর মনের ভক্তি সম্বল করে এই ব্রত সমাধান করা যায়।

ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করার আগে কুমারী মেয়েরা বর্ষীয়ানদের নিকট বসে ছড়াগুলি মুখস্থ করে আবার অনেকে সেটি লিখে নিয়ে ঐ লেখা দেখে ব্রতের সময় আবৃত্তি করে চলে। মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ব্রতের ব্যবহারিক বিষয়গুলি লুপ্ত হলেও ছড়াগুলি কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্ধমানে প্রাপ্ত ও প্রচলিত ব্রতের ছড়াগুলির ভাষা প্রাচীন নয়; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ভাবগুলি প্রাচীনত্বকে ধরে রেখেছে। মোহর, দোলা (পাল্কি), সতীন, ফার্সি, অভ্রের কৌটা প্রভৃতির ব্যবহারিক জীবনে অপ্রচলিত হলেও ব্রতের ছড়া থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

মেয়েলী ব্রতকথার সঙ্গে একটা লোকশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল এবং শৈশবকাল থেকে মেয়েরা এই শিল্পের চর্চা ও অনুশীলন করে এসেছে মা-মাসীমাদের তত্ত্বাবধানে। ব্রত বা পার্বণ উপলক্ষে গৃহস্থের সংসারে বিচিত্র নক্শার আল্পনা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এই আল্পনাগুলির অবদান হল মৌলিক। আতপ চাল জলে ভিজিয়ে শিলে বেটে প্রথমে পিটুলি তৈরী করা হয় এবং ঐ পিটুলিতে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে এক খণ্ড কাপড় গোল করে পাকিয়ে হাতে নিয়ে তিনটি আঙ্গুলকে তুলির মত ব্যবহার করতে হয়। সহজাত কুশলতা ও সংস্কারবশে মেয়েরা অতি দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন কলাকৌশলের দ্বারা রেখাঅঙ্কনবিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। বাংলার ঘরে ঘরে বারোমাসের পূজা-পার্বণে যে আল্পনা দেওয়ার বিধি ব্যবস্থা আছে তার অনুশীলন ও অধ্যয়নের পাঠ হাতেকলমে শুরু হয় ৯।১০ বছর বয়সেই। সাঁজ-পূজনী ব্রতে বিভিন্ন প্রকার নক্শা দেখা যায়, যথা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পদ্ম, নৌকা, ঘোড়া, পাল্কী, ধানের শিষ ইত্যাদি। উক্ত অনুশীলনের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে মেয়েটি যখন গৃহিনী পদে উন্নীত হয় তখন তার শিল্পীহস্তের কুশলতায় আল্পনার রেখাঅঙ্কনের নির্ভুল পরিপাটিজনিত আঙ্গুলের স্পর্শে ও নক্শা বিন্যাসে জন্ম নেয় নক্শা করা কাঁথা। শিল্পীর সুদক্ষ সেলাই ও নক্শা জ্ঞানের দ্বারা পুরানো কাপড় হয়ে ওঠে এক লোভনীয় বস্তুতে। বাংলার চালাঘরের পরিকল্পনাও এসেছিল আল্পনা হতে এবং সম্ভবতঃ তার পরিণতি দেবদেউল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল দোচালা, চারচালা ও আটচালা রীতিতে।

সাঁজ-পূজনী ব্রত ঃ

কুমারী মেয়েদের ব্রতগুলির মধ্যে 'সাঁজ-পূজনী' ব্রত হল শেষ ব্রত এবং গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মকর্ম করতে হলে কুমারী জীবনে 'সাঁজ-পূজনী' ব্রতটি অবশ্য পালনীয়। আমার এক আত্মীয়া সাঁজ-পূজনী ব্রত অনুষ্ঠান না করায় তাঁর 'বীর অষ্টমী' ব্রত উৎযাপন করা হয় নাই। বর্ধমানে একটা প্রবাদ আছে,—

'সকল ব্রত করলেন ধনী। বাকী রেখে সাঁজ-পূজনী'।।

পূজার যোগাড় করে নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের ডেকে মন্ত্র বা ব্রতের ছড়া আবৃত্তি করতে করতে প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর ফুল দেওয়া হয়। মন্ত্রটি হল,—

'সাঁজ-পূজনী অরুন্ধতী, এ ব্রত করে পার্বতী,
এ ব্রত কল্লে কি হয়—
সভা সুন্দর পতি পায়, রাজচন্দ্র পুত্র হয়।'

ঘটপূজা—'সাঁজ-পূজনী সেঁজুতি বার ঘরে তের বাতি
একঘরে মোর ঘটটী,
ঘটটী পূজি, মাগি বর, ধন পুত্রে বাড়ুক ঘর।

গঙ্গা-যমুনা পূজা—'গঙ্গা যমুনার পূজারী হয়ে, সাত ভাইয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।'

চন্দ্র-সূর্য পূজা—'চাঁদ সূর্য্যি পূজন, সোনার থালে ভোজন।
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু, শঙ্খের উপর সোনার খাড়ু ॥'

শরবন পূজা—'শর, শর, শর, আমার বাপ্ ভাই গাঁয়ের বর।'

বেনাগাছ পূজা—'বেনা, বেনা, বেনা, আমার বাপ্ ভাই গাঁয়ের সোনা,
সোনা সোনা ডাক্ পাড়ে, গাগাছি গুয়ো পড়ে,
আমার বাপ্ ভাই বিলিয়ে দেয়, অন্যের বাপ্ ভাই কুড়িয়ে খায়।'

কাজললতা পূজা—'কাজললতা, কাজললতা বাসর ঘর,
দাও মেলানী পাই বর।'

ফুলগাছ পূজা—'ফুলগাছ ফুলগাছ ঝাকরা সতীন বেটী মাকরী
সাত সতীনের সাতটা কোটো আমার আছে নবীন কোটো
নবীন কোটো নড়াচড়া সাত সতীনের মুখটা পোড়া।'

ঢেঁকি ও ঢেঁকি পরন্ত, উনুন জলন্ত।
উনুন পূজা—বাপ ঘর, শশুড় ঘর সমান চলন্ত ॥'

দীপ ও গোময় পূজা—'বাসি গোবর থাসি থাসি বৌরান্না ভালবাসি
উনুনে না দিই ফুঁ বৌরান্না ভাত খেয়ে চাঁদপানা মু।'

এছাড়া আল্পনায় অংকিত টাকাকড়ি, মোহর ও অলংকার ইত্যাদি স্বচ্ছল জীবন-যাত্রার উপযোগী দ্রব্যের প্রতীকের উপর ফুল ছড়িয়ে বলে—

'তোমাকে দিলাম পিঠালীর মোহর, আমাকে দাও সোনার মোহর।
তোমাকে দিলাম পিঠালীর খাড়ু, আমাকে দাও সোনার খাড়ু।'

এরপর ক্রম অনুযায়ী অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের উপর ফুল ছড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করে সবশেষে দীপ পূজার মন্ত্র পাঠ করা হয়—

'রূপোর প্রদীপ সোনার শিষ ; শ্বতদূর [অমুক] যায় আলো দিস।'
কলারপাতা 'আঙ্গট পত্র কলার পাত, চার বছর করলাম বত।

পূজা ঃ 'যত বত তত মতি [অমুক] আমাদের পুণ্যবতী ।'

পূজার শেষে শরফুল দুটি আগুনে জেবলে জবলন্ত অবস্থায় পূজার ফুলগুলিকে জড়ো করার সময় প্রণামের ভঙ্গীতে মন্ত্র পাঠ,—

'অরুণ ঠাকুর বরণে, ফুল ফুটেছে চরণে ।
যখন ঠাকুর ঘাটে যান, ফুলগুলি সব কুড়িয়ে লন ।'

পূজা সমাপন্তে ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিসহ ঘটের জল পুষ্করিণীতে ভাসান হয় এবং প্রত্যাবর্তনের পথে পথে সাড়া জাগান চিৎকার শোনা যায়,—

'ঘট গেল ভেসে
ভাই এলো হেঁসে ।'

সবশেষে উপস্থিত শিশু ও রমণীগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করার প্রথা আছে এবং এই প্রসাদ খেলে দাঁত শক্ত হয় । তবে ব্রতচারিণীকে ঐ প্রসাদ খেতে নাই ; অবশ্য তার জন্য প্রসাদী হবার পূর্বেই কিছুটা মাখা-চাল তুলে রাখার রীতি আছে । এইভাবে চার বছর ধরে ব্রত অনুষ্ঠান করার পর চতুর্থ বছরের শেষে মুড়ির নাড়ু বিতরণ করে 'ব্রত উজান' (উৎযাপন) সমাপ্ত হয় । এ প্রথা আজও শহর ও পল্লী-গ্রামে প্রচলিত আছে ।

পুণ্যি পুকুর ব্রত ঃ বৈশাখ মাসে কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে । পুণ্যি পুকুরব্রত অনুষ্ঠানের জন্য পূজার উপকরণ বিশেষ প্রয়োজন হয় না । বাড়ীর উঠানে বর্গাকারে (১ হাত × ১ হাত) ছোট খাল কাটা হয় ; যেটি ব্রতচারিণীর কাছে 'পুণ্যপুকুর' এবং মাটি দিয়ে এর চারদিকে বাঁধ দেওয়ার রীতি আছে । অতঃপর কাঁটাসহ বেলের ছোট ডাল পুকুরের মধ্যে পোঁতা হয় । বেলের কাঁটাগুলিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে আতপ চাল, ছোলার ডাল ও স-শিষ কাঁচা আমকে নৈবেদ্যরূপে সাজিয়ে সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে বাড়ীর মধ্যে ছোট মেয়েটির অনুষ্ঠান চলে । এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের তুলনা করা যায় । পুষ্করিণী খননের পর খালের মধ্যভাগে বেলকাঠ পোঁতার পর পূজা ও হোমান্তে দুধ-গঙ্গাজল ঢালা হয় ।

'পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা । কে পূজেরে দুপুর বেলা ।।
আমি সতী নিরবতী । সাত ভাই-এর বোন ভাগ্যবতী ।।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে । মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে ।।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মেয়ের মা, সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে স-শিষ কাঁচা আম, আতপ চাল ও ছোলার ডাল সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ গাছ, তুলসীতলা ও দেবালয়ে নিবেদন করে থাকে ।

হরিচরণ ব্রত ঃ একটু বড় বয়সী মেয়েরা মাটির তৈরী শ্রীহরি বা নারায়ণের পদযুগলে পূজা করে থাকে । শিব যেমন বিল্বপত্রে তুষ্ট, নারায়ণও অনুরূপভাবে একটু চন্দন, দু-চারখানা তুলসীর পাতা আর গঙ্গাজলেই সন্তুষ্ট থাকেন । এ

ব্রতের নাম 'হরিচরণ ব্রত'। মেয়েটি পা মুড়ে বসে ধীরে ধীরে শেখানো মন্ত্র বা ব্রতের ছড়া আবৃত্তি করে যায়। বর্ধমানে প্রচলিত ছড়াটি হল,—

'হরির চরণ হরির পা। চুয়ো চন্দন দিয়ে পূজি পা ॥
হরি বলে ওগো মা। কোন ভাগ্যবতী পূজে পা ॥
সে ভাগ্যবতী কি চায়। মনোমত বর চায় ॥
মন ভরা ধন চায়। কোল ভরা পুত্র চায় ॥
বাড়ী ভরা গোলা চায়। আড়ি ভরা সিঁদুর চায় ॥
সভা সুন্দর পতি চায়। রাজার মত পুত্র চায় ॥
গোয়ালে গরু বাকারে ধান। বছরান্তে পুত্র চান ॥
মরণ হয় স্বামী পুত্রের কোলে। এক গলা গঙ্গার জলে।'

তুষ-তোষলী ব্রত : শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই উপজাতীয় ধ্যান-ধারণা থেকে টুসু পূজা শুরু হয়েছিল এবং এর পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়েছে 'তুষ-তোষলী ব্রত'। কুমারী, সধবা বা বিধবা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হতে শুরু করে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত ব্রত অনুষ্ঠান করা হয়। গোবরের সঙ্গে ধানের তুষ মিশিয়ে একুশটা নাড়ু তৈরী করে মাটির সরায় রেখে তার উপর ২১টি করে অশ্বত্থ ও বেগুন ঢাকা পাতা দিতে হয়। এর-পর মাটির তৈরী বুড়োবুড়ির মূর্তি গড়ে সরায় রেখে প্রত্যহ ভোর বেলায় সরিষার ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। অনেক গ্রামে বুড়োবুড়ির পরিবর্তে লক্ষ্মীমূর্তি রাখার প্রথা আছে। এক মাস ধরে ব্রত পালনের পর মালসাসহ অন্যান্য দ্রব্যগুলি পুষ্করিণী অথবা নদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। সীমান্ত বাংলায় টুসু উৎসবের পরিবর্তিত রূপ হল তুষ-তোষলীর ব্রত, যার মধ্যে শস্যোৎসবের ইঙ্গিত নিহিত আছে। ধান্যের পর প্রধান শস্য সরিষা, তাই ডাইনির দ্বারা যাতে সরিষা নষ্ট না হয় তার জন্য সরিষা ফুল দিয়ে সম্ভবতঃ পূজার বিধান আছে। টুসু উৎসবে যেমন 'ফুলসই' পাতানোর রেওয়াজ আছে, তেমনি বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে দুটি ছোট মেয়েদের মধ্যে সই পাতানোর প্রথা আগেও ছিল এবং আজও সেই ধারা বয়ে চলেছে। এই ব্রতের ছড়ায় ধনে জনে পরিপূর্ণ সংসারের আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়েছে। ছড়াটি হল,—

'তুষুলী গো রাই, তুষুলী গো মাই,
তোমায় পূজিয়া আমি কি বর পাই।
অমর গুরু বাপ চাই, ধন সাগরে মা চাই।
রাজেশ্বর স্বামী চাই, সভা আলো জামাই চাই।
সভাপণ্ডিত ভাই চাই, সভাশোভা বেটা চাই।
সিঁথের সিঁদুর দপ্‌দপ্‌ করে, হাতের নোয়া ঝক্‌ঝক্‌ করে।
আলনায় কাপড় দলমল করে, ঘটি বাটি ঝক্‌মক্‌ করে।
সিঁথের সিঁদুর মারাই-এ ধান, সেই বুবতী এই বর চান।'

যমপুকুর ব্রত ঃ বর্ধমান জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হতে সারা কার্তিক মাস ধরে যমপুকুর ব্রত অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। কুমারী মেয়েরা এই ব্রতের অধিকারিণী। বাড়ীর উঠানে একটা ছোট পুকুর (২½ ফুট × ২½ ফুট) কেটে চার কোণে খেত তৈরী করে কলাই, মটর, ছোলা ও খেঁসারির বীজ বপন করা হয় এবং পুকুরের মধ্যস্থলে একঝাড় সবুজ ধানগাছ, সাদা ও কালো কচুগাছ, কলমী ও শুশুনী শাকের লতা অল্প জলে পুঁতে রাখতে হয়। পুকুরের পাড়ে একটি সিঁদুর মাখা ঘট স্থাপন করার বিধি আছে। ঐ ক্ষুদ্র সংস্করণের পুকুরটির মধ্যে একটা সজীব চ্যাং মাছ ছেড়ে দিতে হয় এবং চার কোণে ৪খানি হলুদ ও ৪ টি কড়ি পুঁতে রাখা হয়। এক মাস ধরে সূর্যোদয়ের পূর্বে (ব্রতের মন্ত্র কাকে শুনলে ব্রত পচে যায় ; এই বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে) শুদ্ধ কাপড় পড়ে চন্দন মাখান পুষ্প দিয়ে যমপুকুর পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করা হয়।

পুকুর পূজা ঃ 'যমপুকুরটী পূজন। সোনার থালে ভোজন ॥
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু। শঙ্খের উপর সোনার খাড়ু ॥'

একই মন্ত্রে ধানগাছ, খেত ও পুকুর পাড়ের পূজা করা হয়।

কচুগাছ পূজা ঃ 'কালো কচু ধল কচু লকলক করে।
যমের দুয়োরে অর্গল পরে ॥'

পুকুরে জল ঢালার সময় মন্ত্র ঃ

চার কোণা পুকুরটি টাবু টুবু করে। চ্যাং মাছটি এদিক ওদিক লাফিয়ে পড়ে ॥
শুশুনী কলমী দমদম্ করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারে পক্ষী শুকোয় বিল। সোনার কপাট রূপোর খিল ॥
খিল খসাতে হাতে ছড়। আমার বাপ্ ভাই লক্ষেশ্বর ॥

সবশেষে প্রণামের সময় বলা হয়,—

'যমপুকুর ব্রত করে যে। যমের জ্বালা পায় না সে ॥'

তুষু উৎসব ঃ

তুষু বা টুসু বিহার-পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী স্থানের লোক-উৎসব। এই উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হতে পৌষ-সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। বর্ধমান জেলায় টুসু উৎসবের ধুমধামের আধিক্য কম। কেবলমাত্র জেলার সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং ঐ অঞ্চলে তুষু বা টুসুকে নিয়ে ছড়ার প্রচলন আছে। টুসুকে দেবতার পরিবর্তে কন্যারূপে পাওয়া যায় এবং ছোট কন্যার মনের মত করে ছড়াটি রচিত হয়েছিল। আবার অনেক সময় ভাদু গান ও তুষ গান প্রায় মিশে গেছে। বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে এরূপ একটা গানের প্রচলন আছে (প্রবাসী, ১৩৩৩ সাল, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৮৭),—

'চল তুসু, চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা।
খেলতে খেলতে দেখে আসব কয়লা-খাদের জলতোলা ॥

হলুদ বনের তুষু তুমি হলুদ কেন মাখ না ?
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না ॥
ও তুষুর মা, ও তুষুর মা, তোদের কি কি তরকারী ?
ঐ শালারি ক্ষেতের বেগুন ঐ কানারির গুগলী ॥
বাড়ীময় নীল বুনেছি নীলের শুঁটি ধরে না ।
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না ॥
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই-আসে না ।
জামাই আদর বড় আদর তিন বেলা বই থাকে না ॥
আর দু'দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান ।
বসতে দিব শীতল পাটী নীলমণিকে করব দান ॥
চল তুষু, চল সারদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব ।
কুলির জলে সিনান করে রোদেতে চুল শুকাব ॥
এক কিল সইলাম, দু'কিল সইলাম, তিন কিল বই আর সইব না ।
যা লো ননদ, বলে দিবি, তোর ভাইয়ের ঘর আর করব না ॥
নদীর ধারে গাই বিয়োল বাছুরের নাম হাসি গো ।
রাখালটাকে কিনে দিব পিতল বাঁধা বাঁশী গো ॥'

ভাদু উৎসব :

ভাদু উৎসব হল ভাদ্র মাসের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলায় এবং সংলগ্ন বিহার রাজ্যের দু' একটা জেলায় প্রধানত ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাদু উৎসবের উৎস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান মতবাদ হল এই যে, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিংহদেও-এর কন্যা ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরানির অকালে মৃত্যু ঘটায় তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কাশীপুরে ভাদু উৎসব বা ভাদু গানের প্রচলন হয়। কিন্তু রামশঙ্কর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, এ ঘটনার কোন ঐতিহাসিকতা নাই। কারণ নীলমণি সিংহদেও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ) সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর ভাদুরানি বা ভদ্রেশ্বরী নাম্নী কোন কন্যা ছিল না। এঘটনা মেনে নিতে হলে ভাদু উৎসবকে আধুনিক উৎসব রূপে গণ্য করতে হবে। অথচ এটি একটি প্রাচীন লোক উৎসব। শেখ শুভোদয় গ্রন্থে ভাদ্র মাসে ভাজো বা ভাদো ব্রত পালনের কথা ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—'ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্র পূজার সঙ্গে অথবা বাস্তু পূজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে ভাদু পরব হইয়াছে।' রামশঙ্কর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, ভাদু উৎসবের সঙ্গে চাষবাসের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আষাঢ়-শ্রাবণ দু'মাস ধরে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাদ্র মাস হতে ধানের গাছ বাড়তে শুরু হলে চাষীর মন উৎফুল্লে ভরে উঠে। তাই চাষী-ঘরের

মেয়েরা এটিকে ফসল ফলানোর উৎসবরূপে গণ্য করে। তবে ভাঁজা বা ভাঁজো উৎসবের সঙ্গে ভাদু উৎসবের তফাৎ আছে। ভাঁজো উৎসব হয় শুক্ল ইন্দ্র দ্বাদশীর রাত্রে।

ভাদু গানের বিষয়বস্তুতে পৌরাণিক আখ্যানও আছে আবার এ যুগের পঞ্চায়েত, রিলিফ ব্যবস্থা ও ডি. ভি. সি. নিয়ে গান রচনা হয়েছে। অধ্যাপক গোপেন্দুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তুলসী ডাঙ্গা (থানা—ভাতাড়) হতে যে গানটি সংগ্রহ করেছিলেন তাতে ভাদুকে জননী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে,—

'ভাদু পরম সতী—ভাদুর পদে করি মিনতি।
গোলকেতে ছিলেন ভাদু নারায়ণের প্রকৃতি
দ্যুলোক ভুলোকে আসে গোকুলে হয় শ্রীমতী।
ভৃগুরাজা ভাদুর পিতা মাতা হল পুলমা সতী
বর্ধমানে জন্ম ভাদুর সাধু সন্ন্যাসী ভারতী।
ভাদু মণি মা জননী গো
সন্ধ্যা দাওগা সকালে
ভাদু ছিলেন গোকুলে
ভাদু পরম সতী ॥'

লোকঅনুষ্ঠানের ছড়া ঃ

মেয়েলী ব্রতকথায় ছড়া মন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ব্যবহারের 'অধিকারিণী হলেন বাড়ীর কর্ত্রী। পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিবসের রাত্রে আহারান্তে সকল কাজ শেষ করে বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে গৃহকর্ত্রী পৌষ ডাকতে যান। গোবর (ষাঁড় বা মহিষের গোবর নিষিদ্ধ) গোল করে পাকিয়ে তিনটিকে ত্রিভুজাকৃতি করে তার উপর আরও একটিকে স্থাপন করা হয়। মনে হয় ত্রিভুজাকৃতি অংশটি তিন ভুবনের সমষ্টি এবং তার উপরে স্থাপিত আছে গোলোক—যথায় লক্ষ্মী-নারায়ণের অধিষ্ঠান। আবার ত্রিভুজাকৃতির জন্য সেটিকে কোন তান্ত্রিক-যন্ত্রও বলা যেতে পারে, যার উপর চতুর্থটিতে লক্ষ্মীদেবীর আসন। পূজার উপকরণ হিসাবে সিঁদুর, মুলোর ফুল, সরিষার ফুল, ধূপ-দীপ যোগাড় করতে হয়। বাড়ির উঠান, সদর দরজাসমূহ, গোয়াল-ঘর, তুলসীতলা, গৃহদেবতা ও অন্যান্য স্থানে পৌষ ডাকার রীতি আছে। জল ছিটিয়ে গোল করে পাকানো গোবরের ভেঁটা চারটিকে মাটিতে স্থাপন করা হয়। অতঃপর সিঁদুর সহযোগে মুলোর ফুল ও সরিষার ফুল দিয়ে মন্ত্র পাঠ করা হয়,—

'এসো পৌষ যেয়ো না।
জন্ম জন্ম ছেড়ো না॥
পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি।
হাতে নড়ি কাঁকে ঝুড়ি।
পৌষ আসছে গুড়ি গুড়ি॥

আনবো গাঙ্গের জল, ঘরে বসে নেয়ো ধুয়ো।
বাহান্ন পৌটি হয়ো, ঘরে বসে পিঠে খেয়ো।
এমন সোনার পৌষ যেন জন্ম জন্ম হয় ॥'

এভাবে পৌষ লক্ষ্মীকে আবাহন করা হয়—'তুমি যেন আমার বাড়ীতে জন্ম-জন্মান্তরে বাঁধা থাকো'। মুলা ও সরিষার ফুল উৎসর্গ করার তাৎপর্য হল পৌষ মাসেই মুলার আয়ুকাল শেষ—তাই মুলার ফুলে লক্ষ্মীদেবীর প্রয়োজনীয় শ্বেত পুষ্প দিয়ে পুজার ব্যবস্থা এবং পয়লা মাঘ হ'তে বাঙালী বিধবারা মুলা আহার করেন না। আউশ ধান তোলার পরে অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সরিষার বীজ বপন করা হয়। পৌষ মাস পর্যন্ত গাছ বড় হয়ে ফুল আসে এবং মাঘ মাসে ফল ধরে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঐ ফল পেকে যায় এবং ঐ সময় শস্য ঘরে তোলা হয়। সরিষার ফুল লক্ষ্মীর পায়ে সমর্পণ করে তাঁর নিকট উৎকৃষ্ট শস্যের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের নিকট গোবর পবিত্র জিনিস এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গোবরের প্রয়োজনীয়তাও অসীম। কিন্তু ত্রিভুজাকৃতি তিনটি ভেঁটার উপর একটি ভেঁটাকে স্থাপন করার অর্থ কি ? বর্ধমান জেলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার থাকিলেও ষোড়শ শতকের পূর্বে এই জেলায় তন্ত্রাচার ও শাক্ত দেবদেবীর পুজা পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল। প্রাধান্য আজও আছে তবে বৈষ্ণবধর্ম তার অংশীদার হয়ে লোক-সমাজে একটা আংশিক দাবী নিয়ে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সম্ভবতঃ ত্রিভুজাকৃতি অংশটি কোন তান্ত্রিক যন্ত্র এবং উক্ত যন্ত্রের উপর লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে বলেই মনে করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে অপর একটি অনুষ্ঠানের কথা এসে পড়ে। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'বিড়ে বাঁধা'। এ অনুষ্ঠানের প্রধান হোতা হলেন গৃহকর্তা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে অর্ধ-পক্ক ধানের খেতের ঈশান কোণ হতে আড়াই মুঠা ধানগাছ সংগ্রহ করা হয়। একটা শুদ্ধ কাপড়ে ধানগাছের গুচ্ছটিকে নবপত্রিকার অনুকরণে জড়িয়ে নেওয়া হয় এবং গৃহে পুরোহিত ডাকিয়ে অথবা ঠাকুর বাড়ীতে ঐ ধান গাছের পুজা করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এইভাবে আড়াই মুঠা ধান কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসাকে 'মুঠ' আনা বলে। পুজার শেষে কাপড়টি খুলে নিয়ে কোন নিরাপদ ও নিরুপদ্রব আশ্রয়ে মুঠ বা ধান গাছের আঁটিটিকে দু' মাসের জন্য রেখে দেওয়ার রীতি আছে। পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহকর্তা ঐ ধান গাছটি জলেভিজিয়ে হাঁটুতে চেপে ধরে আড়াই পাক প্যাঁচ দিয়ে প্রতিটি খড়কে পাকিয়ে নেন। পুজা করা হয়েছে বলে পায়ের পাতায় ধরতে নাই। আড়াই মুঠি ধান গাছ—আড়াই প্যাঁচ পাক, এ সকলের অর্থ কি ? তন্ত্র শাস্ত্রে 'তিন' শুভ এবং ব্যাপক প্রচলন থাকলেও লৌকিক বিশ্বাসে 'তিন', 'তেরো' ও 'তেইশ সংখ্যা অশুভ। সে কারণে তিন প্যাঁচ পাকের পরিবর্তে আড়াই মুঠি ধান গাছ ও আড়াই প্যাঁচ পাকের ব্যবস্থা। অতঃপর অপরাহ্ণে গৃহকর্তা পুজা করা প্যাঁচানো খড় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে একটি করে রেখে আসার জন্য। এ সকলের তাৎপর্য হল ; প্রথমেই দেখা যায় যে, আমন ধানে পাক ধরার সঙ্গে সঙ্গে ধান্য লক্ষ্মীকে

ঘরে এনে পূজার ব্যবস্থা করা। তারপর অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ধান কাটা পর্ব এবং প্রায় সারা পৌষ মাস ধরে ধান গোলাজাত করার ব্যস্ততায় কেটে যায়। অবশেষে শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে হাজির হয় পৌষ সংক্রান্তির দিনটি। চাষীরা আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত চাষের তদারকিতে নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকে এবং এই সময়ে চাষের উপযোগী প্রচুর জিনিসের প্রয়োজন হয়। এই বিড়ে দেওয়া প্রথার মাধ্যমে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত প্রতি জিনিসের খোঁজ পড়ে। মাঠে ও বাগানে বিড়ে দেওয়ার তাৎপর্যের অর্থ হল, যে সমুদয় কৃষিজাত দ্রব্য ঘরে তোলা হয় নাই সেগুলি ধান কাটার মরসুমে কিঞ্চিৎ অবহেলিত হয়ে থাকে। এই অবস্থায়, ঐগুলির খোঁজখবর নেওয়া, বাঁশবাগান, আম-কাঁঠালের বাগান প্রভৃতি সম্পর্কে কিছুটা অনুসন্ধানের জন্য বিড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অপরপক্ষে গৃহিণীরাও পিছিয়ে নেই। তাঁরাও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহে বিড়া বেঁধে দেন। এরও তাৎপর্য হল যে ব্যক্তি যে বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তিনি সেই সকল দ্রব্যের উপর বিড়া বাঁধেন অর্থাৎ গৃহকর্তার এক্তিয়ার হল কৃষি ও কৃষি-উপযোগ। দ্রব্যসমূহের উপর এবং গৃহিণীর অধিকারে রয়ে গেল গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ। বিড়া বাঁধা পর্ব চুকে গেলে রাত্রের আহারের পর পৌষ ডেকে শুভকর্ম সমাপনান্তে গৃহস্থের গৃহে আসে চরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি। পরদিন ভোরে অর্থাৎ উত্তরায়ণের দিন গৃহিণীরা উত্তরায়ণের স্নান সেরে নিজেদের পরম পুণ্যবতী ও সৌভাগ্যবতী মনে করেন।

ছড়ায় হেঁয়ালি ঃ

ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ব্রতের ছড়া ব্যতীত জনপ্রিয় ছড়ার ভাণ্ডার ভড়ে উঠেছে গ্রামনাম বা স্থাননামযুক্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে। এদেশেব গ্রামগ[illegible]র অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজ ও সংস্কৃতি[illegible]রা মূলতঃ কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের দিকে ঝুঁকেছে। গ্রামীণ আচারব্যবহার, খাদ্য, বিদ্যাচর্চা, ভৌগোলিক অবস্থা, জাতি বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত প্রথা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে গ্রামনাম বা স্থাননামকে কেন্দ্র করে ছড়ার প্রচলন শুরু হয়েছিল। এ ছড়াগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রুতিমধুর হলেও কখন কখন তার মধ্যে বক্রোক্তিরও প্রকাশ ঘটেছে। এ ধরনের ছড়াগুলি আবার ভৌগোলিক সীমা মেনে চলে না। মুখে মুখে রচিত হয়ে লোক সাধারণের দ্বারা এগুলি প্রচলিত হয়েছে। হয়ত নদীয়ার লোকের রচিত বর্ধমান সম্পর্কিত ছড়া অথবা বর্ধমানের লোকেদের দ্বারা রচিত বর্ধমান সম্পর্কিত ছড়া অথবা বর্ধমানের লোকেদের দ্বারা রচিত বীরভূম সম্পর্কিত ছড়াগুলি তার নজির।

ছড়ার মাধ্যমে স্থান বিবরণের তাৎপর্য সুদূরে প্রসারিত। "স্থান বিবরণী ছড়াগুলি, ছেলে ভুলানো ছড়া বা ঘুম পাড়ানি ছড়া-গানের মত মূলত কাব্যরস ভিত্তিক

না হলেও, সমাজ ইতিহাস নির্ণয়-এর উপাদানস্বরূপ গ্রাম্য ছড়াগুলি যে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"[৬৭] জীবিকা উপার্জনের পর ধর্মচর্চা, সমাজচর্চা, সাহিত্যচর্চা, ইতিহাসচর্চা করেও মনের খোরাক জোগাতে লোক-সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়। গ্রাম্য ছড়াগুলি লোকসাহিত্যের অঙ্গ। তাই এগুলিকে খুঁজতে হবে—জানতে হবে—আর সেই সঙ্গে সঙ্কলন করে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। ধাঁধা বা হেঁয়ালির মধ্যে অর্থনীতি, সমাজ ও লোকসংস্কারের অন্তর্নিহিত বীজগুলি লুকিয়ে আছে। হেঁয়ালির আকারে একটা ভৌগোলিক প্রশ্ন কবি কাশীরাম দাসের নামে প্রচলিত আছে,—

"বারো ঘাট তেরো হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর।
ইহা যে জানে তাহার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥"

অথবা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের ভাষায়,—

"অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বাম পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥"

উত্তরটি সমাধান করতে পারলেই কাশীরামের নিবাসস্থল জানা যাবে। আলোচ্য হেঁয়ালির অর্থ খুঁজে দুটি ভৌগোলিক প্রশ্নের উত্তর সমাধান করা যায়। প্রথমটির উত্তর হ'ল—ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্ভুক্ত, ইন্দ্রাণী (নগর ?) অঞ্চলে গঙ্গা বা ভাগীরথীর ডান তীরে দ্বাদশটি ঘাট, যথা—(১) বারো দুয়ারী ঘাট, (২) কালুর ঘাট, (৩) কদমতলার ঘাট, (৪) বকসীর ঘাট, (৫) স্বরূপপালের ঘাট, (৬) গণেশ মাতার ঘাট, (৭) শিবের ঘাট, (৮) দেওয়ানের ঘাট, (৯) মনোহারীর ঘাট, (১০) ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট, (১১) শঙ্খেশ্বরের ঘাট ও (১২) মায়ের ঘাট (মতান্তরে কান্তবাবুর ঘাট)। বার ঘাটের ন্যায় তের হাটেরও সন্ধান জানা যায়, যথা—(১) দাঁড়হাট (দাঁইহাট), (২) পাতাই হাট, (৩) মণ্ডল হাট, (৪) আকাইহাট, (৫) বিকিহাট, (৬) পানুহাট, (৭) খাঁর হাট বা গুড়ে হাট, (৮) ঘোষ হাট, (৯) আতু হাট, (১০) গঞ্জ মুর্শিদপুর বা কাটোয়া শহরের হাট। হেঁয়ালিতে তিন চণ্ডীর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অতীতে এ অঞ্চলে তিন চণ্ডীর দেউল ছিল, যথা—আকাইচণ্ডী, পাতাইচণ্ডী ও কুলাইচণ্ডী। তিন দেবীর প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিন ঈশ্বরের (শিব) সন্ধান জানা যায়, তাঁরা স্থানীয়ভাবে চন্দ্রেশ্বর, শঙ্খেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামেই বিখ্যাত ছিল।

হেঁয়ালির দ্বিতীয় পর্যায়ের ছড়াটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোল শাস্ত্রানুসারে কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিককে নির্দেশ করে অর্থাৎ বর্ণনায় মাথা হবে উত্তর দিকে এবং পদতল দক্ষিণ দিককে নির্দেশ করে। গোপীনাথের পদতলে অর্থাৎ গোপীনাথের অধিষ্ঠানের দক্ষিণে অবস্থিত রচয়িতার বাসভূমি বা আবাসস্থল। তা'হলে অগ্রদ্বীপের মোটামুটি দক্ষিণে অবস্থিত কাটোয়া থানার সিঙ্গীগ্রাম, যা কাশীরাম দাস ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্মস্থানরূপে পরিচিত। তাহলে মাত্র দু' লাইনের এই ধাঁধা বা হেঁয়ালির মধ্যে

ইতিহাস বা পুরাতত্ত্বের অনেক গোপন কথা লুকিয়ে আছে, যেগুলিকে সন্ধান করে বের করতে হবে এবং ঐগুলির প্রকৃত সন্ধান জানা গেলে ইন্দ্রাণী জনপদের লুপ্ত ইতিহাস ও আরও বহু তথ্য যে আবিষ্কৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এগুলি একান্তই গবেষণার বস্তু। সুকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের লেখনীতে বর্ধমান শহরের সৌন্দর্যের খ্যাতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। কবির বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকলেও তাঁর একটা বিখ্যাত উক্তি হতে সমসাময়িক বর্ধমান শহরের বিস্তৃতির পরিচয় মেলে। নগর বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে,—

'আট হাট ষোলগলি বত্রিশ বাজার।' অথবা পাঠান্তর ভেদে,—
'আট হাট সোড়গোল বত্রিশ বাজার।'

আটহাটের পরিচয় পাওয়া যায় ও ষোলগলির পরিবর্তে সোড়গোল পাঠান্তরকে সঠিক বলা যেতে পারে। আটহাটের এলাকা জুড়ে ঐ সময়ে শহর বর্ধমানের বিস্তৃতি ছিল, যথা—নবাবহাট, কাজীর হাট, বোরহাট, কোটাল হাট, টিকর হাট, গোলা হাট, পোদ্দার হাট, (বর্তমান খাজা আনোয়ার বেড়) ও বীরহাট। তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্তমান শহরের কেন্দ্রস্থলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বর্ধমান শহরের অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন শহরটি বেহুলা, বাঁকা ও দামোদরনদ দ্বারা সীমায়িত ছিল। বত্রিশ বাজারের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হলেও বহরাম বাজার, রেকাবী বাজার, মোগলটুলী, জহুরী বাজার, কাষ্ঠগোলা, রাধাগঞ্জ বাজার ইত্যাদি পুরাতন গঞ্জগুলির স্মৃতিচিহ্নকে ধরে রেখেছে।

নিজ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মহতাব্ চাঁদকে লক্ষ্য করে দাশরথি রায় শোনালেন,—

'ধনে ধনেশ সমান মান পক্ষে অপ্রমাণ
কে মানী তদ্বিদ্যমান, বর্ধমানপতি।'

ছড়ায় স্থান নাম ঃ

বর্ধমান জেলায় অসংখ্য স্থান-নাম বিষয়ে প্রচলিত ছড়াগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গেলে সামাজিক সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থকরী কাজকর্মের অবকাশে আমরা ধর্মচর্চা, সমাজচর্চা, সাহিত্যচর্চা, প্রাচীন ইতিহাসচর্চা ইত্যাদি করে থাকি ; অনুরূপভাবে মনের খোরাক যোগাতে লোকসাহিত্যের আলোচনাও কি প্রাসঙ্গিক নয়? বলতে গেলে সামাজিক পুরাকাহিনীর একাংশ ফসিলের মতই ঢাকা পড়ে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে। তাই তাকে খুঁজে বের করাই হবে লোকসংস্কৃতিবিদগণের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরা যে মন্তব্য করেছেন তা একান্তই উল্লেখযোগ্য—"কত জনপদ, কত লোকালয়, কত হাট-বাজার-গঞ্জ, কত জাতি গোষ্ঠী আর তার সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের এই লৌকিক অবদান আজও এই পরিবর্তনের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত দিনের ফেলে আসা সেই জীবনের কাহিনী, সেই পুরাতন সমাজের ইতিহাস। তাই একান্তভাবেই বলা যেতে পারে, গ্রামবাংলার এই ছড়া-প্রবাদগুলি হল আঞ্চলিক লোকচেতনার গিরি নির্ঝর বিশেষ।"[৬৮]

বর্ধমান জেলার সদর শহর বর্ধমান। তাই বর্ধমান জেলার স্থাননামের ছড়াগুলি সঙ্কলন করার সময় বর্ধমান শহরকে নিয়ে প্রচলিত ছড়াগুলির নমুনা দেওয়া হল :

'মশা মাছি মুসলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান॥'

বর্ধমানের মানুষজনের পোষাক কেমন সে সম্পর্কে জানা যায়—

'কাছা লম্বা কোঁচা টান।
তার বাড়ী বর্ধমান॥'

মতান্তরে,—লম্বা কাঁছা কোঁচায় টান।
তার বাড়ী বর্ধমান॥ (জানবে তবে বর্ধমান॥)

বর্ধমানের লোকেদের কথাবার্তায় যে একটু টান আছে, সে সম্পর্কে :

'যদি দেখ কথায় টান।
বাড়ী জানবে বর্ধমান॥'

বর্ধমান জেলায় অধিবাসীগণের মধ্যে ক্ষেত্রী বা ছেত্রা বা ক্ষত্রিয়রা অর্থাৎ বর্ধমান রাজবংশ ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। বিশেষতঃ বিগত শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রথমদিকে তাদের খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্ধমান জেলার উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এই জেলার বহুকালের বাসিন্দা এবং 'বর্ধমানের আগুড়ি' একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে এবং এই জেলায় বর্ধিষ্ণু মুসলমানগণের বসবাসও দীর্ঘদিনের। বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, মেমারী ও মঙ্গল-কোট প্রভৃতি স্থানে বসবাসকারী মুসলমানগণ উচ্চরুচিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বলে দাবি করেন। সে সম্পর্কিত ছড়াটি হল :

'ক্ষেত্রী আগুড়ী (উগ্রক্ষত্রিয়) মুসলমান।
তিন নিয়ে বর্ধমান।'

এই জেলায় বসবাসকারী সদগোপ এবং মানকরের মোদক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট স্থান আছে, যথা :

'চাষা ময়রা মুসলমান।
তিন মিলে বর্ধমান॥'

কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায়,—

'চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যা লাভ হবে।' (দ্ব্যর্থক)

বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অধীনে দিগনগরে সদগোপ রাজাদের এক সরিকের রাজপাট ছিল বলে জনশ্রুতি এবং সেখানকার মহিলাদের মোটা মোটা চিক্কণ চুলের খ্যাতি জানা যায় নিচের ছড়াটিতে :

'আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব দিগনগর দিয়ে॥
দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে।

মোটা মোটা গুলগুলি পেতে বসেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে ॥'

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বয়স্ক লোকমাত্রই সে কথা স্মরণ করেন। এই ভূমিকম্পে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাটনা শহর সহ প্রায় সমগ্র উত্তর বিহার। বর্ধমান জেলায় যে সকল গ্রাম এই ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিল, সেগুলিকে ছড়াবন্ধ করে আজও ভিখারীরা গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। এমন একটি ছড়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকটে বাল্যকালে প্রায়ই শোনা যেত। ছড়াটি এরূপ ঃ

'ছিখণ্ড [শ্রীখণ্ড] লণ্ড ভণ্ড, দানগঞ্জের আছে কি।
মেটির্রি হয়েছে মাটি খাঁটি কথা জেনেছি ॥'

একদা, নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দনের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিকটবর্তী শ্রীখণ্ড গ্রামের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। দাঁইহাটের এক অংশের নাম ছিল দেওয়ানগঞ্জ, যা চলতি কথায় দানগঞ্জের হাট নামে পরিচিত। মাটিয়ারী গ্রামে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের অষ্ট-ধাতু নির্মিত প্রমাণ আকারের মূর্তি আছে এবং রাম নবমীর দিন মেলা ও উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর বহু লোকের সমাগম হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বে মাটিয়ারী বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু বর্তমানে সেটি নদীয়া জেলার অন্তর্গত হয়েছে।

বর্ধমানের জমিদার ছিলেন অবিভক্ত বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারীর মালিক ; তাই তাঁদের বৃত্তিদানের কথা ছিল প্রবাদতুল্য,—

'দিনাজপুরের নগদদান বর্ধমানের বৃত্তি।
কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর রানী ভবানীর কীর্তি ॥'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলাই গ্রামে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে (বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৪৮৯), সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক দিনাজপুরের জমিদার শ্রীমন্ত দত্ত অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁর দৌহিত্র শুকদেব (অগ্রদ্বীপ শ্রীপাটের গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের বংশধর) দিনাজপুরের জমিদারী লাভ করেন।

মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী সম্পর্কিত প্রবাদ ঃ

'যে ভয়ে পালাও তুমি সেই মা-যোগাদ্যা আমি ॥'

অগ্রদ্বীপে ঘোষ ঠাকুরের (গোবিন্দ ঘোষ) শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বয়ং গোপীনাথ এবং কয়েক কিলোমিটার দূরে দেওয়ানগঞ্জে (দাঁইহাট) মানিকপীরের মাজারে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সকলে হাজির হন। তাই লোক মুখে প্রবাদটি শোনা যায়,—

'অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাট।
মানিকপীর দেওয়ান আছেন নগরীর হাট ॥'

ছড়া প্রবাদে কাটোয়া যে একটা সুপরিচিত স্থান তার প্রমাণ পাওয়া যায়,—

'সাত শহর মেগে খায়,
কাটোয়া কোন্ পথে যায়।'

ভাতাড় থানার অধীনস্থ কামারপাড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের কামারদের কর্মকুশলতার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল এবং জাতি বা গোষ্ঠীর বৃত্তির দ্বারা তাঁরা যথেষ্ট ধনোপার্জন করেছেন। কামারপাড়ার অধিকাংশ গৃহ লোহার করোগেট-টিন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, ফলে বর্ষার সময় টিনের চালে বৃষ্টিপাতের ফলে যে গুরুগম্ভীর আওয়াজ হত তাই নিয়ে প্রচলিত ছড়াটি হল—

'যদি পাও ঢাকের সাড়া।
তবে জানবে কামারপাড়া॥

ঘোড়ানাশ গ্রামের জমিদার ভবানন্দ রায়ের সুব্যবস্থায় গ্রামস্থ সকলেই যে সুখী ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—

'রাজার সুখে অরণ্যে বাস
তার সাক্ষী ঘোড়ানাশ॥'

অগ্রদ্বীপের সন্নিকটবর্তী বয়ড়া গ্রামবাসী কেদার রায় ছিলেন নবাব সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। প্রবাদ যে, তাঁর ভার্যার ইচ্ছা অনুসারে প্রতি রাত্রে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাই কেদার রায় প্রসঙ্গে যে ছড়াটি শোনা যায় ঃ

'বাপের ঠাকুর কেদার রায়।
রেতে আসে রেতে যায়॥'

বহড়া গ্রামবাসী দরিয়ৎ খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কেদার নামক একটি ভৃত্য ছিল। ভক্ত প্রবর কেদার জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দরিয়ৎ খাঁ,—

'কেদার হইতে কম নহে দরিয়ৎ।
নিমেষে দেখালে ভৃত্যে জগন্নাথের রথ॥'

বর্ধমান শহর দামোদরের বন্যার জলে প্রায়ই ভেসে যেত তাই দামোদরকে নিয়ে জনসাধারণের চিন্তার পরিসীমা থাকত না, এ নিয়ে ছড়াটি হল,—

'রেঢ়ো নদ দামোদর। তাকে নিয়ে অত্যান্তর॥'

মতান্তরে,—

'ওরে নদ দামোদর। তোকে নিয়ে অত্যান্তর॥'

বাংলা ১২৩০ সালে দামোদরের প্রবল বন্যায় নদী-তীরবর্তী স্থান সমূহের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে একটি ছড়া গাথা হয়েছিল,—

'নদী সে দামোদরে বরাকর করছে আনাগোনা।
দুধার মিশিয়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এল বান পঞ্চকোটে, নিমেক লুটে ভাঙ্গলো রাজারগড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্বত পাথর॥

মিশায়ে নানা খোলা বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে ঐ জড় হ'লো চৌদ্দ তাল জল ॥'

অজয়নদের তীরে কোন্দা-গোবিন্দপুর গ্রামের ঘনশ্যাম গোস্বামী একাধারে ছিলেন সার্থক বৈষ্ণব, আবার তিনি তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এক কথায় ঘনশ্যাম শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁর বাসস্থান শ্রীপাট কোন্দা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

'নাড়াও নারে—পাঁঠাও কাটে।
দেখে এলাম কোন্দার পাটে ॥'

বাংলা ১২০২ সালে বৈদ্যপুরের শিশু নন্দীর বংশধরেরা কারুকার্যখচিত দুটি রথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ নিয়ে প্রচলিত ছড়াটি হল—

'বদ্যিপুরের নন্দী বুড়ো ;   রথ দিয়েছে তেরো চুড়ো।
হনুমান ধরলো ধ্বজা ;   বুড়ো তুই তবলা বাজা ॥'

বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন খড়ি নদীর সন্নিকটে কর্জনা-নর্জনা গ্রাম ছিল দস্যুজনের লীলা-ভূমি। পথচারীরা দলবদ্ধভাবে এই অঞ্চল পার হত, তাই গ্রাম দুটির বিভীষিকা নিয়ে শোনা যায় ঃ

'যদি পেরুলি নরজা,
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা।'

অথবা, 'যদি পেরুলি কর্জনা,
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা না।'

ভক্ত-সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের মাতুলালয় চান্নাগ্রাম যেতে হলে ওড়গাঁয়ের মাঠ বা 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' অতিক্রম করতে হত। ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় দিবাভাগেও পথচারীদের জীবন ও ধন সম্পদ ডাকাত বা লেঠেলদের হাতে নিরাপদ ছিল না। তাই লোক মুখে প্রবাদ আছে,—

'যদি যাবে চান্না
ঘরে উঠবে কান্না।'

একদা ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গাতে ডাকাতদের হাত হতে পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখে কমলাকান্ত জগজ্জননীর শ্যামা মা'র উদ্দেশ্যে গান ধরলেন,—

'আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা ॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা সুখের সময় সবাই তারা।
বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা ॥'

বর্ধমান জেলায় প্রচলিত ছড়ায় বিভিন্ন স্থানের খ্যাতি ও অখ্যাতি উভয়ই জানা যায়। আবার কোন কোন ছড়ায় সমাজ-সংস্কৃতির চিত্রও ফুটে উঠেছে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাকে নিয়ে যে ছড়াটির বিশেষ খ্যাতি আছে সেটি

বর্ধমানের ছড়া না হলেও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়। কারণ বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে যে জেলায় ঐ দ্রব্য উৎকৃষ্ট তাই ভোলা ময়রার নামে প্রচলিত ছড়ার বিষয়বস্তু। ছড়াটি এরূপ ঃ—

'মৈমন সিং-এর মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই।
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই॥
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম॥
রংপুরের শশুর ভালো, রাজশাহীর জামাই।
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই॥
দিনাজপুরের কায়েত ভাল, হাওড়ার ভাল শুঁড়ি।
পাবনার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি॥
বর্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশ পরগণার গোপ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, শীঘ্র বংশলোপ॥
হুগলীর ভালো কোটাল, লেঠেল, বীরভুমের ভাল ঘোল।
ঢাকের বাদ্যি থামলে ভালো, বলো হরি হরিবোল॥'

রাঢ়ের কবি কুমুদরঞ্জন উৎসবের সময়ে কোন্ কোন্ গ্রাম হতে যোগান আসত তার কিছু নমুনার বর্ণনা দিয়েছেন,—

"সিউড়ী হতে রায়বেঁশে দল, 'নারানপুরের' দগড় বাঁশী,
নিগণ তাহার ঢোল পাঠালো, আতসবাজী বনকাপাসী,
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর, ধেনোর গোয়াল দই পাঠালে,
উজল বাতি 'পালিশ গাঁয়ে'র ফুলঝুড়ি ও রঙমশালে,
'বালুচরে'র রঙিন চেলী গায়ে হেন জলছে হীরা,
ময়ূরপঙ্খী ডাকসাইটা বুনেই দিল 'বাঘাডিগিরা,'
বর্ধমানের রাজার এবং অগ্রদ্বীপের দুইটা হাতী,
এঁকে সিঁদুর তিলক ভালে হয়েছিল বিয়ের সাথী॥"

বৈষ্ণবদের অনুকরণে ভাগীরথী নদীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি দেখে স্থানীয় লোক ছড়া গেঁথেছিল,—

'পাটুলী ডুবুডুবু দামপাল ভাসে।
সোনার নারায়নপুর খিলখিলিয়ে হাঁসে॥'

অনুরূপভাবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে একটা ছড়ার প্রচলন দেখা যায়,—

'চক্ চক্ চক্ আজাপুর বারুল ত বাহাদুর।
দত্তপাড়া মদের হাঁড়া, কুলীনগ্রাম লক্ষ্মীছাড়া॥
বুদ্ধির শিরোমণি কেওতারা।
অবুঝহাটি নপাড়া॥

শূঁড়ো, জৌগ্রাম জলে ভাসে।
ইলসরা ময়না দাঁড়িয়ে হাঁসে ।।'

কালনা থানার অন্তর্গত সিঙ্গারকোন গ্রামের অধিবাসীরা যে সাংস্কৃতিক চর্চায় কাল কাটাত তারও প্রমাণ মেলে একটি গ্রাম্য ছড়াতে,—

'গান বাজনা সুজন।
তিনে মিলে সিঙ্গারকোন ।।'

অগ্রদ্বীপে সাহেবধনী ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের সমাগমের জন্য কটাক্ষপাত করা হয়,—

'অগ্রদ্বীপের কোলে
নেড়ানেড়ী দোলে।'

কালনা থানার অন্তর্গত হাসানহাটির লেঠেলদের পেশাগত খ্যাতি ছিল,—

'লাঠালাঠি ফাটাফাটি,
তিন নিয়ে হাসান হাটি।'

গ্রাম ভেদে তরিতরকারি উৎপাদনের পৃথক ধারার সঙ্গে ব্যক্তিভেদে রাঁধুনীর হাতের রান্নার স্বাদও পৃথক হয়,—

'খুরুলে বেগুন পাবেন পারহাটিতে মুলো।
মা রাঁধলে যেমন তেমন বৌ রাঁধলে তুলো ।।'

বীরভদ্র গোস্বামী কর্তৃক দীক্ষিত বার শত বৌদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত এবং এই সম্প্রদায় বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্রের শ্রীপাটে উৎসব উপলক্ষে হাজির হলে তৎসম্পর্কিত ছড়া বাঁধা হয়েছিল। ছড়াটি হল,—

'নেড়া নেড়ী আসে বাঘনাপাড়ায়,
আনন্দে নাচেগায় গাছেরই গোড়ায়,
কাঁথা কমণ্ডুলু সব তাদেরই গলায়।'

বুদবুদ থানার অন্তর্গত মানকর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং অতীতে এই গ্রামের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পকলা, বর্ধিষ্ণু বাসিন্দা ও জীবনযাত্রার উন্নত মানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ কয়েকটি গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়,—

১। 'মানই যার রাজকর,
সেই গ্রাম মানকর।' (বর্ধমান রাজের গুরুবংশ)

২। 'পাল ভট্টাচাজ্জ খাঁ
তিন নিয়ে মানকর গাঁ।' (বাসিন্দা)

৩। 'পরে তসর খায় ঘি,
তার আবার খরচ কি ?' (জীবনযাত্রার মান)

৪। 'পুরুষ নাইকো মানকরে,
মেয়ে নাই গো মান করে।' (নীলকণ্ঠের উক্তি)

আবার তিনটি জেলার গ্রাম নিয়ে ছড়ার প্রচলনও দেখা যায়—

কড়চের ত্যাঁদড়, (সিউড়ীথানার কড়িধ্যা গ্রাম)।
আউসগাঁয়ের বাঁদর (আউসগ্রাম থানার সদর কার্যালয়)।
গুসকরার ঢেমন (আউসগ্রাম থানার অধীনস্থ)।
দাবাপুরের বামন (কোতলপুর থানার অধীনস্থ)।

বিবিধ ছড়া ঃ

বাস্তুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিধান আছে ঘরের দরজা কোন্ দিকে স্থাপন করা হবে, তাই নিয়ে এরূপ একটি প্রবচন হল,—

'দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
পুব দুয়ারী তার প্রজা,
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই,
উত্তর দুয়ারী করতে নাই।'

উত্তরদিকে মাথা রেখে একটি হাতী শুয়েছিল এবং গণেশের জন্য ঐ হাতীটি তার মুণ্ডু খুইয়ে পরে গণেশের হাতীর মুণ্ডু হয়েছিল। ক্ষীরগ্রামে এ নিয়ে যে প্রবাদটি আছে ঃ 'উত্তর দুয়ারী ঘরে না করিবে বাস।'

শরীর রক্ষার জন্য আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করে থাকি তাদের এক একটার দ্রব্য গুণ এক এক রকমের। বর্ধমানে প্রচলিত এই ছড়াটি হল ঃ

'মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে শর্করা বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল ॥'

একসময়ে কালনার জাপোটের কারখানায় প্রচুর ভুরো চিনি (অপরিষ্কার চিনি-গুড় ও চিনির মাঝামাঝি) তৈরী হত এবং গোপ অধ্যুষিত বর্ধমানে ঘি-এরও অভাব ছিল না ; তাই নীলকণ্ঠ গান বেঁধেছিলেন,

'লুচি নন্দিনী ঘৃতে ভাজুনি
কচুরি ভগিনী প্রিয়ে।
যখন লুচির উপরে পড়ে ভুরো।
যেন দেউলেতে সোনার চুড়ো ॥

নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে সমাজজীবনে পাড়া প্রতিবাসীদের তুলনামূলক একটি ছড়ার প্রচলন রায়না অঞ্চলে দেখা যায় ঃ

'এক খেঁাচেতে মাছ ওঠে না
সেই বা কেমন বঁড়শী।
আর এক ডাকেতে সাড়া দেয় না
সেই বা কেমন পড়শী।' (আয়ুব হোসেন সংগৃহীত)

যাত্রাকালে পিছন হতে নাম ধরে ডাকতে নেই ; কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে পিছন হ'তে পুত্রের নাম ধরে ডাকা নির্দোষের,—

'আগে থেকে পিছু ভালো যদি ডাকে মা'য় ।' (মকুন্দরাম)
শনিবার বারবেলায় যাত্রা নিষিদ্ধ,—
'শনিবার সপ্তমী তিথি সম্মুখে বারবেলা ।
আজি রণে যেয়ো নারে ইছাই গোয়ালা ॥' (ঘনরাম)
বুধবারে শুভ কাজে যাত্রা করলে, উদ্দেশ্য সফল হয়,—
'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথায় যা ।'
বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে একেবারেই যাত্রা নিষিদ্ধ,—
'যদি পাও রাজ্য দেশ
বেড়িও না বেস্পতির শেষ ।'
বাপের বাড়ীতে বিবাহিত মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘদিন থাকা অসম্মানজনক,—
'বাপের বাড়ীর ঝি নষ্ট,
পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,
সোনা নষ্ট সেকরা বাড়ী
মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী ।'

হ্যালীর ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনীয় সুসাহিত্যিক পঞ্চানন্দ ওরফে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান শহরে জলকল নিয়ে 'রাজমার্গে নল প্রদান' এর প্রধান কর্মকর্তাকে (বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু) উদ্দেশ্য করে যে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন তা বহুদিন পর্যন্ত বর্ধমানবাসীর হাসির খোরাক হয়েছিল, যেমন,—

'একি হল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ,
জলযোগান হল বুঝি দায় ।
রায়—বাহাদুর, টাক ফুরফুর,
গাড়ু গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায় ॥

বর্ধমান জেলার লোক সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বনিয়াদ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। অতীতে চাষের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির উপর চাষীরা নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হলে তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই চাষের পক্ষে লাভালাভ বিচার করে বার মাসের হিসাব ছড়ার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে।

'যদি বর্ষে অগ্ঘানে, রাজা নামেন মাগনে ।
যদি বর্ষে পৌষে, টাকা আসে তুষে ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ।
যদি বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাওন দ্বিগুণে ।
চৈত্রে মাঠ মাথার, বৈশাখে ঝড় পাথার ।
জ্যৈষ্ঠে রেনা ওঠে, আষাঢ়ে বর্ষা বটে ।

কর্কট ছরকট, সিংহ শুকান কন্যা কানে কান
বিনা বায়ে তুলাবর্ষে কোথা রাখ ধান।'

সুবর্ষার লক্ষণ—'আমে বান, আর তেঁতুলে ধান।' প্রচুর শস্য উৎপাদনের লক্ষণ,—

দিনে জল রাতে তারা।
এই জানবে শুকোর ধারা॥
দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥

ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার শস্যের জন্য জমি চাষের পদ্ধতি ছড়ায় নির্দিষ্ট আছে,—

'ষোল চাষে মুলো, আট চাষে তুলো।
চার চাষে ধান বিনা চাষে পান।'

মাঘ মাসে শীতের প্রকোপে মহিষের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু ও বলবান জীবও কাতর হয়,—

'মাঘ মাসের জাড়ে
মোষের শিঙ নড়ে।'

পাঁচালী গানের মধ্যে দাশু রায়ের ছড়াগুলি ছিল বেশ উপভোগ্য,—

'মাটি আর পাটে। লোহা আর কাঠে॥
দেবতা আর কুসুমে। জরি আর পশমে॥
গুড়ে আর ছানায়। মুক্ত আর সোনায়॥'
এর বিপরীত হল,—
'রাবণের দ্বেষ হনুমানে। বৈরাগীর দ্বেষ বলিদানে॥
কুপুত্রের দ্বেষ বাপখুড়াকে। ষষ্ঠীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে॥'

লোকগাথা ঃ

'শ্রীধর্মমঙ্গলের' কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তাঁর রচিত কাব্যে। নরসিংহ বসুর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে, আসাদুল্লা খান ও কীর্তিচাঁদ সম্পর্কে স-প্রশংস উক্তিও উল্লেখযোগ্য। রাজা উপাধি-ধারী না হয়েও জমিদার কীর্তিচাঁদকে তাঁর প্রজারা রাজা বা মহারাজারূপে মান্য করত এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে কীর্তিচাঁদের বিশেষ সম্মান ছিল। কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর একটি লোকগাথা বর্ধমানে রচিত ও প্রচলিত হয়েছিল। সুকুমার সেনের মতে, "এগুলি সমসাময়িক রচনারই আধুনিক সংস্করণ।" সুকুমার সেন এই লোক-গাথাটি ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' নামক গ্রন্থে (বাংলা ১৩২১ সাল) উক্ত গাথাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'কীর্তিচাঁদ রাজার গীত' নামে 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় (৪ঠা মাঘ ১৩৮৬ সাল) রাজুয়া নিবাসী মহম্মদ আয়ুব হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত। গাথাটি 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' ও সুকুমার সেনের

উল্লেখিত গাথা অপেক্ষা অর্বাচীন হলেও এতে রচনাকারের নাম (গঙ্গারাম দত্ত) ও কীর্তিচাঁদের মৃত্যু তারিখ ও গাথা রচনার তারিখ বর্ণিত আছে। রাজার সমাধি লিপিতে মৃত্যু তারিখ অগ্রহায়ণ মাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু আয়ুব হোসেনের সংগ্রহে কার্তিক মাসের উল্লেখ থাকায় তাঁর সম্পাদিত গাথার সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। গাথাটি হল,—

'রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর
হেদে হে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর।
বর্ধমানে বাড়ী তোমার দীঘনগরে হাট
সাধ করে বাঁধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট।
ধর্ম্মশীল মহারাজা পাপে না দেন মন
কতশত করান রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন।
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।

আজান বাহু ছিল তোমার জানে জগতেতে
অর্জুন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে।
জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথরি।
বর্গী ভয় হতে রাজা আমাদের রাখলে যতনেতে
তোমার সমান দয়াল রাজা না দেখি ধরাতে।
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।

ক্ষেত্রীকুলে জনম তোমার-তরয়ালের ধনী
চন্দ্রকোণা জয় করিতে সাজিলেন আপনি।
দক্ষিণ ছেড়ে এলেন রাজা সাতগাড়ি টাকা
মাল মুলুকে লুটে নিলে যমে দিলে দাগা।
আষাঢ়েতে রথ যাত্রা অঘ্রান মাসে রাস
অঘ্রাণ মাসে মরলেন রাজা স্বর্গে করলেন বাস
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।

হাঁড়া হাঁড়া ঘৃত জ্বলে জ্বলে চন্দন কাঠ
দাঁইহাটে রহিল রাজার শান বাঁধা ঘাট।

পাখ কান্দে পাখুড়ী কান্দে কান্দে রাজ-তোতা
মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা।
শহরের লোক কান্দে করে হায় হায়
হেঁটমুণ্ড করে কান্দে হরেকৃষ্ণ রায়।
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।

হাতিশালে হাতি কান্দে ঘোড়ায় না খায় পানি
বিনিয়ে বিনিয়ে কান্দে কীর্তিচান্দের রানি।
ছোটরানির কাপড়খানি বড় রানিকে সাজে
রানির কপালে সিঁন্দুরের ফোঁটা গঙ্গাজলের মাঝে।
হাতিশালে হাতি কান্দে পাইকশালে ঘোড়া
মানিকচাঁন্দ বাবু কান্দে ভিজে জামাজোড়া।
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।'

কীর্তিচাঁদ রাজার গীতের ন্যায় দেবদেবীর লৌকিক আখ্যান নিয়ে পাঁচালী বা বন্দনা রচনার নমুনাও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যোগাদ্যার শঙ্খ পরিধান, গোপাল দাস মাহাত্ম্য, কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরিধান, গোপীনাথ বিষয়ক গীতি-কবিতা ইত্যাদির প্রচলন আছে। এছাড়া বোলান, ভাদু, তুসু, ঝাঁপান, লেটো, হাবু ও বাউল গান প্রভৃতি বিষয়ে লোকগাথার প্রচলন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। বর্ধমানের পথে-ঘাটে করতাল ও খোল সহযোগে হিন্দুরা এবং চিমটি বাজিয়ে মুসলমান ফকিরেরা যে গান গেয়ে থাকেন তার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের প্রবাহমান ধারা সজীব আছে।

বঙ্গদেশের সংস্কৃতির মূলভিত্তি নিহিত আছে বাংলার গ্রামসমূহে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে গ্রামবাংলার রূপ পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এ পরিবর্তন এসেছিল অর্থনৈতিক জীবনে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে সামাজিক পরিবর্তনও শুরু হয়ে গেল। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় হয়ত বর্ধমানের প্রাচীন লোককথা একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে, তাই সেগুলিকে ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। বর্ধমানের মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচারণ ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, কীর্তন, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবন্ধ ও যৌগিক সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই জেলার সংস্কৃতি। প্রাচীন ও নূতনের সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পথ ধরেই এগিয়ে চলে সংস্কৃতির প্রভাব। নানা রকম লৌকিক উপকরণে গঠিত এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখা প্রয়োজন। আজীবন লোক সংস্কৃতির ব্রতে ব্রতী শঙ্কর সেনগুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে উপসংহার টানা যায়,[৭০]—"গ্রাম্য জনতার কর্মক্লান্ত জীবনে লোক-সংস্কৃতি যুগিয়েছে প্রেরণা, মনে করেছে আনন্দের সঞ্চার, প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন ক্লিষ্ট মানুষ ধর্মাচরণ, পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান,

নৃত্য, গীত, নাটক, যাত্রা, কথকতা, কাহিনী, ছড়া, ধাঁধা, হেঁয়ালী, প্রবাদ-প্রবচন, শিল্পকলা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেছে। চাওয়া-পাওয়া, হতাশা, বঞ্চনা, আনন্দ হাসির কথা ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির উপকরণের মাধ্যমে।"

লোককথার সংগ্রহ প্রসঙ্গে বর্ধমানের কৃতি-সন্তানদের সংগ্রহ ও গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে কয়েকজন কৃতি-সন্তানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা,—অধ্যাপক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সাংখ্যতীর্থ, ডঃ রফিকুল ইসলাম, মহম্মদ আয়ুব-হোসেন, আব্দুল কুদ্দুশ মল্লিক, রামশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। তবে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে লোককথার পথিকৃৎ হলেন কুড়মুন-পলাশী নিবাসী রেভাঃ লালবিহারী দে।

লোকশিল্প ঃ

বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, শিল্পের উদ্দেশ্য হল স্রষ্টার সৃজনমূলক মানসিকতা ও সৌন্দর্যবোধকে ব্যবহারের উপযোগী করে ফুটিয়ে তোলা। সমাজজীবনের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতির বিধিবন্ধ ও সংমিশ্রণ হল সংস্কৃতি। বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রামীণ সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনে, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে লোকশিল্পের। বিশেষজ্ঞের ভাষায়, লোকশিল্প হল[৭১]—'**The traditional nature of folkart is evident in its tendency to retain motives, symbols and decorative patterns through many generations.**' আরও একটু বিস্তৃত বা পরিষ্কার করে বলা যায়—'**Folkart, then is an essentially native non-academic, frequently untrained type of art. It is founded on traditional technique, it concentrates on things rather than on ideas; its craftmen know the satisfaction of recreation rather than that of creation.**'

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লোকশিল্পকে লোকায়ত শিল্প বলেছেন। লোকশিল্প তথা লোকায়ত শিল্পের বিকাশ ঘটেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ও অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ শিল্প জ্ঞান হ'তে। "ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানের আলপনায়, কাঁচা ও পোড়া মাটির তৈরি পুতুল ও খেলনায়, মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটি লেপা বেড়ার উপর অথবা সরা ও ঘটের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নকসায়, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্যে, ঝুলানো শিকা'র পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান।"[৭২]

লোকশিল্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য হতে লোকশিল্পের উদ্ভব, লোকশিল্পের

ধারা, লোকশিল্পের প্রসার ও স্থানীয় অর্থনীতিতে লোকশিল্পের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। আবার এই কর্মে নিয়োজিত শিল্পীদের সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা অতীতেও হয়েছে এবং বর্তমানেও এদের সম্পর্কে নানাবিধ সমীক্ষা ও গবেষণা হচ্ছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানের শিল্পীরাও বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠী বা জাতিতে বিভক্ত ছিলেন ; তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীগত পেশাই জাতি নির্ণয় করতে সহায়তা করত।

'বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে' জাতি ও জীবিকা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

'কঃ কিং করিষ্যতে কর্ম্ম স তদ্‌বৃত্তাং স্বশক্তিতঃ।
কর্ম্মানিরূপনামানো যুয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ ॥' (উত্তরখণ্ডঃ ২৬।১৪)

পেশা অনুযায়ী বর্ধমানের শিল্পীরা ন'টি গোষ্ঠী বা জাতিতে বিভক্ত, যথা ঃ—

১। সূত্রধর	২। কর্মকার	৩। তন্তুবায়
৪। কুম্ভকার	৫। কাংশকার	৬। স্বর্ণকার
৭। শঙ্খকার	৮। চিত্রকর	৯। মালাকর।

প্রারম্ভিক পর্বে উপজাতীয় শিল্প চেতনা হতে লোকশিল্পের উদ্ভব হলেও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে লোকশিল্পীদের হিন্দু সমাজে প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আরও পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক কারণে বংশগত পেশা ত্যাগ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ায় লোকশিল্পী-সঙ্ঘ আজ ক্ষয়িষ্ণু। এতদসত্ত্বেও পূর্বসূরীদের ধারা বজায় রেখে আজও যাঁরা লোকশিল্পের চর্চা করে চলেছেন তাঁদের শিল্পকর্মের মৌলিক বিশেষত্ব লোকশিল্পকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে, এতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ধমানের লোকশিল্প চেতনা বহু প্রাচীনকাল হতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এযুগেও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপন স্থান অধিকার করে আছে। প্রত্ন-শিল্প বা প্রাচীন লোকশিল্প যে আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন সমগ্র রাঢ়ের মধ্যে লোক-শিল্পের অন্যতম আদি উদ্ভবস্থল হিসাবে বর্ধমানের আদিম অধিবাসীগণের অবদান অনস্বীকার্য। ১নং ও ২নং চিত্রে পাণ্ডুরাজারঢিবিতে ও বাণেশ্বর ডাঙ্গায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি এই কথারই প্রতিধ্বনি করে যে, এ যুগের লোকশিল্পের আধুনিক ধারার বিকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে তিন হাজার বছর পূর্বের শিল্পীদের। বর্ধমানের প্রাচীন মানুষ তাদের নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে শিল্প সচেতন ছিল এবং কালের আঙ্গিনায় তাদের শিল্প চেতনাকে উন্নততর পর্যায়ে বিকাশ ঘটিয়ে প্রাচীন ধারার উত্তরসূরী হিসাবে সেই গৌরবের অধিকারী হয়ে আছে।

বর্তমানকালে শিল্প অর্থে ভারী ও লাভজনক কুটির শিল্পকে বোঝায়। তবে কুটির শিল্পের কিয়দংশ লোকশিল্প সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্যবহারিক অর্থে লোকশিল্প সাধারণ শিল্প হতে পৃথক। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় যুগের প্রয়োজনে, সমাজের চাহিদায় ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের তাগিদে পূর্ব-

সুরীদের কলাকৌশলের কাঠামোকে বজায় রেখে বর্ধমানেও Folkart বা লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু আধুনিককালে যন্ত্রদানবের পেষণে পরিবর্তিত রুচিবোধ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা সমস্যাজনিত কারণে গ্রামীণ সমাজে লোকশিল্প আজ মুমূর্ষু প্রায়। স্থানীয় লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কেবলমাত্র সরকারী অনুদানের উপর ভিত্তি করে লোকশিল্পের বিকাশ লাভ ঘটতে পারে না। আয়তনের বিশালতার জন্য বর্ধমানের মানব সমাজের রুচিবোধ সকল স্থানে এক নয়; আবার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বাজারের অপ্রতুলতার জন্য জেলার সর্বত্র এক ধরনের লোকশিল্প গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে, হয়ত কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা বংশ কোন একটা নির্দিষ্ট শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে দাঁইহাটের পাথরের ভাস্কর্য শিল্প, গুসকরার ঢোকরা শিল্প অথবা নূতনগ্রামের কাঠের পুতুল বা খেলনা ইত্যাদি।

সমষ্টিগত সমাজজীবনের প্রয়োজনে বর্ধমানের লোকশিল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা,—(১) মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, (২) প্রস্তর ও মৃৎ শিল্প, (৩) পুতুল ও খেলনা, (৪) মাদুর ও দারু শিল্প, (৫) ধাতুশিল্প, (৬) চিত্র বা পটশিল্প ও (৭) গৃহসজ্জা সামগ্রী।

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে বর্ধমানের মানব সমাজে লোহার ব্যবহার আয়ত্তাধীন হয়েছিল। এদেশে কৃষি বিজ্ঞানকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভবপর হয়েছিল লোহার তৈরী কৃষিকার্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরীর মাধ্যমে। এছাড়া লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ-বিদ্যা আয়ত্ত করে মৎস্যশিকার, পশুশিকার, আত্মরক্ষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল ঐ যুগের মানুষ। বর্ধমানের পশ্চিম ভাগে কয়লা খনি ও ল্যাটেরাইট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান কার্য অনুষ্ঠিত হলে দেখা যাবে যে, অতীতে এ অঞ্চলের মানুষের কাছে লোহা গলানো ও যন্ত্রাংশ নির্মাণ পদ্ধতি আয়ত্তাধীন ছিল।

দেশীয় প্রথায় হাপরের সাহায্যে কামারশালায় কুড়াল, কাস্তে, দা, বঁটি, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি, দরজা-জানালার লৌহ সামগ্রী তৈরীর প্রচলন বহুকাল ধরে চলে আসছে। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজে প্রতিপদে কামারের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় প্রায় প্রতিটি বড় বড় গ্রামে এদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হন্তারকের কাজের জন্য কামারদের ডাক পড়ে। বর্ধমানের গ্রামে আজও দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির অধিকার বা শস্যের বিনিময়ে গৃহস্থের বাৎসরিক লোহার তৈরী দ্রব্যাদি নির্মাণের প্রথা বলবৎ আছে। এ জেলায় কাঞ্চননগরের তৈরী ক্ষুর, কাঁচি, ছুরি ইত্যাদির খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বনপাস-কামারপাড়ার কর্মকারদের তরবারি ও খাঁড়া নির্মাণের কলা-কৌশল ছিল প্রবাদবাক্যের মত। 'বর্ধমানরাজ-বংশানুচরিতে' উল্লিখিত আছে যে, কামারপাড়ার জনৈক কর্মকার এক কোপে রাজবাড়ীর এক বৃক্ষের গুঁড়ি ছেদন করতে

সক্ষম হওয়ায় কীর্তিচাঁদ রায় কর্তৃক সেই কর্মকার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষকের অভাব ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে দেশীয় প্রথায় সৃষ্ট লোহার জিনিষের কদর কমে যাওয়ায় কর্মকার গোষ্ঠী নিজেদের পেশা বা বৃত্তিকে নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ হতে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়ত গ্যাস ও বিদ্যুৎচালিত কামারশালা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাবে।

চীনামাটি, এ্যালমুনিয়ম ও স্টেনলেস স্টিলের নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে এদেশে তৈজসপত্র সংরক্ষণ সামগ্রী ও আহারের বাসনপত্র ব্যবহারে মৃৎপাত্র ও পিতল কাঁসার বাসনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। টিন ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ স্বল্প মূল্যে সংগৃহীত ও সহজলভ্য হওয়ায় মৃৎপাত্রের সমারোহ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগেও বর্ধমানের লোকেরা খাগড়া-বহরমপুর, দাঁইহাট, কাটোয়া, মাটিয়ারী ও বনপাসের কাঁসারীদের দ্বারা নির্মিত কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজার্চনায় তামা, ব্রোঞ্জ ও পিতলের বাসনপত্রের প্রচলন ছিল। এছাড়া দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করা হত পিতল, ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতু দিয়ে। বনপাস ও দাঁইহাটের কারিগরদের তৈরী জিনিষের উপর পালিশ ছিল বেশ উঁচুদরের। কারিগরি মুন্সিয়ানায় নির্মিত সেসব বাসনপত্রের ঔজ্জ্বল্যের জন্য যেমন কদর ছিল, অনুরূপভাবে পিতল ও তামার দ্রব্যাদির উপর খোদিত নক্সাও সেগুলির গুণগতমান নির্ণয়ের সহায়ক হত। দাঁইহাট ও বনপাসের কাঁসারীরা লতা-পাতা, ফুল, বিবিধ নক্সা, মাছ, দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি খোদাই-এ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শহর ও গঞ্জে বসবাসকারী কামারদের ন্যায় কাঁসারীরাও ছিলেন পেশাগতভাবে এক শিল্পীগোষ্ঠী। পিতল-কাঁসা শিল্পের অবক্ষয়ের জন্য এ শিল্পীরা বংশগত পেশা ছেড়ে বর্তমানে কর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পেশাগতভাবে স্বর্ণকারগণ গ্রামীণ শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও আজকাল এদের লোকশিল্পের শিল্পীগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত হিসাবে ধরা হয় না। বর্তমানকালে কলিকাতায় প্রচলিত নক্সার বই হতে নমুনা দেখে মফস্বলে স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করা হয়। আবার পেশাগতভাবে অনেকেই স্বর্ণকার গোষ্ঠীভুক্ত নন। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল শহর ও বড় বড় গ্রামে সোনার গহনা, ক্রেতার অভিরুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নক্সায় নির্মিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর স্বর্ণকারগণের অবস্থিতি বা বাসস্থান নির্ভর করায়, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানে এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণকার গোষ্ঠী দেখা যায়।[৭৩]

গরুর গাড়ীর চাকা, মই, লাঙ্গল, ঘরের কাঠামো ও দরজা জানালা, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি, খাট ও নানা ধরনের আসবাবপত্র তৈরী করতে সূত্রধর মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয়। সাধারণ গৃহস্থালীর প্রয়োজনে এইসব কারিগররা যেমন নানাবিধ ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে থাকে তেমনি অনুপম শিল্পকলার নিদর্শনও পাওয়া যায় এদের কৃত দরজার নক্সা, খাটের নক্সা, দেবদেবীর মূর্তিগঠন ইত্যাদিতে। সিমেণ্ট ব্যবহারের পূর্বে

অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা কাঠের তৈরী ঝিল্লী ব্যবহার করত যার নির্মাতাগণ ছিলেন এইসব সূত্রধরেরা। এ জেলায় বহুস্থানে নিতাই-গৌর, রাধাকৃষ্ণ মূর্তিসমূহ ও বিশেষ করে বোড়র বলরামমূর্তি কাষ্ঠ নির্মিত হওয়ায় প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে (বৈশাখ মাস) এইসব দেব-বিগ্রহের অঙ্গ মার্জনা করার দায়িত্বও ছিল এইসব সুদক্ষ শিল্পীদের। রাধাশ্যাম দাসেব (মাধবীতলা, কাটোয়া) তৈরী অপূর্ব নক্সাখচিত কাঠের গৌরাঙ্গ-মন্দিরের নমুনা ও অন্যান্য খোদাইকার্য দারুশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিখ্যাত সূত্রধর কারিগরদের সম্পর্কে কেতুগ্রামে প্রাপ্ত লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করে তারাপদ সাঁতরা, গ্রাম পরিচিতিসহ শিল্পীসংঘকে স্মরণ করে রেখেছেন। প্রচলিত ছড়াটি হল,—[৭৪]

'বর্ধমান জেলা হয়গো ছেরেন্দা। সূত্রধর দশঘর পরমানন্দ॥
ঝামটপুরে রহেগো রামাইচন্দ্র। পেনেরায় ঘর কুম্ভু গৌরাঙ্গ॥
কোপার পাল হয় গঙ্গারাম। কন্দর্পশীল হয় কেতুগ্রাম॥
তেঁতুলের পো নন্দ দত্ত। বহরানের দে চৈতন্য খ্যাত॥
জেয়োপাড়ার সাগর কর। এই মত ঘর সূত্রধর॥'

পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধরগণ বর্ধমান ও আটকুল এই দু'ভাগে বিভক্ত। বর্ধমান থাকের সূত্রধরগণ প্রধানতঃ পাটুলী, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, দাঁইহাট, করজগ্রাম, গাঁফুলিয়া, কাষ্ঠশালী, মেরতলা, নবগ্রাম, নূতনগ্রাম, গোরাপাড়া, সাতগাছিয়া, কোলকোন, পিলশোঞা, বনপাস, শ্রীখণ্ড, গুসকরা, বীরকুলটি, কেতুগ্রাম, বহরান, ছেরেন্দা, কোপা, জেয়োপাড়া, কালনা, পেনেরা, তেঁতুলে প্রভৃতি গ্রামে বসবাস করত।[৭৫]

বাংলার কীর্তন গানের বিশেষ ধারার আদি উদ্ভবস্থল শ্রীখণ্ড, মনোহরশাহী ও রানিহাটী (রেনেটি) পরগণায় এবং কীর্তন গানের জন্য প্রয়োজন হয় মৃদঙ্গ ও শ্রীখোলের। কালনার নিকটবর্তী একচাকা গ্রামের সূত্রধরদের শ্রীখোল নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধি আছে। সূত্রধর শিল্প-কারিগরি সম্পর্কিত আরও দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। জেলার আভ্যন্তরভাগে রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এবং মোটর গাড়ীর প্রচলনের ফলে গো-যান ও পাল্কির ব্যবহার আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। সেকারণে গরুর গাড়ীর ছই এবং পাল্কি তৈরী করতে একদা যে সূত্রধরদের ডাক পড়তো, আজ তার প্রয়োজন হয় না। বর্ধমানের সূত্রধরগণ সপ্তডিঙ্গা মধুকর হতে আরম্ভ করে ডিঙ্গি-নৌকা প্রস্তুত করতে যে সক্ষম ছিলেন তার প্রমাণ রেখে গেছেন বিপ্রদাস পিপলাই ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, তাঁদের রচিত 'মনসা-বিজয়' ও 'চণ্ডীমঙ্গল-এ'।

শাল, সেগুন, শিশু, আম, জাম ও কাঁঠালের বাগান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহীরা দালান-কোঠা নির্মাণ করছে, গো-যানের পরিবর্তে মোটরগাড়ী, রেলগাড়ীর রেওয়াজ বেড়েছে। আর সেই সূত্রে সূত্রধরগণ নিজস্ব জীবিকা থেকে কর্মচ্যুত হয়ে রুজি-রোজগারের ভরসায় কর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

হয়ত অচিরাৎ দারু-ভাস্কর্যশিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাবে ; তারই পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বাংলার সূত্রধরদের মধ্যে কাঠের পুতুল বা 'মামীডলস' নির্মাণের জন্য নূতনগ্রামের সূত্রধরদের বিশেষ খ্যাতি আছে। রং করা কাঠের পুতুল কলিকাতায় কালিঘাটের পুতুল বলে বিক্রি হলেও এর সৃজনভূমি হল বর্ধমানের নূতনগ্রামে। এই গ্রামের সূত্রধরগণ নানা ঢঙের কাঠের মূর্তি তৈরী করে, যথা, কীর্তনরত নিতাই-গৌর, দেবদেবীর মূর্তি, পঁ্যাচা ও অন্যান্য খেলনা ইত্যাদি। নূতনগ্রামের পুতুলে রঙের বাহার অপূর্ব। বর্তমানে দাঁইহাট ও কাটোয়ায় কাঠের পুতুল তৈরী হলেও শিল্পের বাজারে তার বনেদী নামটাই চালু আছে। সাম্প্রতিককালের কোন এক সরকারী প্রদর্শনীতে নূতনগ্রামের গোপাল ভাস্করের তৈরী কাঠের পুতুল শিল্প রসিকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া বর্ধমানের ধ্রুবচন্দ্র শীল ও রামচন্দ্র শীল, কাঞ্চননগরের (রথতলা) গৌরাঙ্গ দাস, কাটোয়ার রাধাশ্যাম দাস ও নূতনগ্রামের তপন ভাস্করের হাতের কাজের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। নূতনগ্রামের ভাস্কর পরিবারের আদিনিবাস ছিল দাঁইহাটে এবং গোপাল ভাস্করের পূর্বপুরুষ একদা পাথর খোদাই-এর কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এঁরা আজ অন্য মাধ্যমের কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্ধমানের শিল্প সাধনার ধারায় যে উপজাতীয় শিল্প চেতনার বিকাশ লাভ ঘটেছে তা'হল ডাকরা শিল্প এবং এই শিল্পীরা ডোকরাকামার নামেই বিশেষ খ্যাত। আউসগ্রাম ও গুসকরা অঞ্চলে ডোকরাকামার ও মাল-উপজাতীয়দের বসবাস। তারা কাঁসা-পিতল দিয়ে দেবদেবীর প্রতিকৃতি, জন্তুজানোয়ারের মূর্তি, চাল-মাপার কুনকে ইত্যাদি তৈরী করে থাকে। এই ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীটি সরকারী প্রচেষ্টায় ও অনুদানে প্রথাগতভাবে কোনমতে সেই প্রাচীন শিল্পধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ডোকরা শিল্পটি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীভুত। আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুরগ্রামটি বাঁকুড়া জেলার কেশিয়াকোলের পরেই এই শিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দরিয়াপুরের শম্ভুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মটর, হারাধন, সুখময়, দুঃখময়, শিবরাম, রামময়, হরি, ধীরেন, মোহময়, হাবুল, মঙ্গল, অমর, অনিল, প্রাণ, অসম, শ্যামল প্রভৃতি কর্মকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণ আজও ডোকরাশিল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তবে এই গ্রামের মনোহর কর্মকারই এযুগের ডোকরাশিল্পের প্রকৃত স্রষ্টা।

ডাকের সাজ যা শোলার সাজের প্রচলন শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতকে। মালাকর গোষ্ঠীর লোকেদের বংশগত পেশাটি হল শোলা শিল্প। ডোবা পুকুরে ও বিলে শোলা জন্মায় এবং ঐ শোলা রোদে শুকিয়ে শোলারটুপি, বোতলের ছিপি, চাঁদমালা, নানারকমের ফুল, লতা-পাতা ও ঠাকুরের সাজসজ্জা প্রস্তুত হয়। কাটোয়ার কার্তিক পূজা, রাসলীলা ও কালী প্রতিমা, অন্নপূর্ণা প্রতিমার সাজসজ্জা প্রধানতঃ ডাকের সাজ দিয়ে সাজান হয়। বর্ধমানে শোলা তেমন জন্মে না, তাই ঘাটতি

অংশের কিছুটা নদীয়া থেকে আমদানী করতে হয়। এই শিল্পে নিযুক্ত মালাকরগণের অধিকাংশ কাটোয়া, কেতুগ্রাম, দোমোহনী জামুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে। বর্ধমানের শিল্পীদের মধ্যে বনকাপাসির অরবিন্দ রায়, পাঁচুগোপাল ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আদিত্য মালাকর, শ্রীমতী কল্যাণী মালাকর, অর্ধেন্দু রায়, লক্ষ্মণ ঘোষ, কাটোয়ার রতন মালাকর (সাহেব বাগান), নিতাই দাস বৈরাগী (সাহেব বাগান), ধীরেন্দ্রনাথ চিত্রকর (মাধবীতলা), অমিয়লাল মালাকর (মাধবীতলা), জয়ন্ত চিত্রকর (মাধবীতলা), মলয় দাস বৈরাগ্য (সাহেব বাগান), বর্ধমানের নারায়ণচন্দ্র মালাকর (বড়বাজার), ভাতারের জয়ন্ত মালাকর, বলগোনার নিখিল চিত্রকরের তৈরী শোলার সাজ কলিকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে চাহিদা আছে। বনকাপাসির আদিত্য মালাকর তাঁর শিল্পকর্মের নৈপুণ্যের জন্য বেশ কয়েকটি সরকারী পুরস্কার লাভ করেছেন। আবার অনেকে শোলার সাজের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের সাধনাও করে থাকেন। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে যাঁরা কোন এক বিশেষ শিল্পে নিয়োজিত থেকে সংসার চালাতে সক্ষম হন না তাঁদের জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে নানা কর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। কাটোয়ার ধীরেন্দ্রনাথ চিত্রকর (মাধবীতলা), একদিকে শোলার সাজের যেমন পারদর্শী অনুরূপভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য অবসর সময়ে পট আঁকেন ; এছাড়া তিনি সুন্দর কারুকার্যখচিত পিতলের রথও নির্মাণ করেছেন। বর্ধমানের বহু গ্রামে মালাকরগণের বসবাস আছে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ গ্রাম-গঞ্জের মালাকরদের শোলার সাজের শিল্প নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি আছে, যথা, বর্ধমান শহর, কাটোয়া, পাটুলী, আসানসোল, ভাতাড়, নিগন, মদনপুর, দোমহনী (বরাবণী), বক্তারনগর (রানিগঞ্জ), পানাগড় বুজুরুকদিহি (কাঁকসা), কুরমুন (গলসী), হাটগোবিন্দপুর, নবগ্রাম (বর্ধমান) প্রভৃতি গ্রামে।

পৃথিবীর আদিমতম শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্পের স্থান অন্যতম। প্রাচীন যুগ থেকে পানীয় ও আহার্য বস্তু সংরক্ষণের নিমিত্ত সহজলভ্য পাত্রের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। মৃৎশিল্প এদেশের কুম্ভকারদের জাতিগত পেশা। কুম্ভকারগণ চাকে কাদার তাল দিয়ে মৃৎপাত্র নির্মাণ করে আগুন পুড়িয়ে সেগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। মৃৎপাত্র সাদামাটা ও নক্সা করে রংচঙে উভয় শ্রেণীর হতে পরে। ধাতুপাত্র ও পলিথিন-প্লাসটিকের প্রচলনের ফলে শৌখিন মৃৎপাত্রের ব্যবহার ও কদর ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। গৃহস্থালির প্রয়োজন ব্যতীত ধর্মীয় ও দেবপূজার প্রয়োজনে মৃৎপাত্রের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের প্রাচীন শিল্প ও ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্যকে আজও ধরে রেখেছে। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার যুগ হতে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত মৃৎপাত্রের ব্যবহারেও এই শিল্পচর্চায় কোন ছেদ পড়ে নাই। এ যুগের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, হাটকীর্তিনগরের গুণধর পাল ও গদাধর পাল, বর্ধমানের হরিহর দে, দিবেন্দু দে, তুষার দাস গোবিন্দ পাল ও মোহিনীমোহন গোস্বামী, কালনার বিনয় পাল, কাটোয়ার মলয় দাস বৈরাগ্য প্রমুখ ব্যক্তি।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাথরের অবদান যথেষ্ট হলেও মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজমহল বা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল হতে পাথর আনয়নের প্রয়োজন হত। সেকারণে পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় ইঁটের তৈরী মন্দির ও মাটি বা ধাতুর তৈরী মূর্তির গড়ার প্রচলন দেখা যায়। নির্মাতার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপর পাথরের মন্দির বা মূর্তি তৈরী অনেকাংশে নির্ভরশীল। দাঁইহাটের নবীন ভাস্করের বাঙ্গালাজোড়া খ্যাতি থাকলেও তাঁর বংশধরগণ একাজ প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু রায়পাড়ার মহিলা শিল্পী শ্রীমতী দেবী কণ্ডু আজও এই শিল্পকে উপার্জনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। দাঁইহাটের বিশ্বনাথ ভাস্কর সম্ভবতঃ এ জেলার শিলা ভাস্কর্যের সর্বশেষ প্রতিনিধি। কাটোয়া ও দাঁইহাটের ভাস্করগণ কর্মান্তর গ্রহণ করলেও পাথর খোদাই-এর কাজ বন্ধ হয়ে যায় নাই। চুরুলিয়ার সন্নিকটে 'দেশের-মোহন' গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী পাথর খোদাই-এর কাজে জীবিকা নির্বাহ করছে।

একালে গ্রামীণ সমাজ ও তার অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধও পালটে যাচ্ছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর শিল্পীর শিল্পকর্মের কোন চাহিদা নাই। বর্ধমানের মন্দির-শিল্পে নিয়োজিত দু'শ্রেণীর শিল্পী তাই আজ কর্মচ্যুত। তবে যাঁরা মন্দিরের স্থাপত্যকর্মে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা গৃহনির্মাণে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু ভাস্কর্য-শিল্প তথা 'টেরাকোটা' ফলক নির্মাণে পারদর্শী শিল্পীরা আজ কর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও বর্ধমানের শিল্পী সুধীর নাগ (বাদামতলা, চাঁদমারী) এখনও 'টেরাকোটা' ফলক তৈরীর কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার মৃৎশিল্পীদের অনেকে প্লাসটার অব প্যারিস দিয়ে পুতুল তৈরী করেন এবং তার উপর রং-এর প্রলেপ দিয়ে সেগুলিকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করায় বাজারে বেশ চাহিদা আছে। কালনার বীরেন্দ্রনাথ পাল (জাপোট, পালপাড়া), নবস্থার (মেমারী) রাজারাম বিশ্বাস, কাটোয়ার শ্রীমতী মায়ারাণী দাস ও বর্ধমানের শ্রীমতী মেহেরুন্নিসা খাতুন তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন উৎসব ও পূজায় মাটির তৈরী প্রতিমার বেশ চাহিদা আছে। কাটোয়া, কালনা, বর্ধমান শহরে ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, কার্তিক, সরস্বতী, ইত্যাদি পূজায় মৃৎশিল্পীদের ডাক পরে এবং তাঁদের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতা হয় তা বেশ উপভোগ্য। তবে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে কাটোয়ার কুম্ভকার-পাড়ার শিল্পীদের সুনাম যথেষ্ট এবং কার্তিক-লড়াই-এর সময় কুম্ভকার সম্প্রদায় অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজ নিজ সুনাম রক্ষার বিষয়ে যত্নবান হন। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তৈরী নক্‌সা ও মাটির সঙ্গে অভ্র মিশিয়ে কুলটী-আসানসোল অঞ্চলের শিল্পীগণ যে অপূর্ব টেরোকোটা সাজসজ্জা নির্মাণ করেন তার গুণগতমান বেশ উৎকর্ষ। গৃহস্থালিতে ও পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত মাটির আধার প্রস্তুত বিষয়ে গাঁফুলিয়া, চাণ্ডুলী সোদপুর (থানা কাটোয়া) প্রভৃতি গ্রামের কুম্ভকারগণ কর্তৃক নির্মিত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে। বর্ধমানের কুম্ভকারগোষ্ঠীকে চারটি থাকে ভাগ করা হলেও

(উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, চৌরাশী ও কুচোল) বর্তমানকালে এই থাক বা ঘরানাগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

বর্ধমান জেলার অপর এক ক্ষয়িষ্ণু শিল্পীগোষ্ঠী কোন রকমে অন্যান্য কাজকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেও তাঁদের বংশগত শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীরা পটুয়া নামে পরিচিত। কাগজের উপর নানা চিত্র তুলি দিয়ে আঁকা হয়। অন্ততঃপক্ষে তিন মিটার দৈর্ঘ্য ও আধ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট পট আঁকা হয়। পূর্বে কাপড়ে আঁকা হত, কিন্তু বর্তমানে কাগজেই এই পট আঁকা হয়; বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুর্গা পূজার চালচিত্রও পটুয়ারা এঁকে থাকেন। এছাড়া আঁকেন যমপট বা রামপট। তদুপরি দেবদেবীর গুণকীর্তন ছাড়া সমসাময়িক সমাজচিত্রের ঘটনা নিয়েও বেশ কিছু আঁকা হয়। একালে বধূ নির্যাতনের উপর বেশ কিছু পটের প্রচলন দেখা গেছে। ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনেও পটুয়াদের তুলি কখনই বিরত থাকে নাই। বর্ধমানের চিত্রকরগণ মশাগ্রাম, কাটোয়া, দুর্গাগ্রাম, নিগন ও মালডাঙ্গায় বসবাস করেন। পট অঙ্কন ও পটের গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করা এযুগে কষ্টকর হয়ে উঠেছে, তাই অনেকে কৃষিকার্য ও দুর্গাপূজার চালচিত্র অঙ্কন করতে শুরু করেছেন। চিত্রাঙ্কনে কাটোয়ার গোপীনাথ বৈরাগ্য ও ধ্রুব মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট সুনাম আছে। আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণসহ কীর্তনের দৃশ্য সম্বলিত চিত্রটির অঙ্কনরীতি পটশিল্পের পূর্ণ পরিণতির একটি লক্ষণীয় উদাহরণ।

বাঙালীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ও বিবাহে শঙ্খের প্রয়োজন হয়। বাঙালীর জীবনে শঙ্খ এত আদরণীয় বস্তু যে প্রাচীন লৌকিক দেবীগণের শঙ্খ পরিধানের বিষয়ে বহু লোককাহিনী গড়ে উঠেছে। শঙ্খশিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানী করা হয় দক্ষিণ ভারত হতে এবং আমাদের শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের গুণে সেগুলি পরিমার্জিত হয়ে দেবালয়ে ও গৃহস্থের ঘরে শোভা বর্ধন করছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে শাঁখার ব্যবহারের প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং এগুলি গ্রামগঞ্জেই প্রস্তুত হয়। শঙ্খশিল্পের জন্য কলিকাতার সুনাম অধিক হলেও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান এ বিষয়ে পিছিয়ে নাই। এ শিল্পের জন্য ব্যবহৃত করাত তৈরী হয় বর্ধমানের দীননাথপুর ও কাঞ্চননগরে, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।[৭৬] হাতে পরার শঙ্খ (কঙ্কন), আংটি, বোতাম ইত্যাদিতে শঙ্খের ব্যবহার হয়। তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে পল্লীগ্রামে যে ধরনের শঙ্খের প্রচলন দেখা যায় সেটি হল শঙ্খের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ভিতরে লোহার তার দিয়ে তৈরী করে লাল ও হলুদ রং করা হয়। একাজে নিয়োজিত শিল্পীরা শঙ্খ-বণিক নামে সমাজে পরিচিত। বর্ধমান জেলার ঘোড়ানাশ (থানা কাটোয়া), পাটুলি (থানা পূর্বস্থলী) ও বাঘনাপাড়ার (থানা কালনা) শিল্পীরা এখনও শঙ্খশিল্পের এই ধারাকে বজায় রেখেছে। এ জেলায় বেত গাছের পরিমাণ স্বল্প হলেও বাঁশ, খেজুর ও তালগাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। গৃহ নির্মাণ ব্যতীত বাঁশ হতে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্য ও গৃহসজ্জার সৌখিন দ্রব্য কালনা, পূর্বস্থলী জামালপুর ও কেতুগ্রাম থানার শিল্পীরাই তৈরী করে.

থাকেন। খেজুর, তাল ও পাতি গাছ হতে নকসা যুক্ত মাদুর ও পাটি তৈরী হয়। পাটি তৈরীর কাজে দিগনগরের শ্রীমতী সলেমা বিবি ও শ্রীমতী হাসিনা বিবির বিশেষ খ্যাতি আছে। এ যুগে নকসী কাঁথার শিল্প চেতনা হতে জন্ম নিয়েছে চিকন শিল্পের এবং গৃহস্থের মেয়েরা নিজেদের প্রয়োজনে গৃহশিল্প হিসাবে এটিকে বেছে নিয়েছেন। তবে এ কাজে বিশেষ পরিদর্শী হলেন বর্ধমানের শ্রীমতী মেহেরুন্নিসা আমিন, শ্রীমতী মণিকণা রায়, শ্রীমতী মৌমিতা রায়, কাটোয়ার মায়ারাণী দাস ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাস। বস্ত্রশিল্প লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বাঘাটিকরা ও সমুদ্রগড়ের তন্তুবায়-গণের তৈরী কাপড়ের উপর নূতন নূতন নক্সা বর্ধমানের বস্ত্রশিল্পের সৌন্দর্য ও ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে।

শিক্ষা :

শিক্ষার প্রসার ও সাহিত্যের বিকাশকে আংশিকভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির পরিমাপক রূপে গণ্য করা যায়। শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ধারা 'বর্ধমান' নামক স্থাননামকে কালের প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান হতে সাহায্য করেছে। শিক্ষা একদিকে যেমন জ্ঞানের আলো দেয়, তেমনি অন্ধ কুসংস্কার ও সামাজিক শোষণ হতে মানুষকে রক্ষা করে। এককথায় সংস্কৃতি নামক মহামহীরুহটিকে শিক্ষাই পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত করে থাকে।

অতীতে এদেশে শিক্ষার ব্যাপকতা ছিল না এবং যে যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা চালু ছিল সে সময়ে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাশিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। প্রাচীন জৈনশাস্ত্র হতে জানা যায় যে, রাঢ় দেশে শিক্ষার কোন প্রসার ছিল না। কালক্রমে উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বর্ধমানে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছিল একথা মনে করা যায়। সর্বপ্রাচীন 'মল্লসারুল তাম্রশাসনে' প্রমাণ পাওয়ায় যায় যে, যাগযজ্ঞে পারদর্শী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৎসস্বামী বর্ধমানে বসবাসের নিমিত্ত ভূমিদান গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'রামগঞ্জ তাম্রশাসনে' উল্লিখিত যজুর্বেদ শাখার নিম্বোর্ক শর্মা ও 'নৈহাটী তাম্রশাসনে' উল্লিখিত সামবেদ শাখার বাসুদেব শর্মা বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এই ভূমিদানগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ভূমিদানের ব্যবস্থা সুদূর অতীতকাল হতে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলে এসেছিল। ভট্টভবদেবের সখা বাচস্পতি মিশ্রের রচিত 'ভবদেব প্রশস্তি' হতে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাঢ়ে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত, গণিত, বাস্তুবিদ্যা, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পঠনপাঠন হত। (নবম অধ্যায়ে চতুষ্পাঠী, অধ্যাপকগণের নাম ও বিদ্যাচর্চার আলোচনা করা হয়েছে।)

প্রাচীনকালে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। মধ্যযুগে রাষ্ট্র বিন্যাস ও শাসকের প্রয়োজনে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার প্রসার শুরু হয় এবং সমসাময়িক-কালে রচিত 'মঙ্গলকাব্য'সমূহে শিক্ষার বিষয়সূচী, টোল, পাঠশালা ও মক্তবের

যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে। ষোড়শ শতকে মহিলাগণ কথক ঠাকুরের নিকট ভাগবত পাঠ শুনে ধর্মশিক্ষা করত তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

'স্বামী আসিবেন ঘরে করিআ কামনা
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা।' (চণ্ডীমঙ্গল)

সেকালে বিদ্যাশিক্ষা অর্থে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাকেই বোঝাত না,—

'আচার বিনয় দীক্ষা জতনে করাইব শিক্ষা
জাকু ছিরা তোমার নিলয়ে।'

মুকুন্দ মিশ্রের বর্ণনায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সংবাদ জানা যায়,—

'কাকারাদি চতুস্ত্রিংশ পড়িলেক স্বর। অকরাদি পঢ়িল বান্যা সংযোগ অক্ষর ॥
গুরুর নিকটে সাধু পায় পরিতোষ। ব্যাকরণ পঢ়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ ॥
নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মতি যে প্রবল। নাটক নাটিকা ছন্দ পঢ়িল পিঙ্গল ॥
সাহিত্য দর্পণ কাব্য পরকাশ ধ্বনি। মহিমা বামন দণ্ডী পঢ়ে ফরমানি ॥
স্ুবত সঙ্গীত শাস্ত্র পঢ়িল যতনে। শুনিয়া যতেক লোক উৎসা হয় মনে ॥'

মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চার নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত বহু পুঁথির সন্ধান মিলেছে। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান বিষয়ে গবেষণাকার্যে রত আছেন। তাঁর মতে, মধ্যযুগে রচিত পুঁথি হতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রচলন ছিল। চিকিৎসা, গণিত, বস্তুতত্ত্ব, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, জীব ও প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই সকল পুঁথি রচিত হয়েছিল।[৭৭] তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ধমানের পণ্ডিতগণের যথেষ্ট অবদান ছিল।

রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' হতে জানা যায় যে, তাঁর পিতার টোল ছিল এবং ঐ টোলে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়ান হত। কাইতি-শ্রীবামপুর, পাষণ্ডা ও আড়ুই গ্রামে টোলের সংবাদ রূপরামের বর্ণনায় পাওয়া যায়। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' পাণিনি, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নের উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নগর বর্ণনা (বিদ্যাসুন্দর) প্রসঙ্গে বর্ধমান শহরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্যাচর্চার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

'ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥'

* * *

'তুরকী আরবী পড়ে ফরাসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥'

মনে হয় পঞ্চদশ শতকে বর্ধমানে আধুনিক বাংলা ভাষা চর্চা শুরু হয়েছিল, যার প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন মালাধর বসু। পঞ্চদশ শতকে কুলিনগ্রাম, অম্বিকা-কালনা,

বিদ্যানগর, শ্রীখণ্ড, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মনে হয় এই সময়ে টোল ও মক্তবগুলি ধর্মকেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্রগুলিকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার জোয়ার আসে এবং এই ধারা পরে সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্বে শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নবদ্বীপ ও বর্ধমানের লোক।

সাহিত্যের বিকাশই শিক্ষার মাপকাঠি নির্দেশের দিগ্দর্শক। বৈষ্ণব সাহিত্য রচয়িতাগণের প্রথম চারজন কবি ছিলেন বর্ধমানের (বৃন্দাবন দাস শেষ জীবনে দেনুড় গ্রামে অবস্থানকালীন সময়ে 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন)। ঐ সময়ে শ্রীখণ্ড ছিল বিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। একমাত্র নবদ্বীপ ব্যতীত অপর কোন স্থানে এত গুণীজনের সমাবেশ ঘটে নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনকে কেন্দ্র করে বহু কবি ও ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীখণ্ডে বসবাস শুরু করেন। ঐ সময়ে এত বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থ বঙ্গভাষায় শ্রীখণ্ড গ্রামে রচিত হয়েছিল, যার নিদর্শন নবদ্বীপেও পাওয়া যায় নাই। বিদ্যানগরে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে শ্রীচৈতন্যদেব লেখাপড়া শিখেছিলেন। সংখ্যাতত্ত্বের দিক হতে বিচার করলে শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায় অপেক্ষা বৈষ্ণবগণ বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিলেন। আবার জাতিগতভাবে কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদগোপগণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ অগ্রসর ছিলেন। কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদগোপেরা সাধারণ লেখাপড়া ও পাটিগণিত শিক্ষা করে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী ও পাঠশালায় পণ্ডিতের কর্মে নিযুক্ত হতেন।

শ্রীখণ্ডের পর মাড়ো-মানকর গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল। অষ্টাদশ শতকে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বর্ধমানের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মানকর গ্রামে কয়েকটি টোল স্থাপিত হয়েছিল এবং অনেক পণ্ডিতের বসবাস ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, 'রামরসায়ন' গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় বহু স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইসলামী শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে মেমারী থানার বোহার গ্রামের খ্যাতি ছিল। যে বিপুল সংখ্যক পুস্তক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' দান করা হয়েছে, তাতে বোহারের বিদ্যাচর্চার বিষয় সহজেই অনুমান করা যায়। আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ার সুবাদে বর্ধমান, কালনা, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, উচালন, চুরুলিয়া, কুসুমগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ইসলামধর্ম ও প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। বড়বেলুন, কুলিনগ্রাম, সাতগাছিয়া, জোগ্রাম, উখড়া, চানক, ক্ষীরগ্রাম, ধাত্রীগ্রাম, পাটনীপাড়া, তালিত, কলাইঝুটি, শাকনাড়া, সোঁয়াই, বৈদ্যপুর, কুবিজপুর, করকোনা, উপলতি, মীরহাট, হাসানহাটী, রামনগর, তেহাটা, ভুরকুণ্ডা, চকব্রাহ্মণগড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, মন্তেশ্বর, কানাইডাঙ্গা, কড়ুই, এরুয়ার প্রভৃতি স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপনের কথা অ্যাডামস্ সাহেবের রিপোর্টে পাওয়া যায়। এছাড়া অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান জেলায় বহু বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল এবং এগুলিতে সাধারণ বাংলা ও পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়া হত।

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট-এর এক রিপোর্টে জানা যায়—'...that there are few villages of any note in which there is not a school but instruction in them is confined to the teaching of children to read and write.' মিশনারীগণের আগমনের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে কোন প্রচেষ্টার কথা জানা যায় না।

বর্ধমানে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা শুরু হয় মিশনারীদের প্রচেষ্টায়। অবশ্য এ প্রচেষ্টার পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ২১ একর জমি ক্রয় করে সাধনপুরে মিশন, আবাসগৃহ ও বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ বছর জুন মাসে উইলার্ড নামক এক শিক্ষক কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত হয়ে স্টুয়ার্টের শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার নিমিত্ত বর্ধমানে আসেন। বর্ধমান জ্বরের সময় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকগণ পলায়ন করায় বিদ্যালয়টি উঠে যায় এবং গীর্জাটি পরবর্তীকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের এক খবরে প্রকাশ—'বর্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোন২ গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্বায় যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশ ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাধনপুর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুল মেষ্টর হইয়াছেন।' ঐ সময়ে মহারাজাও নিজ ব্যয়ে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস ডু বোর্ড্যু মহোদয়ের পত্রে জানা যায়—'১৮১৭ সালে রাজা প্রতাপচন্দ্রের ৺প্রাপ্ত পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বর্ধমানে যে কালেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকাল পর্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম। (গয়া, ৩১ মে, ১৮৩৬)। প্রতাপচাঁদের অর্থানুকুল্যে বর্ধমানে একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে মিশনারীদের দ্বারা বর্ধমানে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও এগুলি অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ শিক্ষয়িত্রী মিসেস পিরোনের (Mrs. Perowne) ইংলণ্ড গমনের কারণে ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসেস ডিয়ার ও মিসেস লিঙ্ক কয়েক বছর চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে সক্ষম হন নাই। আদালত ও সরকারী কাজকর্মে ফার্সী ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র ভর্তির অনাগ্রহ থাকায় ঐগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল।

বর্ধমান মিশনচার্চের পাদ্রী পিরোনের ভারত ত্যাগের ফলে মিশনারী বিদ্যালয়টির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এবং ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে এটি বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যালয়টিকে সাধনপুর হতে শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলে খোসবাগানে স্থান নির্বাচনের পর মহারাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দানে মিশনারীরা পুনরায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী হয়। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর

'সংবাদ কৌমুদী'র এক খবরে প্রকাশ—'বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষনে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত জজসাহেবের যে স্থানে বিচারগৃহ নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিমে প্রায় আটশত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগন নামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নিৰ্ম্মাণ হইতেছে। এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক।' রেভাঃ লঙ উল্লেখ করেছেন যে উক্ত বিদ্যালয়টি ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে শুরু হয় এবং বর্তমানে বি সি· রোডের উপর এটি সি· এম· এস· বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

বর্ধমানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল অনুরূপ কারণবশতঃ খ্রীস্টধর্ম প্রচারের নিমিত্ত কালনা শহরে বিদ্যালয় স্থাপনের কথা জানা যায়। ১৮২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী কোড়ী (Corrie) ও পাদ্রী ডিয়ার (Deer)-এর উদ্যোগে কালনার ৪টি বিদ্যালয় এবং পরের বছরে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পঠনপাঠনের মান অত্যন্ত নিম্ন হওয়ায় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার এখানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া মেমারী, কাটোয়া, রানিগঞ্জে একটি করে মিশনারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও জানা যায়। উনবিংশ শতকে বর্ধমানে স্ত্রীশিক্ষার কোন অগ্রগতি ছিল না। বর্ধমান ত্যাগের পর ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের লেখা মিসেস পিরোনের পত্রে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে,[৭৮]—

'From my first arrival in Burdwan, it was my desire, if possible to form some female schools ; but the very idea of such a thing appeared rediclous to those best acquanted with the natives. My own ignorance of the people and language prevented my making any attempt, except through others, and the consequence was, that for some time nothing was affected. At length a commencement was made in the beginning of March 1822 ; my first school was opened with twelve girls. The prospect of usefulness which now presented itself gave me much pleasure, and I visited the school daily. It was not long, however that the hope of reward alone had induced them to come ; and being disappointed in that respect, they could no longer be prevailed upon to attend. Thus I was, with much reluctance, compelled to close my first school.'

১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে এডুকেশন কমিশনার উইলিয়াম অ্যাডামস্-এর তৃতীয় রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন—'**Burdwan is the best educated district in Bengal.**' তাঁর রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, বর্ধমান জেলায় বাংলা বিদ্যালয় ৬২৯টি, সংস্কৃত-টোল ১৯০টি, আরবী-পারসি শিক্ষার বিদ্যালয় ১০৪টি, ইংরাজী বিদ্যালয় ৩টি, বালিকা

বিদ্যালয় ৪টি ও শিশু বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১টি। মোট ছাত্র সংখ্যা ১৩,১৯০ জনের মধ্যে ক্রিশ্চান ১৩ জন, মুসলমান ৭৬৯ জন ও অবশিষ্ট ১২,৪০৮ জন হিন্দু বালক-বালিকা। শিক্ষক মহাশয়গণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদগোপ সম্প্রদায়ের মানুষ।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর প্রস্তাব অনুসারে ১৮৫৪ সালে বঙ্গদেশের জন্য পৃথক লেফটানেণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি হয় এবং স্যার জেমস ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই পদে নিযুক্ত হন। ১৭ই জুলাই, বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের প্রস্তাবে বঙ্গদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পৃথক দপ্তরের সৃষ্টি হয়। হ্যালিডে ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় চারটি জেলায় বাংলা মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টররূপে নিযুক্ত করায় তিনি বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বর্ধমান জেলায় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে ৫টি, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ১টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী হতে মে মাসের মধ্যে ১০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদের বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী অনুদান লাভ করলেও ছাত্রীদের বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করেছিলেন। মহতাব্ চাঁদ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রথমে অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেও পরে অনীহা প্রকাশ করায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমান শহর ও কালনা ব্যতীত এই বিশাল জমিদারীর মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে বর্ধমানের রাজাদের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নাই। বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে চকদীঘির জমিদার নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আসায় শিক্ষক নির্বাচন ও বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় বিদেশের শিক্ষা পদ্ধতি ও পঠনপাঠন চালু হয়।

বর্ধমান জেলায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত কলেজ হল 'বর্ধমান রাজ-কলেজ'। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে মহারাজার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়টি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে 'হাইস্কুলে' পরিণত হয় এবং ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা আফতাব্ চাঁদের অর্থানুকুল্যে এটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মডেল বিদ্যালয়ের কথা স্মরণে রেখে ও রাজাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বিদ্যোৎসাহী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নিজেদের কীর্তিরক্ষাকল্পে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই সময়ে কুলিনগ্রাম, তোড়কোনা, সিয়ারশোল, ওকড়সা, বলগনা, বাঘনাপাড়া, দিসেরগড়, কাটোয়া, বাদলা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তাঁর পৈত্রিক নিবাসে পিতা নবীনচন্দ্রের নামে এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবীর নামে যবগ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ

প্রদর্শন করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকাভুক্ত শিক্ষা বিভাগকে নবরূপে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে যেমন সাধারণ শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তিবিদ্যা, খনি ও চিকিৎসাবিদ্যা পঠনপাঠনের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সরকারী উদারনীতি ও স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎসাহে এ জেলায় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মভারে নুহ্যমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গতি স্তিমিত হওয়ায় স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ের দূরদৃষ্টির ফলে গ্রামবাংলায় উচ্চশিক্ষা ও কারীগরী শিক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্ত ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন বর্ধমান রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়'। বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ার ফলে বর্ধমান, হুগলী, বীরভুম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বহুবিধ সুযোগসুবিধা লাভের জন্য এতদঞ্চলে উচ্চশিক্ষার হার আজ ক্রমবর্ধমান। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য দুর্গাপুরে রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য সি. এম. ই. আর. আই মহাবিদ্যালয়গুলি এযুগের অন্যতম অবদান।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানের বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন। এর ফলে শিক্ষা বিষয়টি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। সম্পূর্ণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোন বিভাগই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে পারে না বা এর সুযোগও কম। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে একই ধাঁচে, যার ফলে বিদ্যালয়গুলির লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ তৈরীর কারখানায় পরিণত হবে ; এটি কোন সুস্থ সমাজের অগ্রগতির লক্ষণ নয়।

বর্তমান দশকে এ জেলায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র ও শ্রমিকগণকে সাধারণ শিক্ষার আলোকে আলোকিত করাই হচ্ছে প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য। অতি সাম্প্রতিককালে এক খবরে প্রকাশ যে, সারা ভারতের মধ্যে বর্ধমানে সাক্ষরতার স্থান দ্বিতীয়। সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করে মোট ৬০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১২ লক্ষ নিরক্ষরকে বেছে নিয়ে তন্মধ্যে ১১ লক্ষ নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করে তোলা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু অভিযানটিকে কেবলমাত্র সাময়িক-ভাবে পরিচালনা করার পর বন্ধ করে দিলে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কারণ সাক্ষরতা হল শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। তাই ১১ লক্ষ লোককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তুলতে হলে এখানেই থেমে গেলে চলবে না। ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে জনশিক্ষার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এই অভিযানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে ; অন্যথায় চরম হতাশা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আর জনশিক্ষার মাধ্যমেই বর্ধমানের সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি হবে বহমান।

স্কুল-কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা নয়। শিক্ষার প্রয়োগ ও চর্চা

সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র যেমন বিদ্যালয় বা কলেজে যোগদানে অসক্ষমদের সহায়ক; তেমনি প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা শেষ করে শিক্ষাচর্চার সহায়ক হবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেখানে মানুষ অবাধে জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সক্ষম। সত্তরের দশকের শেষভাগ হতে বর্ধমান জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। এ সফলতার পিছনে আছে সরকারী নীতি, গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতা ও স্থানীয় ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিনাশুল্কে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গদেশের বহু জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহারাজা আফতাব্ চাঁদ বর্ধমানে 'রাজ-লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ জেলার প্রথম গ্রন্থাগার হল 'রানিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী' এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ সালে বলে জানা যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে কালনার মেয়ো লাইব্রেরী ও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কাটোয়ায় শ্যামলাল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। একালে রাজ-লাইব্রেরীর কোন অস্তিত্ব নাই এবং ঐ জায়গায় ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া আসানসোল ও দুর্গাপুরে সমমর্যাদাসম্পন্ন আরও দুটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বর্ধমান জেলায় মহকুমা গ্রন্থাগার দুটি, কাটোয়া ও কালনায় এবং টাউন লাইব্রেরীটি রানিগঞ্জে অবস্থিত এবং জেলায় মোট ১৯৭টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (Rural Library) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলি সভ্যদের নিকট মাসিক চাঁদা গ্রহণ করলেও গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের বেতনের ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন। জেলার বহু বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় প্রায় চার শতাধিক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং জেলাপরিষদ বাৎসরিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে থাকে। গ্রন্থাগার ব্যতীত বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, যাঁরা যাত্রা, গান, লোককথা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার এসোশিয়েশনের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলায় পুরাতন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪টি অর্থাৎ সময়ের বিচারে এগুলির বয়স ৫০ বছরের অধিক, যথা,—

আদ্রাহাটী (১৯৩৭)	অমরারগড় (১৯৩৬)	এড়াল (১৯৩০)
এথোরা (১৯৩৫)	কাটোয়া (১৯০৪)	কাটোয়া (১৯৩৫)
কেতুগ্রাম (১৯৩৬)	কালনা (১৯শ শতক)	কালনা (১৯৩৫)
খাটুন্দি (১৯৩৬)	গলিগ্রাম (১৯৩৬)	চৈতন্যপুর (১৯৩৫)
চাণ্ডুলী (১৯১৫)	জাড়গ্রাম (১৯২১)	জামালপুর (১৯৩৬)
জৌগ্রাম (১৯৩৬)	দিগনগর (১৯৩৭)	নারায়ণপুর (১৯৩৩)
বহরান (১৯২০)	বাগনাপাড়া (১৯৩০)	বাহারকুলি (১৯১৪)
বুদবুদ (১৯৩৭)	বৈদ্যপুর (১৯১৭)	মধ্যমগ্রাম (১৯৩২)

মেমারী (১৯২৩)	মৌগ্রাম	রানিগঞ্জ (১৮৭৬)
রানিগঞ্জ (১৯২৪)	রায়না (১৯৩৬)	সাতগাছিয়া
সম্বিপুর (১৯৩৫)	সাঁকতোড়িয়া (১৯২৬)	সোঁয়াই
হালদিপাড়া		

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রন্থাগারিকগণই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন ; অবশ্য অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত জনশিক্ষার এই শাখাটি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার উন্নতি অত্যাবশ্যক ; আর বয়স্কশিক্ষা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার নির্ভর করে এবং জনশিক্ষার দ্বারাই বর্ধমানের সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির গতি হবে সজীব ও চলমান।[৭৯]

পাদটীকা ঃ

১। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪।
২। *Quoted in Kroeber's Anthropology*, p. 252.
৩। *Anthropology*—A. L. Kroeber, p. 261.
৪। *Ancient Society*—L. H. Morgan, p. 29.
৫। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭।
৬। বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়—শঙ্কর সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬৫।
৭। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : তুষার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ, পৃঃ ৩।
৮। *The Tribes & Castes of Bengal*—H. H. Risely, Vol. I, p. XLIV.
৯। *Some Historical Ethnical Aspects of the Burdwan District—W. B. Oldham*, p. 2.
১০। *Indo Aryan Races*—R. P. Chanda, p. 24.
১১। *Everyday life in the Pala Empire*—Dr. Shahanara Hussain. p. 105.
১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম ভাগ, ব্রাহ্মণ্য কাণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ১১৯-২৫।
১৩। *The Jatak*, Book-I [Vol. V]—E. B. Cowell, 254 ; "Ugga a mixed caste, by a Kshatriya father from a Surya mother. The Scholiast however, explains the word by *uggata Pannata*, as though from *uggacchati.*"

১৪। *Caste in India*—J. H. Hutton, p. 97.
১৫। *Statistical Account of Bengal*,—W. W. Hunter, Vol. IV, p. 46-54.
১৬। *Annexture to the Tribal Map of India in the light of Census Report*, 1961.
১৭। সিন্ধু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—অতুল সুর, পৃঃ ৯৪।
১৮। *Statistical Account of Bengal*, Vol. IV, p. 54.
১৯। *Caste in India*, p. 31.
২০। *Ibid.*, p. 54.
২১। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫।
২২। *The Golden Bough*, (Abridged Ed.)—Sir James Frazer, p. 66
২৩। *Ibid.*, p. 99.
২৪। *Ibid*, p. 498.
২৫। পঞ্চোপাসনা—জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২।
২৬। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ১২৮-২৯।
২৭। সাহেব ধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান—সুধীর চক্রবর্তী, পৃঃ ১।
২৮। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ও বাংলার কীর্তনের ইতিহাস—হিতেশরঞ্জন সান্যাল, গ্রন্থদ্বয়ের বিভিন্ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২৯। গৌড় কাহিনী,—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০।
৩০। পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধুসন্ত প্রসঙ্গ—গোলাম সাকলায়েন, পৃঃ ৫০-৫৫ ও লেখকের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ।
৩১। *J. A. S. B.*, 1917, p. 182.
৩২। *Hand Book of Bengal Missions*—Rev. J. Long, p. 79-80 বর্ধমান শহরের চার্চের যাজকের নিকট হতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত তথ্য ও লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
৩৩। *Journal of Ancient History*, Vol. XII, p. 49.
৩৪। ভ্রমণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ সাল, পৃঃ ২৪৬।
৩৫। ভ্রমণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ সাল, পৃঃ ২৩৬-৩৭।
৩৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,—বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩১।
৩৭। *Jain Journal*, 1984, p. 149.
৩৮। *South Indian Shrines*—P. V. Jagadish Ayyar, p. 11.
৩৯। *Epigraphia Indica*, Vol.
৪০। *Architecture of Bengal*—S. K. Saraswati, Book-I, p. 50-51.
৪১। *Indian Archaeology*, A Review, 1966-67, p. 44.

৪২। *Architecture of Bengal*—S. K. Saraswati, Book-I, p. 108.

৪৩। *J. A. S. B.*, 1936, p. 21-25.

৪৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৮৮ সাল, পৃঃ ৫৪।

৪৫। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫-২৬।

৪৬। *Late Medicural Temples of Bengal*—David J. Mecutchan; *Brick Temples of Bengal—Ed. George Michell*; বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, Anicient Monuments of Bengal গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে তারাপদ সাঁতরা মহাশয় ও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আলোচনায় স্থান লাভ করেছে।

৪৭। *History of Aurangeb*—Sir J. N. Sarkar, Vol. III, p. 187.

৪৮। মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, পৃঃ ২০।

৪৯। *Riyazu-s-Salatin*—Ghulam Husain Salim, p. 291.

৫০। *J. B. O. R. S.*, Vol. III, pt. III, p. 374.

৫১। *Inscriptions of Bengal*—Shamsud-Din-Ahmed, Vol. IV, p. 279-80.

৫২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২০ সাল, পৃঃ ১৮৭-৮৮।

৫৩। *Riyazu-S-Salatin*, p. 244.

৫৪। *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV, *Riyazu-S-Salatin*, *Contribution to the Geography and History of Bengal*—H Blochmann, *J. A. S. B.* (1917) *J. B. O. R. S.* (1917) *Bengal Past and Present* (1917) আলোচিত অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। এছাড়া গ্রাম পরিক্রমার সময়ে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য আছে।

৫৫। *Hand Book of Bengal Mission*, p. 80 & 209. *Bengal Dist. Gazetteer, Burdwan*—J. C. K. Peterson, p. 46-48. কৌশিকী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৫ সাল, পৃঃ ২২; বর্তমান লেখকের রচিত 'ইন্দ্রাণীর পুরাকৃতি'। বর্ধমান শহরস্থ চার্চের যাজকের নিকট হতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত তথ্য।

৫৬। ইতিহাস, ১৩৭৯ সাল, পৃঃ ৮৫।

৫৭। *Late Mediaeval Temples of Bengal*, p. 67.

৫৮। ইতিহাস, ১৩৭৯ সাল, পৃঃ ৭৬-৭৮।

৫৯। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২০ সাল, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

৬০। লিরিক, ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ২৬-৩১।

৬১। *Indian Archaeology*, A Review, 1957-58, p. 69.

৬২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ১৮৮-৯০।

৬৩। মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র—তারাপদ সাঁতরা, পৃঃ ৪৮-৫০।

৬৪। বর্ধমান জেলার মেলা—ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, পৃঃ ১৪০।
৬৫। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)—অশোক মিত্র ও বর্ধমান জেলার মেলা, সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ দ্রষ্টব্য।
৬৬। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫০।
৬৭। ছড়ায় স্থান বিবরণ—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪-৫।
৬৮। ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ—তারাপদ সাঁতরা, পৃঃ ৬।
৬৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃঃ ৫৩৬।
৭০। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১২।
৭১। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ১৬৮।
৭২। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৭৬৪।
৭৩। *Tribes and castes of West Bengal*—Ed. Asok Mitra, (ch. on The Artisan castes of West Bengal and their craft—Sudhansu Kumar Roy, p. 333.
৭৪। *Brick Temples of Bengal*—Ed. George Michell, (ch. on Architects and Builders—Tarapada Santra) p. 53-62.
৭৫। বাংলার দারু-ভাস্কর্য—তারাপদ সাঁতরা, পৃঃ ৭১।
৭৬। *Tribes and castes of West Bengal*—p. 315-41.
এছাড়া তারাপদ সাঁতরা ও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্য।
৭৭। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, ১৩৮৬ সাল, পৃঃ ৩৫-৪০।
৭৮। Hand Book of Bengal Mission—The Rev. James Long, p. 421.
৭৯। *Hand Book of Bengal Mission*—Rev. James Long; *Statistical Account of Bengal*, Vol. IV; *Bengal District Gazetteers, Burdwan; Imperial Gazetteers*, Vol. IX; *Bengal Library Directory*, 1942; *History of Modern Bengal* (Part-I)—R. C. Majumder. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড): বর্ধমান রাজবংশানুচরিত; বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ—বিনয় ঘোষ।

নবম অধ্যায়

সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন,—'ভাষার ক্ষেত্রে প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার সমাপ্তি। আর একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশু প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিংশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো, তার কাছ হতে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বের চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। একেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য।' কবিগুরুর এই উক্তি কেবলমাত্র বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়—পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের পক্ষে একথা প্রযোজ্য। মানুষ প্রথমে ভাষাকে আয়ত্ত করে এবং সেই ভাষা হতে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে যা, 'মানুষের হৃদয়ের মহত্ব তার প্রসার কোন্ জাতের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে, তার আনন্দ সম্পদের কত বৈচিত্র্য ও মহামূল্যতা তার সাহিত্য থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।'

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, তাই এই ভাষাতেই আমরা কথা বলি আর মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে বাংলা ভাষার প্রচলন হলেও প্রাকৃত ও অর্ধ-মাগধী ভাষার নিকট আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। আবার কথ্য ভাষায় কোলগোষ্ঠীর ভাষার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অর্থাৎ সাহিত্যে বাংলা ভাষা, আর্যভাষার আবরণে ব্যবহৃত হলেও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্ট্রিক শব্দের ব্যবহার আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছে। ('Bengali, like other Aryan Languages of India, has spread, and is still spreading, at the expenses of the aboriginal tongues. O.D.B.L., p. 3) রাঢ় অঞ্চলে আদি কথ্যভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষা ; যার অস্তিত্বের পরিচয় লোক প্রচলিত শব্দ ও স্থাননামের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচলন দেখা। জৈন ও বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থে প্রাকৃত, অর্ধ-মাগধী ও পালি ভাষার মিশ্র প্রচলন দেখা দিলেও শেষ অবধি সাহিত্যের আসরে সংস্কৃত ভাষা মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল। এককথায় বলা যায় যে, নানা ভাষার সংমিশ্রণে আমাদের বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হতে উত্তর ভারতের সঙ্গে রাঢ় ও বরেন্দ্রের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয় এবং এই যোগাযোগের ফলে একদিকে যেমন বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যসভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে, তেমনি অপর

দিকে আর্যভাষাকে গ্রহণ করে এদেশের আদি ভাষার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে তাকে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হয়। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতবাদ হল, —'People of humbler ranks were continually coming into Bengal from Magadha, Kasi and beyond, as they have always been doing uptil now, and by settling down in the country were re-inforcing the position of the Aryan speech. It is very likely that *Pragjyotisa* and *Vanga*, from their comparatively remote position, received Aryan speech later than West, North, and Central Bengal and this early contrast between an advanced and Aryanised North and West Bengal, and a rather backward East Bengal possibly differing linguistically and racially (in having a prominent Tibeto-Burman element) from West Bengal, is at the root of the contemptuous use of the term বাঙ্গাল-Bengal-for an inhabitant of East Bengal (=*Vang-ala*), even at the present day when the name Vanga has been extended west to *Pundra* and *Radha* (jointly known as Gauda-desa).' [O. D. B. L., page, 73-74.]

দু'টি পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ হতে জানা যায় যে, রাঢ়ে গুপ্তযুগে লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। 'শুশুনিয়া গিরিলিপি' সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল এবং 'মল্লসারুল তাম্রশাসন' সংস্কৃত ভাষায় খোদিত হলেও এর অক্ষর উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপিকে অনুসরণ করেছে। মঙ্গলকোটে আবিষ্কৃত একটি শীলমোহর সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। কাল পরিক্রমায় যে ভাষার সৃষ্টি হল তদ্দ্বারা চর্যাগীতি রচিত হয়ে আদি বাংলাভাষার সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রমাণস্বরূপ থেকে গেছে এবং আরও তিন-চার'শ বছর পরে শুরু হল আধুনিক বাংলা ভাষার চর্চা। এই সময়ে খাঁটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ও ভাষার আলঙ্কারিক দিক পরিস্ফুট হওয়ায় বাংলা ভাষা বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। তবে এ যুগে মৈথিলী ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভিক পর্বের সূচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—'সমাজ, ধর্ম ও আচার এবং গার্হস্থ্য এই তিন পরিবেশে সব জাতির যেমন বাঙালীরও তেমনি মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।' উপরোক্ত তিন পরিবেশের কথা বিচার করলে দেখা যায় যে, চতুর্দশ / পঞ্চদশ শতকে চণ্ডীদাস, কীর্তিবাস, মালাধর, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত-এর রচনার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এবং যার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে ষোড়শ শতকে।

'ষোড়শ শতক'কে বাংলার নবযুগ বা রেনেশাঁ বলা যায় এবং সর্ববাদিসম্মত না হলেও একটা নির্দিষ্ট তারিখ খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য নয়। এই তারিখটা হল, ১৪৩১ শকাব্দের ২৯শে মাঘ (১৫১০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী), কারণ এই দিনে শ্রীচৈতন্যদেব,—

'প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃ কথা
কণ্টক নগরে আইলা শ্রীভারতী যথা ॥' (ভক্তিরত্নাকর—২।২৪)

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ ও নবধর্ম প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে অভূতপূর্ব জনজাগরণের (আধুনিক অর্থে নয়) সৃষ্টি হয়। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এই যুগে বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হয়, যেগুলির সাহিত্যিক মূল্য আজও অম্লান। বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্যরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ষোড়শ শতকে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায়।

বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য কীর্তির জন্য সারা বাংলার কবিদের যথেষ্ট অবদান আছে। কবিরা হয়ত কোন এক ভৌগোলিক অঞ্চলে জন্মেছিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিদের সাহিত্যকীর্তি আঞ্চলিক সীমারেখার দ্বারা সীমায়িত থাকে নাই। কৃষ্ণদাস, শ্রীকবিকঙ্কন, জয়ানন্দ, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস-এর প্রথম পরিচয় তাঁরা বাঙালী কবি এবং তাঁদের রচনা ও ভাবাদর্শ সারা বাংলায় আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ কবিদের আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যায় না। পদাবলী সাহিত্যের কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাসকে কি ভৌগোলিক সীমায় বাঁধা যায়? এ যুগেও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সারা বঙ্গদেশের মানুষের জন্য। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কেউ এ প্রশ্ন তুলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো অথবা যশোহর অথবা বর্ধমানের কবি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর তথা সারা বিশ্বের মানুষের কবি। বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বমানবতা বা অধ্যাত্মবাদ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতার সিমলাপল্লীতে অথবা কালনা থানার দত্তদেরিয়াটোন-এ—এই আলোচনা হবে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্বসূরীদের রচনায় একটা সাধারণ ছাপ থেকে যায়। সেকারণে বর্ধমানের সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে কবি ও সাহিত্যিকদের অবদান সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

সংস্কৃত সাহিত্য :

বাংলা ভাষার অলঙ্কার, ছন্দ, কাব্যমাধুর্য ইত্যাদির জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট অবদান আছে। প্রথম পর্বের অধিকাংশ বিখ্যাত কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করতে হলে সংস্কৃত ভাষাচর্চার কিছুটা ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্যথায় সাহিত্য আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না। রাঢ় অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার প্রাচীন নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে রাঢ় অঞ্চলে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্' হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, কৃষ্ণমিশ্র ছিলেন সম্ভবতঃ বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডিহিভুরস্থট

এলাকার অধিবাসী। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ও গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবকে কেন্দুবিল্ব অথবা নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী বলে দাবী করা হয়।

বর্ধমান এবং সন্নিহিত জেলা মেদিনীপুরে প্রাপ্ত গোপচন্দ্র, শশাঙ্ক, ঈশ্বর ঘোষ ও বল্লালসেনের সময়ে সম্পাদিত তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে সংস্কৃতচর্চার প্রসার যে যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংস্কৃতে রচিত ভুবনেশ্বর প্রশস্তিলিপিতে। ভবদেব-সখা বাচস্পতি মিশ্র রচিত ও অনন্ত বাসুদেব মন্দির গাত্রে প্রথিত রাজা হরিবর্মাদেবের মহামন্ত্রী রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী ভট্টভবদেব নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। প্রশস্তিলিপি হতে আরও জানা যায় যে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্র, তন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকে অনুমান করেন যে, সিদ্ধলগ্রামের অবস্থিতি ছিল বর্ধমানে ; আবার অন্য মতে এই গ্রামটি বীরভূমের অন্তর্গত বলে দাবী করা হয়। দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কাকতীয় বংশের রাজা গণপতির সময়ে রাঢ়ের পূর্বগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণানদীর তীরে গোলকী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন এবং গণপতির কন্যা রাজ্ঞী রুদ্রাম্বার সময়ে সম্পাদিত থলকাপুর প্রশস্তিলিপিতে উল্লেখ আছে যে, দক্ষিণরাঢ়ের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গোলকীমঠে বসবাস করতেন। অমরকোষের সর্বপ্রাচীন টীকাকার সর্বানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তা'হলে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় যে, তিনি রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মত উল্লেখ করে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, প্রাচীনকাল থেকেই বর্ধমানে সংস্কৃতচর্চার প্রসার ছিল এবং 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলে রচিত হয়েছিল। এ মতের স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও উপপুরাণখানি যে বঙ্গদেশে রচিত হয়েছিল সে কথা বলা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতক হতে পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সাহিত্যচর্চা মোটামুটিভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা গ্রন্থকারসহ গ্রন্থসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে নেপালে অনুসন্ধান করলে হয়ত সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে।

জীব গোস্বামীর 'লঘু-বৈষ্ণবতোষণী' হতে উদ্ধৃতি দিয়ে নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে (১ম তরঙ্গ, শ্লোক ৫৪০-৭৭) উল্লেখ করেছেন যে, কর্ণাটদেশাধিপতি জগদ্গুরুর পুত্র অনিরুদ্ধদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর তাঁর অনুজ হরিহর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে স্বীয় সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বসবাসের নিমিত্ত আসেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ, রাজা দনুজমর্দনদেবের অনুরোধে গঙ্গারতীরে নবহট্টে বসতি স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পৌত্র কুমারদেব জ্ঞাতি বিরোধের ফলে নৈহাটী ত্যাগ করে যশোরের ফতেয়াবাদে গমন করেন। কুমারদেবের তিন পুত্র, যথা, সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ। এ প্রসঙ্গ অবতারণার অর্থ হল রূপ-সনাতনকে কেবলমাত্র বর্ধমানবাসী হিসাবে

প্রতিষ্ঠা করা নয়। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী ও সুকুমার সেনের কুমারহট্ট সমীকরণের অসম্পূর্ণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রসঙ্গটি অবতারণা করা হল (সেই সঙ্গে অত্র গ্রন্থের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সনাতনের জন্মকাল ১৫শ শতকের শেষ-ভাগে হলে অন্ততঃপক্ষে তাঁর প্রপিতামহ ঐ শতকের গোড়ার দিকে নবহট্টে এসেছিলেন। কিন্তু রূপ-সনাতনের সমসাময়িক বিপ্রদাস ও জীব গোস্বামীর সমসাময়িক মুকুন্দরাম যে নৈহাটীর উল্লেখ করেছেন সেটি কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী কোন প্রাচীন স্থান নয়, এমনকি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত 'তীর্থমঙ্গল'-এও এর কোন উল্লেখ নাই। সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য অপেক্ষা গ্রহণীয় ব্যাখ্যা হল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ''-এ আলোচিত হরিদাস দাসের ব্যাখ্যা (পৃঃ ৫৬)—'নবহট্ট বা নৈহাটী বা নৈটী গ্রামটি কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে।······এই স্থানে শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত শাস্ত্রাদির শিক্ষাগুরু বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি থাকিতেন।······দক্ষিণখণ্ড গ্রামের [থানা-ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ] গোস্বামী বংশীয়দের নিকট শ্রীপদ্মনাভ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শ্রীলসনাতন প্রভুদের কুলগুরু।' পূর্বাপর বিচার না করে ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জি ও ডঃ শচীন্দ্রকুমার মাইতি একই ভুল করেছেন তাঁদের 'Corpus of Bengal Inscriptions (p. 258) গ্রন্থে। নৈহাটী (২৪ পরগণা) ব্যতীত যে, আরও একটা স্থানের নাম 'নৈহাটী' আছে, তা ননীগোপাল মজুমদারের গ্রন্থে (*Inscriptions of Bengal*, *Vol. 3, p 68*) পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থান-কালীন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবধর্মের বহু আকরগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নৈহাটী গ্রামটি সে যুগে যে বিখ্যাত ছিল তার অপর প্রমাণ হল রাধাবল্লভ দাসের একটি উল্লেখ হতে ; (পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬, লিপিকাল ১১৮৫ সাল) কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠের পর তাঁর সম্পর্কে রাধাবল্লভ দাসের (শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য) সশ্রদ্ধ উক্তি হল,—

'৺শ্রীহরি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়তাং ॥
নৈহাটী নিকট গ্রাম / ঝামটপুর সুখধাম / জাহা ছিলা কবিরাজ গোস্বাঞী
নিত্যানন্দ দয়া করি / পাঠাইলা ব্রজপুরি / জাও তুমি তোমার নিজ ঠাঞী।
য়ারে য়ামার গোস্বাঞি কৃষ্ণদাস
প্রভু য়াজ্ঞা সিরে ধরি / গেলা গোস্বাঞি ব্রজপুরি / রহে রূপ রঘুনাথ পাস।
একে নিত্যানন্দ সক্তি / তাহাতেয় গাঢ় ভক্তি / তাহে রূপ রঘুনাথ সঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ লীলা জত / গৌরলিলা য়ভিমত / ভাসে পহু এ দুই তরঙ্গ।'

ষোড়শ শতকে প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বা স্মার্তভট্টাচার্যের সারা বাংলা জোড়া খ্যাতি ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, জয়ানন্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—'কবি [জয়ানন্দ] যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের নাম স্মার্ত

রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উজ্জ্বল রহিয়াছে।' বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য রঘুনন্দন শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করে 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, যার নির্দেশ আজও প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পরিকর শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর (১৪৭৮-১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ), তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ (বরবকশাহ ও হোসেন শাহের চিকিৎসক) ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর (মুকুন্দের পুত্র) পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবসমাজে নেতৃত্ব প্রদান করে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচারে সহায়তা করেন। নরহরি সংস্কৃত ভাষায় 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল,' 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত,' 'ভক্তামৃতাষ্টক', 'গীতচন্দ্রোদয়' 'নামামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। নরহরিই সর্বপ্রথম 'গৌরলীলাত্মক' কবিতা রচনা করে এ বিষয়ে অন্যান্যদের কাছে পথিকৃৎ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃতপুত্র ও গৌরঅবতারের অংশরূপে কথিত শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সংস্কৃতে কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া লীলাকীর্তনে সারা বাংলাদেশের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। ধর্ম-ভাব ও পাণ্ডিত্যের জন্য অভিরাম গোস্বামী তাঁর নিকট পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় পরাস্ত হয়েছিলেন। 'প্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীখণ্ড নিবাসী গোবিন্দদাসের 'সঙ্গীত সাধক' নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামে দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর পৌত্র ঘনশ্যাম দাস (পিতা দিব্যাসিংহ) 'গোবিন্দ রতিমঞ্জরী' গ্রন্থটিতে স্বরচিত শ্লোক সঙ্কলন করেন।

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস' 'কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা', 'নিত্যানন্দ যুগলাষ্টক', 'রসকল্প-সারষ্টক', 'রামানুজগুরুপরম্পরা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল জাহ্নগরে মাতা নারায়ণী দেবীর সঙ্গে এবং পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের আদেশে দেনুড় গ্রামে বসবাসকালীন সময়ে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। ঝমটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাতের কোন পরিচয় মেলে না। তিনি 'কৃষ্ণামৃত গ্রন্থের টীকা,' 'গোবিন্দ লীলামৃত', 'ভগবত শাস্ত্র', 'গূঢ় রহস্য,' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। মধ্যযুগে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমানের যথেষ্ট অবদান ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণির শিক্ষাগুরু বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁর ভাই গঙ্গাদাস পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী হয়েও বিদ্যানগরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং নানা স্থান হতে তাঁদের নিকট বিদ্যার্থীগণের আগমন ঘটত। বৃদ্ধ বয়সে প্রতিকুল রাজনৈতিক অবস্থার ফলে সার্বভৌম এই স্থান ত্যাগ করে ওড়িশায় চলে যান। অষ্টাদশ শতকে ধাত্রীগ্রাম নিবাসী অভয়রাম তর্কভূষণ (ভট্টাচার্য) ও তাঁর পুত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (বুনো রামনাথ) আর্থিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও আজীবন শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। অষ্টাদশ শতকে মাড়ো-মানকর নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ ও তার ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ

করেন এবং আজও তাঁর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। এছাড়া তিনি 'গৌরাঙ্গচম্পূ', 'রাধামাধবোদয়,' 'দেশিক নির্ণয়,' 'বৈষ্ণব ব্রত নির্ণয়', 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী,' 'শ্রীমদভাগবতের সংশয়শাতনীটীকা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এই সকল গ্রন্থ রচনার জন্য অ্যাডামসের রিপোর্টে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলা ১১৯৩ সালে মাড়োগ্রামে রঘুনন্দনের জন্ম হয় এবং ৪৫ বৎসর বয়সে ১২৩৮ সালে রামরসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন। 'রাম-রসায়ন' গ্রন্থে তাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজন বল্লভ বর্ধমান জেলার নোতা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গোপীজন বল্লভের পুত্র রামেশ্বর ইছাবটগ্রাম-এ চলে যান। তাঁর পুত্র নৃসিংহদেব মাড়োগ্রামে বসবাস করেছিলেন। বংশতালিকাটি হল—১। নিত্যানন্দ ২। বীরভদ্র ৩। গোপীজন বল্লভ ৪। রামেশ্বর ৫। নৃসিংহদেব ৬। বলদেব ৭। লালমোহন, বংশীমোহন ও কিশোরীমোহন ৮। কিশোরীমোহনের প্রথমা স্ত্রীর (এড়াল-বাহাদুরপুরের কন্যা) গর্ভে রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্ম। (বাঙ্গালা ভাষা—রামগতি ন্যায়রত্ন, পৃঃ ৪৯-৫০)। কলিকাতাবাসী রামকমল সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল বলে জানা যায়।

নবদ্বীপের পণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশের পিতা যদুরাম সার্বভৌম মুর্শিদাবাদ হতে নবদ্বীপে আগমন করেন। সম্ভবতঃ শঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুকাল বর্ধমানে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়, কারণ বর্ধমানের জমিদার জগৎরাম রায় তাঁকে ভূমিদান করেছিলেন (তায়দাদ নং ৩৮১৬৭)। সাতগাছিয়ার অধিবাসী রামদুলাল তর্কবাগীশ (১৭১৫-১৮১৫) ন্যায়শাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ, রাজা তেজচন্দ্রের তুষ্টির জন্য 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি' নামে এক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা করেন (১৭৫৩ শকাব্দ)। রামদুলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীচরণের পুত্র কাশীনাথ 'পদ্যমুক্তাবলী' নামে ছন্দশাস্ত্রের একটা পাঁচ পরিচ্ছেদে (১৭২৫ শকাব্দে) গ্রন্থ রচনা করেন। মাড়ো-মানকরের ভট্টাচার্য ও মিশ্র পরিবারের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি বহুকালের। মানকরের মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম, কৈলাসনাথ ও অযোধ্যানাথ সার্বভৌম প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মানকরের ভট্টাচার্য বংশের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের সুসম্পর্কের কথা জানা যায়। জমিদার কীর্তিচাঁদের গুরুবংশ ছিল মানকরে। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে 'ভরত মল্লিক' (বা সেন) পাটনীপাড়ার কল্যাণমল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় 'একার্নবার্থ সংগ্রহ,' 'দ্বিরূপধ্বনিসংগ্রহ' এবং 'মুগ্ধবোধিনী' ও 'লিঙ্গাদিসংগ্রহ' নামে অমরকোষের দুটি টীকা রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে কল্যাণমল্ল মেঘদূত কাব্যের টীকাও রচনা করেন। তালিতগ্রামবাসী কবীন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮শ শতক) ভাগবত অবলম্বনে উদ্ধব কাব্য রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে এ জেলায় মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। তবে তথ্যের অভাবে সকল বিবরণ উল্লেখ করা গেল না। সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে দু'জন বিদুষী মহিলার

নাম জানা যায়। তন্মধ্যে কলাইঝুটি নিবাসী (থানা-আউসগ্রাম) রূপমঞ্জরী ও সোঁয়াই (থানা—রায়না) গ্রামের দুটি বিদ্যালঙ্কারের নাম বিখ্যাত। উভয়ে কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। রূপমঞ্জরী জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্ব-গ্রামে ফিরে এসে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কিন্তু দুটি বিদ্যালঙ্কার কাশীতে টোল স্থাপন করে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা শুরু করেন ও ভট্টাচার্যদের ন্যায় বিদায় ও দক্ষিণা গ্রহণ করতেন। এছাড়া বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জননী কুড়ুনীদেবীর ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে শাকনাড়াগ্রামে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন।

বর্গী হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানের রাজা চিত্রসেনের বর্ধমান ত্যাগ করে কাউগাছি গমন ও মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্তৃক সমগ্র বর্ধমান ও বীরভূম জুড়ে অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পু' কাব্যে। বাণেশ্বরের সঙ্গে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোমালিন্য হওয়ায় বর্ধমানরাজের আশ্রয়ে চলে আসেন। বাণেশ্বর শেষ বয়সে বর্ধমান জেলার নিশিরাগড়ে বসবাস করতেন বলে দাবী করা হয়; ঐ গ্রামের ভট্টাচার্য বংশীয়েরা তাঁর বংশধর এবং ঐ বংশের কুলজী বা বংশলতিকা দেখে এরূপ মন্তব্য করার যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায়। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে নদীয়ারাজের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বর্ধমান-রাজের সম্পর্ক মধুর ছিল। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বর্ধমানের পণ্ডিত না হয়েও এ জেলার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রচিত কীর্তিচাঁদ প্রশস্তি হতে এরূপ অনুমান করা যায়।

ঊনবিংশ শতকে কালনা নিবাসী তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ছয় খণ্ডে প্রকাশিত 'বাচস্পত্য অভিধান'। ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বাচস্পত্য অভিধানের (চৌখাম্বা সিরিজ) জন্য গোণ্ডষ্টুকর, কাউয়েল, উইলসন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাও রচনা করেছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় কাশীধামে এই 'জীবন্ত সংস্কৃত বিশ্বকোষ' ইহলোক ত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করে আক্ষেপ করেছিলেন—"ভারত পণ্ডিত শূন্য হইল"। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল তারানাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন; 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি সরকারকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন,—**'I question if any one in Bengal is equal to him.'** বিদ্যাচর্চা ব্যতীত তারানাথ কালনায় দরিদ্র ছাত্র ও আত্মীয়দের জন্য উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ের পত্তন করে স্বাবলম্বী হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তারানাথের সমসাময়িক কুড়ুনী দেবীর পুত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ হতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কার্যে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন।

তিনি সুকবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেকালে প্রমুখ ইংরাজগণ সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে এই কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হোরেস হেম্যান উইলসনকে সংস্কৃত ভাষায় যে পত্রালাপ করেছিলেন তাতে তাঁর সংস্কৃতানুরাগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮৬৭) রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মোট এগারখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকার মধ্যে 'দণ্ডি রচিত কাব্যাদর্শের টীকা'য় প্রেমচাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমচাঁদ দ্বিতীয় 'মল্লিনাথ' রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। 'পুরুষোত্তর রাজাবলী কাব্য,' 'নানার্থসংগ্রহ অভিধান' এবং একটি অলংকার গ্রন্থ প্রেমচাঁদের মৌলিক রচনা। ৩১ বছর ৯ মাস অধ্যাপনা করার পর বার্ধক্যের জন্য ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেমচাঁদ অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই সময় তাঁর গুণমুগ্ধ অধ্যক্ষ কাওয়েল সাহেব সরকারকে জানালেন,— **'In this kind of labour he is quite unrivallad among the modern Pandits of Bengal. I know of no pandit who has an equal power of writing elegant Sanskrit poetry end prose.'**

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম অ্যাডমসের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলায় ১৯৫টি চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ সকল চতুষ্পাটীতে অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত ও অনুলিখিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ সম্ভবতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি ধ্বংসের অপেক্ষায় দিন গুনছে। অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যেভাবে ক্ষীরগ্রামের পুঁথির একটা বিরাট অংশকে উদ্ধার করেছিলেন অনুরূপভাবে অন্যান্য স্থানের প্রাচীন পুঁথিগুলিকে যথাসময়ে রক্ষা করলে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ধ্বংসের হাত হতে যে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বড়বেলুন ও কানাইডাঙ্গা গ্রামে গোস্বামীদের গৃহে বহু প্রাচীন পুঁথি রক্ষিত আছে বলে শোনা যায়।

বর্ধমানের ন্যায় বিরাট জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের বিষয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা সন্ধানের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। তবে অ্যাডামস-এর রিপোর্ট অবলম্বনে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের অনুসন্ধানের ফলে চতুষ্পাঠী, অবহেলিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্পর্কে যৎসামান্য পরিচয় মেলে। জগন্নাথ পঞ্চানন, শম্ভুরাম বিদ্যালংকার, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ এবং রাধাকান্ত ন্যায়ালংকার—বর্ধমান জেলার এই পাঁচজন পণ্ডিত রাজা রাজবল্লভের সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানে মহারাজার তত্ত্বাবধানে ভারত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। উমাকান্ত তর্কালংকার, ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, আদ্যচরণ ন্যায়রত্ন তর্কভূষণ, রাসমোহন সার্বভৌম, বৈদ্যপুর নিবাসী বীরেশ্বর তর্কতীর্থ প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেছেন। বর্ধমান নিবাসী রামকমল কবিভূষণ মহারাজ তেজচন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় 'নয়নানন্দ' নাটক এবং 'ভাবার্থদর্শ' নামে অপর একটি নাটক রচনা করেছিলেন। কুবিজপুর নিবাসী নৃসিংহ শিরোমণি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর

পুত্রগণও নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর এক পুত্র শম্ভুরাম মহারাজ ত্রিলকচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুরামের দুই পুত্র কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং মহারাজ তেজচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, উমাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন—কালীকান্তের তিন পুত্র। করকণা গ্রাম নিবাসী লক্ষ্মণ ন্যায়ালংকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ এবং চাণকের রাধাকান্ত বাচস্পতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন লেখেন 'গৌরচন্দ্রামৃত' 'মুক্তিদীপিকা' ও 'মনোদূত', কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ 'অলংকার কৌস্তুভ' নামে অলংকারশাস্ত্রের টীকা রচনাকার এবং রাধাকান্ত বাচস্পতি রচনা করেন 'নিকুঞ্জবিলাস,' 'সূর্যশতক' 'দুর্গাশতক' প্রভৃতি।

অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে কালনায় ৫৭টি চতুষ্পাঠী ছিল। কালনার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বনামধন্য তারানাথ তর্কবাচস্পতির পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত, জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন এবং পিতা কালিদাস সার্বভৌমও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কালনা নিবাসী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। কালনা থানার অন্তঃপাতী উপলতি গ্রামের অধিবাসী কাশীনাথ তর্কালংকার 'শব্দসন্দর্ভ সিন্ধু' নামে একটি অভিধান রচনা করেছিলেন। কাশীনাথ নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে একযোগে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। মীরহাট গ্রামের বন্দ্যবংশীয় রামচাঁদ ও রামলোচন বিদ্যাভূষণ, রামলোচনের পুত্র হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন এবং তৎপুত্র শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ (মৃত্যু ১৮৬০) ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। হরিনারায়ণের লেখা 'অমরকোষের মুগ্ধবোধিনী টীকা' পাওয়া গেছে। শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের পুত্র সিদ্ধেশ্বর কাব্যস্মৃতিরত্ন স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে হাসনহাটী নিবাসী বিশ্বেশ্বর ন্যায়রত্ন, বৈদ্যপুর নিবাসী কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মীরহাট নিবাসী নবীনচন্দ্র শিরোমণি, নীলকণ্ঠ বিদ্যারত্ন, গয়ারাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। হরিনারায়ণের বংশেই রামদুলাল তর্কবাগীশ এবং ক্ষণদাস ন্যায়ালংকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈদ্যপুর নিবাসী রামেশ্বর শিরোমণি, হাসনহাটী নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চুড়ামণির পুত্র চন্দ্রকান্ত চুড়ামণি প্রমুখ শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের সমসাময়িক ছিলেন। রামনগর নিবাসী দ্বারকানাথ শিরোমণি (স্মার্ত পণ্ডিত), তেহাটা নিবাসী ভবতারণ ভট্টাচার্য, রামনগর নিবাসী শিবনাথ তর্কালংকার, তেহাটা নিবাসী তারিণীচরণ বিদ্যালংকার প্রমুখ হরিনারায়ণ ও শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের ছাত্র ছিলেন। শিবনাথ তর্কালংকারের পুত্র বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতর্কতীর্থ (মৃত্যু ১৯৬৯) স্বীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুরে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী চতুষ্পাঠী' স্থাপনা করেন। ভুরকুণ্ডা নিবাসী বাসুদেব কাব্যস্মৃতি মীমাংসাতীর্থ ঐ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। হাসনহাটীগ্রামে মনোহর বিদ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর

ন্যায়রত্ন, কালীনাথ ন্যায়রত্ন, কালাচাঁদ ন্যায়বাগীশ, রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ, কাশীপতি স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের কথা জানা যায়। বৈদ্যপুরের রামপদ কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ (মৃত্যু ১৯৭২) স্বগ্রামে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। ধাত্রীগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি (মৃত্যু ১৩১৫) কাশীর সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন। চক্‌ব্রাহ্মণ-গড়িয়া গ্রামবাসী দুর্গাদাস লাহিড়ী (১২০৯-১৩০৯) চতুর্বেদের সম্পাদনা ও প্রকাশ ব্যতীত 'মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' নামক বেদের প্রক্ষেপের অভিনব ব্যাখ্যা করে যশস্বী হয়েছিলেন। মণিপুর রাজদরবার তাঁকে 'বেদাচার্য' ও ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'বেদবিশারদ' উপাধিদানে সম্মানিত করেছিলেন।

মহাপীঠ যোগাদ্যার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র ক্ষীরগ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী ছিল এবং এখানে বহু পুঁথি পাওয়া গেছে। উমাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত, রঘুপতি বিদ্যালংকার, মথুরানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ভগবানচন্দ্র শিরোমণি, ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ক্ষীরগ্রামের অলংকার। এঁরা বর্ধমান মহারাজার নিযুক্ত যোগাদ্যাবাটীর পুরুষানুক্রমিক সভাপণ্ডিত ছিলেন। মথুরানাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে রাজা-ভট্টাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই বংশের ভূদেবভূষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা করতেন। শবসাধক ভিক্ষাকর তর্কালংকার সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তমলুক থেকে ক্ষীরগ্রামে এসেছিলেন। ভিক্ষাকরের পুত্র গুরুপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। ভরদ্বাজবংশীয় এককড়ি স্মৃতিতীর্থও ক্ষীরগ্রামে অধ্যাপনা করতেন। রামকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ও তাঁর পুত্র যাদবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন। যাদবেন্দ্র 'শ্যামাম্বরূপাখ্য' স্তোস্ত্রের টীকা রচনা করেছিলেন। মহারাজ তিলকচাঁদ যাদবেন্দ্রকে বিশাল ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। এই গ্রামে সর্বপ্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে স্বর্গীয় মুক্তিপদ অধিকারীর গৃহে এবং তন্মধ্যে প্রাচীনতম পুঁথিটি লিখিত হয়েছিল ১৫৭৩ শকাব্দের (১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে) কোন এক সময়ে।

বাংলা সাহিত্য ঃ

বাংলা ভাষার প্রচলন বহুকালের হলেও বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল দশম শতকের পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে। আদিস্তরের এই সকল রচনাকে ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন 'প্রত্ন-বাঙ্গলা' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, চর্যাগীতির ভাষা প্রধানত ও মূলত বাংলা। তারপর বেশ কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে, যে সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চার কোন নিদর্শন জানা যায় না। রামগতি ন্যায়রত্ন ও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের পথিকৃৎ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে, আর সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক ক্রম বজায় রেখে বঙ্গসাহিত্যচর্চার পথকে সুগম করে দিয়েছেন

বর্ধমানের সুসন্তান ডঃ সুকুমার সেন। সুকবি কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বসুর পূর্বে কালনির্দেশপূর্বক বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প। রাষ্ট্র বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লবের যুগে গ্রামবাংলার লৌকিক দেবদেবী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছোট ছোট পালাগান রচিত হত বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এই সকল পালাগান গাওয়া হত। আবার কখনো কখনো পৌরাণিক ও ভাগবতের আখ্যানভাগ নিয়ে দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক পাঁচালী ও পালাগান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরও পরবর্তীকালে ছোট ছোট পালাগানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলে গ্রন্থাকারে এগুলি লিপিবন্ধ করা শুরু হল। লোক প্রচলিত আখ্যানগুলিই ছিল মঙ্গলকাব্যের আদি উৎস এবং মঙ্গলকাব্যের বিশালতার আড়ালে পালাগান ও পাঁচালীগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। প্রাচীন পুঁথিশালায় এ সকল পাঁচালীর প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়। কবি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত যোগাদ্যাদেবীর শাঁখাপরার আখ্যান নিয়ে রচিত ছোট ছোট পাঁচালীর খণ্ডিত অংশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। দেবী কল্যাণেশ্বরীকে নিয়ে আধুনিকযুগে রচিত পাঁচালী বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সম্পর্কিত বহু বাদানুবাদ আছে এবং তিনজন চণ্ডীদাসের বাসস্থান নির্ণয় করা সর্ববাদিসম্মতভাবে আজও সম্ভবপর হয় নাই। তবে কোন একজন চণ্ডীদাস যে কেতুগ্রাম নিবাসী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় গণমার্তণ্ডের রচনাকার নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের পূর্বপুরুষ চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্যে রচিত প্রশস্তিতে। কেতুগ্রামবাসী নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,—

'ধীরশ্রীল নৃসিংহজে মুখকুলে জাতঃ কবীনাং রবির্—
বিদ্যানামনুকম্পয়া বিতরণে মহাং সুপর্বদ্রুমঃ।
নানাশাস্ত্র বিচারচারু চতুরোহলঙ্কার টীকাকৃতির্
ভট্টাচার্য্যশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ॥'

যদি পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে নানুরের চণ্ডীদাসকে ধরা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায় যে, তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কেতুগ্রামে। তিনি পরিণত বয়সে বাশুলী বিগ্রহসহ স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক নানুরে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। শেষ বয়সে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁর বহুল প্রচারিত তথ্য চণ্ডীদাসের পৈত্রিক বাসগৃহ সম্পর্কে মন্তব্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়ে কেতুগ্রামের স্বপক্ষে মত দিয়ে গেছেন। আজও নানুরের বাশুলী পূজায় কেতুগ্রামের অগ্রাধিকার বলবৎ আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের সঙ্গে নানুর গ্রামের (কীর্ণাহার হতে অধিক দূরে অবস্থিত নয়) সম্পর্ক বিষয়ে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস বিষয়ক পাতড়া'র একটি পুঁথির পাতা বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় (পুঁথিপরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭১) রক্ষিত আছে। অজ্ঞাতনামা কবির মতে,—'পূর্বে গ্রামেতে ছিল কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস, / করিম্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল

নির্জাস। তাহার পুজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি / সেই পাদপদ্ম মোই হৃদে করি থ [া] কি।' উক্ত পুঁথির অনুলিখনের তারিখ ৩রা মাঘ ১১৮২ সাল।

কবিশেখর কালিদাস রায় এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন,—"প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই রচিত হয়েছে বর্ধমান জেলায় এবং সাহিত্যের সর্ববিধ শাখাই এ জেলাতে পুষ্পিত ও ফলিত আছে।" প্রয়াত কবির এই উক্তিতে কিছু ভাবাবেগ থাকলেও তাঁর উক্তি অযথার্থ নয়। কবি কৃত্তিবাস ওঝা যেরূপ পয়ার ত্রিপদী ছন্দে বাল্মিকী রামায়ণ অবলম্বনে বাংলা রামায়ণ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন, অনুরূপভাবে সমসাময়িক-কালে বর্ধমানের কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে খাঁটি বাংলায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সারির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। মালাধর তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য গৌড়ের সুলতানের নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন, যা মালাধরের উক্তি হতে প্রমাণিত হয়,—

'গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর ছিলা নাম গুণরাজ খান ॥'

অথবা, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়,—

'গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)

মালাধরের উল্লিখিত গৌড়েশ্বর কে ? মালাধরের সময়ে গৌড়েশ্বরের সাহিত্যানুরাগেরও পরিচয় মেলে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি শ্লোকে গ্রন্থ আরম্ভ ও সমাপ্তিকালের উল্লেখ আছে এবং তাঁর উক্তি থেকে জানা যায় যে, ১৪৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আরম্ভকাল এবং ১৪৮০-৮১ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালাধরের গ্রন্থারম্ভের কালে গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকুন-উদ্-দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খ্রীস্টাব্দ)। তা'হলে কীর্তিবাস ও মালাধর সমসাময়িক ছিলেন এবং ঐ একই সুলতানের সময়ে কীর্তিবাস গৌড়ের রাজ-দরবারে এসেছিলেন। মালাধরের দ্বিতীয় রচনা 'শ্রীরাম পাঁচালী' বা 'ধর্ম ইতিহাস' সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রথম রামচরিত। তাঁর লক্ষ্মী চরিত্রের পুঁথি আছে বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় (পুঁথি নং ৮৭৭) এবং এটি গুণরাজ খান ভণিতায় সমাপ্ত হয়েছে,—

'গুণরাজ খান প্রণমিয়া হরি হর।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে যুন সর্ব্বনর ॥ লক্ষ্মী চরিত্র সমাপ্ত ॥'

ষোড়শ শতক হল বাংলার নবজাগরণের যুগ। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম প্রচারের ফলে এদেশের ধর্ম ও সাহিত্য নূতনভাবে প্রসার ও প্রচার লাভ করে। সর্বপ্রকার আড়ষ্টভাব কাটিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর 'চৈতন্যচরিত'গুলির রচনা শুরু হয়। এ বিষয়ে বর্ধমান জেলার বৈষ্ণব কবিগণ ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। বাংলা ভাষায় 'চৈতন্য-চরিত' রচনাকারগণের মধ্যে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ

হলেন অগ্রগণ্য। আর একক গ্রাম হিসাবে ঐ সময়ে শ্রীখণ্ড ছিল বিদ্যাচর্চা ও বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়নের পীঠস্থান। নরহরি সরকার ঠাকুর ও দামোদর সেনকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবেরা এখানে সমবেত হয়েছিল এবং শ্রীরঘুনন্দনের সময় এতদঞ্চলে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাটোয়া ও খেতুরী মহোৎসবের সময় শ্রীরঘুনন্দনের সম্বর্ধনা ও সম্মান ছিল অনেকের উর্ধ্বে। রামগোপাল দাসের 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে, কুলাই-এর ঘোষ পদবীধারী কায়স্থ বংশীয় দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ নিম কাঠের তৈরী প্রথম চৈতন্য-বিগ্রহের মূর্তি নরহরি সককারের হস্তে অর্পণ করায় তিনি শ্রীখণ্ড, গঙ্গানগর ও কাটোয়ায় বিগ্রহ তিনটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'শাখানির্ণয়ে' আছে,—

'ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বানাইলা।
সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা॥
ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাড়ীতে।
মধ্যমে পাঠাইলা গঙ্গানগর সেবাতে॥
বড় ঠাকুর বড় রূপ কাঁহা নাহি যায়।
যাঁর আকর্ষণে তিন ভুবন ভুলায়॥
বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন॥
কণ্টকনগর হয় মহাপ্রভুর স্থান।
তোমা সেবা স্বীকার করেন চৈতন্য ভগবান॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় 'চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস' নিত্যানন্দের আদেশে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। নরহরি-শিষ্য লোচনানন্দ গুরুর আদেশে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করায় বৈষ্ণব সমাজে বিভ্রান্তি দূরীকরণের নিমিত্ত বৃন্দাবনের গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' নামে প্রচারিত হয়। চৈতন্যলীলার আদিপর্ব বৃন্দাবনদাস সর্বস্তরে বর্ণনা করায় এই অংশ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংক্ষিপ্ত করেছেন। বৃন্দাবন প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও চৈতন্যের জীবৎকালের শেষ পর্যায়ে তিনি মোটামুটিভাবে যুবক। চৈতন্যের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের জন্ম হয় এবং সেকারণে তাঁর পক্ষে চৈতন্যজীবনীর উপাদান সংগ্রহ করার সুবিধা থাকলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্বগ্রামবাসী ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের পূর্বপুরুষ উজানী-কোগ্রামবাসী লোচনদাস বা লোচনানন্দ দাসের চৈতন্যজীবনী 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে খ্যাত। খণ্ডবাসী নরহরি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের অনুপ্রেরণায় 'চৈতন্য-মঙ্গল' রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ প্রচ্ছন্নরূপে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। নরহরি সরকার, বিষ্ণুশক্তি ও রাধার অবতাররূপে গদাধর পণ্ডিতকে স্বীকার করে নিয়ে গৌর-গদাধর মূর্তির উপাসনা পদ্ধতি নবদ্বীপে চালু করলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অনুগামীরা নরহরির উপর বিরক্ত হল এবং ধরে নেওয়া যায় এই কারণেই বৃন্দাবনদাস নরহরির নাম পর্যন্ত

উল্লেখ করেন নাই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লোচনদাস ছিলেন উদার স্বভাবের। লোচনের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বিষয়ে ইঙ্গিত থাকলেও, বৃন্দাবন এই জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদপুষ্ট 'গুহিয়া' বা জয়ানন্দ ছিলেন বর্ধমানের সন্নিকটে আমাইপুর বা রামাইপুর নিবাসী সুবুদ্ধি মিশ্র ও রোদনীর সন্তান। জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গলে' লোচনের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদেহে লীন হবার কথা নাই। তাঁর মতে পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত সৃষ্টির ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়েছিল। অনেকের মতে এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্যই জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' বহুকাল বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল না। জয়ানন্দের গ্রন্থে চৈতন্যজীবনী ব্যতীত সামাজিক অবস্থা, পুরী হতে মেদিনীপুর, মান্দারণ, বর্ধমান ও নবদ্বীপের সন্নিকটে বয়ড়া হয়ে গৌড় গমন (অথবা প্রত্যাগমন), হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা ব্যতীত কীর্তিবাস, গুণরাজ খান, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ আছে। এছাড়া বীরভদ্র ও অভিরাম গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব সামজের নেতৃত্ব প্রদানের কথাও জানা যায়।

ষোড়শ শতক পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য (মতান্তরে জাহ্নবা দেবীর শিষ্য)। জ্ঞানদাসের বাসস্থান সম্পর্কে উক্তি আছে,—

'রাঢ়দেশ কাঁদরা-নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥' (ভক্তিরত্নাকর = ১৪।১৮০)

কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত বর্তমান জ্ঞানদাস-কাঁদড়া গ্রামে তাঁর শ্রীপাট ছিল এবং এখানেই তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদাবলী রচনা করেন। তাঁর ব্রজবুলির পদগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে, অনেক সময় বিদ্যাপতির সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। যথা,—

'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতিঅঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।'

কবি বিদ্যাপতি শুনিয়েছেন,—

'লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তাইও হিয়া জুড়লন গেল॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্যদাস সরখেলের ছোট ভাই গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। এঁর নিবাস ছিল অম্বিকা-কালনা (অম্বুয়া মুলুক) এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরীদাসের পাণ্ডিত্যের উল্লেখ আছে। গৌরীদাসের কৃষ্ণদাস নামক এক ভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন পদকর্তা। কুলিনগ্রামের বাসুদেব সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি পুঁথিতে উল্লেখ আছে,—

'রামানন্দ বসু জন্ম কুলিনগ্রামেতে।
গোপাল বসুর জন্ম হইল তথাতে॥'

সম্ভবতঃ গোপাল বসু কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসুর জ্ঞাতি অথবা আত্মীয় ছিলেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' (পৃঃ ৬৩) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কুলীনয় গ্রামে। শিবানন্দের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যথা,—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ বা কবি কর্ণপুর (জন্ম ১৪৪৯ শকাব্দ)। শিবানন্দ সেন শ্বশুরালয় কাঁচড়াপাড়াতে বসবাসের নিমিত্ত চলে যান। পরবর্তীকালে শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসস্থান কুলীনগ্রামের পরিবর্তে কাঁচড়াপাড়া লেখা হয়েছে। চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত পূর্বস্থলী থানার মামগাছিতে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ সেবার ভার পান এবং তিনিও ছিলেন পদকর্তা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণীর নিকট তিনি এই ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি বিদ্যানগরে বসবাস করতেন। ইনি ছিলেন সনাতন গোস্বামীর গুরু এবং গৌড় হতে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব এঁর গৃহে আতিথ্য লাভ করেন। এই সময়ে আকাইহাটবাসী কালাকৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের মল্লার দেশে বেতাপানি নামক স্থানে বামাচারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা তিনি প্রতারিত ও বিপদগ্রস্ত হলে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় কালাকৃষ্ণ রক্ষা পান। কথিত আছে, কীর্তনরত অবস্থায় রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর আকাইহাটের যে স্থানে পতিত হয়েছিল তথায় কালাকৃষ্ণের শ্রীপাট স্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্য শাখার রামাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ বাঘনাপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

চৈতন্যচরিত রচনাকারগণের মধ্যে ঝামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে। যুবা বয়সে নিত্যানন্দের আজ্ঞা পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে যান ও তথায় সনাতন, রূপ, শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাসের সাহচর্য লাভ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পর্যন্ত বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মধ্য ও অন্তলীলা ভাগের রচনায় তাঁর সমকক্ষজন এ যাবৎকালের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' রচনার সুনির্দিষ্ট সময় জানা না গেলেও অনেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছা-কাছি কোন এক সময়ে বলে নির্দিষ্ট করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে প্রচারিত হয় নাই। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাস আচার্যকে গৌড়দেশে গ্রন্থ প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমোদন লাভ না করায় গ্রন্থপ্রচারের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ ঘটেছিল। ভাগবতগীতা ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ এত সমাদৃত হয় নাই এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃতের অজস্র টীকা রচিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাঞ্চননগর নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র গোবিন্দ দাস কর্মকার চৈতন্যের সেবক ও দ্বারপাল ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভ্রমণসঙ্গীরূপে প্রতিদিনের কার্যকলাপ নিয়ে গোবিন্দদাস 'কড়চা' রচনা করেছেন, যা একটি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশেষতঃ তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবরণ সুন্দরভাবে

তাঁর 'কড়চায়' বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পরিকর চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস ছিল তেলিয়াবুধরি (জেলা—মুর্শিদাবাদ) গ্রামে। খণ্ডবাসী কবি দামোদরের কন্যাকে বিবাহ করে চিরঞ্জীব সেন খণ্ডে (শ্রীখণ্ড) বসবাস করেন। দামোদরের সুবিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত দামোদর'। দামোদর ও চিরঞ্জীব উভয়েই প্রসিদ্ধ পদকর্তা। অল্প বয়সে চিরঞ্জীবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্রদ্বয়—রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস, মাতামহের নিকট লালিতপালিত হন। চিরঞ্জীবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁর কবিত্ব-শক্তির জন্য কবিরাজ উপাধি লাভ করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহান্তদের নামোল্লেখ আছে, যথা,—

'খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥'

'কৃষ্ণমঙ্গলে'র রচয়িতা দ্বিজ পরশুরামের নিবাস জানা যায় না; তবে তিনি খণ্ড-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে সুকুমার সেন অনুমান করেছেন। পরশুরামের উক্তিতেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়,—'ঘরের ঠাকুর বন্দ্যো শ্রীরঘুনন্দন।'

প্রসিদ্ধ পদাবলীর রচয়িতা বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের অন্তরঙ্গ সখা মনোহর দাস কাঁদড়া গ্রামে বসবাস করতেন। বাবা আউল মনোহর দাস জ্ঞানদাসের জীবদ্দশা পর্যন্ত কাঁদড়ায় ছিলেন। জ্ঞানদাসের পরলোকগমনের পর কাটোয়ার সন্নিকটে বেগুনকোলায় কিছুকাল বসবাসের পর হুগলী জেলার বদনগঞ্জে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং পরে ব্রজবাসী হন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর বৈদ্যজাতীয় শিষ্য যদুনন্দন দাসের বাড়ী ছিল কাঁদড়া গ্রামে। তিনি 'গোবিন্দলীলামৃত', 'বিদগ্ধমাধব', 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক। মনোহর দাসের ভাই কিশোরদাস কাঁদড়া শ্রীপাটের প্রথম মহান্ত ও প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন। কেতুগ্রাম থানার কুলাই নিবাসী গোপাল ঘোষের তিন পুত্র ছিলেন পদকর্তা এবং তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদরূপে গণ্য হন। কুলপঞ্জিকায় আছে,—

'ধন্যরে গোপাল ঘোষ সকলি বৈষ্ণব।
যে কুলে জন্মিলা বাসু, গোবিন্দ, মাধব ॥'

তন্মধ্যে কনিষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই কার্য উপলক্ষে তিনি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খান চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন। রামানন্দ বসু কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। বাৎসল্যরসের পদকর্তা ও রেনেটী কীর্তন গানের প্রথম প্রবর্তকরূপে বিপ্রদাস ঘোষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়া চৈতন্যযুগে ও তার পরবর্তীকালে আত্মারাম (শ্রীখণ্ড), রঘুনন্দনের পুত্র কানুদাস (শ্রীখণ্ড), কৃষ্ণদাস (অম্বিকা-কালনা নিবাসী ও নিত্যানন্দের খুড়শ্বশুর), চৈতন্যদাস, পরমেশ্বরী দাস (কেতুগ্রাম) প্রভৃতি পদকর্তার নাম জানা যায়।

'মাধবসঙ্গীত' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থের রচনাকার পরশুরাম রায়ের নিবাস ছিল

চম্পকনগরে। অমিতাভ চৌধুরীর মতে চম্পক নগরের অবস্থিতি হল মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানায়। কিন্তু সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন যে, এটি বর্ধমান জেলায়। কিন্তু উভয়েই 'শিখর শ্যাম' নামক নৃপতির বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেন নাই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন কবির উক্তি অনুসারে 'দ্বাদশকন্যা' বীরভুম জেলার দাসকলগ্রামের নামান্তর এবং সুকুমার সেনের মতে এটি 'বারঘন্যা' গ্রাম। সম্ভবতঃ দু'জনের মন্তব্যেই কিছু অসমঞ্জস্য আছে। জ্ঞানদাস সখা আউল মনোহর দাস কবির গুরু ছিলেন। অতএব কবি ষোড়শ শতকের শেষভাগে 'মাধব সঙ্গীত' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। পৈত্রিক বাসস্থান ও নিজ বাসস্থান সম্পর্কে কবির উক্তি হল,—

(১) 'চম্পক নগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম
মিরাস পুরুষ ছয় সাত।'

(২) 'ক্ষেত্রি অবতংস মহারাজ বংশ
কুমার শিখর শ্যাম।'

(৩) 'সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয় শিরোমণি
শিখর শ্যাম অধিপতি
নৃপতি আশ্রমে দ্বাদশকন্য গ্রামে
রচিল সঙ্গীত পুঁথি।'

ষোড়শ শতকের শেষভাগে হিজলী অঞ্চলের জমিদার ছিলেন তাজ খাঁ মসনদী আলার পিতামহ ইখ্তিয়ার খাঁ এবং ঐ সময়ে মেদিনীপুর অঞ্চলে শিখর বা শেখর নামযুক্ত কোন নৃপতির পরিচয় জানা যায় না। কেবলমাত্র একটি ওড়িয়া ভাষার পদের উপর নির্ভর করে কবিকে হিজলী অঞ্চলের অধিবাসী মনে করার কারণ নেই। এই সময়ে শিখর-ভুমরাজ্যের অধিপতি ছিলেন জগমোহন শেখর। আইন-ই-আকবরীতে আছে পরগণা সেরগড় ও পরগণা চম্পানগরীর (Ain Vol 2, p 155) অবস্থিতি পাশাপাশি ছিল। মনে হয় পরগণা দুটি শিখরভুম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কবির উক্তি অনুসারে চম্পকনগরীতে তাঁর সাত পুরুষের নিবাস অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে এই গ্রামের অস্তিত্ব থাকা উচিত। কিন্তু হিজলী অঞ্চলে অতি ক্ষুদ্র গ্রামটির ঐ সময়ে কোন অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অপরপক্ষে প্রায় প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে চম্পাইনগরীর উল্লেখ পাওয়া যায় সেটির অবস্থিতি হল বর্ধমান জেলার গলসী থানায়।

'ভক্তিরত্নাকরে' উল্লিখিত অষ্ট কবিরাজের মধ্যে প্রথম জন শ্রীখণ্ডবাসী দামোদরের দৌহিত্র ও চিরঞ্জীবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অপর একজন কবিরাজের সন্ধান ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়,—

'পঞ্চকুট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব-বাস কড়ুই—কবীন্দ্র ভক্ত্যতুল।' (ভক্তিরত্নাকর ১০।১৩৯)

গোকুলের পূর্ববাস ছিল কাটোয়া থানার কড়ুইগ্রামে এবং পরে পঞ্চকুট রাজ্যের

অন্তর্গত সেরগড়ে (দিসেরগড়) বসবাস করেন। রামগোপাল দাসের উক্তি হতে জানা যায় যে, শ্রীখণ্ডবাসী যশোরাজ খান, মহাকবি দামোদর ও শ্রীকবিরঞ্জন রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরীতে' যশোরাজ খানের একটি পদের ভণিতা হতে জানা যায় যে, তিনি হোসেন শাহের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাসের পর বঙ্গদেশের মধ্যে দ্বিতীয় পদকর্তা হলেন যশরাজ খান, যাঁর একটি মাত্র পদের সন্ধান জানা যায়। 'রসমঞ্জরী'তে প্রাপ্ত ভণিতাসহ পদটি হল,—

'এক পওোধর চন্দন লেপিত / আরে সহজই গোর।
হেম ধরাধর কনক ভুসন কোলে মিলল জোর ॥
মাধব তুয়া দরসন কাজে।
আধপদ চালন করিঞা সুন্দরী / বাহির দেহলী মাঝে ॥
জহিল লোচন কাজরে রঞ্জিত / ধবল কমল কর বাম।
নীল ধবল কমল দুঅ চান্দ / পুজল কত কোটি কাম ॥
শ্রীযুক্ত হসেন / জগত ভুষণ / সেই ইহ রস জান।
পঞ্চগোড়েশ্বর / ভোগপুরন্দর / ভনে জসরাজ খান ॥'

মহাকবি দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিও হোসেন শাহের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। 'কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী' রামগোপালের এই উক্তি হতে প্রমাণিত হয় যে কবিরঞ্জন নামে একজন প্রাচীন পদকর্তার বাস ছিল শ্রীখণ্ডে। কবিরঞ্জন সম্পর্কে রামগোপালের উক্তি হল,—

'গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্ বিলাসঃ শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভর্ৎসিতপঞ্চবানঃ শ্রীরঞ্জনঃ সর্বকলানিধানঃ ॥'

ছোট বিদ্যাপতি বা বিদ্যাপতি ভণিতায় কবিরঞ্জনের পদও পাওয়া যায়। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর দুটি পদ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি নাসির-উদ্দিন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২) ও গিয়াস-উদ্দিন মহম্মদ শাহের (১৫৩৩-৩৮) অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম পদটি হল,—

'সে যে নাশিরা শাহ সে জানে।
যারে হানল মদন বানে ॥

চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগোড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।'

দ্বিতীয় পদটিতে আছে,—

'মহলম জুগপতি চিরে জীবে জীবথু গ্যাসদীন সুরতান ॥'

ছোট বিদ্যাপতি বা কবিরঞ্জন ছিলেন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ হল তাঁর কাব্যচর্চার কাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রায়শেখরের পদাবলীর ভূমিকায় আছে—'অনেকের মতে তিনি বর্ধমানের পড়ান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন' এবং তিনি শ্রীরঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন,—

'পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।' (পৃষ্ঠা ৩৬০)

রায়শেখর একদিকে সমকালীন বৈষ্ণব মহান্তদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন (পদসংখ্যা ২৪৭) ; অনুরূপভাবে ঐ পদের মধ্যেই ব্যক্ত করলেন—'কুলশীল জাতি মোর / পণ্ডিত শ্রীদামোদর' অর্থাৎ তিনি বৈদ্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে নাগরী ভাবের প্রবর্তক নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীরাধিকার সহচরী 'মধুমতী' রূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেকারণে শ্রীনিবাসাদি পদকর্তাগণ এবিষয়ে পদও রচনা করেছেন। 'মধুমতী' প্রসঙ্গে রায়শেখরের পদটিও চমৎকার। যথা,—

'ভুবন মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্রি দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস।'

মধুর ও লালিত্যপূর্ণ পদের জন্য জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের পর রায়শেখরের স্থান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীরঘুনন্দনের সমসাময়িক শ্রীনিবাস আচার্য নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্য উপাধি পান এবং গোপাল ভট্ট তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত 'চৈতন্যচরিতামৃতের'র মূল পুঁথি তিনি এদেশে প্রচারের নিমিত্ত নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত 'ষড়গোস্বামীষ্টকম্', 'নরহরিঠাকুরাষ্টকম্' অন্যান্য পদসমূহ হতে ঐ সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক কথা জানা যায়। শেষ বয়সে কাটোয়া ও শ্রীখণ্ডের মধ্যবর্তী যাজীগ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। খেতুড়ী ও বড়ডাঙ্গার মহোৎসবের তিনি অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দের বাসস্থান ছিল যাজীগ্রামে এবং তিনিও একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের ব্রাহ্মণশিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর নিবাস কাটোয়ার সন্নিকটে বেগুনকোলা গ্রামে এবং তিনি 'সংগ্রহতোষণী'র রচনাকার ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর ইনিই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। পদাবলী রচনা ব্যতীত তিনি 'সঙ্গীত মাধব' নামক নাটকে স্বীয় বংশ পরিচয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গুরু শ্রীনিবাস আচার্য তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন এবং সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর অদ্বিতীয় পদকর্তা। গুণমুগ্ধ কবি 'শ্রীবল্লভ' তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে একটি পদও রচনা করেছেন,—

'ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥'

গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ভাষাতেই নয়, অলঙ্কার ও ভাব সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। মল্লার রাগের একটি পদের শেষাংশ হল,—

'গজ-গতি-গামি গান-গুণ-গুম্ফিত
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গো-রস-গাহি গবীশ্বর-নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ ॥'

গোবিন্দ দাস প্রথম জীবনে শ্রীখণ্ডে বসবাসের সময়ে শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট দীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহুকাল তেলিয়াবুধরীতে (পৈত্রিক বাসস্থান) অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র দিব্যসিংহের একটিমাত্র পদ পাওয়া গেছে। দিব্যসিংহের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগতির শিষ্য ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিন্দরতি মঞ্জরী'তে বহু ব্রজবুলি পদ আছে।

রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। রামগোপালের পিতা মদন রায়ের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মাতামহ গৌরাঙ্গ দাসের নিকট লালিত-পালিত হন। কবি যে কিছুকাল কেতুগ্রামে বসবাস করেছিলেন তার উল্লেখও তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথা,—'কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।' খণ্ড বা শ্রীখণ্ডকে সময়ে সময়ে 'বৈদ্যখণ্ড' বলা হত, তার উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে। 'রসকল্পবল্লী'তে উল্লেখ আছে যে, শ্রীখণ্ডের বৈদ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাঘব সেন এই গ্রামে আগমন করেন এবং তাঁর বংশধরগণ ছিলেন যশস্বী পুরুষ। এই বংশের যশরাজ খান, মহাকবি দামোদর, কবিরঞ্জন ও দামোদরের দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ জন্মেছিলেন। 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে আছে,—

'বৈদ্যখণ্ডে গ্রামে রাঘব সেন নাম। সমাজ করিল বৈদ্য অতি অনুপাম ॥
তার বংশাবলী হয়ে অনেক বিস্তার। কবিপণ্ডিত নাম আর বৈষ্ণব অপার ॥
যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি। কবিরঞ্জন আদি সভে রাজ সেবি ॥
চিরঞ্জীব সুলোচন মহাভাগবত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে বিদিত ॥'

রামগোপাল ১৫৬৫ শকাব্দে (১৬৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দে) 'রসকল্পবল্লী' রচনা করেন। শব্দচয়ন ও অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং তাঁকে এই দুই মহাকবির উত্তরসূরী বলা যায়। 'রসকল্পবল্লী' ব্যতীত 'শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বসার', 'পাটনির্ণয়', 'শাখানির্ণয়', অষ্টরস নিরূপণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য সমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু তথ্য জানা যায়। তাঁর পুত্র পীতাম্বর দাসের উল্লেখযোগ্য রচনা হল—'অষ্টরস ব্যাখ্যা' ও রসশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'। পীতাম্বরের বাসস্থান ও গুরুর উল্লেখ 'রস-মঞ্জরী'তে পাওয়া যায়,—

'শ্রীসচী নন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাহার ॥'

রঘুনন্দনের বংশধর অনুপ্রাস-এর রাজা জগদানন্দ ঠাকুর একজন প্রথম শ্রেণীর পদকর্তা ছিলেন। তিনি শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে রানিগঞ্জের নিকট দক্ষিণখণ্ডে (বীরভূম ?) বসবাস করেন। ইনি একখানি চিত্র কাব্য রচনা করেছিলেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের মতে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার চাখন্দী গ্রামে। তিনি কেবলমাত্র বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন না—পদসংগ্রহকারও ছিলেন। তাঁর পদসংকলনের সুবৃহৎ ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'পদামৃতসমুদ্র' আজও আদরণীয় গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়।

'গোপালবিজয়ের' রচনাকার কবিশেখরের বাসস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। মনোমোহন ঘোষ, কালিদাস রায়, সুকুমার সেন ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে রায়শেখরের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে এবং তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এ মত এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে পদাবলীর রচনাকার রায়শেখর বর্ধমানের পড়ানগ্রামের আধিবাসী (পরে শ্রীখণ্ডবাসী) শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে'র রচয়িতা ও গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলরামদাস ছিলেন শ্রীখণ্ড নিবাসী আত্মারামের পুত্র। তিনি জাহ্নবাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম ছিল নিত্যানন্দ এবং এই নামেই তিনি 'প্রেমবিলাস' রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'গৌরাঙ্গ-অষ্টক', 'বীরচন্দ্রচরিত' 'রসকল্পসার' 'কৃষ্ণলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। নরোত্তম ঠাকুরের সময়ে খেতুরী উৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বলরামদাসের ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রসিদ্ধ পদকর্তা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে এবং ঐ গ্রামের 'খণ্ডেশ্বরীতলা'য় তাঁদের আবাসগৃহ ছিল। রামগোপালের 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে,—'চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল' উক্তি হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি অন্ততঃপক্ষে ষোড়শ শতকে জন্মেছিলেন। জ্ঞানদাস কাঁদড়ার নিকটবর্তী রাজুর গ্রামবাসী নৃসিংহবল্লভ মিত্র মঙ্গল ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং ময়নাডালে চৈতন্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শশিশেখরের পদগুলিই কীর্তনের সুরে প্রবর্তিত হয়ে এযুগের 'মনোহরসাহী কীর্তন'-এর ঢঙে কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন। মনোহরসাহী কীর্তনের শেষধারার গায়ক অনুরাগী দাসের পুত্র রসিকলাল দাস (১২৪৮-১৩২০ বঙ্গাব্দ) ছিলেন দক্ষিণখণ্ড নিবাসী। তাঁর পিতার নিকট তিনি কীর্তনশিক্ষা করেন। রসিকলালের অভিনব সুর ও চালের সৃষ্টির ফলে মনোহরসাহী কীর্তন আরও শ্রুতিমধুর হয়েছিল। বাংলা ১২১৩ সালে কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' বর্ধমানে সংকলিত হয়েছিল।

পাটুলী নিবাসী ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বংশীবদন কুলিয়াবাসী হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা গত হবার পর বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় আসেন। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস খেতুরীর উৎসবে যোগ্য ভূমিকা পালন করে যশস্বী হন এবং তাঁর পুত্র ও জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য রামচন্দ্র বাঘনাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। রামচন্দ্র ছিলেন অন্যতম পদকর্তা এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লভ বা রাজবল্লভ 'মুরলীবিলাস' ও 'বংশীবিলাস' রচনা করেন। কালনার পিয়ারীগঞ্জ

শ্রীপাটের নকুল ব্রহ্মচারী নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। 'বংশীশিক্ষার' (১৭১৬ খ্রীস্টাব্দ) অপর এক রচনাকার প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল পুরুষোত্তম মিশ্র। কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাদাসের পুত্র প্রেমদাসের নিবাস ছিল ভাতার থানার কুলনগর গ্রামে। তিনি ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' রচনা করেন ; রচনাটি মূলানুগ ও সুললিত। চার উল্লাসে সমাপ্ত বংশীশিক্ষায় তত্ত্বকথা ও বংশকথা আছে। রামানন্দ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বর্ধমান থেকে 'রামলীলা' নামে একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে বা তৎসমকালীন বলে বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানির মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে—কালিদাসের রঘুবংশ থেকে ইনি কোন কোন অংশ গ্রহণ করেছেন, এঁর সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে, ইনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। ইনি সোচ্ছ্বাসে লিখেছেন যে, পুরীর দারুব্রহ্মকে ইনি 'পাপিষ্ঠ' বৈষ্ণব ও মুসলমানগণের হাত থেকে বলপূর্বক গ্রহণ করে পুনরায় বৌদ্ধজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। দারুব্রহ্মকে এইভাবে অভিষিক্ত করে তিনি তৎসম্মুখে তাঁর 'রামলীলা' (রামায়ণ) পাঠ করবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি কাব্যখানি রচনা করেছেন ; কাব্যে প্রদত্ত তাঁর আত্মবিবরণ পাঠ করলে মনে হয় তাঁর বহু শিষ্য ও অনুচর ছিল এবং তিনি নিজেকে শূদ্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যের মাত্র একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে, যা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু নিকট ছিল। বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রক্ষিত (পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪) কানুদাসের আত্মকাহিনীমূলক পুঁথির একটি পৃষ্ঠায় আছে,—

'দুষ্কর্ম করিলাম [আমি] কাটয়া ভিতর এই হেতু মোর লজ্জিত অন্তর।
মোনে ছিল কাটআয় না দেখাইব মুখ ভগবত গৃহস্থ জায় ফাটে মোর বুক।'

জামালপুর থানার সাঁচড়া গ্রামে কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরী দাস নামক এক পদকর্তার সন্ধান জানা যায়।

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বর্ধমান হল মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্ভবস্থল। মালাধর বসু মঙ্গলকাব্যের সূচনা করলেও তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করে মুকুন্দরামের রচনায়। মঙ্গলকাব্যের সকল শাখাতেই কাহিনীর কেন্দ্রস্থলগুলি নির্বাচনের সময়ে বর্ধমানের দুটি প্রধান স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কবিগণ কর্তৃক রচিত মঙ্গলকাব্যে স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী নির্বাচন, জলপথ বর্ণনা ইত্যাদি হতে অনুমান করা যায় যে, বহু পূর্বকাল হতে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীগুলির আদি উদ্ভবস্থল বর্ধমানেই ছিল। বর্ধমানের কবি না হয়েও 'মনসাবিজয়'-এর (১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ) রচয়িতা বিপ্রদাস মূল কাহিনীর স্থান-নাম ও পাত্রপাত্রীর যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলি বর্ধমানের স্বপক্ষেই।

মঙ্গলকাব্যের সবশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সরকার সুলেমানাবাদ-এর মধ্যস্থ হাভেলী সুলেমানাবাদ পরগণার অন্তর্গত রত্নানদীর তীরে

দামুন্যা গ্রামে (থানা—রায়না) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু রাজরোষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়াগ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হল ষোড়শ শতকের সামাজিক ইতিহাসের একখানি আকর গ্রন্থ। মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের এরূপ নিখুঁত ভৌগোলিক বিবরণ এই সময়ে রচিত অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। মুকুন্দরামের কাব্য রচনার তারিখ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নাই। গ্রন্থশেষে [?] পাওয়া যায়,—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

রস শব্দের অর্থ 'ছয়' ধরলে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দ অথবা 'নয়' ধরলে ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ হল চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল। কিন্তু 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' প্রসঙ্গে মানসিংহের উল্লেখ থাকায় ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দকে গ্রন্থ রচনার তারিখ হিসাবে মেনে নিতে অসুবিধা আছে। বারা খাঁর পক্ষে কুতুব খাঁ, মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীকে ১০৪৭ সালের (১৬৪০ খ্রীস্টাব্দ) ১লা ফাল্গুন ২০ বিঘা ভূমি দান করেছেন। এই তারিখটি মিল করার জন্য নগেন্দ্রনাথ বসু রস অর্থে নয় ধরে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ বলে মন্তব্য করেছেন। অনেকে মানসিংহকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির উক্তি হল (অধিকাংশ পুঁথিতে পাওয়া যায়),—

'ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।'

কিন্তু মানসিংহকে উপেক্ষা করলেও সহর 'শিলিমাবাজ' বা 'ছেলিমাবাজ' উক্তি হতে মনে করা যায় যে, এটি সেলিমাবাদের নামান্তর। তাহলে সেলিমের জন্মের (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দ) পূর্বে এই স্থানের নাম সেলিমাবাদ ছিল না। ব্লকম্যানের মতে, সম্ভবতঃ এই অঞ্চল বিজিত হওয়ার পরে শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে সুলেমানাবাদের পরিবর্তে সেলিমাবাদ হয়। 'আইন-ই-আকবরী'র বাংলা সুবার অংশ কমপক্ষে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই এবং ওড়িশার নবাব কতলু খাঁর মৃত্যুর পূর্বে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল মোঘলদের অধীনস্থ ছিল না এবং ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের পূর্বে এই অঞ্চলে মোঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দ ধরার অপর একটা অসুবিধা আছে। কারণ পুত্রসহ তৎপূর্বে গ্রাম ত্যাগ করলে ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে শিবরাম জীবিত থাকতে পারেন না। এছাড়া উপসংহারে অষ্টমঙ্গলায় আছে,—

'অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন প্রসাদ আদরে।'

সুকুমার সেন, 'অমর সাগর মুনিবর' (অমর = ১৪, সাগর = ৭, মুনিবর = ৭) অর্থে ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দ ধরে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল অনুমান করেছেন। কিন্তু মানসিংহের উল্লেখ থাকায় এটি তাঁর কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়।

মুকুন্দরাম সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকা (পৃঃ ৪৫-৫২), অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' (পৃঃ ১৫০-১৬৮), ডঃ ক্ষুদিরাম দাস (বিশ্বভারতী পত্রিকা) এবং স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী'তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ বহু মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সপ্রশংস উক্তি হল,—'বাঙালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কনকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে; যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কল্পনা-শক্তি তাহাতে যে তাঁহার প্রাচুর্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না; অথচ তাঁহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না।' এরপর রামগতি ন্যায়রত্ন মন্তব্য করেন—'কবিকঙ্কণ বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি।' মুকুন্দরামের কাব্যে সাবলীল চরিত্র গঠন ও কৌতুকরসকে উপভোগ্য করে তোলার ক্ষমতাকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সাহেবেরা কোন প্রশস্তি না করলে কোন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ই. বি. কাওয়েল (প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) 'চণ্ডীমঙ্গল' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন,—'These attempts of mine to put certain episodes of the "Chandi" into on English dress had lain for many years forgotten in desk, until I happened to read Mr. G. A. Grierson's warm encomiums on this old Bengali poem "as comming from the heart and not from the school, and as full of passages adorned with true poetry and descriptive power.' অতঃপর মুকুন্দরাম সম্পর্কে যে গবেষণা ও আলোচনার সূত্রপাত হল তা আজও চলছে। তাই সুকুমার সেন সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেন,—'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি যেমন মুকুন্দের পক্ষে কাওয়েল ও গ্রীয়ার্সনের প্রশংসা লাভ প্রায় তেমনি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অর্থাৎ, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে মুকুন্দ এমনিই অপঠিত থাকিয়াও একজন ভালো কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাওয়েলের অনুবাদ প্রকাশের পর হইতেই সাহিত্য-পণ্ডিত-সমাজে মুকুন্দের কবি প্রতিষ্ঠা।' অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবি 'শ্রীমধুসূদন' চণ্ডীমঙ্গলের কবি 'শ্রীকবিকঙ্কণ'কে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন,—

'কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ—সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কেনা পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥'

মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র 'কলঙ্কভঞ্জন', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি সরস কাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরাম মিশ্রের 'গঙ্গার বন্দনা', 'গুরুদক্ষিণা', 'সত্যনারায়ণ কথা' ইত্যাদি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের অপর এক কবি কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র 'বাশুলী মঙ্গলকাব্য' রচনা করেন। বাশুলীমঙ্গলের পুঁথি রায়না থানা হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত (১৩৬৪ সাল) হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাশুলী-মঙ্গলের রচনাকাল ও চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল সম্পূর্ণ এক। বাশুলীমঙ্গলে আছে,—

"শকে রস রস (রথ) বেদ শশাঙ্ক গণিতে
বাশুলী মঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥"

মূলে 'রস' যদি লিপিকর প্রমাদে 'রথ' হয়, তা'হলে রচনা তারিখ হবে ১৪২৯ শকাব্দ বা ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এখানে কোথাও চৈতন্য বন্দনা নাই, অথচ চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্য বন্দনা আছে। আলোচ্য পুঁথিটি শ্রীযুত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মহাশয়ের আমলে ১১৪২ সালের ৩০শে কার্তিক (১৭৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দ) মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত আথাড়িয়া নিবাসী শ্রীকিশোরদাস মিত্র কর্তৃক অনুলিখিত হয়েছিল। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের পরিচয় জানা যায় না। তবে বর্ধমান অঞ্চলের নিখুঁত বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে, তিনি বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চলের কোন স্থানে বসবাস করতেন। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র হলেও মুকুন্দ মিশ্র নামটির উল্লেখ থাকায় তাঁকে বাশুলীমঙ্গলের রচয়িতা মনে করার অসুবিধা আছে। অপরপক্ষে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বাশুলীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সমাধান করেছেন এইভাবে,—"শাকে 'রস' (৬), সেই রসে 'বেদ' (৪) তাতে 'শশাঙ্কগণিতা' চন্দ্রকলা (১৬)। ১৬৪৬ শক বা ১৭২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে রচনাকাল হতে পারে।" তবে সমাধানটিও কষ্ট-কল্পিত বলে মনে হয়। মূল পুঁথি ও অনুলিপির সময়ের ব্যবধান হল এগার-বার বছরের। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল (১৭১১ খ্রীস্টাব্দ) অপেক্ষা 'বাশুলীমঙ্গলের' ভাষা প্রাচীন বলে মনে হয়। যদিও সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তীকালের রচনা। কিন্তু এ মন্তব্যেও সন্দেহের অবকাশ আছে। সাহিত্যানুরাগী জমিদার কীর্তিচাঁদের নাম অনুলিপিতে পাওয়া যায় এবং গ্রন্থটি কীর্তিচাঁদের সময়ে রচিত হলে তাঁর নামোল্লেখ আশা করা যেত। তাছাড়া অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কীর্তিচাঁদের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন, সেটি ভুল।

মুকুন্দরামের সমসাময়িক 'মঙ্গলচণ্ডী গীত' গ্রন্থের রচনাকার দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দের পুঁথি পূর্ববঙ্গে পাওয়া গেলেও সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে দ্বিজ মাধব সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজ মাধবের গ্রন্থ সমাপ্তিকাল হল ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ। এছাড়া কবির রচিত 'গঙ্গামঙ্গল' ও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক দু'খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সর্প বা মনসাপূজার ধারা এদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। জৈন, বৌদ্ধ ও লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তিগুলির মধ্যে এর প্রাচীনতা নিহিত থাকলেও হিন্দুধর্মে মনসাপূজা প্রচলনের সঠিক সময় জানা যায় না। তবে পালাগান ও কাহিনীর প্রচলন যে বহু পূর্বের সেকথা বলা যায়। প্রচলিত লৌকিকধারা ও লোককাহিনী অবলম্বনে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় মনসামঙ্গল রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিপ্রদাস পিপল্লাই ও বিজয়গুপ্ত পথিকৃৎ হলেও পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' বেশ জনপ্রিয় ছিল। ক্ষেমানন্দ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন,—'ইতিহাসের পথে ঘনরাম-ভারতচন্দ্রীয় কাব্য-স্বভাবের যিনি পুরোবাহক, ভারতচন্দ্রের প্রতিভার পরিমার্জনা অথবা পরিণতি কেতকাদাসে প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তাঁর কবি প্রবণতার অঙ্কুর কেতকাদাসের রচনায় অস্ফুট নেই।' ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' রচনা ও বাসস্থানের ইঙ্গিত তাঁর রচনার মধ্যেই নিহিত আছে। ১৫৬০ শকাব্দে (১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ) সেলিমাবাদ পরগণার শাসক বারা খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কবি পিতামাতাসহ আস্কর্ণ রায়ের পরামর্শে বর্ধমানের সেলিমাবাদ পরগণা পরিত্যাগ করে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং তথায় মনসার আদেশে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। অপর এক মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের পুঁথি পাওয়া গেছে 'কানাডাঙ্গা' গ্রামে। এছাড়া পরবর্তীকালে বহু মনসার ভাসান ও পালাগানের নমুনা মেলে, যা আজও পল্লী অঞ্চলে গাওয়া হয়ে থাকে। কানাডাঙ্গা (কানাইডাঙ্গ), জেলা বর্ধমান নিবাসী মনোমোহন গোস্বামী ১২২০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুঁথিটির অনুলিখনের কাজ সম্পাদন করেন। ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক অপর একজন 'মনসামঙ্গল' রচয়িতার কথা ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম খণ্ড, অপরার্ধ) পাওয়া যায়। কবি রসিক মিশ্র শ্রীকবিবল্লভের আদিনিবাস ছিল সেনভুম পরগণার অন্তর্গত কাঁকুটে-নন্দনপুর গ্রামে এবং পরবর্তীকালে তিনি বাঁকুড়া জেলার আখড়াশোল গ্রামে বসবাস করেন।

বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ধমান শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। সমগ্র বঙ্গবাসীকে বর্ধমানের কবি শুনিয়েছিল—'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' এবং আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কাশীদাসী মহাভারতের সমাদর আছে। কাটোয়া থানার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে ষোড়শ শতকের কবি কাশীরাম দাসের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। কাশীরামের জন্মস্থান ও গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে, কাশীরাম সমগ্র

মহাভারত রচনা করেন নাই। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব রচনা করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে নন্দরাম, শিবরাম, রমাকান্ত, জয়ন্তদেব প্রমুখ কবি মহাভারতের অবশিষ্টাংশ রচনা করলেও কাশীরামের জনপ্রিয়তার জন্য সমগ্র গ্রন্থটি তাঁর নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। মহাভারতের চার পর্বের রচনাকাল হল ১৫৯৭ হ'তে ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। উদ্যোগ পর্বের একটি ভণিতা থেকে জানা যায় যে, ওড়িশার অন্তর্গত বুড়িবালাঙ নদীর তীরে হরিহরপুর (রেনেল—Harriorpour) নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও যোগেশচন্দ্র বসু অনুমান করেন যে, মেদিনীপুর জেলার 'আবাসগড়' বা 'আওসগড়'-এর রাজার আশ্রয়ে থেকে শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন। অবশ্য এ মতের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'নারায়ণ-নন্দন' নন্দরাম দাসের (সম্ভবতঃ কবির জ্ঞাতি ভ্রাতার পুত্র) উক্তি হতে জানা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে 'ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে' অর্থাৎ গঙ্গার তীরে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[১] ডঃ সুকুমার সেন ত্রিপথগা অর্থে 'ত্রিবেণী'কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। ত্রিপথগা অর্থে গঙ্গার তীরে অবস্থিত যে কোন স্থানকে বোঝাতে পারে। তিনি যে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নাই। কাশীরামের পৈত্রিক নিবাসস্থল নিয়ে মতপার্থক্য আছে। একদল মনে করেন যে, তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কাটোয়া থানার সিঙ্গিগ্রামে (জে. এল. নং ১২১) এবং অপরপক্ষের দাবী হল, তিনি দাঁই-হাটের সন্নিকটে সিদ্ধিগ্রামের অধিবাসী। রামগতি ন্যায়রত্ন মন্তব্য করেছেন—'মুদ্রিত পুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রাম বিষয়েও লোকের ভ্রম জন্মিয়া গিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে 'সিদ্ধি' গ্রাম লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি নাই—সিঙ্গি গ্রাম আছে এবং ঐ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল। (বাঙ্গালা ভাষা, পৃ. ১০৭)। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন—'কাশীরাম দাসের পুত্র [নন্দরাম দাস] স্বীয় পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত ; যদি এ দানপত্র প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কাশী-রামের প্রাদুর্ভাবকাল যাহা অনুমান করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার অনৈক্য হইতেছে না' (বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ১০৯)। এটি অসম্ভবের কোন কারণ নাই। কারণ আওরঙ্গ-জেবের ৮৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় এবং সেই সময়ে বাহাদুর শাহ ছিলেন ৬৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এবং ৬৩ বৎসর বয়সে আকবরের মৃত্যুর সময় শাহজাদা সেলিমের বয়স

১। এই উক্তিতে কিছু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কারণ অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত বনপর্ব-এর পুঁথিতে আছে,—

'আদি সভা বিরাটবনের কত দূর। ইহারচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥
জাত্রাকালে কহে নিজ পুত্রেরে ডাকিয়ে। মোর সব শূন্ত গ্রন্থ পূর্ণ কর গিয়ে॥
তাঁহার আজ্ঞায় [রচে] কাশীর নন্দন। মহাশ্রমে করিয়া করিল সমাপণ॥'

ছিল ৩৬ বছর। যদি কাশীরাম দাস দীর্ঘজীবী হয়ে থাকেন তা'হলে মহাভারত রচনা সমাপ্তির পূর্বে তাঁর পুত্র কর্তৃক দানপত্র সম্পাদিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু রামগতির কথা নির্দ্বিধায়ভাবে মেনে নেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধা হল এই যে, তিনি ঐ দানপত্রের সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পরিচিত ছিলেন না; সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ওকড়সা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রে তিনি একথা জেনেছিলেন।

১৩১৯ সালে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীরামের পৈত্রিক নিবাসস্থল সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। বিষ্ণুপুর হতে আদিপর্বের যে পুঁথি সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সমাপ্তি অংশে পাওয়া যায়,—

'ইন্দ্রাণি নামেতে দেশ পুর্ব্বাপরস্থিতি। দ্বাদশ তির্থেতে জথা দেবী ভাগিরথি ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রাম। পুয়ঙ্করদাস পুত্র সুধাকর নাম ॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥
এই নিবেদন সাধু জনের চরণে। হইব নিম্মর্ল জ্ঞান এক মনে শুনে ॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধু ব্রত। এতদুরে আদি পর্ব হইল সমাপ্ত ॥
সকান্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে। রুক্কিনি নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ॥'

এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় মন্তব্য করেছিলেন,—"যাহা হউক, এই প্রাচীন পুঁথিতে আমরা কাশীরামের জন্মস্থানের নাম অতি সুস্পষ্টভাবে 'সিংহগ্রাম' পাইতেছি। 'সিংহ' শব্দ চলিত বাঙ্গালায় 'সিঙ্গি' উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা উপস্থিত সকলেই জানেন। এখনও সাধারণে স্বর্গীয় কালীসিংহের স্থানে 'কালীসিঙ্গি' বলিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য পুঁথির পাঠ হইতে আমাদের মতভেদ ও সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। কাশীরামের জন্মস্থান সাধুভাষায় সিংহ ও চলিত কথায় সিঙ্গি নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপি যাঁহারা মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন কিছুকাল পূর্বে 'ঙ্গ' 'ন্ধ' এক প্রকারেই লিখিত হইত, এক প্রকার লেখনরূপ বলিয়াই পরবর্তী নকলকারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে 'সিঙ্গি' 'সিন্ধি' রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরে তাহাই আবার মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে মুদ্রিত কাশীরাম হইতে যে 'সিন্ধুগ্রাম' পাঠ শুনাইলাম, তাহাও 'সিংহগ্রাম' শব্দের বিকৃত রূপ।[১] সুতরাং সিঙ্গি নামক গ্রামই যে কবিবর কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতেছে না।" যোগাদ্যা বন্দনার পুঁথিতে "সিন্ধিথায়্যা' ও 'সিঙ্গী ডম্বুর' শব্দের 'ন্ধি' ও 'ঙ্গী'র পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। এছাড়া

১। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের শেষে আছে,—
'শ্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধু গ্রাম। প্রিয়াকর দাসপুত্র সুধাকর নাম ॥'

'সিংহ'-এর পরিবর্তে 'সিংহি' (যার অপভ্রংশ রূপ 'সিঙ্গি') লেখা হত তার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রক্ষিত (পুঁথি পরিচয়, ২ খণ্ড, পৃ ৩৮৮) কবি রামেশ্বরের (১৭৩৫-৪০) 'হরমঙ্গল' বা 'শিবকীর্তন'-এর পুঁথিতে। এখানে উল্লেখ আছে,—

'পূর্ববাস জদুপুরে, হেমৎসিংহি ভঙ্গে জারে। রাজারাম সিংহ কৈল প্রিতি'। হিম্মৎ সিংহ (শোভাসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও রাজারাম সিংহ (কর্ণগড়ের জমিদার) উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ১২৩০ সালে অনুলিখিত (পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬) আদি পর্বের ভণিতায় পাওয়া যায়,—

'কায়স্তকুলেতে জন্ম বাস সিংহ গ্রামে। প্রিয়ঙ্করদাশ পুত্র সুধাকর নামে।'

কাশীদাসের পৈত্রিক নিবাসস্থলের সমস্যার আংশিক সমাধান হলেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের দীর্ঘ আত্মপরিচয়ে (পরিশিষ্ট—১) তাঁদের পৈত্রিক বাসভূমির ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমরা জানি মহাভারত প্রণেতা কাশীরাম দাসের নিবাস সিঙ্গি গ্রাম গঙ্গাতীরে ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত।' তিনি গদাধরের 'জগত-মঙ্গল' বা 'জগন্নাথমঙ্গল'-এর দুটি প্রাপ্ত পুঁথি (জেমো-কান্দিতে প্রাপ্ত পুঁথি—'জেমোপুঁথি' ও বিশ্বকোষ কার্যালয়ে প্রাপ্ত পুঁথিকে 'বিশ্বকোষ পুঁথি' নামে উল্লেখ করেছেন) হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন,—

জেমো পুঁথি	বিশ্বকোষ পুঁথি
'ভাগিরথি তিরে বাস ইন্দ্রায়নি নাম।	'ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রয়ানী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥	তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদীপ গোপীনাথ বামপদতলে।	অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে॥
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥'	নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥'

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় যে, দিগদর্শন যন্ত্রের উর্ধ্বভাগ (মস্তক) উত্তর দিককে নির্দেশ করে থাকে এবং নিম্নভাগ (পদতল) দক্ষিণ দিকের নিদর্শক। গোপীনাথের পদতলে অর্থাৎ গোপীনাথ বিগ্রহের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের দক্ষিণে অবস্থিত কবির পৈত্রিক বাসভূমি। অগ্রদ্বীপের ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে (crowfly distance) সিঙ্গিগ্রামের অবস্থিতি এবং দাঁইহাট (কল্পিত সিন্ধি) হল অগ্রদ্বীপের ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের ৭নং মানচিত্র (প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত) হতে জানা যায় যে, ভাগীরথীর তীরে দাঁইহাটের অবস্থান এবং অগ্রদ্বীপ হতে ভাগীরথীর একটা দক্ষিণমুখী শাখার সন্নিকটে সিঙ্গিগ্রাম অবস্থিত। ১৯১৩-২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত বর্ধমান জেলার সার্ভে মানচিত্রে এটির উর্ধ্বাংশ ভাগীরথী নামেই চিহ্নিত ছিল। এতদঞ্চল সম্পর্কে সীমিত ভৌগোলিক জ্ঞানের জন্য অনেকেই 'গোপীনাথের পদতল'-এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"কিন্তু 'সিঙ্ঘি' ভাগীরথীর তীরেই, তার অনেকখানি এখন ভাগীরথীর গর্ভে চলে গিয়েছে, কিন্তু 'সিঙ্গি' ভাগীরথী তীর থেকে কিছু দূরে কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।" এ উক্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা যায় যে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার মানচিত্র পর্যালোচনা করেন নাই এবং এতদঞ্চল সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত কোন ধারণা নাই। লোকমুখে শুনে তিনি কাশীরামের পৈত্রিক নিবাসভূমির পর্যালোচনা করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, সিঙ্গিগ্রামের অবস্থিতি হল অগ্রদ্বীপের দক্ষিণে, পশ্চিমে নয় এবং সিঙ্ঘি নামে কোন গ্রাম / মৌজা ছিল না বা এ যুগেও নাই। ব্যাপক-ভাবে কাটোয়া হতে দাঁইহাট পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ তীর ভাঙ্গনের কথা কল্পনা মাত্র ; কোন সরকারী প্রমাণ নেই। আংশিকভাবে গ্রামটির অবলুপ্ত হলেও মৌজার নাম থাকা উচিত ছিল। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে কবি গঙ্গারামের বর্ণনায় (অত্র গ্রন্থের ১৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) জানা যায় যে, ঐ সময়ে এই অঞ্চলের বিখ্যাত গ্রামগুলি হল,—কাটোয়া, চাণ্ডুলি, সিঙ্গি, বাক্সা, ঘোড়ানাশ, মস্তইল, গোটপাড়া, চাঁদপাড়া, অগ্রদ্বীপ, পাটলী, আতাইহাট, পাতাইহাট, দাঁইহাট, বেড়া, ভাউসিংহ, বিকীহাট প্রভৃতি। এখানেও সিঙ্গি আছে, কল্পিত সিঙ্ঘিগ্রাম নাই। ডঃ সুকুমার সেনের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করে দু'দিক বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, এতদঞ্চল পরিদর্শন না করে সকলেই ঐতিহাসিক-ভূগোলের আলোচনা করেছেন এবং সেকারণে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়,—'সাত নকলে আসল বস্তু খাস্তা হইয়াছে' অর্থাৎ প্রায় তিনশ' বছর ধরে পুঁথি নকলকারীগণের হস্তে নাম বিভ্রাট চলে আসছে। দাঁইহাটের সন্নিকটে কাশীরাম দাসের পৈত্রিক নিবাস হলে সম্ভবতঃ এটি কবি বিজয়রামের দৃষ্টি এড়াত না এবং তাঁর 'তীর্থমঙ্গল'-এ এর উল্লেখ আশা করা যেত।

সমগ্র মহাভারত কি কাশীরামের রচনা ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী গদাধর দাসের 'জগতমঙ্গল' কাব্যের একটি উক্তির প্রতি (বিশ্বকোষ পুঁথি) অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। গদাধরের উক্তি হল,—

"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর'। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে ॥"

জেমো পুঁথিতেও 'শ্রীকৃষ্ণদাস' ও 'শ্রীকাশীদাস' উল্লেখ পাওয়া যায়। রামেন্দ্র সুন্দরের মতে, এদেশে কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'জগতমঙ্গল'-এ 'শ্রীকৃষ্ণদাস' ও 'শ্রীকাশীদাস' উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৫৬৪ শকাব্দ বা বাংলা ১০৫০ সন বা ইংরাজী ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে 'জগতমঙ্গল' রচিত হয়েছিল এবং সেই সময়ে গদাধরের অগ্রজ দুজন যে জীবিত ছিলেন সেকথা অনুমান করা যায়। 'শ্রী' শব্দের ব্যবহার সঠিক হয়ে থাকলে ১৬০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দে বিরাটপর্ব রচনার পর ১৬৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর মহাভারতের অবশিষ্টাংশ নিজ রচনা না করে অন্যদের জন্য অসমাপ্ত রেখেছিলেন, একথা মনে করার ক্ষেত্রে কিছু দ্বিধা রয়েছে।

তাহলে ভ্রাতুষ্পুত্রকে—'রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে' অথবা 'জাত্রাকালে কহে নিজ পুত্রেরে ডাকিয়ে'—এই পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কাশীরামের পৈত্রিক নিবাসস্থল অনুসন্ধানের ন্যায় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু। চার পর্ব মহাভারত রচনার কথা জানা যায় কালীসিংহের অনূদিত মহাভারতের উপসংহার হতে এবং এটিও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল। জিত নামক এক ব্যক্তি ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে একই কথা উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু তিনিও কাশীদাস হতে প্রায় ২00 বছর পরবর্তীকালের লোক। চার পর্বের পরও গ্রন্থ রচনার কথা বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার ৯২০ নং পুঁথিতে কাশীদাস কর্তৃক শান্তিপর্ব (পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩) রচনা ও সর্বশেষে ভণিতায় জানা যায়,—

'ইন্দ্রানি নগরে গ্রাম পূর্বাপর স্থিতি দ্বাদশ তির্থেতে জথা গঙ্গা ভাগিরথি।
কায়স্ত কুলেতে জাত বাস সিঙ্গি গ্রাম প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।
তস্যজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
কাশিরাম দাশ কহে পাঁচালির মত ভারতে শান্তিপর্ব সুধাসিন্ধুবত।'

১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্র, সেটেলমেণ্ট দপ্তরের মানচিত্র, একালে সরকারী প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য হতে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়। দাইহাট ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জনবসতিপূর্ণ ও জনবসতিবিহীন মৌজাগুলি হল,—ঘোষহাট (২২), পানুহাট (২৩), মণ্ডলহাট (২৪), একাইহাট (২৫), বিকিহাট (২৬), বেড়া (২৭), বা ঘটিকরী (৮৭), পাতাইহাট (৮৮), চরপাতাইহাট (৮৯), দাঁইহাট (৯০), ভাউ সিং (৯১), চর ব্রজনাথপুর (৯৪), সাহাপুর (৯৫), ও বীরবেগুন (৯৬)। এর মধ্যে কোথাও সিন্ধি নামে কোন মৌজার উল্লেখ নেই। প্রাচীন গ্রাম জনবসতিশূন্য হলেও পূর্বোক্ত নামে মৌজার উল্লেখ থাকার নিদর্শন পশ্চিবঙ্গে প্রচুর আছে। এমনকি কাটোয়া থানার জনবসতিবিহীন মৌজার সংখ্যা বর্তমানে এগারটি। কাশীরাম দাস নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন এটা একটা প্রবাদ মাত্র। তিনি জীবনের মূল্যবান সময়টি হরিহরপুরে অতিবাহিত করেছিলেন এবং 'মহাভারত' সেইখানেই রচনা করেন। কাশীদাসী মহাভারতের পুরনো পুঁথিতে সিংহ গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বর্ধমান কালেক্টরীতে রক্ষিত একটা কাল্পনিক তায়দাদের উল্লেখ করলেও সেটা দেখতে পারেন নাই এবং তাঁরা ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে সিঙ্গিগ্রামে ডঃ বিধান-চন্দ্র রায় কর্তৃক কাশীরাম দাস স্মৃতিমন্দিরের দারোদ্ঘাটনের সময় কোন আপত্তি তোলেন নাই। অনুলিপিকরগণের ত্রুটির জন্য কয়েকক্ষেত্রে 'সিঙ্গি' গ্রাম সিন্ধি বা সিংহ গ্রামে পরিণত হয়েছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন মন্তব্য করেছেন যে, কাশীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস, গোপালদাস নামক এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' আখ্যা পান

এবং গুরুর কৃপায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগৎমঙ্গল' কাব্য (১৬৪২ খ্রীস্টাব্দ) ও ভ্রাতুষ্পুত্র (?) নন্দরাম কর্তৃক মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব' (পয়ার ছন্দে) রচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সাহিত্যকৃতির জন্য এই বংশের বিশেষ খ্যাতি ছিল। গদাধরের উক্তিতে 'দেব' বংশের বংশপরিচয়সহ তাঁদের পৈত্রিক নিবাসের উল্লেখ আছে। গদাধর তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি সম্পর্কে যেরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি হল কাটোয়া থানার অন্তর্গত 'সিঙ্গি' গ্রাম।

ব্যাসদেব প্রণীত সুবিশাল সংস্কৃত মহাভারতের প্রামাণ্য পুঁথি (এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত) অবলম্বনে বর্ধমান রাজবাড়ীর চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন পণ্ডিতের দ্বারা বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সমগ্র অনুবাদ রচনা ও প্রকাশনার ভার মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চাঁদ স্বয়ং বহন করলেও তিনি এ কাজের শেষ দেখে যেতে পারেন নাই। মহাভারতের গদ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে কালিপ্রসন্ন সিংহের নিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আজও 'রাজ মহাভারত' প্রামাণ্য অনুবাদরূপে স্বীকৃত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাঁকো (থানা—গলসী) নিবাসী স্যার প্রতাপচন্দ্র রায় সাত খণ্ডে সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদের জন্য ম্যাক্সমুলারের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের একপত্রে [পরিশিষ্ট-১] তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ম্যাক্সমুলারের উপদেশে তিনি এগার খণ্ডে মহাভারতের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য দেশে খ্যাতি অর্জন করেন।

'রাঢ়ের রুক্ষভূমিতে মনসা ও ধর্মঠাকুরের বেশী প্রাধান্য আছে। ধর্মঠাকুর রাঢ়ের আঞ্চলিক দেবতা এবং সেকারণেই মেদিনীপুর থেকে বীরভূম অঞ্চলের মধ্যেই অধিক সংখ্যক ধর্মমঙ্গল রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সূত্রে ময়ূরভট্ট, রামাই পণ্ডিত ও আদি রূপরামের ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেলেও আজ পর্যন্ত কোন প্রামাণ্য পুঁথি বা রচনাকারগণের আবির্ভাবকালের কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত তিনজনকে বাদ দিলে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গলার সুবাদার সুলতান সুজার (১৬৩৯-৫৯ খ্রীস্টাব্দ) সমসাময়িক রূপরাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি বলা যেতে পারে। রূপরাম রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি-শ্রীরামপুরে গ্রামে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী ও মাতার নাম ছিল দৈমন্তী (দয়মন্তী ?)। পিতার টোলে সামান্য লেখাপড়া শিখে গায়েনের দলে ধর্মের গান করে বেড়াতেন এবং ধর্মের আদেশে ১৫৭১ শকাব্দে (১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ) 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। সম্ভবতঃ রূপরামই প্রথম পাঁচালীর সীমা ছাড়িয়ে ধর্মমঙ্গলকাব্যকে সাহিত্যিক রূপদান করেন।

ধর্মমঙ্গলের অপর এক কবি যাদুনাথের 'ধর্মপুরাণ' হাওড়া জেলার ডোমজুড় গ্রামে পাওয়া গেছে। কবির পিতার নাম বিনোদ রায় ও পিতামহের নাম ছিল দামোদর এবং তাঁদের নিবাস ছিল 'দোম'। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল মন্তব্য করেছেন,—

'দোম সম্ভবতঃ বর্তমানের ডোমজুড়' এবং তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, কবি বর্ধমানরাজের প্রজা ছিলেন না। যাদুনাথের নিবাস সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। সেরগড় পরগণায় 'দোমহনী' নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। তাছাড়া তিনি ছিলেন কৃষ্ণরাম রায়ের গুণগ্রাহী এবং যে বছর কৃষ্ণরাম রায় নিহত (১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দ) হন, সেই সালে তাঁর 'ধর্মপুরাণ' রচনা শেষ হয়েছিল। কবির এক উক্তি হতে অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণরাম রায়ের নিধনকালে কবি বর্ধমান হতে অধিক দূরে ছিলেন না। তাহলে দোমহনীও কবির নিবাসের একটি সম্ভাব্যময় স্থান রূপে বিবেচিত হতে পারে।

ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী 'কৈয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রাম'-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের সমসাময়িক এবং তাঁর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়েছিলেন, একথা কবির বারংবার উক্তিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘনরাম ১৬৩৩ শকাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ (১৭১১ খ্রীস্টাব্দ) তারিখে 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। রায়না থানার কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্মস্থান। পিতামহ ধনঞ্জয়, পিতা গৌরীকান্ত, মাতামহ গঙ্গাহরি, মাতা সীতা ও চার পুত্রের (রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ) নাম কবির রচনাতেই বর্ণিত আছে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনরাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—"তাঁর রচনা ভঙ্গিমা সংস্কৃত প্রধান ও মার্জিত, বক্তব্য বিষয়ে স্থূল রুচির স্পর্শ দু'এক জায়গায় থাকলেও গ্রাম্য ইতরতা নেই, তির্যক বাণী ভঙ্গিমাও বেশ চিত্তাকর্ষী হয়েছে। সর্বোপরি এতে এক যুগের রাঢ়ের সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হয়েছে—সমাজ ও ইতিহাসের দিক থেকে এ গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান।" ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন।

পানাগড় হতে ১৪।১৫ কিলোমিটার উত্তরে গোপভূম পরগণার বসুধাগ্রামে ধর্মমঙ্গলের অপর এক কবি নরসিংহ বসুর পৈত্রিক বাসস্থান। তাঁর পিতামহ মথুরা বসু বসুধাগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে শাঁখারীগ্রামে বসবাস করেন। নরসিংহ কীর্তিচাঁদের অশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন,—

'অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।'

তিনি বীরভুমের জমিদার (রাজনগর) আসফ-উল্লাখানের তরফে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উকিল নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মনিবেরও সুখ্যাতি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়,—

'বাঙলার বীরভুম বিখ্যাত অবনি
শ্রীআসফুল্লা-খান রাজা শিরোমণি।'

মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে সমরসাহী পরগণার অধীনস্থ 'সেহাড়া' (থানা—রায়না) নিবাসী রামকান্ত রায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তিনি যে তেজচন্দ্রের অনুগৃহীত ছিলেন, সে কথা তাঁর রচিত কাব্যেই প্রকাশ পেয়েছে,—

'নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর/সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর।
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর/শ্রীযুত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর।'

ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুরবাসী রামদাস আদক জাড়গ্রামের (থানা—জামালপুর, বর্ধমান) কালুরায় কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য (১৫৮৪ শকাব্দ) রচনা করেন। খুরুল (থানা ভাতার) নিবাসী কবি হৃদয়রাম সাউ-এর ধর্মমঙ্গলের (রচনাকাল ১১৪৬ সাল) পুঁথি পাওয়া গেছে। ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব কাহিনী গড়ে উঠেছে বল্লুকা বা ভল্লুকা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কাহিনীর কেন্দ্রস্থল হল অজয়ের দক্ষিণতীরে 'গৌরাঙ্গপুর' বা 'ঢেকুরগড়'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আলোচ্য নদী ও স্থানটির অবস্থিতি বর্ধমান জেলাতেই।

সত্যপীর ও নারায়ণ পূজা অবলম্বনে পাঁচালী বা ব্রতকথা পাঠ করার রেওয়াজ বহুকাল ধরে চলে আসছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সত্যনারায়ণ পাঁচালী এ জেলাতেও রচিত হয়েছিল এবং এরূপ কয়েকটি পাঁচালীর সন্ধান দিয়েছেন অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, যথা—পাটুলি-নারায়ণপুরের মৌজিরাম ঘোষাল, ভারুহা গ্রামের [ভারুচা, মন্তেশ্বর] দ্বিজ গিরিধর (রচনাকাল ১০৭০ সাল), ধাত্রীগ্রামের কৃষ্ণকান্ত, সাহাপুরের রামশঙ্কর সেন, দেবগ্রামের দ্বিজকৃপারাম, নারায়ণপুরের গুণনিধি চক্রবর্তী, নাসিগ্রামের কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, মীরহাটের (কালনা) গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি। 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী একখানি 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' নামে ছোট পাঁচালী কাব্য রচনা করেন, তাতেও কীর্তিচাঁদের নামোল্লেখ আছে,—

'জয়যুক্ত রিপু মুক্ত করকণ্টদায়।
দ্বিজভক্ত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়॥'

প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরগ্রামবাসী রামকিশোর ভট্টাচার্য তর্কবাগীশ কৃত '৺শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ কথা'র পুঁথির সন্ধান পেয়ে উহা প্রকাশ করেন। রামকিশোরের ভাষায় পুঁথির রচনাকাল হল,—

'বেদ বাণ তর্কতন্বী শাক পরিমিত।
সমাপ্ত হইল পুঁথি কিশোর রচিত॥'

মূল পুঁথির রচনাকাল ১৬৫৪ শকাব্দ বা ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দ হলেও এর সন্ধান জানা যায় না। বাংলা ১২৭০ সালে ২৫শে চৈত্র তারিখের অনুলিপি হতে এটি ছাপা হয়েছে। রামকিশোরের পুত্র বাঞ্ছারাম তর্করত্নের 'যোগাদ্যা বন্দনা' সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত হলেও সংস্কৃত রচনার সন্ধান জানা যায় না। বাঞ্ছারাম কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি ও ষষ্ঠীপূজা পদ্ধতি ১৭১২ শকাব্দে (১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ) রচিত হয়েছিল। এড়ুয়ার নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'সত্যদেবের পাঁচালি', বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় (পুঁথি নং ৬ : লিপিকাল ২৫শে ভাদ্র, ১১১৮ সাল) রক্ষিত আছে। যার শেষাংশে ভণিতা পাওয়া যায়,—

'অধ্যায়ের সমাধান / ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দান / পাঠকে বন্ধন করে পুঁথি।
সত্যদেব কৃপাময় / দ্বিজ রামকৃষ্ণ কয় / এড়ুয়ারে জাহার বসতি ॥'

বাংলা ১০৯৯ সালে রচিত 'নারদপুরাণে'র কবি কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল অম্বিকা-কালনার হাঁসপুকুর পল্লীতে। 'নারদপুরাণে'র শেষ ভাগে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে আছে,—

'অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার / সুবর্ণ বণিক কুলে উৎপত্তি আমার।
পৈত্রিক বসতি পূর্বে অম্বিকা নগর / হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর ॥'

কৃষ্ণদাসের উক্তিতে জানা যায় তাঁর পিতামহের নাম মদনমোহন এবং পিতার নাম ছিল তারাচাঁদ এবং তিনি (অপর নাম রামকৃষ্ণ) কলকাতার বহুবাজার পল্লীতে বসবাস করতেন। আগমচন্দ্রিকা ও কমলোদয় গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণমোহনের নিবাস ছিল পূর্বস্থলী গ্রামে। অম্বিকা-কালনার প্রাণবল্লভ ঘোষ কীর্তিচাঁদের মাতা ব্রজকিশোরীর নির্দেশে ঊনিশটি পালায় বিভক্ত 'জাহ্ন্বীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। প্রাণবল্লভ কীর্তিচাঁদের কর্মচারী ও তাঁর মাতার অনুগত ব্যক্তি ছিলেন।

দেশ ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সাহিত্যের মাধ্যমেই বিকশিত হয়। দেশে শান্তি বিরাজিত হলে সম্পদ গড়ে ওঠে, সেকারণে দেখা গেছে যে এই সময়ে সংস্কৃতির সকল শাখাতেই পল্লব-পুষ্পের সমারোহ দেখা দেয়। 'কবিরা কালের সাক্ষী', তাই তাঁদের রচনায় সমকালীন সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া সাহিত্য রচনা করতে গেলে রচনাকারের উপদ্রববিহীন জীবন-যাত্রার প্রয়োজন আছে। মধ্যযুগে অধিকাংশ কবি রাজা-মহারাজাদের (বড় ও ছোট জমিদার) আশ্রয়পুষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করতেন। চতুষ্পাঠীগুলিও পরিচালিত হত ধনীব্যক্তিদের বৃত্তিদানের উপর। রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সকলেই ধন ও প্রাণ ভয়ে ভীত হওয়ায় সামাজিক সকল বন্ধনের মূলদেশ আঘাতপ্রাপ্তির ফলে এই সময়ে সাহিত্য রচনার গতিও ব্যাহত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল এবং সেই সময়ে চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের সুশাসন ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাঢ়ের বহু কবি কাব্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর দু'বছর পরে বর্গী হাঙ্গামায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় বিকল হয়ে যায় এবং এগার বছর ধরে এরূপ অবস্থা চলতে থাকে। এরপর ১৭৫৭-৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজদৌলার নিধন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমানের জমিদারী উপঢৌকন, কোম্পানি কর্তৃক সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভ ও সর্বশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সমগ্র বাঙালী সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। সেজন্য স্বাভাবিক কারণে বর্ধমানেও এ সময়ে সাহিত্যচর্চার গতি রুদ্ধ ছিল।

বর্গী হাঙ্গামার সময় রাজা চিত্রসেনের পলায়নের কাহিনী নিয়ে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পূ'র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অত্যাচারের

কাহিনী কবি গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' পাওয়া যায়। গঙ্গারামের বর্ণনায় পাওয়া যায়,—

'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালা-এ পুঁথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়াপি লইয়া ॥'

সাহিত্যচর্চা ত দূরের কথা, বড় বড় বর্ধিষ্ণু গ্রামও প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ১৬৭২ শকাব্দে অর্থাৎ সন ১১৫৮ সালের ১৪ই পৌষ, শনিবার তারিখে সমাপ্ত হয়েছিল। মনে হয় কবি কাটোয়া-দাঁইহাট অথবা মুর্শিদাবাদের লোক, অন্যথায় এরূপ নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া অপরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবতঃ অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের ভয়ে স্থানত্যাগ করেছিলেন, সেকারণে পূর্ববঙ্গে এই পুঁথি পাওয়া গেছে।

সুকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের নিবাস ছিল চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার পেঁড়োগ্রামে (বর্তমান হাওড়া জেলায়)। কিন্তু বর্ধমানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনদিন মধুর হয় নাই। অগ্রজগণ ও জ্ঞাতিবর্গের কুট-চক্রান্তের শিকার হয়ে ভারতচন্দ্র বর্ধমানের জমিদারের কুনজরে পড়ায় তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয় এবং ভাগীরথীর পরপারে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব অঞ্চলে তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিতরূপে বসবাস করতে থাকেন। অন্যথা হলে, হয়ত তিনিও বর্ধমানরাজের অনুগৃহীত হতেন। গীতগোবিন্দের বাংলা অনুবাদকদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি গিরিধর দাসের বাসস্থান ছিল বরাকর নদে পূর্বভাগে হাতিনাল গ্রামে (থানা—কুলটী)।

কোচবিহার দরবার গ্রন্থাগারে জগৎসিংহ ভণিতায় 'গীতগোবিন্দ'-এর বাংলা অনুবাদ আছে। খণ্ডঘোষ নিবাসী কবিচন্দ্র এটি রচনা করেন। বৈদ্যবংশীয় কবিচন্দ্রের পিতামহের নাম বৈদ্যবিশারদ ও তাঁর পিতার নাম ছিল কবিকর্ণপুর। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কাষ্ঠশালী নিবাসী দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ) বর্ধমানে কর্মরত অবস্থায় 'শাক্তপদবলী' ও 'শ্যামাসঙ্গীত' রচনা করেন। অকিঞ্চন ভণিতায় তাঁর পদগুলি পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এবং দিল্লীর বিখ্যাত ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। রঘুনাথ খাম্বাজ, একতালা রাগে শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে সেকালের বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করেছিলেন। একটা গানের নমুনা হল,—

'নীলবরণী নবীনা রমনী নাগিনী জড়িতা জটাবিভূষিনী,
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী।
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে উঁহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে জীবের উপায়, নিত্যসিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী।'

তাঁর পিতা ব্রজকিশোরও কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন। শ্রীখণ্ড নিবাসী অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র দাস, ১৭১৫ শকাব্দে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'বিলাপ পরিবৃতিমালা'র কাব্যানুবাদ করেন।

অম্বিকা-কালনা নিবাসী মহেশ্বর ভট্টাচার্যের পুত্র সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৬৯-১৮২১ খ্রীস্টাব্দ) চান্না গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে বসবাস করতেন। কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত ও শ্যামা সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র ও তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ আকৃষ্ট হন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি বর্ধমান শহরের কোটালহাটে এসে বসবাস শুরু করেন। কমলাকান্ত বহু 'শ্যামাসঙ্গীত', 'শাক্তপদ' ও 'আগমনী গানে'র রচয়িতা। তাঁর রচনায় মার্জিত রুচি ও অলঙ্কৃত ভাষায় আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের ভাষায়—'রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে কমলাকান্তের শাক্তপদের তুলনা করলে বোঝা যায় রামপ্রসাদের রচনারীতিতে আছে গ্রাম্য রুচির ছাপ, কিন্তু কমলাকান্তের পদ তুলনামূলকভাবে অলঙ্কৃত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ।'

কমলাকান্তের পর বর্ধমানের অপর এক কবি বঙ্গবাসীগণকে শোনালেন চণ্ডীর গান,—

'হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।"

কালী ও কৃষ্ণের প্রভেদ দূর করে খেরুর নিবাসী নবাই ময়রা (১১৯৯-১২৫১) তাঁর রচনা ও গানে বঙ্গবাসীকে মাতিয়ে তুললেন। যৎসামান্য লেখাপড়া জেনে মাল-ডাঙ্গায় ময়রার দোকানে কিছুকাল চাকুরী করার পর উত্তর জীবনে নবাই-এর রচনাশক্তি ও সুকণ্ঠের গুণে তাঁর খ্যাতি সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্রজকিশোর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও কবি অকিঞ্চনের অগ্রজ নন্দকুমার রায় (দেওয়ান) একজন খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। সন্নিকটবর্তী পিলা নিবাসী 'ষষ্ঠী-মঙ্গল' নামক এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা রামধন চক্রবর্তী দাশুরায়ের মাতুলবংশের লোক এবং তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

পাঞ্জাব হতে আগত কাপুরবংশীয়গণ বর্ধমানের রাজার অনুগ্রহে বহুদিন ধরে বর্ধমানে বসবাস করে আসছেন। কাশীনাথ কাপুরের পুত্র পরাণচাঁদের জন্ম ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ভগিনী কমলকুমারীর সঙ্গে মহারাজার বিবাহ হয়। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারীর মৃত্যু হলে পরাণ-বাবু রাজএস্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে জমিদারীর প্রায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। দেওয়ান, শ্যালক ও শ্বশুররূপে অবতীর্ণ পরাণবাবু, বিভিন্ন উপায়ে তেজচন্দ্রের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন এবং তেজচন্দ্রের মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে 'হরিহরমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। বর্ধমানরাজ্যসহ বর্ধমানরাজের যতদূর প্রশংসা করা পরাণবাবু তাই করেছেন, যথা,—

'আজ্ঞা দিলা রাজা বর্ধমান অধিকারী।
রানী যাঁর রাজলক্ষ্মী কমলকুমারী॥'

অথবা,

'জমিদারী বর্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজশ্চন্দ্র যার পতি।
মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বসুমতী॥'

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অনুকরণে কাম-বিলাসী জমিদারের বাসনা চরিতার্থেই এটি রচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যে শৃঙ্গাররসাত্মক যৌনলীলা বর্ণিত হয়েছে ; জয়সেন ও জয়ন্তী উপলক্ষ মাত্র। কাব্যটির ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভকাল ও ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এর সমাপ্তিকাল।

হরিহরমঙ্গলে 'বর্ধমান' নামকরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—"বিজ্ঞ রাজা তেজচন্দের মানদানের ফলে এখানে মানীগণের মান নিয়ত বর্ধিত হয়। এমন কি অন্যদেশী প্রবাসী যাঁরা তাঁরাও বর্ধমানে এসে রাজার কাছ থেকে মান লাভ করে ধন্য হল, আবার জগতের মানীগণ অনুক্ষণ প্রণিপাত করে রাজারও মান বর্ধন করেন—এইসব কারণে নগরের নাম হয়েছে 'বর্ধমান'।" এই কাব্যে রাজসভার বিবরণসহ তেজচন্দ্রের সাড়ম্বর দেবসেবা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের প্রতিপালন, ভূমিদান, যাগযজ্ঞ, অতিথিসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা, রাজসভার শ্রুতি ও স্মৃতিচর্চা, যাত্রা-নাটক-গীত, শাস্ত্রপাঠ, রাজার পশুপক্ষী প্রীতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তবে রাজ্যবিস্তার বর্ণনাটিতে তেজচন্দ্রের আমলে তাঁর অধিকৃত প্রত্যেকটি পরগণার নামোল্লেখপূর্বক বর্ণনাটিকে সমসাময়িককালের ভূমিরাজস্বের প্রামাণ্য দলিল বলে গণ্য করা যায়।

কমলকান্তের ন্যায় যুবরাজ প্রতাপচাঁদের অপর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন সে যুগের গায়ক ও গীতিকার কালীমির্জা বা কালিদাস মুখোপাধ্যায়। কালীমির্জার 'শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী' কাব্যে প্রতাপচাঁদ সম্পর্কিত প্রশস্তিতে আছে,—

'তেজচন্দ্র তনয় প্রতাপচন্দ্র নাম।
সর্বজনপ্রিয় আর সর্বগুণ-ধাম ॥'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কালীমির্জা দেওয়ান রঘুনাথের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। কালীমির্জার ন্যায় অপর একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহানুই নিবাসী প্যারীমোহন কবিরত্ন (জন্ম ৪ঠা আশ্বিন, ১২৪১ সাল) বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা ব্যতীত তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তবে রাজা প্রতাপ-চাঁদ তাঁকে কবিরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নান্দাল গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর (জন্ম ১২০২ সাল ও মৃত্যু ১২৭৩ সাল) 'শ্যামা-সঙ্গীত' রচনা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

বাংলা গদ্যচর্চার আদিপর্ব শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হতে এবং এ বিষয়ে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অবদানকে অগ্রগণ্য বলা যায়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে লালবাজারের সন্নিকটে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগণ কর্তৃক মিশন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাগদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হলেও, এর সঙ্গে বাঙালীর সাহিত্য চর্চার কোন যোগ ছিল না। সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন উনবিংশ শতকে শুরু হলেও বর্ধমান অঞ্চলে চিঠিপত্রে গদ্যের ব্যবহার অষ্টাদশ শতকেও ছিল। বর্ধমানের বিভিন্ন-স্থানে প্রাপ্ত পুরাতন দলিলপত্রের নমুনা পঞ্চানন মণ্ডল 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র গ্রন্থে' সংকলন করেছেন। প্রাচীন দলিলপত্রাদিতে গদ্যের প্রচলন ছিল, তার প্রাচীন প্রমাণ

পাওয়া যায় বারাখাঁ কর্তৃক শিবরাম চক্রবর্তীর অনুকূলে সম্পাদিত দলিলটিতে। বর্ধমান রাজবংশানুচরিতে মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে একটি মামলার নিষ্পত্তি বাংলা গদ্যে লিখিত হয়েছিল এবং দলিলটি ১১৮১ সালে সম্পাদিত হয়েছিল। নিমন্ত্রণ পত্রাদিতে গদ্যের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে শারদীয় 'বিজয়তোরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পঞ্চানন মণ্ডলের দাবী অনুসারে মন্তব্য করা যায় যে, এটি কোন নূতন আবিষ্কার নয়; দলিলের অনুলিপিটি ১৩২১ সালে 'রাজবংশানু-চরিত' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকে বর্ধমানের সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন দেখা যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম সম্পাদিত সংবাদপত্র 'বাঙ্গালা গেজেট' প্রকাশ করেন বয়ড়া নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র রায়। অনেকে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ'কে প্রথম প্রকাশিত সংবাদ-পত্র হিসাবে স্থান দিতে চান; কিন্তু ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। অপরপক্ষে গঙ্গাকিশোর স্বীয় নিবাসস্থল 'বয়ড়া' হতে ঐ বছর ১৪ই মে 'বাঙ্গলা গেজেট' প্রকাশ করেন অর্থাৎ সমাচার দর্পণের নয়দিন পূর্বে এর প্রকাশকাল। গঙ্গাকিশোরের রচিত 'শব্দার্ণব' নামক অভিধান গ্রন্থখানি ১২৩২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, দাশু রায়ের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ বয়ড়ার মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে 'দায়ভাগ', 'দ্রব্যগুণ'ও 'চিকিৎসার্ণব', **'A Grammer in English and Bengali'** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে পাঁচালী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায় বা দাশু রায় (১২১২ সালের মাঘ মাস) কাটোয়া থানার অন্তর্গত বাঁধমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহ করেন। বাল্যে মাতুলালয়ে লেখাপড়া শিখে নীলকুঠীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে অক্ষয়া বাইতিনীর কবির দলে গানের বাঁধনদার ছিলেন। দাশু রায় ছিলেন এ দেশের প্রথম সমাজ সচেতন কবি। তাঁর সমগ্র পাঁচালী ৬৪টি পালা অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। তিনি নিজের উদ্যোগে বয়ড়া হতে সমগ্র পাঁচালী ৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। ১২৬৪ সালের ২রা কার্তিক কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী তিথিতে ভাগীরথীর তীরে অন্তর্জলি অবস্থায় ৫১ বৎসর ৯ মাস বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনের শেষ লক্ষণ দেখা দিলে, কবিরাজ ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—'বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিল'। দাশু রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে বঙ্গের লোক-সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বা কণ্ঠ মশাই। এ সময়ে কবিগানের প্রচলন স্তিমিত হয়ে আসে। তাই নূতন পথের সন্ধান করলেন হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া নিবাসী গোবিন্দ অধিকারীর যোগ্যশিষ্য 'নীলকণ্ঠ'। বাংলা ১২৪৮ সালের ৪ঠা মাঘ ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ধবনীগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। নীলকণ্ঠের রচনা দক্ষতা ও সুকণ্ঠের জন্যে কৃষ্ণযাত্রাকে তিনি উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুকণ্ঠ

ও রচনা নৈপুণ্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহারাজা মহতাব্‌চাঁদ, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী দিলেন। 'নীলকণ্ঠে'র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, কৃষ্ণযাত্রার কাহিনীকে সুসংবদ্ধভাবে ভাবের প্রগাঢ়তার সঙ্গে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে রাধাকৃষ্ণলীলার গীতিময় অভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তিমার্গের একটা নির্ঝরধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ ঝুলন-একাদশীর দিন ত্রিবেণীতে কয়েক হাজার লোকের সম্মুখে অন্তর্জলি অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। পরলোকযাত্রী পিতার অনুরোধে কণ্ঠমশাই-এর পুত্র কমলকুমার সেদিন ত্রিবেণীর ঘাটে বঙ্গবাণীকে শোনালেন নীলকণ্ঠের রচিত গানটি,—

'আমি যখন আমি নই মন আর মরণে কি ভয় আছে
যাঁর জীবন তাঁরই মরণ, তাঁর ভাবনা সেই ভাবছে।
বারংবার আমি সেজেছি, ভুগলাম ভালো ভবের মাঝে,
আর ভোবো না মিছে কাজে যাওয়া আসা ঘুচে গেছে।'

নীলকণ্ঠের সমসাময়িক মতিলাল রায় (১২৪৯-১৩১৫) লোকসাহিত্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্বস্থলী থানার ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালের ২১শে মাঘ জন্ম-গ্রহণ করেন। মতিলাল ছিলেন একজন প্রতিভাবান পালা রচনাকার ও দক্ষ অভিনেতা। তিনি 'বিজয়চণ্ডী' 'নিমাই সন্ন্যাস', 'ভীষ্মের শরশয্যা' ইত্যাদি নাটক রচনা করে নিজের দল গড়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁর রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী শ্রোতা। ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা পৌষ কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে সন্তোষপুর নিবাসী (থানা—ভাতাড়) শশি হাজরা ছিলেন যাত্রাজগতের একজন স্মরণীয় পরিচালক। মতিলাল রায়ের সমসাময়িক মাহাচান্দা নিবাসী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৭-১৩৩৯) কুড়িখানির অধিক নাটক রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। 'প্রিয়ব্রত', 'পঞ্চনদ', 'জরাসন্ধ', 'কালচক্র' প্রভৃতি তাঁর কালজয়ী রচনা। এছাড়া 'কর্ণবধ' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের রচয়িতা ধনকৃষ্ণ সেন ছিলেন বর্ধমানের সন্তান।

পূর্বস্থলীর সন্নিকটে চুপী নিবাসী পীতাম্বর দত্তের পুত্র অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫. ৭. ১৮২০—১৮ ৫.১৮৮৬), তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থটি। এছাড়া 'চারুপাঠ, 'ধর্মনীতি' 'পদার্থবিদ্যা' আর শিক্ষা বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বিজ্ঞান সম্পর্কিত বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট-এর তত্ত্বাবধানে চার্চ মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক বর্ধমান শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে স্টিওয়ার্ট 'A set of Elementary Bangalee Tables', 'ইতিহাস কথা' বা 'উপদেশ কথা,' 'তমোনাশক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারাচাঁদ দত্ত ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে

'মনোরঞ্জনেতিহাস' (ইংরাজী ও বাংলা সংস্করণ) ও 'বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতি শিক্ষক উপাখ্যান' নামক গ্রন্থ দু'টি ছাত্রদের জন্য রচনা করেন। উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের (জাল প্রতাপচাঁদ ?) জীবদ্দশায় শ্রীখণ্ড নিবাসী অনুপচন্দ্র 'লীলারসপ্রসঙ্গ সঙ্গীত' (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' নামক দেশাত্মবোধক কবিতার রচনাকার কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৩.৫.১৮৮৭) কালনার সন্নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শুরসুন্দরী', 'নীতিকুসুমাঞ্জলি', 'কাঞ্চিকাবেরী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি বহু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা করেন। রঙ্গলালকে ইংরাজী প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলা যায়। মাহাতো-রামচন্দ্রপুর নিবাসী রাজকৃষ্ণ রায় (২১.১০.১৮৪৯-১১ ৩ ১৮৯৪) একাধারে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, তেমনি অপরদিকে তিনি উপন্যাস ও থিয়েটারের নাট্যকার হিসাবে যশস্বী হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ রাজকৃষ্ণ হলেন প্রথম বাঙালী যিনি সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে 'পতিব্রতা', 'তরণীসেন বধ', 'দ্বাদশ গোপাল', 'বামনভিক্ষা', 'লায়লা মজনু', 'আগমনী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গোদা নিবাসী রামচরণ মিত্র (১৮৪৭-১৯২৬) আইন পাশ করে হাইকোর্টে ওকালতি ও অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেগোর ল' প্রফেসর' নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত 'Law of Joint Property' এবং 'Partition in British India' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চাণকের (থানা—মঙ্গলকোট) এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে রায়-বাহাদুর রসময় মিত্র (১৮৫৯-১৯৩১) উনবিংশ শতকের শিক্ষা জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েছিলেন। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হিন্দু স্কুলের অন্যতম পরিচালকরূপে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য রায়বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন। কীর্তন গানে সুকণ্ঠের অধিকারী রসময় 'কৃপাদৃষ্টি', 'রাসরস', 'কণিকা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।

বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তি যে ইংরাজী ভাষায় এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন তার প্রমাণ রেখে গেছেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর সোনাপলাশী গ্রামের এক সুবর্ণ বণিককুলে তাঁর জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররূপে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ব্যতীত সমকালীন বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় বিবিধ প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হত। 'Folk Tales of Bengal' এবং 'Govind Samanta' or The History of a Bengal Raiyat (যার নবতম সংস্করণের নাম 'Bengal Peasant Life') তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। লালবিহারীর সংকলিত 'Recollection of Alexander

Duff' (1883) গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বর্ধমানের এই সুসন্তান ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিগত শতকের শেষভাগে বঙ্গভাষাভাষী সকলের ঘরে ঘরে সুবৃহৎ উপন্যাস 'শ্রীশ্রী-রাজলক্ষ্মী' স্থান পেয়েছিল। ইন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য ও সুহৃদ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০.১২.১৮৫৪-১৮ ৮.১৯০৫) মেমারী থানার ইলসরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'কালাচাঁদ', 'মডেল ভগিনী', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', 'বাঙালীচরিত', 'চিনিবাস চরিতামৃত,' 'কৌতুককলা', 'নেড়া হরিদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আত্মীয়তা সূত্রে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমসাময়িক 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫ ৭.১৮৫৩-২৮ ৮.১৯২২) মেমারী থানার বড়ারগ্রামে (বর্ধমান শহর হতে ১৬ কিলো মিটার পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার নসিপুর হতে প্রকাশিত 'বিনোদিনী পত্রিকা'য় 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল। পেশায় কীর্নাহারের ডাক্তার হলেও 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা,' 'দ্রৌপদী নিগ্রহ', 'আর্য সঙ্গীত', 'সিন্ধুদূত' ইত্যাদি সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বাংলার সাহিত্য জগতে পাঁচুঠাকুর ওরফে পঞ্চানন্দের তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হুল নিক্ষেপের ফলে সকলেই সন্ত্রস্ত থাকত। বাংলার জীবন ও সাহিত্যাকাশে পঞ্চানন্দ ছিলেন 'হ্যালীর ধূমকেতু।' পঞ্চানন্দের প্রকৃত নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৭৭১ শকাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ পৈত্রিক বাসস্থান গঙ্গাটিকুরীর ৬ কিলো মিটার পশ্চিমে পাণ্ডুগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের আদিনিবাস ছিল গাঁফুলিয়াগ্রামে। ওকালতি পাশ করে কিছুকাল আইন ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। সে যুগে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ী মেলা ভার ছিল। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্', 'ভারত উদ্ধার', 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম', 'হাতে হাতে ফল', 'জাতিভেদ', 'খাজনার আইন', 'পাঁচুঠাকুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষভাগে বহুকাল ধরে বর্ধমান শহরে বসবাস করতেন। ইন্দ্রনাথের রচনাবলী পাঠ করলে আজও মনে হয় যে, উকিল ইন্দ্রনাথ জীবিত নাই, কিন্তু 'পঞ্চানন্দ' মরে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একবার মন্তব্য করেছিলেন, "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য আকাশে Holley's Comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশদিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে কাহার কোন অন্ধকার কোন্‌টি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আর দেশসুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও একসময়ে তাঁকে বলেছিলেন "ইন্দির তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্ নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠতে পারি নে।' কিছুদিন পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'নষ্টে মূতে' ও 'বোধদয়'-এর

এমন অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল, তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূধর চট্টোপাধ্যায় মারফৎ আশীর্বাদ প্রেরণ করায় ইন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'এতদিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল।'

মাজিদা নিবাসী বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র কর্মসূত্রে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি ও অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসে চাকুরী করলেও তিনি সমকালীন অর্থনীতি সম্পর্কে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে 'অপচয়' ও 'উন্নতি' প্রকাশ করেন। খাঁড়গ্রামের ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১-১৩০৯), চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম নাটক 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' রচনা করেন। এছাড়া অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁর রচিত ১৩খানি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। কলিকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবার মেমারীর দক্ষিণে আঝাপুর গ্রামে বসবাস করতেন এবং ভাগ্যান্বেষণে তাঁদের পূর্বপুরুষ আঝাপুর হতে কলিকাতায় আসেন। সেদিক হতে বিচার করলে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮-৩০.১১.১৯০৯) ও তরু দত্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল বর্ধমানে। স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের সিবিলিয়নের পরিচয় অপেক্ষা বড় পরিচয় হল সুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে। স্বল্পায়ু তরু দত্ত (৪.৩.১৮৫৬-৩০.৮.১৮৭৭) খ্রীস্টধর্মাবলম্বী হয়ে প্রবাসে বসবাস করলেও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'Ancient Ballads and Legends of Hindusthan'** গ্রন্থ (১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) রচনা করে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর **'Jogadya Uma'** নামক কবিতাটি ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর শঙ্খপরিধান উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। সম্ভবতঃ রমেশচন্দ্র দত্তের (বর্ধমানের জেলাশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন) নিকট লৌকিক কাহিনী শুনে গভীর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে তিনি উপসংহারে শোনালেন,—

"Absurd may be The tale I tell
I'll not suited to the marching times,
I loved the lips from which it fell
So let it stand among my rhymes."

বর্ধমানের অপর এক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বকীয় ছন্দে মাতৃভাষায় 'যোগাদ্যা'র কাব্যানুবাদের এই অংশটি তুলে ধরলেন—

'কাহিনী এ মোর অদ্ভুত অতিশয়, / মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময় / তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে।'

বর্ধমান শহরের সন্নিকটে বড়শূল নিবাসী তারাচরণ দাস ভারতচন্দ্রের অনুকরণে ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে রচনা করেন 'মন্মথ কাব্য'। দেবীপুর স্টেশনের সন্নিকটে আলিপুর গ্রামে বাংলা ১২১২ সালে শ্যামাপূজার দিন জন্মগ্রহণ করেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। দেবীপুর গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট সংস্কৃত শিক্ষাকালে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ তিনি সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় চারশ'। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে উপলতি গ্রামের

(থানা—কালনা) মন্মথ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ) বহু শ্যামাসংগীত রচনা করেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। বৈষ্ণবকবি বলরামের বংশধর শ্রীশচন্দ্র (১৮৬০-১৯০৮) ন'পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা প্রসন্নকুমার পুঁটিয়া রাজএস্টেটের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল পুঁটিয়াতে। মাতৃস্থানীয়া মহারাণী শরৎকুমারী দেবীর উৎসাহে তাঁর সাহিত্যসেবার পথ সুগম হয়। বঙ্গদর্শনের লেখক হিসাবে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ছিল। ১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ (২য় পর্যায়) বন্ধ হলে শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে পুনঃপ্রকাশ হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদনায় 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫) নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন', 'কৃতজ্ঞতা,' 'বিশ্বনাথ', 'রাজ-তপস্বিনী'(অসম্পূর্ণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বালক, সাধনা, ভারতী ও বঙ্গদর্শনের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কে অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন,—'পল্লীবাসীর জীবন্ত প্রকৃতি মানুষ, শিশুচরিত্রের বাহুল্য এবং শিশুমনের প্রতি লেখকের আগ্রহ, ঘটনার আকস্মিকতা ও বর্ণনার বাহুল্য শ্রীশচন্দ্রের রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।'

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মভূমি দামুন্যাগ্রামে বৈদ্যবংশীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পরে তিনি হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়াগ্রামে বসবাস করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং 'চিকিৎসাতত্ত্ব বারিধি', 'চিকিৎসা কল্পলতিকা' ইত্যাদি ৬খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে ঐতিহাসিক বিষয়ক প্রবন্ধগুলি আজও অম্লান হয়ে আছে এবং এ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে 'তারকেশ্বর', 'জয়কৃষ্ণ চরিত', 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়' (প্রথমার্ধ), 'বঙ্গে বর্গী হাঙ্গামা' (প্রবন্ধ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরামের জীবনী নিয়ে তিনি প্রথম গবেষণামূলক রচনার পথপ্রদর্শক।

রবির কিরণোজ্জ্বলে সারা বঙ্গদেশ আলোকিত হলে বর্ধমানের সাহিত্যাকাশে ঐ কিরণচ্ছটার কিছুটা বিকশিত হয়েছিল। কবির দেশ বর্ধমানে সেদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ খ্যাতনামা কবিরা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত বৈষ্ণব-সাহিত্য, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ও মহাভারত রচনার জন্য বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডার যে মহামূল্য ধনের দ্বারা ধনভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল, তন্মধ্যে বর্ধমানের অবদানকে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। বিংশ শতকেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিলে বর্ধমানের বেশ কিছু কবি ও সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্য আসরে প্রথম সারিতে স্থানলাভ করেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে কালনা থানার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) জন্ম হয়। তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার হরিহরপুরগ্রামে। কিন্তু তাঁরা মাতুলালয়েই বসবাস করতেন এবং এখনও ঐ বংশের লোকেরা পাতিলপাড়াতেই বসবাস করছেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও গদ্য ও পদ্য রচনাতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী ও মানব হিতৈষী কবিরূপে চিহ্নিত করা হলেও তিনি ছিলেন 'রবীন্দ্র-রাহুমুক্ত আধুনিকতার দুরূহ সম্মানে ভূষিত কবি'। কল্লোলগোষ্ঠীর জনপ্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথের কোন নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্য জীবনের বেশ কিছু অংশ অজানা থেকে গেছে। পত্রপত্রিকায় পদ্য ও গদ্য রচনা ব্যতীত তাঁর 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', অনুপূর্বা', 'মরুছায়া', 'সায়ম' এবং 'ত্রিযামা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর 'নিশান্তিক' নামক কাব্যগ্রন্থখানি ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১২.২ ১৮৮২-২৫ ৬ ১৯২১) পৈত্রিক বাসস্থান পূর্বস্থলীর সন্নিকটে চুপিগ্রামে। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম চিন্তাশীল, তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অক্ষয়কুমার দত্ত সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন। কিন্তু পিতৃ-হারা হওয়ায় তিনি মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া শেখেন। তিনি অল্প বয়সেই রবীন্দ্র-নাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং কবিগুরুর অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন। নানাবিধ ছন্দ-রচনায় ও ছন্দ উদ্ভাবনে সেযুগে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদেও তাঁর অসীম কৃতিত্ব ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সবিতা', 'বেনু ও বীণা', 'তীর্থরেণু', 'কুহু ও কেকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উপন্যাস, অনুবাদ, নাট্য-সংগ্রহ ও শিশুদের কবিতাবলীও উল্লেখযোগ্য।

পল্লীকবি বিশেষণে বিভূষিত কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সারা জীবন ঐ গ্রামেই বসবাস করেছেন। কর্মজীবনে মাথরুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কাটিয়ে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর একান্তে বসে আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃত অর্থে কুমুদরঞ্জন ছিলেন পল্লীকবি। কুমুদরঞ্জনের কাব্যসম্ভার ছিল সরল, সুললিত অথচ ভাবগম্ভীর এবং তিনি ছিলেন রাঢ়ীয় কাব্য গুরুদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। সেই অর্থে কুমুদরঞ্জনকে রাঢ়ের আধুনিককালের মর্মগ্রাহী প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি বলা যায়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে তিনি একজন শক্তিশালী কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'অজয়', 'উজানী', 'বীথি', 'একতারা', 'নূপুর' 'বনমল্লিকা', 'দ্বারাবতী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ৮৮ বৎসর বয়সে বহু সম্পদের অধিকারী হয়ে কুমুদরঞ্জন ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন।

বৈষ্ণব কবি লোচনের বংশধর কবিশেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২২ই জুলাই কড়ুইগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্য-

সমালোচক ও বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ; আবার অন্যরূপে তিনি আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। কালিদাসের রচনায় সহজ সরল ও আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়। কবি ও সমালোচক কালিদাস রায়ের রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', 'শরৎ সাহিত্য', 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য', 'আহরণ ও আহরণী', 'চয়নিকা,' 'ব্রজরেণু', 'বৈকালী', 'বল্লবী' ইত্যাদি। কর্মজীবনে রংপুর জেলার উলিপুরে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এসে ভবানীপুরে মিত্র ইন্স্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর মাসে তিনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রযুগে নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা অবলম্বনে যে সকল কবি কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রগণ্য। চুরুলিয়াবাসী কাজী ফকির আহমদের পুত্র নজরুল ইসলাম ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হয়েও রাজরোষ ও দেশবাসীর সময়োপযোগী সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হয়ে নজরুলকে জীবনের অধিকাংশ সময়ে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়েছিল—'বাঙালী জাতির এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না।' নজরুল কেবলমাত্র 'বিদ্রোহী' বা রুদ্ররসের কবি নন। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে প্রেম, প্রকৃতি, শ্যামাসঙ্গীত ইসলামী গান, গজলগান, সঙ্গীত ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। নজরুলের কবি প্রতিভার কাছে তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির পরিচয় ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁর রচিত ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই কবি ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে আগস্ট ঢাকায় ইহলোক ত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা', 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলি-মালা', 'অগ্নি-বীণা', 'দোলনচাঁপা,' 'সর্বহারা', 'সিন্ধু হিল্লোল', 'হাসির গান' ও 'নজরুল গীতিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। । যদি জীবনের অমূল্য ৩৪টি বছর তাঁকে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকতে না হত তা'হলে নজরুলের রচনাসম্ভার সারা ভারতের মধ্যে এক অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি বলে বিবেচিত হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে এক বিশেষ কালের কবি এ অপবাদ তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না।

কাটোয়ার কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯৮-২৭·১ ১৩৬৬) বাল্যকাল হতেই মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। পোস্টঅফিসের দায়িত্বশীল উচ্চপদে কর্মরত থেকেও তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ ও উপন্যাসগুলি ব্যতীত বাংলায় একখানি কোষগ্রন্থের সংকলন প্রায় সম্পূর্ণ করে গেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের মাতুল ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় নিবাস ছিল উখরাগ্রামে। তাঁর মৃত্যুর পর রচিত কাব্য গ্রন্থ 'জীবনখাতা' প্রকাশিত হয়েছে। পৈত্রিক সূত্রে বর্ধমানের না হয়েও প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মাতুলালয়ে বসবাস হেতু তিনিও এ জেলার আপনজন হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায় মাতুলালয় অণ্ডালে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করতেন। তাঁর মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর মাতুল কবি ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯২২) স্বীয় কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভাগিনেয়কে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করতেন। মাতুলালয়ে বসবাসকালীন সময়ে তিনি 'কয়লাকুঠীর দেশ' রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। খনি শ্রমিকদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে এবং তাদের জীবনের বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করে শৈলজানন্দ বাংলা কথাসাহিত্যের নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'নারীর মন', 'জোহানের বিহা', 'নারীমেধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আঝাপুর নিবাসী কবি কৃষ্ণধন দে অধ্যাপনার (বঙ্গবাসী কলেজ) সঙ্গে সঙ্গে কাব্যগ্রন্থ রচনায় খ্যাতিলাভ করে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে 'ব্যথার পরাগ' ও 'প্রণয় গীতিমালা' ব্যতীত ছোটদের জন্য 'রঘুবংশের গল্প,' 'দশকুমার চরিতের 'গল্প,' 'লিপিরেখা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে অথবা বিংশ শতকের প্রথমদশকে অমরারগড় নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর-কাব্য' নামক এক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ রচনার কোন তারিখ জানা যায় না তবে কাব্যখানি ১৩১৯ সালে জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। নয়টি সর্গে ও উপসংহার অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হলেও কাব্যমূল্য না থাকায় এ গ্রন্থের কোন প্রচার ছিল না বা আজও নাই। কবির পিতামহ কেনারাম সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক ছিলেন।

ইতিহাস ও গণিতচর্চার ক্ষেত্রে এককালে বর্ধমান পিছিয়ে ছিল না। শোনা যায় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভৃগুরামদাস বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর প্রকৃত বাসস্থান নির্ণয় করা যায় নাই। তিনি শুভঙ্কর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁর চরিত গণিতের সূত্রাবলী শুভঙ্করের আর্যা নামে পরিচিত ছিল। শোনা যায় তিনি মল্লরাজ গোপাল সিংহের সময়ে বিষ্ণুপুর রাজের সভাসদ্ ছিলেন এবং শুভঙ্করদাসের পরিকল্পনামত এই রাজ্যে একটি খাল কাটা হয়েছিল। বিদ্যাপতিপুর নিবাসী অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯২৭) ছিলেন সুপণ্ডিত ও ঐতিহাসিক। কর্মজীবনে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্স্টিটিউশন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। ১২৬৭ সালে ২৯শে অগ্রহায়ণ কাটোয়া থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাঁইহাট ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে তিনি লেখাপড়া শেষ করে কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং এই স্থানেই কালীপ্রসন্নের দুই সুযোগ্য ছাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাসচর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। কলিকাতা ট্রেনিং কলেজ ও হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর স্বগ্রামে নিজস্ব

পাঠাগারে অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করেন। সাহিত্য ও নারায়ণ পত্রিকায় তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে যুগে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মধ্যযুগে বাঙলা' ও 'নবাবী আমলের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনি 'ভারতের ইতিহাস' রচনা করেন।

কালীপ্রসন্নের সুযোগ্য ছাত্র রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮১ ঃ মৃত্যু ১৯৬৪) মেমারী থানার আমাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করে রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কর্মজীবন শুরু করেন। রিপন কলেজ ব্যতীত বিশপ কলেজ, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ (ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অধ্যক্ষ), বারানসী, মহীশূর ও লক্ষ্মৌ-এ অধ্যাপনা করেন। জীবনের প্রায় ২৫ বছর কাল লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদরে পঠিত হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,—**'Hindu Civilisation,' 'Fundamental Unity of India,' 'Glimpses of Ancient India', 'Chandragupta Maurya and his times,' 'The University of Nalanda'** ইত্যাদি। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাধাকুমুদের স্বগ্রাম নিবাসী ও জ্ঞাতিভ্রাতা রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৮) বহরমপুর কলেজে শিক্ষা লাভ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিসহ এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তিনি সুদীর্ঘকাল কলিকাতা ও লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 'করেন। ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত অর্থনীতি-বিদরূপে আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে **'The Changing Faces of Bengal'** এবং 'বাংলা ও বাঙালী' সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া তিনি, 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'মনোময় ভারত', 'দরিদ্রের ক্রন্দন,' 'তরুণের ভারত,' 'বিশ্বভারত' (২ খণ্ড) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ জীবনী অভিধান গ্রন্থে রাধাকুমুদ ও রাধাকমলের জন্মস্থান বা পৈত্রিক বাসস্থান বহরমপুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্বস্থলী থানার অধীনস্থ চক ব্রাহ্মণগড়িয়ার অধিবাসী দুর্গাদাস লাহিড়ীর (১৮৫৮-১৯৩২) অক্ষয়কীর্তি হল ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ 'চতুর্বেদ' প্রকাশ। তাঁর সাহিত্যকীর্তির অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হল 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা ; কিন্তু একাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। ৮ খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভাগটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি টেনিসনের 'এনক আর্ডেন' কাব্যগ্রন্থের বাংলা ভাষায় পদ্যানুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁব রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'দ্বাদশনারী', 'নির্বাণজীবন,' 'ভারতে দুর্গোৎসব,' 'বৈষ্ণবপদ লহরী,' 'রামায়ণ,' 'মহাভারত,' 'স্বাধীনতার ইতিহাস,' 'শিখযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ও স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়াশুনা করে জেনেভায় লীগ অব নেশনস্-এর সেক্রেটারিয়েটে সংবাদ বিভাগের সদস্যপদে যোগদান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'Colours of a great city,' 'Rossetti and Contemporary Criticism,' 'Cradle of the Clouds' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষের পিতা বটকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫-৫০) অকালপৌষ গ্রাম জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্স ও জার্মানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকার্য সমাপ্ত করে বৈদিক সাহিত্য ও ভারততত্ত্বের এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (যাদবপুর) অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিতকালে তিনি 'Linguistic Introduction to Sanskrit,' 'Collections of Fragments of lost Brahmanas,' 'Pali Literature and Language,' 'Hindu Law and Custom,' 'Hindu Ideal of life' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আইনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকরূপে চুরপুনীবাসী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৯৪৫-৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রাচীন ভারতের আইন' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রমথনাথ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস শাখার বিশিষ্ট সদস্য প্রমথনাথ মিত্র (১২৫৬-১৩২৩) শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চাণ্ডুলী নিবাসী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীস্বামীর (২৭.৮. ১৮৮০-২২.১০. ১৯৭৩) পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেও শেষজীবনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'Approaches to Truth,' 'Metaphysis of Physics,' Science and Sadhana (6 vols.), 'বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান,' 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কালাজ্বরের প্রতিষেধক ঔষধের আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর (৭ ৬. ১৮৭৫-৬.২. ১৯৪৬) পৈত্রিক নিবাসস্থল ছিল পূর্বস্থলীর নিকট স্বরডাঙ্গাগ্রামে। এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছুকাল পরে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে যুগান্তকারী কালাজ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন', আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির ভাষণে পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে এর উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাষণ দান করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু স্যার ইউ. এন ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর ৪০ বছর পরে বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় কালাজ্বর দেখা দিলে 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' এর খোঁজ পরে এবং কিন্তু ততদিনে এর ফরমূলা কালের অতলতলে তলিয়ে গেছে। নিকটবর্তী চুপী গ্রামের অধিবাসী ও যোগীপ্রবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য শ্যামাদাস বাচস্পতি কবিরাজী চিকিৎসায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্যামা-

দাসের শিষ্য সাতগড়িয়া নিবাসী (নাদনঘাট) কবিরাজ অমলাচরণ সেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁর রচিত 'আরোগ্য মঞ্জরী' গ্রন্থের এককালে বিশেষ খ্যাতি ছিল। কাইতি নিবাসী ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, এম. ডি., এফ. আর. সি. এস. (জন্ম ২৭শে মে ১৮৬৭ : মৃত্যু ৫ই অক্টোবর ১৯৩৪) ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বারোটি পুস্তক ব্যতীত 'মুক্তিপথ' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

পালি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও ভারততত্ত্ববিদরূপে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত (জন্ম ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩ : মৃত্যু ২৭শে নভেম্বর ১৯৭৩) ছিলেন পূর্বস্থলী নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র। পালি ভাষায় এম. এ. পাশ করার পর তিনি রেঙ্গুন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। **'Aspects of Mahajan Buddhism in its relation to Hinajana'** নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপনা হতে অবসর গ্রহণের পর কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে **'Gilgit Manuscript'** নামক বৌদ্ধ 'বিনয়' গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। দেবনাগরী অক্ষরে 'স্ফুটার্থাভিধর্মকোশ ব্যাখ্যা' নামক ৫ খণ্ডে সম্পাদিত কোষগ্রন্থখানি তাঁর অক্ষয় সাহিত্য-কীর্তিরূপে গণ্য হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে **'Buddhist Sects of India,' 'Mahayana Buddhism,' 'Early Manastic Buddhism,' 'Hindu Caste and Sects in Bengal'** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় মহিলাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে যশস্বিনীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ নীরদমোহিনী বসু (জন্ম-২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪ : মৃত্যু ২রা নভেম্বর ১৯৫৪), এ জেলার প্রথম মহিলা যিনি সর্বপ্রথম সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর স্বামী বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর (বেরুগ্রাম, বর্ধমান) প্রযত্নে তিনি ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পারিজাত' 'বামাবোধিনী', 'ছায়া' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া টেনিসনের কয়েকটি আখ্যায়িকা কাব্যের তিনি পদ্যানুবাদ করে প্রকাশ করেন। বর্ধমান শহরের কুঞ্জবিহারী নন্দীর কন্যা শৈলবালা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ কক্সবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। বাংলা ১৩২১ সালে মেমারীর নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৩৩৬ সালে তাঁর স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ যুগে পল্লীগ্রামের কোন বিধবা বধূর পক্ষে সাহিত্য-চর্চা ছিল সামাজিক অপরাধ। এতৎসত্ত্বেও তিনি নিয়মিত প্রবাসী পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হত। 'নমিত', 'জন্ম অপরাধী' 'ইমানদার', 'গঙ্গাজল' 'জয়পতাকা' ইত্যাদি প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দরামের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি 'সরস্বতী' উপাধি পেয়েছিলেন। শেষজীবনে তিনি

কিছুকাল স্বামী অসীমানন্দের সরস্বতীআশ্রমে বসবাস করেন এবং প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে আসানসোলে বসবাসকালীন সময়ে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর এই নির্ভীক মহিলা কথা সাহিত্যিক ইহলোক ত্যাগ করেন। আজ শৈলবালা নেই, কিন্তু তাঁর স্ত্রী-জাতির প্রতি আহ্বান আজও নশ্বর হয়ে আছে,—'সাহিত্যচর্চাটা সে যুগে ছিল মেয়েদের পক্ষে সমাজদ্রোহিতা, অপরাধ।...আজ সে দিন চলে গেছে।...সমগ্র দেশ নূতন চেতনায় জেগে উঠুক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধ ব্যক্তিত্বের আলোয় সমগ্র দেশ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক।'

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং সেদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'বর্ধমান কবির দেশ ; প্রায় ৫০০ বছর ধরে বর্ধমানের কবিরা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে আসছে। এ যুগেও কুমুদ দা' আছেন, নজরুল আছেন, আমি আছি। কিন্তু উপন্যাসের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য —কেবলমাত্র রমাপদই আশা ভরসা।' একথা আজ আমরা যেরূপ অনুভব করছি, প্রায় বিশ বছর পূর্বে কবি ও সমালোচক কবিশেখরও একই বিষয়ে অভাব অনুভব করে-ছিলেন। এযুগে একমাত্র রমাপদ চৌধুরীর লেখনী বর্ধমানের কথাসাহিত্যকে সচল করে রেখেছে। পলসোনা নিবাসী রমাপদ চৌধুরী (জন্ম ডিসেম্বর ১৯২২) 'এখনই' উপন্যাসখানির জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছেন। এছাড়া ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'আনন্দ পুরস্কার' এবং 'বাড়ী বদলে যায়' উপন্যাসখানির জন্যে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি লাভ করেন 'অকাদেমী পুরস্কার'। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল,—'প্রথম প্রহর', 'লালবাঈ', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ', 'এই পৃথিবী পান্থ-নিবাস', 'হৃদয়', 'দুটি চোখ দুটি মন' কেবলমাত্র পাঠকেই আনন্দ দেয় নাই, বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় তিনি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

এযুগে বর্ধমানের প্রবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রেই মনে পড়ে কুমুদরঞ্জনের ভাবশিষ্য প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা। এছাড়া গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, নারায়ণচৌধুরী, ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী, পঞ্চানন মণ্ডল, অধ্যাপক ডঃ আবদুস সামাদ, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, মহম্মদ আয়ুব হোসেন, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, সঞ্জীব কুমার বসু, অজিত ভট্টাচার্য, বারিদবরণ ঘোষ, সমীরণ চৌধুরী, বিদ্যানন্দ চৌধুরী, কবিতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধকারগণের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'হিন্দুদের দেবদেবী' (৩ খণ্ড) একটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং বর্তমানে তিনি সুবিশাল 'সাহিত্যিক জীবনী অভিধান' রচনায় ব্যাপৃত আছেন, যার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনাকারগণের মধ্যে হরেকৃষ্ণ কোঙার, ফকিরচন্দ্র রায় ও সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়-এর নাম একালে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ফকিরচন্দ্র রায়-এর (নিবাস সাকো) 'স্বাধীনতা

আন্দোলনের পটভূমিকার' গ্রন্থখানির প্রথমভাগ প্রকাশিত হলেও অবশিষ্টাংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং এর সম্ভাবনাও যথেষ্ট ক্ষীণ। সরোজ মুখোপাধ্যায়ের (এড়াল-বাহাদুরপুর) রচিত 'আমার আমি' (২ খণ্ড) সমকালীন একখানি উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক বিষয়ক গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায়। কৃষক আন্দোলনের নেতারূপে হরেকৃষ্ণ কোঙারের নাম সারা ভারতে পরিচিত। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্ট রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পরে তাঁরা মেমারী থানার দক্ষিণ রাধাকান্তপুরে বসবাসের নিমিত্ত চলে আসেন এবং এইখানেই তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। আজীবন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং কৃষক ও কৃষির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে। 'ভারতের কৃষি সমস্যা', 'নির্বাচিত রচনা সংকলন' 'Agrarian Problem of India' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ফুটে উঠেছে। হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিধান সভার সদস্য ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ওয়াড়ির বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮-৬৫), মেড়াল গ্রামের নলিনচন্দ্র দত্ত (১৮৯৩-১৯৬৪) ও চান্নাগ্রামের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নিরালম্ব স্বামী (১৮৭৭-১৯৩০) প্রমুখ মনীষীগণের রাজনৈতিক বিষয় রচনা ছিল বলে জানা যায়; কিন্তু মহাকালের গ্রাস হতে সেগুলিকে রক্ষা করা হয় নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে মণ্ডলগ্রাম নিবাসী ডঃ সোমেশ্বর রায়চৌধুরী (জন্ম ২৪শে পৌষ ১৩০৩ সাল : মৃত্যু ২৩শে নভেম্বর ১৯৪৯) পেশায় চিকিৎসক হয়েও রাজসাহী ও নদীয়া জেলার নীলাকরদের (২য় পর্যায়) বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কারাবরণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর রচিত 'নীলকর বিদ্রোহ' গ্রন্থখানিকে উৎকৃষ্ট রচনা বলে গণ্য করা যায়।

বর্তমানকালে পাতিলপাড়ার অপর এক কবি ও সুপণ্ডিত ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (১২৯৯-১৩৯৩) জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে "তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক কৃত্রিম মনগড়াকে 'অস্পৃশ্য' অভিধায় চিহ্নিত" করে সমাজকে তীব্র ভাষায় কশাঘাত করলেন। তাঁর কাব্য চিন্তার প্রথম ফসল 'মন্দিরের চাবি' (১৯৩১) প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজায়াপ্ত হয়। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'সপ্তপদী' 'সাঁঝের প্রদীপ' সহ বহু প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। পতিলপাড়া হতে কবি উখরায় (থানা—অণ্ডাল) কিছুকাল বসবাস করার পর কলিকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন এবং ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি 'কলিকাতা সাহিত্যিকা' ও 'বর্ধমান সম্মিলনী'র প্রকৃত অর্থে অভিভাবক ছিলেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আসরে সব্যসাচীর সম্মান লাভ করেছেন গোতানের অধিবাসী ডঃ সুকুমার সেন। বর্তমানকালে জীবিত সাহিত্যিক, সমালোচক ও

ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে সুকুমার সেন যে শ্রেষ্ঠস্থান অলংকৃত করে আছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে আচার্য সুনীতিকুমারের যোগ্য-শিষ্য সুকুমার আজ প্রবাদপুরুষ। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা এত বিশাল যে, এক নিঃশ্বাসে এগুলি বলা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাহিত্যে সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি এবং যেখানেই তিনি প্রবেশ করেছেন সেখানেই স্বীয় মেধার বলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৯০ বছর বয়সে বর্ধমানের গৌরব সুকুমার সেনকে কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল তারিখে একপত্রে জানিয়েছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়িনি।...এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা-দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছে।" তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪ খণ্ড), 'ভাষার ইতিবৃত্ত' 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস', 'চর্যাগীতি পদাবলী', 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী,' 'মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী,' 'বঙ্গভূমিকা,' 'ইসলামী সাহিত্য,' 'বিচিত্র সাহিত্য', 'Women's Dialect in Bengal,' 'A History of Brajabuli Literature, 'Old Persian Inscription of the Achaemenian Emperors,' 'Comparative Grammer of Middle Indo-Aryan,' 'An Etymological Dictionary of Bengal' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,— বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়,' শ্রীকবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল,' রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল,' 'সেখশুভোদয়' প্রভৃতি। আজীবন সাহিত্যসেবী সুকুমারের সৃজনী প্রতিভা আজও স্তব্ধ হয়ে যায় নাই। একজন খাঁটি বাঙালী হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও স্যার আশুতোষকে আদর্শপুরুষ বলে মনে করেন। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যদেব হলে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী,' আর বিদ্যাসাগর হলেন 'খাঁটি বাঙালী'। বর্ধমানের মানুষ সুকুমার হলেন 'বর্ধমানের গর্ব"।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি থাকলেও রামচন্দ্রপুর নিবাসী ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (অধুনা উত্তরপাড়াবাসী) বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল,' (১৯৫৮), 'মধুসূদন সাহিত্য পরিক্রমা' (১৯৬৫), 'রামপ্রসাদ জীবনী ও রচনা' (১৯৭৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি 'ত্রৈলোক্য রচনা সম্ভার' (১ম ও ২য়) গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। অতি সাম্প্রতিক-কালে বর্ধমানবাসী ডঃ আবদুস সামাদ তাঁর গবেষণামূলক 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য'* নামক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে একটা বিশেষ সময়ের সাহিত্যচর্চাকে তুলে ধরেছেন। বর্ধমানের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল যে,

বর্ধমানের প্রাক্তন জেলাশাসক স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়ার 'Practical English Sanskrit Dictionary' গ্রন্থখানি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান হতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্যে এ খবর জানা যায়।

সাহিত্যচর্চায় বর্ধমান রাজবংশের দু'জন কৃতিপুরুষের মধ্যে মহতাব্ চাঁদ ও বিজয় চাঁদের সাহিত্যকীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয় চাঁদের সাহিত্যচর্চার কথা পূর্বেই (পৃষ্ঠা ২০৪) বলা হয়েছে। বিষয়কর্মের মধ্যে লিপ্ত থেকেও সময়ের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মহতাব্ চাঁদের সাহিত্যানুরাগের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দেওয়ান রঘুনাথ ও কমলাকান্তের উত্তরসূরী মহতাব্ চাঁদের শ্যামাসঙ্গীতগুলির যথেষ্ট উৎকর্ষতা আছে। মহতাব্ চাঁদ—'চন্দ্র' ভণিতাযুক্ত একটি শাক্ত পদে 'জগজ্জননীর রূপ' বর্ণনা করলেন,—

'একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—/ কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ?
জিনিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ, / বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার / মুক্তমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥
জপমালা এক করে জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে, / দ্বিকরে অভয় করে, করেন ধারণ ॥
সহচন্দ্র কান্তমণি, মুকুট শিরোধারিণী, / হে ভৈরবী ত্রিনয়নি, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ।'

একালেও বর্ধমানে সাহিত্যচর্চার গতি রুদ্ধ হয়ে যায় নাই। তবে বিরাট জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন তাঁদের সাহিত্য কীর্তির পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে। বহু প্রতিভাবান গবেষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল গবেষণামূলক কাজ করেছেন, প্রচারের অভাবে এগুলি দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে কয়েকজনে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। চৈতন্যপুর নিবাসী রণজিৎ রায়চৌধুরী আজীবন সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। তাঁর রচিত 'অধিবাস' (১৩৪৯), 'আল্পনা' (১৩৫৮), 'পঞ্চপ্রদীপ' (১৩৬০) ও 'নিবেদন' (১৩৬৭) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলির যথেষ্ট সমাদর ছিল। কসা নিবাসী নিত্যগোপাল সামন্ত (১৯২৯) কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে 'মহুয়া বনের মেয়ে' 'ললিতা কবিতা মেয়ে' নামক দু'খানি উপন্যাস ও 'শুকনো বকুল' নামে একটি কবিতার বই রচনা করেছেন। শীতলগ্রামবাসী সুনীল চৌধুরী ও হলধরপুর নিবাসী ভৈরব গাঙ্গুলী বহু যাত্রা-পালা রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের রচিত যাত্রাপালাগুলি কলিকাতার বড় বড় অপেরায় অভিনীত হয়। অধুনা উত্তরপাড়াবাসী হলেও মন্তেশ্বর থানার বাগাসন গ্রামের 'ইন্দুদা' ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনাটিকে বহমান রেখেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে 'বড়বাজার', 'শকুনসৈনিক,' 'বেড়াদার' এবং কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'সুষমা,' 'অবরুদ্ধ অভিমানে', 'বকুলকোরক,' 'অন্যঅনুভব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পথ বেছে নিয়ে ক্ষীরগ্রামবাসী সঞ্জীব কুমার বন্ধু বাণীবন্দনাকে আদর্শ বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'শিখার কালি মধুময়,' 'আকাশ ও মাটি,' 'পোড়ো জমি' ও 'এ পৃথিবী আরো কিছু অনন্য হৃদয়' প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত কাব্যের উৎকর্ষতার জন্য কবিশেখর কালিদাস রায় ও কবি অজিত দত্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এছাড়া সমাজ ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত 'উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি' হল একটি বিতর্কমূলক রচনা।

বর্ধমানের সাহিত্যের ইতিহাস এত বিশাল ও ব্যাপক যে, এই স্বল্প পরিসরে বিষয়টির উপর সম্যক আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই। সুদীর্ঘ পাঁচশ' বছরের সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে কেবলমাত্র রচনাকার ও রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করা সম্ভবপর হয়েছে; যদিও এ সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। সাধারণ-ভাবে সত্তরের দশক পর্যন্ত রচনাগুলি আলোচনায় স্থানলাভ করেছে। এ যুগের বর্ধমান জেলার সাহিত্যসেবীগণের সর্ববিধ পরিচয় না জানার জন্য বিষয়টিকে সমকালীন করে তোলা যায় নাই। তবে 'ইতিহাস' ও 'সাহিত্যের ইতিহাস'কে যত নিরাপদ দূরত্বে পরিত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল।'

সাহিত্যসভা :

কেবলমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেই বর্ধমানের অবদান সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সাহিত্যচর্চা ও আলোচনার ক্ষেত্রেও বর্ধমান পিছিয়ে ছিল না। মহারাজা মহতাব্ চাঁদ এবং মহারাজা স্যার বিজয় চাঁদের আমলে সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যালোচনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আজ পর্যন্ত বর্ধমানে তিনবার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা ১৩২০ সালের ২০শে, ২১শে ও ২২শে চৈত্র 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান শহরে। কলিকাতা ব্যতীত এত বৃহৎ সভা আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কার্যকরী সমিতির পক্ষ হতে যে সুবৃহৎ স্মারক—গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে ঐ মহতী সভার কথা স্মরণে আসে। এরপর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ১৩৬৮ সালের ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক পঞ্চানন্দ ওরফে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এবং তাঁর সুযোগ্য বংশধর শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এই সভার মূল সভাপতির পদ অলংকৃত করে ছিলেন সুধীর-রঞ্জন দাস ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অতুল্য ঘোষ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে এল. শ্রীমালী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সরোজ রায়চৌধুরী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহার-রঞ্জন রায়, মন্মথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, অখিল নিয়োগী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের সাহিত্যকীর্তির জন্য বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। তৃতীয়বার বর্ধমান শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৮০ সালের ৩০শে ও ৩১শে চৈত্র। মূল সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেন আশাপূর্ণা দেবী। এছাড়া ডঃ

আশুতোষ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), দেবনারায়ণ গুপ্ত ও হরপ্রসাদ মিত্র বিভিন্ন শাখার কার্য পরিচালনা করেন।

তিনটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনটি ছিল ঐতিহাসিক সম্মেলন। সেকারণে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু' এক কথা বলার প্রয়োজন আছে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর (পৈতৃক-নিবাস মাথরুণ) অনুপ্রেরণায় এবং মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের উৎসাহ ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সম্মেলন। সভার মূল-সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যতীত বর্ধমান শহরে সেদিন বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জের যে সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে যদুনাথ সরকার (ইতিহাস শাখার সভাপতি), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (দর্শন শাখার সভাপতি), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (বিজ্ঞান শাখার সভাপতি), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, ননীগোপাল মজুমদার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সী রওসন আলী চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তাফি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কুমার মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গুণালঙ্কার মহাস্থবির, জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রাজা বনবিহারী কাপুর, নলিনাক্ষ বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, জলধর সেন প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি বিজয়চাঁদ মহতাব্ সভার মূল-সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে যে ভাষায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে,—"যে কারণেই হউক বর্ধমানে শিবমন্দির কিছু বেশী—এক স্থানেই তো ১০৮টি শিবমন্দির বর্তমান—বর্ধমান শিবেরই মন্দির·। শিবনাম সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও বুঝি সেইজন্য বর্ধমানের প্রতি এত আকর্ষণ এবং বোধহয় সেই কারণেই হরের প্রসাদ স্বরূপ স্বয়ং হরপ্রসাদ আজ এখানে অধিষ্ঠিত। শিবই যতিরাজ—তাই আজ স্বয়ং যতীন্দ্র (কলিকাতা নিবাসী যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী) বর্ধমানে, আর ব্যোমকেশ তো বহুদিন হইতেই স্নেহবশে বর্ধমানে যাতায়াত করিতেছেন।"—উপসংহারে সেদিন তাঁর কণ্ঠের সেই উদাত্ত বাণী ও ব্যবহারে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিজয়চাঁদের বক্তব্যের উত্তরে মূল-সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজের এবং সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন—"আমাদের সম্মিলন কতকটা রামলীলার মত। সেও তিনদিনের ব্যাপার, এও তাই। সেখানকার রামকে কেবল তিনদিন বসিয়াই থাকিতে হয়, এখানকার সভাপতিকেও তাই করিতে হয়। এখন বাঁচিলাম, এইবার আসুন, সকলে আনন্দ করিয়া স্বরূপে ঘরে ফিরিয়া যাই।"

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যসভায় সেদিনের বর্ধমানের নবীন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর ভাষায় পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করে নব্যবঙ্গের বিদ্বজ্জনদের উদাত্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন তাঁর 'আবাহন',—

"কাশীরাম যেথা গাহিল প্রথম পীযূষ বাহিনী গাথা,
শ্রীকৃষ্ণদাস রচিল মধুর চরিতামৃত কথা,
প্লাবিত যে দেশ পতিত পাবন গোরার প্রেমের বানে,
যেখানে কোমল কমলাকান্ত মগ্ন আছিল ধ্যানে,
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত-পূজ্য অতিথি-বেশে ;
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', 'লোচনানন্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।
গঙ্গা-অজয়-সীকরসিক্ত যেথাকার বায়ু সতত বহে,
যেথাকার সাধু 'কমলে কামিনী' হেরে ভীম কালিদহে,
পথে-ঘাটে বাউল এবং 'কণ্ঠের' মধুরগীতে
ভকতি-উৎসব বহাইয়া দেয় নিতি নর-নারী-চিতে ;
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত পূজ্য অতিথি-বেশে ;
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', 'লোচনানন্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।
দাশরথি যেথা তুফান তুলিল মধুর পাঁচালী গানে,
মাঠের রাখালো যাহার গানের মধুরতাটুকু জানে,
ইন্দ্রনাথের শুভ্র-হাস্যে হাসিল যেথায় বাণী
আনন্দ-ধারা পঞ্চানন্দ যেথায় জোটাল আনি।
এই সেই দেশ, এস হে ভক্ত, পূজ্য অতিথি-বেশে,
'মুকুন্দ', 'জ্ঞান', 'লোচনান্দ', 'বৃন্দাবনের' দেশে।

অগ্রজ কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৈষ্ণবকবি লোচনের বংশধর কালিদাস রায় সুরের ঝঙ্কারে বাংলার জ্ঞান-তপস্বীদের জানিয়েছিলেন তাঁর আন্তরিক 'অভিনন্দন,'—

(১)

এস সুধীগণ, মানস মোহন, এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।
হেথা কাশীরাম অমৃত-সমান প্রচারিল মহাভারত মন্ত্র,
বাঙালী জাতির একাধারে বেদ-সংহিতা-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র।
হেথা মহামতি কবি দাশরথি নবীন গীতার সরল ছন্দে
শাক্ত-বিষ্ণু-উপাসক দলে বাঁধিল মধুর মিলন-বন্ধে।

(২)

বঙ্গবাণীর দারু-তরীখানি সোনা করি ছিল ভারতচন্দ্র,
কবিকঙ্কণ জানিয়া তুলিল চণ্ডীর গানে মধুর মন্ত্র ;
হেথা রঘুনাথ পিয়িত না বারি শ্যামাসঙ্গীত না রচি নিত্য,
হেথা শ্রীধর্মমঙ্গল—গানে দিল ঘনরাম পরম বিত্ত।
এস সুধিগণ, মানস-মোহন, এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

(৩)

প্রেমের গোঁসাই-ঠাকুর নিমাই লভিল এখানে বিরাগ-দীক্ষা,
লোচন এখানে লোচনের নীরে করে পথে পথে প্রেমের ভিক্ষা,
কবিরাজ আর দাস-গোবিন্দ রসের পাথারে ডুবাল বঙ্গে,
দাস নরহরি সব পরিহরি, হরি-কীর্তনে নাচিল রঙ্গে।
এস সুধিগণ, মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

(৪)

সাধক-ভক্ত কমলাকান্ত দিল মার পায়ে জবার মাল্য
উদ্ধারণের উদ্ধার-পীঠ গঙ্গা সলিলে অমৃত ঢালল।
সাধু-দরবেশ কোটী বাউলের পদধূলি হেথা করিল সখ্য,
নরপতি হেথা, বিত্তের মাঝে ছাড়েনি নিত্য ধ্রুব সে লক্ষ্য।
এস সুধিগণ মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

(৫)

ছিল একদিন দেবীর চরণে ঝরিত হেথায় রতন-চূর্ণ,
মাঠভরা মণি গোলাভরা সোনা পয়স্বিণীতে গোগৃহ পূর্ণ,
রোগে-শোকে আজি দৈন্যের দাহে দহে রাক্ষসী জীবন-হন্ত্রী,
উর্ণনাভের জালে ভরা তবু বুক হতে আজো ছাড়েনি তন্ত্রী॥
এস সুধিগণ মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

(৬)

এস হে মনীষি কবি জ্ঞানী ঋষি! ও কর-পরশে জাগায়ে সুপ্তে,
বাঁচায়ে আবার বাহার-মন্ত্রে ভস্ম গুপ্তে নিহিত লুপ্তে।
আজিকে কাঙ্গাল বিদুরের গৃহে লভি আতিথ্য নীবার-মুষ্টি,
ভক্ত, বিরাগী, ভিখারীর দেশে লভিতে হইলে পরমা তুষ্টি।
এস সুধিগণ, মানস মোহন এসো বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা ঃ

ইসলাম, কাজি নজরুল—রচনাবলী (৩ খণ্ড), কলিকাতা।

কবিরাজ, কৃষ্ণদাস—চৈতন্যচরিতামৃত (সাহিত্য অকাদেমী সং), নূতনদিল্লী, ১৯৭৭।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গল, কলিকাতা, ১৩৮৪।

চক্রবর্তী, ঘনরাম— শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

চক্রবর্তী, নরহরি —শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, কলিকাতা, ১৯৮৭।

চক্রবর্তী, হরিপদ —দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৬৭।

চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাদেমী সং), নূতনদিল্লী, ১৩৯২।

জয়ানন্দ— চৈতন্যমঙ্গল (এশিয়াটিক সোসাইটি সং), কলিকাতা, ১৯৭১।

ঠাকুর, গৌরগুনানন্দ —শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, শ্রীখণ্ড, ১৩৬১।

দত্ত, গোপেশচন্দ্র —কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৬।

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ—রচনাবলী (৩ খণ্ড), কলিকাতা।

দাস, বৃন্দাবন—চৈতন্যভাগবত (সাহিত্য অকাদেমী সং), নূতনদিল্লী, ১৩৮৮।

দাস, রামগোপাল—রসকল্পবল্লী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

দাস, লোচনানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৭৯।

দাস, হরিদাস—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, ৪৬৫ গৌরাঙ্গ অব্দ।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—ভারতের শাক্ত সাহিত্য ও শক্তি সাধনা, কলিকাতা, ১৩৭২।

ন্যায়রত্ন, রামগতি —বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, ১৯৯১।

পরশুরাম, দ্বিজ—কৃষ্ণমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪।

পরশুরাম—মাধব সঙ্গীত, বিশ্বভারতী, ১৩৭১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৩৮৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ - রচনাবলী (৩ খণ্ড), কলিকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ—রাজসভার কবি ও কাব্য, কলিকাতা, ১৯৮৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ—সাহিত্যসাধক চরিতমালা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস।

বসু, নগেন্দ্রনাথ—বিশ্বকোষ, (প্রয়োজনীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ—মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫।

ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র—বাঙালীর স্বারস্বত অবদান (১ম খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৫৮।

মজুমদার, বিমানবিহারী—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র—মধ্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতামালা), ১৯৬৬।
মণ্ডল, পঞ্চানন—পুঁথি পরিচয়, বিশ্বভারতী, (৪ খণ্ড)।—যাদুনাথের ধর্ম্মপুরাণ, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮।—পুঁথিপত্রে সমাজচিত্র, বিশ্বভারতী।
মল্লিক, রমেন্দ্রনাথ— কবি কুমুদরঞ্জন স্মরণিকা, কলিকাতা, ১৩৭৯।
মিশ্র, কবিচন্দ্র মুকুন্দ—বাশুলীমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৪।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার—রবীন্দ্র জীবন কথা, বিশ্বভারতী।
মুখোপাধ্যায়, সুখময়—প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, কলিকাতা, ১৯৮৭।
—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, কলিকাতা, ১৯৭৪।
—সুলতানী আমলে দু'শ বছর, কলিকাতা, ১৯৮৮।
মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন—বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১।
রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর—শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ, কলি. বিশ্ব. ১৯৫৭।
রায়শেখর—পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫।
সান্যাল, হিতেশরঞ্জন—বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯।
সেন, দীনেশচন্দ্র—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৮৬।
সেন, সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৮৩।—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪ খণ্ড) কলিকাতা।
সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র— সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬।

ইংরাজী ঃ

Chatterjee, Suniti Kr.—*The Origin and Development of Bengali Language*, Vol. I, Calcutta, 1985.
Pal, Praphulla Chandra—*A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society*, 1951.
Shastri, M. M. Hara Prasad—*Do*, Ed. J. N. Gupta, 1941.

বিশেষ প্রবন্ধ ঃ

১। বাংলা সাহিত্যে বর্ধমান—কালিদাস রায়, বর্ধমান পরিচিতি, ১৯৫৪।
২। বর্ধমান —ঐ বর্ধমান সম্মিলনী, কলিকাতা, ১৩৬৪।
৩। রাঢ়দেশের পটভূমিকায় কুমুদরঞ্জন—সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৭৪।
৪। বর্ধমানের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য—কাননবিহারী গোস্বামী, বর্ধমান সম্মিলনী, ১৩৬৪।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ধমান—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৭৪।
৬। বর্ধমানের সংস্কৃতচর্চা— ঐ ঐ ১৯৭৪।
৭। কাশীরাম দাসের বংশ পরিচয় ও কালনির্ণয়—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬।
৮। কাশীরাম দাস—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৮।
৯। কাশীরামের জন্মস্থান—নগেন্দ্রনাথ বসু, সাঃ পঃ পঃ, ১৩১৯।
১০। সত্যপীরের পাঁচালী—অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, সাঃ পঃ পঃ, ১৩১৯।
১১। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর— ঐ সাঃ পঃ পঃ, ১৩২০।
১২। ঠাকুর নবহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর—আনন্দ নাথ রায়, সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৬।

পত্রপত্রিকা ঃ

(ক) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী, ও জন্মভুমি।
(খ) বর্ধমান, বিজয়তোরণ, ভাবনাচিন্তা, প্রফুল্ল, শিক্ষানিকেতন, শিক্ষা সমাচার।
(গ) ক্ষীরগ্রাম শ্রীযোগাদ্যা বানীপীঠ পত্রিকা (প্লাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা)।
(ঘ) অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান, ১৩২১ সাল।

পরিশিষ্ট—১

September 1, 1882
7, Norham Gardens, Oxford,

Dear Sir,—You could not have afforded me more valuable present than your editions of the *Mahabharata* and the *Ramayana* with Bengali translations. I read your Sanskrit prefaces and admire your truely patriotic spirit. It is a misfortune that your countrymen should neglect and even despise their native literature while we here in Europe study and admire it. Of course your youngmen have something to learn from European teachers but this is no reason why they should put away their own national literature. I expect the time will come when every educated native will be as proud of his *Mahabharata* and *Ramayana* as *Germans* are of their *Nibelunge* and Greeks, even modern Greeks, of their *Homer*.

I am particularly glad to see that you do all that you are doing with the help of your own countrymen. That is the right way to go to work. If I can be of help to you of course I shall gladly do all that, at my time of life, I am able to do. Send me the English translation of the *Mahabharata* and I shall see whether it requires much alteration. Much time I have not at my disposal for I have many things which I shall like to do before it is too late. I send you today the beginning of a translation of the *Mahabharata* which I copied 30 years ago and added some notes. I do not remember from where I copied it—perhapes it may be useful—please to return it to me if you want it no longer.

I am glad to see that the Maharaja of Kashmir is one of your patrons. I believe Kashmir is rich in old Sanskrit manuscripts, but I am afraid they will perish unless they are printed. Printing is now the only means of saving your Sanskrit Literature from inevitable destruction. Many books which existed one or two centuries ago are now lost and it will be so with the rest, unless you establish native printing presses and print your old texts. Much can be done by private enterprise as you have shown.

Believe me, yours sincerely—*F. Max Mueller*

স্যার প্রতাপচন্দ্র রায় মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলারকে প্রেরণ করায় তিনি সগ্রন্থ অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ করেন।

পরিশিষ্ট—২

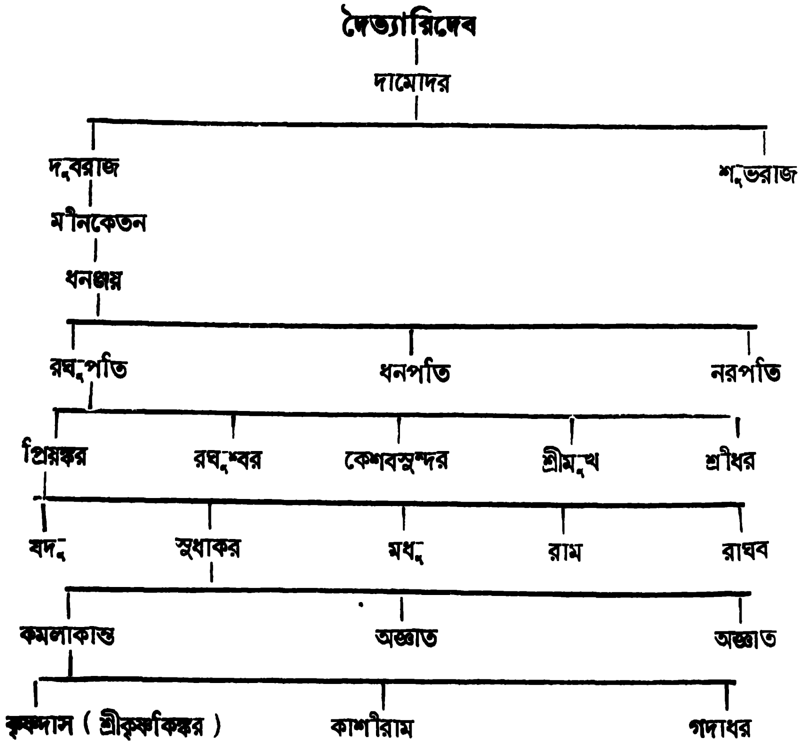
কাশীদাসের বংশ পরিচয়

ভাগিরথি তিরে বাস ইন্দ্রায়নি নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠীত গনি সিঙ্গি গ্রাম
অগ্রদীপ গোপীনাথ বামপদ তলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥
তাহাতে সাণ্ডিল্য গোত্র দেব জে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি ॥
দুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন। দুবরাজ পুত্র হৈল মিন জে কেতন ॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়। তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয় ॥
রঘুপতি ধনপতি নাম নরপতি। রঘুপতি পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠীত মতি ॥
প্রিয়ঙ্কর রঘুশ্বর কেশব সুন্দর। চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল [এ] পঞ্চ উদ্ভব। জদু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব ॥
সুধাকর নন্দন জে এ তিন প্রকার। শ্রীমন্ত কমলাকান্তের এ তিন কোঙর ॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করণ। দ্বিতিয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান ॥
ত্রিতিএ কনেষ্ঠ দিন গদাধর দাস। জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ।
স্কন্দ পুরাণ মত শুনিয়া রচিত্র। কথা ব্রহ্মপুরাণের প্রস্তাব বিচিত্র ॥
না পুজে পুরাণ ইহ সত্যাদি লোকেতে। তেকারণে করিলাম পাঁচালির মতে ॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥
চতুঃসষ্ঠী সকাব্দা সহস্রপঞ্চশত। সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত ॥
নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথে ভজে নিতি ॥
জগন্নাথ সেবা বিনে নাহি জানে আন। রাজ্য তৃণবত হরি কার্য্যে পনণ প্রাণ ॥
অনেক করিল কর্ম প্রিয় জগন্নাথ। দুষ্টজন দমন দুঃখিত জন ত্রান ॥
পুত সম করে সদা প্রজার পালন। জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরণ ॥
রাজ চক্রবর্ত্তি সহি জেন দীল্লীপতি। ধর্ম্মন্যায় তোসন করিল বসুমতি ॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ। মহানুপ্রতাপী হয় বৈরী গায় জস ॥
উৎকলে অনেক গনি নিকট নগর। মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর ॥
বিস এর বাড়ি স্থিতি সেই বরস্থান। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তি পড়িল পুরাণ ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইৎসা হইল মনে। পাচালির মত রচি শ্রীহরিকির্ত্তনে ॥
নাহি সন্ধি জ্ঞান নাহি পড়ি ব্যাকরণ। কেবল মুর্খের মত করিল রচন ॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে। যদি বা অসুদ্ধ হরি প্রসঙ্গ জানিবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদপঙ্কজ অভয়। ভব নারদাদী জাহা মাগয়ে আশ্চয়।
দিনহীন মতি চাহে সেপায় স্মরণ। চন্দ্র পরসিতে জেন মণ্ডুকের মন ॥
সভেমাত্র ভরোশা আছএ এক আর। পতিত পাবন দিনবন্ধু নাম সার ॥
সেই নাম বিনে নাহিক আমার নিস্তার। গদাধর বসিয়াছে ভরসায় তার ॥

রচনা কাল ঃ ১৫৬৪ শকাব্দ = ১০৫০ সাল = ১৬৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দ

পরিশিষ্ট—৩

জেমো পুঁথি (জগতমঙ্গলকাব্য) অবলম্বনে কাশীরাম দাসের বংশ-তালিকা।



মন্তব্য : এক পুরুষে ২৫ বছর ধরলে গদাধরের (১৫৪২ খ্রীস্টাব্দ) ঊর্ধ্বতন ১০ম পুরুষ উত্তররাঢ়ী কায়স্থ দৈত্যারিদেব অন্ততঃপক্ষে (১৫৪২-২৫ × ১০) = ১২৯২ খ্রীস্টাব্দ বা ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে সিঙ্গিগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। গদাধর দাস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীকাশীদাস উক্তি হতে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, 'জগতমঙ্গল' সমাপ্তিকালে তাঁর অগ্রজদ্বয় জীবিত ছিলেন। এই তথ্যের উপর আলোকপাত করে মহাভারতের অসমাপ্ত পর্বগুলির বিষয়ে পুনরায় আলোচনার পথ উন্মুক্ত করা উচিত।

পরিশিষ্ট—৪

দ্বিজ দয়ারামের 'যোগাদ্যা বন্দনা'র পুঁথি

রাঢ়ের মধ্যমণ্ডলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শাক্তপীঠ 'ক্ষীরগ্রাম' ও আরাধ্যা দেবী 'যোগাদ্যা'র খ্যাতি এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। 'কুব্জিকাতন্ত্রে'র রচনাকাল হতে শুরু করে 'প্রাণতোষিণী তন্ত্র' রচনার সময় পর্যন্ত তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'Sakta Pithas' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দেবী যোগাদ্যার পূজা-পদ্ধতি রাঢ়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এযুগেও বিভিন্ন জেলায় অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশটির অধিক গ্রামে যোগাদ্যা পূজার প্রচলন থাকলেও যোগাদ্যা পূজার মূলকেন্দ্র বা উদ্ভবস্থল ক্ষীরগ্রামকে নিয়ে নানা আখ্যান গড়ে উঠেছে। অপর পক্ষে গবেষকের ভাষায় 'Jogadya cult'-এর উদ্ভবস্থল ক্ষীরগ্রামকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল 'দেবী মাহাত্ম্য'।

মধ্যযুগে যোগাদ্যা পূজার জনপ্রিয়তার জন্য এ বিষয়ে বেশ কিছু আখ্যানমূলক গাথা বা বন্দনা রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের গ্রন্থে ৪০টির অধিক 'যোগাদ্যা বন্দনা'র পুঁথির সন্ধান জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সর্বপ্রথম 'যোগাদ্যা বন্দনা' রচনাকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন সুকবি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাস বিক্ষিপ্তভাবে বা অকস্মাৎ যোগাদ্যা বন্দনা রচনা করেন নাই। 'রামায়ণে'র লঙ্কাকাণ্ডে 'মহীরাবণ বধ পালা'য় বর্ণিত আছে যে, মহীরাবণের পূজিতা 'ভদ্রকালী' বা 'যোগাদ্যা'কে মহীরাবণ বধের পর রামচন্দ্রের আদেশে মর্তদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃত্তিবাসের যোগাদ্যা বন্দনার পুঁথিতে রামায়ণের ঐ অংশের পরবর্তী ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। একালেও ২৭শে বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত চার দিন ধরে ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর সম্মুখে রামায়ণ গান গাওয়ার রীতি আছে এবং এই চার দিন দেবীর কোন ভোগ হয় না। মহীরাবণ বধ পালাগানের মাধ্যমে প্রথম দিনের আসর শুরু হয় এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বন্দনা গান গাওয়ার রীতি আজও চলছে। কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বিজ দয়ারাম, দ্বিজ বাঞ্ছারাম, পরমানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি যোগাদ্যা বন্দনা রচনা করেছেন। দ্বিজ বাঞ্ছারামের বন্দনা পরিমার্জিত হয়ে ছাপার আকারে পাওয়া যায়। 'যোগাদ্যা বন্দনা'র অপর এক রচনাকার দ্বিজ দয়ারাম ছিলেন ক্ষীরগ্রামবাসী। অনুজপ্রতিম সনৎকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালা হতে সংগ্রহ করেছেন,—

> 'দ্বিজ দয়ারাম কহে ক্ষীরগ্রামে বাস।
> হরিধ্বনি করিলে হয় পাপের বিনাস॥'

দয়ারাম সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের লোক। অধ্যাপক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সৌজন্যে দয়ারামের পুঁথির অনুলিখিত কপি প্রাপ্তির সুযোগ হয়েছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে শ্রীরামপুরে কেরী লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথিটি কেরীসাহেবের সময়ে অনুলিখিত হয়েছিল। 'যোগাদ্যা বন্দনা' রচনার প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে এর সুসম্পর্ক আছে। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রাবণপুত্র মায়াবী মহীরাবণ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে সম্মোহিত করে পাতালে বন্দী করে রাখেন। বিভীষণের উপদেশে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে পাতাল হতে উদ্ধারের জন্য হনুমান দেবী যোগাদ্যার নিকট গমন করেন। রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ডে) আছে,—

'মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা। প্রীতিবাক্যে কহি গিয়া গূঢ়কিত কথা ॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত। সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দির সহিত ॥
মনোমত বুঝে আসি মহেশজায়ার। রাম বলে, কতক্ষণে আসিবে আবার ॥
মারুতি বলেন, এক তিল ছাড়া নই। কি বলেন কাত্যায়নী কথা দুই কই ॥
এত বলি মারুতি যে হইল বিদায়। মহামায়া মন্দিরেতে অবিলম্বে যায় ॥
মক্ষিরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কানে। মহী বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে। আপনি কি এই আজ্ঞা করেছ মহীরে ॥
সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে ॥
রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস। এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস ॥
মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে। পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে ॥
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ। দেব-দ্বিজ-ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার। রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ॥
মহী-বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান। যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান ॥
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম। প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥
রাম কহিবেন শুন হে মহীরাবণ। দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন ॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে। অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে ॥
হেঁট মুখে পড়ে মহী প্রণাম করিবে। তুমি লয়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে ॥'

মহীরাবণ বধের পর দেবী যোগাদ্যার প্রতি মহারাণীর খেদোক্তি,—

'মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর। ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর ॥
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে। কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে ॥
আচম্বিতে রাজালয়ে পড়িল প্রমাদ। অন্তঃপুরে মহারাণী পাইলা সংবাদ ॥
রাজার মরণ শুনি রাণী জ্বলে কোপে। আলুথালু বেশভুষা অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে। এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে। মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হতে ॥
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর। কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর ॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে। নরবানরের প্রাণ লব শেষকালে ॥'

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে পাতাল হ'তে উদ্ধারের পর লঙ্কাযাত্রার প্রাক্কালে দেবী যোগাদ্যার সঙ্গে হনুমানের কথোপকথন,—

'শত্রুরে মারিয়া যাত্রা কৈল তিনজন। মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর। সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর॥
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার। দেবিরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার॥
হইয়া হরিষ বন্তে চলে তিনজন। আগে রাম পাছে হনু মধ্যেতে লক্ষ্মণ॥
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ। রাম-লক্ষ্মণ পেয়ে সুগ্রীব বিভীষণ॥'

কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত 'যোগাদ্যা বন্দনা'র প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে উপরোক্ত বর্ণনাটি যথেষ্ট মূল্যবান। অনেকে মন্তব্য করেন যে, এটি কৃত্তিবাস ওঝার নামে রচিত পরবর্তী-কালের কোন রচনা। কিন্তু এটি পরবর্তীকালের রচনা হলে এর শেষাংশে কৃত্তিবাসের ভণিতা থাকার কোন কারণ ছিল না। নিম্নে বর্ণিত কৃত্তিবাস রচিত 'যোগাদ্যা বন্দনা'র প্রথমাংশ হতে বোঝা যায় যে, রামায়ণের 'মহীরাবণ বধ পালা' ও 'যোগাদ্যা বন্দনা' একই ব্যক্তির রচনা।

'জয় মা যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামবাসী। অবনীতে সিদ্ধ পীঠ গুপ্ত বারানসী॥
দক্ষিণ হস্তে খর্পর মায়ের বাম হস্তে খাণ্ডা। রাবণের ঘরে মাতা ছিল উগ্রচণ্ডা॥
তব পূজা আয়োজন কৈল চিরকাল। তোমারে পূজিয়া রাজা জিনিল পাতাল॥
মহীরাবণের তরে বিধি হইল বাম। বণ্চনায় হরে নিল লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
তার অন্বেষণে গেলা বীর হনুমান। মহীমুণ্ডু কেটে তোমা দিল বলিদান॥
বাম স্কন্ধে লক্ষ্মণ দক্ষিণ স্কন্ধে রাম। মাথায় প্রতিমা করি যাইলেন হনুমান॥
মর্ত্ত্যদেশ মধ্যে আছে ক্ষীরগ্রাম নাম। তথায় রাখিলেন তোমা বীর হনুমান॥
বিশ্বকর্ম্ম ডাকি হনু দিলা আজ্ঞাদান। অক্ষয় দেউল হেথা করহ নির্মাণ॥
হনুর পাইয়া আজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মা আইল। অক্ষয় দেউল তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
বিচিত্র মন্দির দেখি তুষ্ট রঘুপতি। রাখিলেন সেই স্থানে দেবী ভগবতী॥
ক্ষীরপীঠে মহামায়ে করিয়া স্থাপন। রাবণ বধিতে লঙ্কা গেলা নারায়ণ॥
* * * * * *
কৃত্তিবাস বলে যত যোগাদ্যার মায়া। করগো কালিকা দেবী বারেকের দয়া॥'

কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষীরগ্রামবাসী দ্বিজ দয়ারাম 'যোগাদ্যা বন্দনা' রচনা করেন। বন্দনাটি তিন অংশে বিভক্ত, যথা—প্রথম অংশে দেবীর প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় অংশে পূজা-পদ্ধতি ও পূজা প্রচার এবং শেষাংশে দেবীর শঙ্খ পরিধান উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

যোগাদ্যা বন্দনা

শ্রীশ্রীরাম ঃ

বন্দিব যোগাদ্যা মাতা ক্ষিরগ্রামবাসী। অবনিতে মহাপিট গুপ্ত বারানসী॥
বাম হস্তে খর্পর মাএর দক্ষিণ হস্তে খাড়া। লঙ্কায় রাবণের ঘরে ছিল উগ্রচণ্ডা॥

তব পূজা রাবণ রাজা করে চিরকাল। তোমা সেব্যা স্বর্গমর্ত্ত জিনিল পাতাল ॥
রাবণ হরিলে রামের সীতা নামে নারী। তাহার উদ্দেশ্যে হনু গেলা লঙ্কাপুরী ॥
লঙ্কা সমর্পণ করি হনুমানের তরে। পাতালে আছিলা মহীরাবণের ঘরে ॥
মহীরাবণের তরে বিধি হইল বাম। পাতালে লইয়া গেল লক্ষ্মণ আর রাম ॥
রামের উদ্দেশ্যে হনু গেলেন তথায়। মহিমুণ্ড কেটে বলি দিলেক তোমায় ॥
সঙ্গে করি নিএ হরি আইলা দশভুজা। অবনী মণ্ডলে আসি কৈল তব পূজা ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানা উপহার। ছাগ মেষ মহিষ শঙ্খ্যা নাই তার ॥
বিশ্বকর্ম্মা তরে রাম দিলা আজ্ঞাদান। অক্ষয় দেউল বিসাই করিল নির্ম্মাণ ॥
সিংহপৃষ্ঠে মহামায়া করিয়া স্থাপন। রাবণ বধিতে লঙ্কা গেলা নারায়ণ ।।
হরিদত্ত নামে রাজা আছিলা সুইয়া। সপনে কহেন দেবী শিয়োরে বসিয়া ॥
কত নিদ্রা জাও রাজা হয়্যা অচেতন। কৈলাস ছাড়িয়া আইলাম তোমার অঙ্গন ॥
তোমারে সদয় আমি দেবী ভদ্রকালী। মোরপূজা কর রাজা দিয়া নরবলী ॥
আস্তে ব্যস্তে মহারাজা তুলিলেন গা। সিয়োরে বসিয়া দেখে জগতের মা ॥
প্রণাম করিল রাজা হয়্যা কৃতাঞ্জলি। নিত্য নিত্য কোথা মাগো পাব নরবলী ॥
নিত্য২ ভগবতী যদি দেহ প্রাণ। নিজ মুণ্ড কেটে তবে দিব বলিদান ॥
ইসদ হাসিয়া বলেন দেবী ভদ্রকালী। শুন রাজা পূজার নিয়ম কথা বলি ॥
সমস্ত বৈশাখ মাষে হরিদ্রা না বাঁটি। সমস্ত বৈশাখ অগ্নে নাহি দিবে কাটি ॥
সমস্ত বৈশাখে সলিতে পাকাতে না পাবে। চক্রধর লোক গ্রামে বসিতে না দিবে ॥
পূর্ণ গর্ভবতী নারী রবে জার ঘরে। সমস্ত বৈষাখ তারে থোবে স্থানান্তরে ॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাষ। সন্ধ্যাকালে আরতী করিবে বারমাষ ॥
সমস্ত বৈশাখ মাসে না বহিবে হাল। সঞ্রাতি দিবসে পূজা কর চিরকাল ॥
সপন দেখিয়া তবে উঠিলেন রাজা। প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিলেন পূজা ॥
সাতদিন পূজা কৈল দিয়া সাত বালা। অবশেষে ক্ষিরগ্রামে করে দিল পালা ॥
সমস্ত গ্রামের পালা নিবাড়িয়া গেল। পূজারি ব্রাহ্মণের পালা একদিন হইল ॥
একপুত্র বই আর দ্বিতীয় পুত্র নাই। কি দিয়া করিব পূজা অভয়ার ঠাঁই ॥
প্রাণ রক্ষা নাহি পায় ক্ষীরগ্রামে রয়্যা। স্ত্রীপুত্র লয়্যা দ্বিজ জায় পলাইয়া ॥
মনে ভয় দ্বিজবর জায় পলাইয়া। ব্রাহ্মণীর বেসে পথ আগুলিল গিয়া ॥
ডাকিয়া সুধান দেবী ব্রাহ্মণের তরে। এতরাত্রে দ্বিজবর জাও কোথাকারে ॥
স্ত্রীপুত্র সঙ্গে করি চলিয়াছ কোথা। বুঝি পালায়্যা জাও খেয়ে মোর মাথা ॥
কিবা রাজ পিড়া হইল তোমার উপরে। কি হেতু পালায়্যা জাও সত্য কহ মোরে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন মা কহিতে ভয়বাসি। যোগাদ্যা নামেতে রাজা আন্যেছে রাক্ষশী ॥
পুত্র বলি দিয়া রাজা দেবীপূজা কৈল। ঘরে২ ক্ষিরগ্রামের পালা করি দিল ॥
প্রাণরক্ষা নাহি পায় ক্ষিরগ্রামে রয়্যা। তেকারণে গ্রাম ছেড়্যা জাই পলাইয়া ॥
হাসিয়া হাসিয়া কহেন দেবী কাত্যায়নী। জার ভয়ে পলাও তুমি সেই দেবী আমি ॥

ব্রাহ্মণ বলিল মা বলি তোমার স্থানে। তুমি কাত্যায়নী দেবী জানিব কেমনে॥
আশ্বিনে অম্বিকা মূর্ত্তি যদি দেখা পাই। তবে সে প্রত্যয় হয় ফিরে ঘরে জাই॥
ভকত বৎসলা দেবী মাতা কাত্যায়নী। ব্রাহ্মণের আগে হইলা মহিষমর্দিনী॥
বাম দিগে কার্ত্তিক দক্ষিণে গনোপতি। দুইদিগে সোভা করে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
সিংহপৃষ্ঠে মহামায়া দশভুজা রূপে। শূল হস্তে বধে জেন অসুরের বুকে॥
কবরী চাঁচর কেশে নানা ফুল জাতি। নয়নে অঞ্জন সোভে গলে গজমতি॥
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার চতুর্দ্দিগে সোভে॥ দেখিয়া অমন রূপ জগমনো লোভে।
প্রণাম করিল দ্বিজ দেবী বিদ্যমানে। সহস্তে আমার মুণ্ড লেহ বলিদানে॥
দেবী বলে দ্বিজবর সুনহ বচন। কে তোমা খাইবে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান॥
আজি হতে আর মোর না করিহ ভয়। স্ত্রীপুত্র লয়্যা তুমি জাও নিজালয়॥
দেশদেশান্তর হতে নর যে আসিবে। বৎসর অন্তর তারে বলিদান দিবে॥
এতবলি মহামায়া বসিল মন্দিরে। স্ত্রীপুত্র লয়্যা দ্বিজ চল্যে গেল ঘরে॥
একদিন মহামায়া বট বৃক্ষ তটে। স্নান ছলে বসিয়াছে খামাসের ঘাটে॥
অঙ্গ মার্জ্জনা করেন দেবী মহেশ্বরী। হেনকালে শঙ্খ লয়্যা আইলা শাঁখারী॥
ডাক দিয়া কন দেবী শাঁখারীর তরে। কিসের পসরা তোমার মাথার উপরে॥
শাঁখারী বলেন মাতা কি জিজ্ঞাসো মোরে। ক্ষীরগ্রামে জাই আমি শঙ্খ বেচিবারে॥
শখ লাগি ভবানীর ভুলে গেল মন। শুনগো শাঁখারী শঙ্খ দেখিব কেমন॥
এত সুন্যে গেল বেন্যা খামাসের ঘাটে। শঙ্খ তুলাইয়া দিল দেবীর নিকটে॥
শঙ্খ দেখি মহা সুখি হল্যা মহামায়া। শাঁখারিকে কন তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
শ্রীরাম লক্ষণ নামে শঙ্খ দুই বাই। দুই বাই শঙ্খ আমি কিন্যা নিতে চাই॥
দেবী বলে দুই বাই শঙ্খ নেব আমি। শঙ্খের উচিত মূল্য কিবা লবে তুমি॥
শঙ্খের উচিত মূল্য পাঁচ তঙ্কা হয়। দেবী বলে শঙ্খ মোরে পরাইয়া জাও॥
শাঁখারী বলেন মাতা বসিয়াছ একা। কেমনে পরাব শঙ্খ মনে লাগে শঙ্কা॥
কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বহুরি। তোমারে পরাব শঙ্খ কে দিবে টাকা কড়ি॥
এবোল শুনিয়া দেবী মন্দ মন্দ হাসে। হাসিয়া হাসিয়া কন শাঁখারীর পাশে॥
সুনগো শাঁখারী তোমায় পরিচয় দি। পুজারি ব্রাহ্মণ জিনি তার আমি ঝি॥
দুই বাই শঙ্খ মোরে দেহ পরাইয়া। পিতার নিকটে গিয়া তঙ্কা লহ চায়্যা॥
পুজারি ব্রাহ্মণের ঠাঞী পাঁচ তঙ্কা লও। প্রসাদ খাইয়া শেষে বিদায় হয়্যা জাও॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বেন্যা হাত দিল মাথে। বসিল দেবীর আগে শঙ্খ পরাইতে॥
হাতে ধরি শাঁখারি শঙ্করি পানে চায়। হস্তে পদ্ম পাএ পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়॥
প্রণাম করিয়া বেন্যা জোড় করে কয়। কপট তেজিয়া মোরে দিহ পরিচয়॥
তোমারে না হয় আমার মানুষ গেয়ান। সাক্ষাতে তোমারে দেখি লক্ষী অধিষ্ঠান॥
এতেক বলিল জদি বিনয়ে শাঁখারী। হাসিয়া হাসিয়া কন দেবী মহেশ্বরী॥
বিপ্রবংশে জন্ম মোর নাম ভগবতী। দুই পুত্র আমার কার্ত্তিক গণোপতি॥

দুই পুত্র আমার আমি থাকি বাপঘরে। স্বামী দরিদ্র মোরে পুসিতে না পারে
সিদ্ধি খায়্যা পাগল হয়্যা ফিরে অভিরত। সর্পগুনা গাত্রে বান্দে বাদিয়ার মত ॥
স্ত্রীপুত্র ত্যজিয়া তার সংসারে অভিলাষ। সব ছেড়্যা সায় কৈল বারানসী বাস ॥
পরিধান বাঘ ছাল ভষ্ম মাখে গায়। সিঙ্গী ডম্বুর বাজাইয়া ভিক্ষা মাগি খায় ॥
ভবানীর মায়া বেন্যা নারিলা বুঝিতে। তৈল হাতে দিয়া শঙ্খ লাগিল পরাইতে ॥
দেব ঋষি মুনি জারে ধ্যানে না পায়। হাতে ধর্যা বেন্যা শঙ্খ পরাইল তায় ॥
শঙ্খ পরিয়া দেবী কহেন বেন্যারে। তঙ্কা গিয়া নেও চেয়্যা পিতার গোচরে ॥
গম্ভীরার কোলঙ্গাতে পাঁচ তঙ্কা আছে। টাকা লয়্যা প্রশাদ পাও পিতার কাছে ॥
মাথায় পসরা বেন্যা করিল গমন। রন্ধনসালায় গিয়া দিল দরসন ॥
কি করিছ দ্বিজবর রন্ধনে বসিয়া। তোমার কন্যাকে আইলাম শঙ্খ পরাইয়া ॥
ধামাছের ঘাটে শঙ্খ পরেন তোমার ঝি। টাকা দিয়া বিদায় কর প্রসাদ পাএছি ॥
বিপ্র বলে শঙ্খ পরাইলি কারে বেন্যা। এক পুত্র বই মোর নাহিক মোর কন্যা ॥
বেন্যা বলে দ্বিজবর না ভাড়াও মোরে। পাঁচ তঙ্কা আছে দেখ গম্ভীরা ভিতরে ॥
বেন্যার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণে হল্য শঙ্কা। গম্ভীরার কোলঙ্গাতে পাল্যে পাঁচ তঙ্কা ॥
টাকা পেয়্যা দ্বিজবর হরসিতে জায়। টাকা দিয়া আছাড় খেয়্যা পড়ে বেন্যার পায়।
তোমার ভাগ্যের কথা কিবা আছেলেখা। যুগের যোগাদ্যামাকে পরাইলি শাঁখা ॥
মাথার পশরা বেন্যা আছাড়ি ফেলিয়া। ধামাছে চলিলা বেন্যা মা মা বলিয়া ॥
ব্রাহ্মণ বনিক গেল বট বৃক্ষ তটে। দেখিতে না পায় আর ধামাছের ঘাটে ॥
অনেক প্রকারে দ্বিজ করিলেন স্তুতি। কৃপাকরি দরসন দেহ ভগবতী ॥
এতসুনি কাত্যায়নী হরসিত হল্যা। জল থেকে দুইবাই শঙ্খ দেখাইলা ॥
বেন্যা বলে জতদিন মহিতলে জিব। বতসরে ২ আমি শঙ্খ আনি দিব ॥
দেবীর চরণে দোঁহে প্রণাম করিয়া। নিজ নিকেতনে জায় হরশিত হয়্যা ॥
দ্বিজ দয়ারামে ভনে মনে অভিলাস। হরিবোল বল সবে পাপের বিনাশ ॥

ইতি যোগাদ্যাদেবার বন্দনা সমাপ্ত ঃ। শ্রীশ্রীরাম ঃ।
শ্রীশ্রীকালী ॥ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ শ্রীশ্রীহরি ॥ ঃ ॥

শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত পুঁথি অবলম্বনে যোগাদ্যা বন্দনা প্রকাশিত হ'ল। প্রাচীন বানান অনুসৃত হয়েছে।

ঐতিহাসিক কালপঞ্জী ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(প্রাচীন যুগ)

৪০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ	বীরভানপুরের সভ্যতার উন্মেষ
১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ	তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষ ঃ পাণ্ডুরাজারঢিবির প্রথম যুগ
১২০০ ঐ	ঐ দ্বিতীয় যুগের উন্মেষ
৯৫০ ঐ	ঐ মঙ্গলকোটের সভ্যতার উন্মেষ
৭৫০ ঐ	ঐ তৃতীয় যুগের উন্মেষ
৯০০ ঐ	ঐ লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার
৪০০ ঐ (আঃ)	ঐ চতুর্থ যুগের উন্মেষ
৫৬৬-৪৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ	বুদ্ধদেব
৫৯৯-৫২৮ ঐ	বর্ধমান মহাবীর
৩৬৪-৩২৪ ঐ	নন্দ বংশ
৩২৭-৩২৪ ঐ	আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান
৩২৪-৩০০ ঐ	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
৩০০-২৭২ ঐ	বিন্দুসার
২৭২-২৩২ ঐ	অশোক
১৮৭-১২০ ঐ	শুঙ্গবংশ
খ্রীস্ট পূর্বাব্দ দ্বিতীয় শতক	খারবেল
২০ খ্রীঃ পূঃ ১৭৬ খ্রীস্টাব্দ	কুষাণবংশ
৩০০-৩২০ খ্রীস্টাব্দ	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন
৩২০ খ্রীস্টাব্দ	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
৩৩৫ ঐ	সমুদ্রগুপ্ত
৩৭৬ ঐ	২য় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য
৪১৪ ঐ	১ম কুমারগুপ্ত
৪৫৫ ঐ	স্কন্দগুপ্ত
৪৭৫ ঐ	বুধগুপ্ত
৬ষ্ঠ শতাব্দী	গোপচন্দ্র
ঐ	বিজয়সেন
ঐ	ধর্মাদিত্য
৫৯৫-৬২৪ (আঃ) খ্রীস্টাব্দ	শশাঙ্ক
৬০৬-৬৪৩ ঐ	হর্ষবর্ধন
৬২৯-৪৫ খ্রীস্টাব্দ	হিউয়েন সাঙ-এর ভারতভ্রমণ কাল

৭৫০-৭৭০ খ্রীস্টাব্দ	গোপাল
৭৭০-৮১০ ঐ	ধর্মপাল
৮১০-৮৫০ ঐ	দেবপাল
নবম / দশম শতাব্দী	ঈশ্বর ঘোষ
৮৫০-১০৭৫ খ্রীস্টাব্দ	পরবর্তী পালরাজাদের শাসনকাল
১০২৩ ঐ	চোল অভিযান (মহীপালের সময়ে ৯৮৮-১০৩৮)
১০৭৫ ঐ	কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ
১০৭৭-১১২০ ঐ	রামপাল
১১শ শতাব্দী	সামন্তসেন : হেমন্তসেন
১০৯৫-১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ	বিজয়সেন
১১৫৮-১১৭৯ ঐ	বল্লালসেন
১১৭৯-১২০৭ ঐ	লক্ষ্মণসেন
১১শ শতাব্দী	ভট্টভবদেব
১২০২ খ্রীস্টাব্দ	বক্তিয়ার খলজির কর্তৃক নদীয়া অভিযান ও অধিকার
৫৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ	বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ আরম্ভ
৭৮ খ্রীস্টাব্দ	শকাব্দ আরম্ভ
৩২০ ঐ	গুপ্তাব্দ আরম্ভ
৫৯৩ ঐ	বঙ্গাব্দ আরম্ভ*
৬২২ ঐ (১৬ই জুলাই)	হিজরী সনের পহেলা মহরম আরম্ভ
৬৯৪ ঐ	মল্লাব্দ আরম্ভ*

(মধ্যযুগ)

১২০৮ খ্রীস্টাব্দ	বক্তিয়ার খলজির মৃত্যু
১১৯৩-১২৯০ ঐ	দাস বংশ
১২৯০-১৩২০ ঐ	খলজি বংশ
১৩২০-১৪১২ ঐ	তুঘলক বংশ
১৪১২-১৫২৬ ঐ	লোদী বংশ
১৫২৬-১৮৫৭ ঐ	মোঘল বংশ
১২০৮-১১ খ্রীস্টাব্দ	আলিমর্দান
১২১১-২৬ ঐ	গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ
১২২৬-২৮ ঐ	নাসিরউদ্দিন মহম্মদ
১২২৯-৩১ ঐ	ইখতিয়ারউদ্দিন খলজি
১২৩১-৩৩ ঐ	আলাউদ্দিন জানি

* ষোড়শ শতকের পূর্বে বঙ্গাব্দ বা মল্লাব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল।

১২০৩-০৬	খ্রীস্টাব্দ	সৈফুদ্দিন আইবক
১২০৬-৪৫	ঐ	তুঘ্রল তুঘান খান
১২৪৬-৪৭	ঐ	তোমর খান
১২৪৭-৫১	ঐ	মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি
১২৫১-৫৬	ঐ	ইখতিয়ারউদ্দিন মুজবক
১২৫৭-৬৭	ঐ	মামলক বংশ
১২৬৭-৮১	ঐ	মুগীস্উদ্দিন তোঘ্রল
১২৮২-১৩০০	ঐ	বলবনী বংশ
১৩২৩-৩৯	ঐ	ইজ্জুদ্দিন য়াহিয়া খাঁ
ঐ		দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শাসনকেন্দ্র সপ্তগ্রামে স্থাপিত
১৩৩৯-৪৫	ঐ	আলাউদ্দিন আলি শাহ
১৩৩৯-৫৮	ঐ	শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ
১৩৫৮-৮৯	ঐ	সিকন্দর শাহ (১ম)
১৩৮৯-৯৬	ঐ	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
১৩৯৬-১৪০৬	ঐ	সৈফুদ্দিন হমজা শাহ
১৪০৬-০৯	ঐ	শামস্উদ্দিন (২য়)
১৪০৯-১৪	ঐ	শাহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ
১৪১৪-৩১	ঐ	জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ
১৪৩১-৪২	ঐ	শামস্উদ্দিন মহম্মদ শাহ
১৪৪২-৫৯	ঐ	নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ
১৪৫৯-৭৪	ঐ	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ
১৪৭৪-৮১	ঐ	শামস্উদ্দিন ইউসুফ শাহ
১৪৮২-৮৭	ঐ	সিকন্দর শাহ (২য়)
১৪৮৭	ঐ	বারবকশাহ
১৪৮৫-১৫৩৩	ঐ	শ্রীচৈতন্যদেব
১৪৮৭-৯০	ঐ	সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ
১৪৯০-৯১	ঐ	নাসিরউদ্দিন মহম্মদ শাহ
১৪৯১-৯৩	ঐ	সামস্উদ্দিন মজফ্ফর শাহ
১৪৯৩-১৫১৯	ঐ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
১৫১৯ ৩২	ঐ	নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ
১৫৩৩	ঐ	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ
১৫৩৩-৩৭	ঐ	গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ শাহ
১৫২৬	ঐ	পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ
১৫২৬-৩০	ঐ	জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর

১৫৩০-৩৯	খ্রীস্টাব্দ	নাসিরউদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন
১৫৩৯-৪৫	ঐ	ফরিদউদ্দিন শেরশাহ
১৫৫৬	ঐ	পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৫৫৬-১৬০৫	ঐ	জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর
১৫৬৪-৭২	ঐ	সোলেমান কররানী
১৫৭২-৭৬	ঐ	দায়ুদ খান
১৫৭৪	ঐ	বর্ধমানের যুদ্ধে দায়ুদ খাঁর পরাজয়
১৫৭৫	ঐ	তুকারই-এর যুদ্ধ
১৫৭৬	ঐ	দায়ুদ খানের মৃত্যু
১৫৭৬	ঐ	পাঠানদের সঙ্গে বর্ধমান ও মঙ্গলকোটের যুদ্ধ
১৫৯০	ঐ	কতলু খান-এর মৃত্যু
১৫৮২-৮৩	ঐ	আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল
১৬০৫-২৭	ঐ	নূরুদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর
১৫৭৭	ঐ	মেহেরউন্নিসার জন্ম
১৫৯৫	ঐ	শের আফগান ও মেহেরউন্নিসার বিবাহ
১৬০৬	ঐ	শের আফগানের বর্ধমান আগমন
১৬০৭	ঐ	শের আফগানের মৃত্যু
১৬১১	ঐ	জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের বিবাহ
১৬২৪	ঐ	শাহজাহানের বিদ্রোহ ও বর্ধমান অধিকার
১৬২৮-৫৮	ঐ	শাহিবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান
১৬৫৮-১৭০৭	ঐ	মহিউদ্দিন মহম্মদ আওরঙ্গজেব
১৬৬৬	ঐ	শাহজাহানের মৃত্যু
১৭০৪	ঐ	মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন
১৭০৮-১২	ঐ	বাহাদুর শাহ (১ম)
১৭১২	ঐ	জাহান্দার শাহ
১৭১৩-১৯	ঐ	ফারুক সায়র
১৭১৮-১৯	ঐ	চৌথ আদায়ের স্বীকৃতি
১৭৩৭	ঐ	বাজীরাও-এর দিল্লী অভিযান
১৭১৯-৪৮	ঐ	মহম্মদ শাহ
১৭৩৯	ঐ	নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লীতে গণহত্যা
১৭৪০	ঐ	বাজীরাও-এর মৃত্যু
১৭৪২	ঐ	বর্গীহাঙ্গামা ; বর্ধমান, কাটোয়া ও মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন
১৭৪৩	ঐ	কাটোয়ার যুদ্ধ
১৭৪৪	ঐ	মানকরায় ভাস্করয়ামের নিধন

১৭৫১	খ্রীস্টাব্দ	চৌথ আদায়ের স্বীকৃতি ও চুক্তি

(আধুনিক যুগ)

১৭৫৭	খ্রীস্টাব্দ	পলাশীর যুদ্ধ
১৭৫৮	ঐ	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নদীয়া ও চাকলা বর্ধমানের দেওয়ানী লাভ
১৭৬০	ঐ	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চাকলা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের দেওয়ানী লাভ
১৭৬১	ঐ	তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ
১৭৬৫	ঐ	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ ; বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রতিষ্ঠা
১৭৬৯-৭০	ঐ	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
১৭৭২-৮৫	ঐ	ওয়ারেন হেস্টিংস
১৭৮৬-৯৩	ঐ	লর্ড কর্ণওয়ালিস
১৭৭২	ঐ	পাঁচশালা বন্দোবস্ত
১৭৭৮	ঐ	একশালা বন্দোবস্ত
১৭৯০	ঐ	দশশালা বন্দোবস্ত
১৭৯৩	ঐ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৯	ঐ	বর্ধমানে পত্তনি প্রথার প্রবর্তন
১৮১৯	ঐ	পত্তনি আইন (সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে প্রযোজ্য)
১৮৫৭	ঐ	সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৮৫	ঐ	বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন
১৯০৫	ঐ	বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন
১৯৪৭	ঐ	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও খণ্ডিত ভারত

মোঘল আমলে বাংলার সুবাদারগণ

১৫৭৫-৭৮	খ্রীস্টাব্দ	হোসেন কুলিবেগ (খান-ই-জাহান)
১৫৭৮-৮০	ঐ	মুজফ্ফর খান
১৫৮২	ঐ	খান-ই-আজম
১৫৮২-৮৭	ঐ	সাহাবাজ খান
১৫৮৭	ঐ	ওয়াজির খান
১৫৮৭-৯৪	ঐ	সৈয়াদ খান
১৫৯৪-৯৮	ঐ	মানসিংহ
১৫৯৮	ঐ	জগৎসিংহ

১৫৯৮-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ		মানসিংহ
১৬০৬	ঐ	কুতুবউদ্দিন কোকা
১৬০৬-৮	ঐ	জাহাঙ্গীর কুলি খান
১৬০৮-১৩	ঐ	ইসলাম খান
১৬১৪-১৭	ঐ	কাশিম খান
১৬১৭-২৪	ঐ	ইব্রাহিম খান
১৬২৪-২৭	ঐ	মহব্বৎ খান
১৬২৭ ২৮	ঐ	ফিদাই খান
১৬২৮-৩২	ঐ	কাশিম খান
১৬৩২-৩৫	ঐ	আজম খান
১৬৩৫-৩৯	ঐ	ইসলাম খান
১৬৩৯-৪৭	ঐ	শাহজাদা মহম্মদ সুজা
১৬৪৭-৪৯	ঐ	ইতকাদ খান
১৬৫০-৬০	ঐ	শাহজাদা মহম্মদ সুজা
১৬৬০-৬৩	ঐ	মীরজুমলা খান
১৬৬৪-৮৮	ঐ	শায়েস্তা খান
১৬৮৮-৮৯	ঐ	খান জাহান বাহাদুর
১৬৮৯-৯৬	ঐ	ইব্রাহিম খান
১৬৯৬-৯৭	ঐ	জবরদস্ত খান
১৬৯৭-১৭১২	ঐ	শাহজাদা আজীম-উস-শান
১৭০০-১৭	ঐ	মুর্শিদকুলী খান (দেওয়ান)
১৭১৭-২৭	ঐ	মুর্শিদকুলী খান (সুবাদার / নবাব)
১৭২৭-৩৯	ঐ	সুজাউদ্দিন খান
১৭৩৯-৪০	ঐ	সরফরাজ খান
১৭৪০-৫৬	ঐ	আলিবর্দি খান
১৭৫৬-৫৭	ঐ	সিরাজদৌলা
১৭৫৭-৬০	ঐ	মীরজাফর খাঁন
১৭৬০-৬৩	ঐ	মীরকাশিম খান
১৭৬৩-৬৪	ঐ	মীরজাফর খান
১৭৬৪-৬৬	ঐ	নজমুদ্দৌলা

বর্ধমান রাজবংশ ও বর্ধমান

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ	সরকার সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ, মান্দারণ ও সপ্তগ্রামের পত্তন

সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ (আনুঃ)		সঙ্গম রায়
	ঐ	বঙ্কবিহারী রায়
১৬৫৭	ঐ	আবুরায় ; বর্ধমানের নগরকোতোয়াল ও চৌধুরী পদপ্রাপ্তি
অজ্ঞাত		বাবু রায়
১৬৭৫	ঐ	ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যু
১৬৭৫-৯৬	ঐ	কৃষ্ণরাম রায়
১৬৯৫	ঐ	শোভাসিংহের বিদ্রোহ
১৬৯৬	ঐ	শোভাসিংহের মৃত্যু
১৬৯৮	ঐ	রহিম খাঁন-এর মৃত্যু ; খাজা আনোয়ার-এর মৃত্যু; কোম্পানি কর্তৃক ডিহি কলিকাতা-সহ তিনখানি গ্রাম ক্রয়
১৬১৮-১৭০২	ঐ	জগৎরাম রায়
১৭২২	ঐ	চাকলা বর্ধমানের সৃষ্টি
১৭০২-৪০	ঐ	কীর্তিচাঁদ রায়
১৭৪০-৪৪	ঐ	রাজা চিত্রসেন রায়
১৭৪৪-৭০	ঐ	রাজা ত্রিলোকচাঁদ রায়
১৭৬৪	ঐ	তেজচন্দ্রের জন্ম
১৭৭০-১৮৩২	ঐ	মহারাজা তেজচন্দ্র রায়
১৭৭৬-৯৮	ঐ	মহারানি বিষণকুমারী
১৭৯৫	ঐ	চাকলা বর্ধমানের বিভক্তিকরণ
১৭৯১	ঐ	প্রতাপচাঁদের জন্ম
১৮২২	ঐ	প্রতাপচাঁদের মৃত্যু (ঘোষিত)
১৮২০	ঐ	মহতাবচাঁদের (চুনিলাল) জন্ম
১৮৩৩-৭৯	ঐ	মহতাবচাঁদ
১৮৫৬	ঐ	জাল প্রতাপচাঁদের মৃত্যু
১৮৬০	ঐ	আফতাবচাঁদের জন্ম
১৮৭২	ঐ	বর্তমান বর্ধমান জেলার সীমানা বিন্যাস
১৮৭৯-৮৬	ঐ	আফতাবচাঁদ
১৮৮৫-১৯০২	ঐ	কোর্ট অব ওয়ার্ডস্
১৮৮১	ঐ	বিজয়চাঁদের জন্ম
১৯০২-৪১	ঐ	বিজয়চাঁদ মহতাব্
১৯০৫	ঐ	উদয়চাঁদের জন্ম
১৯৪১-৫৫	ঐ	উদয়চাঁদ মহতাব্
১৯৫৫	ঐ	জমিদারী প্রথার বিলোপ
১৯৮৪	ঐ	উদয়চাঁদের মৃত্যু

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

[ইংরাজী]

Abul Fazal-I-Allami Ain-I-Akbari, Vol. I, Tr. H. Blochmann ; Vol. II, Tr. H. S. Jarrett, Ed. Sir J. N. Sarkar, Calcutta.

Abdul Karim Murshid Quli Khan and his times, Dacca, 1963.

Archaeological Survey of India—Epigraphia Indica, New Delhi, Vols. I, V, VI, VIII, IX, XII, XV, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX.

Epigraphia Indo-Moslemia, 1935-36.

Epigraphipa Indica : Arabic and Persian Suppl. 1975.

Ascoli, F. D.—Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, London, 1917.

Beal, Samuel Buddhist Records of the Western World, New Delhi.

Banerjee, J. N.—Development of Hindu Iconography, Cal. 1956.

Banerjee, R. D. History of Orissa (in II Vols.), Calcutta, 1930. Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, New Delhi, 1985 ; The Palas of Bengal, Calcutta, 1915.

Bhattacharjee, A. K. A Corpus of Dedicatory Inscriptions from Temples of West Bengal, Calcutta, 1982.

Bhattacharjee, B. Indian Buddhist Iconography, Calcutta, 1968.

Bhattacharjee, B. C. Indian Images (The Brahamanic Iconography), New Delhi, 1921.

Blochmann, H. Contribution to the Geography and History of Bengal (Mohammadan Period), Calcutta, 1968.

Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, Appendix : Geographical and Historical Notes on the Burdwan and Presidency Division.

Bhattacharjee, Hara Shankar. Zamindars and Patnidars, Burdwan, 1985.

Bower, A. G. The Family History of the Bansberia Raj, Calcutta, 1896.

Campbell, A. Claude. Glimpses of Bengal, Calcutta, 1907.

Campas, J. J. A. History of the Portuguese in Bengal, Patna, 1979.

Campbell, Sir George. Memoir of My Indian Cover, London, 1893.

Chaudhuri, Dr. A. K. Sibi King Vessantara his, Country and Cultural Heritage, Calcutta, 1974.

Chakrabarty, Monamahan A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal (1757-1916), 1918, Calcutta.

Chatterjee, Anjali. Bengal in the Region of Aurangzib, Calcutta, 1967.

Chattopadhyaya, Alaka & *Lama Chimpa,* Taranatha's History of Buddhism in Bengal, Calcutta, 1980.

Chanda, R. P. Indo Aryan Races, Calcutta, 1969.

Cland, W. Pancha Vimsa Brahamana, Calcutta, 1931.

Cowell, E. B. The Jatak, Book-I, London, 1895.

Chunder, Bholanath Travell of a Hindoo (in 2 Vols.) Calcutta, 1868.

Dalton, E. T. Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1973.

Dasgupta, S. B. Obscure Religious Cults, Calcutta, 1969.

Dasgupta, Prodosh Temple Terracotta of Bengal, Calcutta, 1971.

Datta, K. K. Alivardi and his times, Calcutta, 1963.

Dey, N. L. The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, London, 1927.

Diwakar. R. R. Bihar Through Ages, 1958.

Dutta, Bimal Kumar Bengal Temples, New Delhi, 1975.

Firminger, W. K. Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report, Calcutta, 1962.

Fousboll, V. The Jatak, Vol. VI, London, 1896.

Frazer, Sir James G. The Golden Bough (Abriged), London, 1967.

Ganapati Shastri, T. Ed. Aryya Manjusrimulakalpa, Trivandrum, 1920.

Ganguli, Dr. Kalyan Kr. Howrah in Perspective, Nabasan, 1981.

Geiger, Wilhelm The Mahavamsa (Eng. Tr.), Colombo, 1950.

Ghosh, N. N. Memoirs of Nabakissen Bahadur, Calcutta, 1901.

Ghulam Husain Salim Riyazu-S-Salatin, Calcutta, 1903.

Gleig, Rev. G. R. Memoirs of Warren Hastings, London, 1841.

Govt. of Bengal, List of Ancient Monuments in Bengal, 1896.

Settlement Report of the Burdwan Raj and Certain other

Estates in the Dist. of Burdwan, Hooghly and Bankura (1891-96).

The Report of the Land Revenue Commission, Bengal (in 6 Vols.), Calcutta, 1940.

Govt. of India, Land Revenue Policy, London, 1902.

Govt. of West Bengal, Dist. Census Hand Book, Burdwan, 1961.

Dist. Census Hand Book, Barddhaman, 1981.

Final Population (Vill. and Towns), Burdwan, 1971.

Hamilton, Walter East Indian Gazetteer of Hindustan, London, 1828.

Hazra, R. C. Studies in the Upapurans (in 2 Vols.) Calcutta.

Hill, K. A. L. Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Burdwan, Vol. I, (1927-34).

Hill, S. C. India Record Series (in 3 Vols.), 1906.

Holwell, John Zephania Interesting Historical Events, London, 1774.

Hunter, W. W. Statistical Account of Bengal, Vol. IV, London.

Imperial Gazetteers of India, Vol. IX, London, 1908.

Bengal Manuscripts Records, (in 4 Vols), London, 1908.

The Annals of Rural Bengal, London, 1896.

Hussain, Dr. Shahanara Every Day Life in the Pala Empire, Dacca, 1968.

Jayaswal, K. P. Imperial History of India, Lahore, 1934.

Law, B. C. The Historical Geo. of Ancient India, Paris, 1968.

Mahavir, His Life and Teachings, Calcutta, 1936.

Long, The Rev James Hand Book of Bengal Missions, London, 1848.

Selections from Unpublished Records of Government, Calcutta, 1973.

Majumder, A. B. The Story of Administration of Laws in Bengal, Calcutta, 1966.

Majumder, N. G. Inscriptions of Bengal, Vol. 3, Rajshahi, 1929.

Majumdar, Dr. R. C. History of Ancient Bengal, Calcutta, 1971.

History of Mediaeval Bengal, Calcutta, 1973.

History of Modern Bengal, Calcutta, 1981.

Ed. History of Bengal, Vol. I, Dacca, 1943.

Ed. The History and Culture of the Indian People, in II Vols., Bombay.

Majumdar Sastri, S. N. Cunningham's Ancient Geography of India, Calcutta, 1924.

Marshall, P. J. East Indian Fortunes, (The British in Bengal in the 18th Century), London, 1976.

McCutchan, David J. Late Mediaeval Temples of Bengal, Calcutta

Michell, George Ed. Brick Temples of Bengal From the Archives. of David McCutchan, Princeton, 1983.

Mirza Nathan *Baharistan-i*-Ghayabi (in 2 vols), Gauhati, 1936.

Mitra, Asok Dist. Census Hand Book. Burdwan, Calcutta, 1953.

West Bengal Dist. Records (New Series), Burdwan ;

Letter Received (1788-1800), Calcutta, 1955.

Letter Issued (1788-1800), Calcutta, 1956.

The Tribes and Castes of West Bengal, Calcutta, 1951.

Monahan, F. J. The Early History of Bengal, London, 1925.

Mookerji, Radha Kumud Indian Shipping, Calcutta, 1957.

Indian Land System, Calcutta, 1958.

Morgan, L, H. Ancient Society, Calcutta, 1949.

Moreland, W. H. From Akbar to Aurangzib, New Delhi, 1990.

Mukherjee and Maity Corpus of Bengal Inscriptions, Calcutta, 1967.

National Archives of India, New Delhi, Fort William Correspondence (in 22 Vols.)

Nijamuddin, Ahmed *Tabkat-i*-Akbari, Calcutta, 1939.

Niyogi, Puspa Brahmanic Settlement in different Sub-divisions of Ancient Bengal, Calcutta, 1967.

Oldham, W. B. Some Historical and Ethical Aspects of the Burdwan District, Calcutta, Edition 1891 & 1894.

Pertsch, W. Tr. Kshitish Vanshavali Charitam, Berlin, 1852.

Paterson, J. C. K. Bengal District Gazetteers, Burdwan, Calcutta, 1910.

Qanungo, Kalikaranjan Sher Shah and his Times, Calcutta, 1965.

R*ajguru, S. N.* Inscriptions of Orissa, (in 6 Vols.), Bhubaneshwar.

His ory of the Gangas (in 2 Vols.), Bhubaneswar, 1968.

Raverty, J. Tabkat-I.Nasiri (in 2 Vols.), Lahore, 1986.

Raymond The Seir-Mutaqherin (in 4 Vols.), Calcutta, 1902.

Risley, H. H. Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1981.
Rogers, A. Tuzuk-I-Jahangiri, Ed. H. Beveridge, New Delhi, 1989.
Roy A. K. A Short History of Calcutta, Calcutta, 1982.
Roy, Parimal Kr. Agricultuarl History of Bengal, Part-I, Calcutta,
Roy Chaudhuri, G. C. Political History Ancient India, Calcutta.
Roy Chaudhuri, P. C. Temples and Legends of Bengal, Bombay, 1967.
Roy Chaudhuri, T. K. Bengal Under Akbar and Jahangir, Calcutta.
Sanyal, Hitesh Ranjan Social Mobility in Bengal, Calcutta, 1981.
Sarkar, Sir Jadunath History of Aurangjib, Vol. III & V, Calcutta.
The Military History of India, Calcutta, 1970.
Bengal Nawabs, Calcutta, 1985.
The Fall of the Mughal Empire (in 5 Vols) Calcutta.
Ed. History of Bengal, Vol. 2, Dacca, 1948.
Sastri, Haraprasad Ed. Ramcharitam of Sandhyakarnandi, Calcutta, 1969.
Sen, Amulya Ch. Asoka's Edicts, Calcutta, 1956.
Sen, B. C. Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal Calcutta, 1942.
Shamsud-din Ahmed Inscriptions of Bengal, Vol. 4., Rajshahi, 1960.
Sinha, N. K. The Economic History of Bengal, (in 3 Vols.)
Sinha, B. P. Decline of the Kingdom of Magadh, Patna, 1954.
Sircar, D. C. Select Inscriptions, Vol. I & II
Sakta Pithas, Delhi, 1973.
Indian Epigraphical Glossary, Delhi, 1966.
Shahanara Hussian Everyday Life in the Pala Empire, Dacca, 1968.
Smith, Sir V. A. The Early History of India, London, 1908.
Stwarts, Charles The History of Bengal, Calcutta, 1903.
Vansittart, Henry A Narrative of the Transaction in Bengal, London, 1766.
Wattars, Thomas. On Yuan Chowang's Travels in India, Delhi, 1973.
Wilson, C. R. The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I, Calcutta, 1895 ; India Record Series, (in 2 Vol.), 1905.
Wilson, H. H. A Glossary of Judicial and Revenue Terms, London, 1855.
Yusuf Ali Khan. Tarikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi. Calcutta, 1982.

[বাংলা]

অধিকারী, ইন্দু—বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, কলিকাতা, ১৯৮৯।
আহমদ, ওয়াকিল—বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪।
ইরফান হাবিব—মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (অনু.), কলিকাতা, ১৯৮৫।
করণ, সুধীরকুমার—সীমান্ত বাংলার লোকযান, কলিকাতা, ১৯৬৬।
কবিরাজ, কৃষ্ণদাস—চৈতন্যচরিতামৃত (সাঃ অকাঃ সং), নূতন দিল্লী, ১৯৭৭।
কুমার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—বংশ পরিচয় (১৫ খণ্ডে), কলিকাতা।
কোঙার, ডঃ গোপীকান্ত—বর্ধমান জেলার মেলা (তারিখ বিহীন), কলিকাতা।
গাঙ্গুলী, মানিকরাম—ধর্মমঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৬০।
গুপ্ত, পরমেশ্বরীলাল—ভারতের মুদ্রা, নূতন দিল্লী, ১৯৮৭।
গোলাম সাকলায়েন—পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু-সন্ত প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৭।
ঘোষ, ঈশানচন্দ্র—জাতক (৬ খণ্ড), কলিকাতা।
ঘোষ, দেবপ্রসাদ—ভারতীয় শিল্প ধারা, কলিকাতা, ১৯৮৬।
ঘোষ, বিনয়—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১ম খণ্ড,-১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড।
ঘোষ, শরৎচন্দ্র—সদগোপ তত্ত্ব (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৩৮।
চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৬২।
চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাঃ), নূতন দিল্লী, ১৩৯২।
চক্রবর্ত্তী, রতনলাল—বাংলা দেশের মন্দির, ঢাকা, ১৩৯৪।
চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—কল্পসূত্র (অনুঃ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩।
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র—জাল প্রতাপচাঁদ, কলিকাতা, ১৮৮৩।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮২।
চন্দ, রমাপ্রসাদ—গৌড়রাজমালা, কলিকাতা, ১৯৭৫।
চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ—কাটোয়ার ইতিহাস (তারিখবিহীন), কাটোয়া।
চৌধুরী, নারায়ণ ও সেন, অনুকুল—বর্ধমান পরিচিতি, কলিকাতা, ১৩৭৩।
চৌধুরী কামিলা, ডঃ মিহির—রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।
দত্ত, অক্ষয়কুমার—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৩১৪।
দাস, উপেন্দ্রকুমার—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (২ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৩৭৩।
দাস, হরিদাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, ৪৭১ চৈতন্যাব্দ।
দাস ও মুখোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৭৭।
দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র—প্রাগৈতিহাসিক বাংলা, কলিকাতা ১৯৮১।
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭২।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার—পশ্চিবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা ১৯৭০।
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প, (তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ) ১৯৭৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার—ছড়ায় স্থান বিবরণ, কলিকাতা, ১৯৮৬।
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন—বাঙ্গালার ইতিহাস, (নবাবী আমল), কলিকাতা, ১৩১৫।
—মধ্যযুগের বাঙ্গালা, কলিকাতা, ১৩৩০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ—পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—বাঙ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড), কলিকাতা ১৯৭১।
বসাক, রাধাগোবিন্দ—রামচরিত (মূলসহ অনু.) ১৩৬০, কলিকাতা, ১৩৬০।
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড), কলিকাতা।
প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি, কলিকাতা।
বসু, আশীষ—বাংলায় ভ্রমণ (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪০।
বসু, আশীষ—পশ্চিমবঙ্গের শিল্প চেতনা, কলিকাতা ১৯৬২।
বসু, কানাইলাল—দেবোত্তর পরওয়ানা (১৩২১-৩৬) রাজ প্রিণ্টিং অফিস, বর্ধমান।
বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ—বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা ১৯৮৭।
বসু, লোকেশ্বর—আমাদের পদবীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৩।
বসু, সুরেন্দ্রমোহন—ভারত গৌরব (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯১৬।
বসু, নগেন্দ্রনাথ—বিশ্বকোষ (২২ খণ্ড), ১ম সংস্করণ, কলিকাতা।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড), কলিকাতা, ১৩২১।
ঐ (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), কলিকাতা, ১৩০৫।
বর্ধমানের পুরাকথা, কলিকাতা, ১৩২১।
সঃ কবি বিজয়রামের তীর্থমঙ্গল, কলিকাতা, ১৩২২।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ—সংবাদপত্রের সেকালের কথা (২ খণ্ড) কলিকাতা।
বন্ধু, সঞ্জীব কুমার—উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি, বর্ধমান, ১৩৯২।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫।
ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম), কলিকাতা, ১৯৫৮।
ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ—ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৮৪।
মজুমদার—ডঃ রমেশচন্দ্র—বাংলা দেশের ইতিহাস (৩ খণ্ড), কলিকাতা।
—মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতামালা), ১৯৬৬।
—বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৭০।
মণ্ডল, ডঃ সুশীলা—বঙ্গদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৩।
মল্লিক, কুমুদনাথ—নদীয়া কাহিনী, (সঃ মোহিত রায়), কলিকাতা, ১৯৮৬।
মাইতি, ডঃ প্রদ্যোতকুমার—বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, কলিকাতা, ১৯৮৮।
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ—ছেলে ভুলানো ছড়া, কলিকাতা, ১৯০৫।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার—নবরত্নভারতী (ভৌগোলিক অভিধান), কলিকাতা ১৯৫৮।
মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস—বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, বর্ধমান, ১৩২১।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়—সুলতানী আমলের দু'শ বছর, কলিকাতা, ১৯৬২।
—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, কলিকাতা, ১৯৭৪।
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল—বাঙলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৩৪৭।
মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ—গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭২।
মিত্র, অশোক—সঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৫ম খণ্ড (বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা), নিউ দিল্লী, ১৯৮২।
মিত্র, খগেন্দ্রনাথ—কীর্ত্তন, বিশ্বভারতী, ১৩৮৯।
মিত্র, সতীশচন্দ্র—যশোর খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড), কলিকাতা।
মৈত্র, অক্ষয়কুমার—গৌড় লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯।
মিনহাজ-ই-সিরাজ—তবকাত-ই-নাসিরী (বঙ্গানুবাদ), ঢাকা, ১৯৮৩।
রায়, নিখিলনাথ—মুর্শিদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩।
—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩০৯।
রায়, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৯৮০।
—প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, কলিকাতা, ১৩৫৬।
রায়, পাঁচুগোপাল—রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর।
রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র—পূজাপার্বণ, বিশ্বভারতী।
সরকার, জগদীশনারায়ণ—বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ), কলিকাতা।
সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র—শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২।
পাল পূর্ব্বযুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮৫।
সরকার, বিহারীলাল—বঙ্গে বর্গী, কলিকাতা, ১৩১৪।
সান্যাল, ডঃ হিতেশরঞ্জন—বাংলার কীর্তনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯।
সাঁতরা, তারাপদ—বাংলার দারুভাস্কর্য ১৯৮০।
—ছড়া প্রবাদের গ্রামবাংলার সমাজ, নবাসন ১৩৮৮।
সুর, ডঃ অতুল—বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮০।
—বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৮৬।
সেন, দীনেশচন্দ্র—বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২।
—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৮৬।
সেন, ডঃ সুকুমার—বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪।
—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা ১৯৬২।
—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬২।
সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল—স্বদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৩৭৯।
সেনগুপ্ত, পল্লব—পূজা পার্বণের উৎস কথা, কলিকাতা, ১৯৮৪।
সেনগুপ্ত, শঙ্কর—বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৮৫।
সেনগুপ্ত, সুবোধ—সঃ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ ও নবম অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি দেখুন।

[সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা]

Calcutta Review.
Journal of Asiatic Society of Bengal.
Ancient India (A. S. I.).
Indian Archaeology : A Review (A. S. I.).
Indian Historical Quarterly.
Indian Antiquary.
Bulletin of the Anthropological Survey of India.
Jain Journal, Calcutta.
Heritage of Burdwan, Burdwan.
Indian Bradshaw.
অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৩২১
বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী সংখ্যা ।
বর্ধমান সম্মিলনী, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ।
বর্ধমান পরিচিতি (স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৯৫৪ ।
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'।
'প্রবাসী' পত্রিকা ।
'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ।
'মাসিক বসুমতী' পত্রিকা ।
'কৌশিকী' ।
'শ্রমণ' ।
'আনন্দ সাহিত্য পত্রিকা,' উত্তরপাড়া ।
'শারদীয়া বিজয় তোরণ,' বর্ধমান ।
'শারদীয়া বর্ধমান', বর্ধমান ।

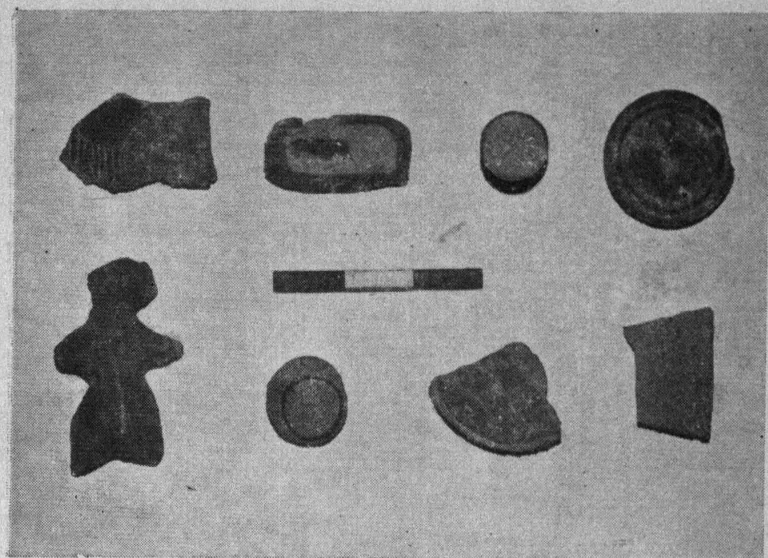
নির্ঘণ্ট

স্থান-নাম

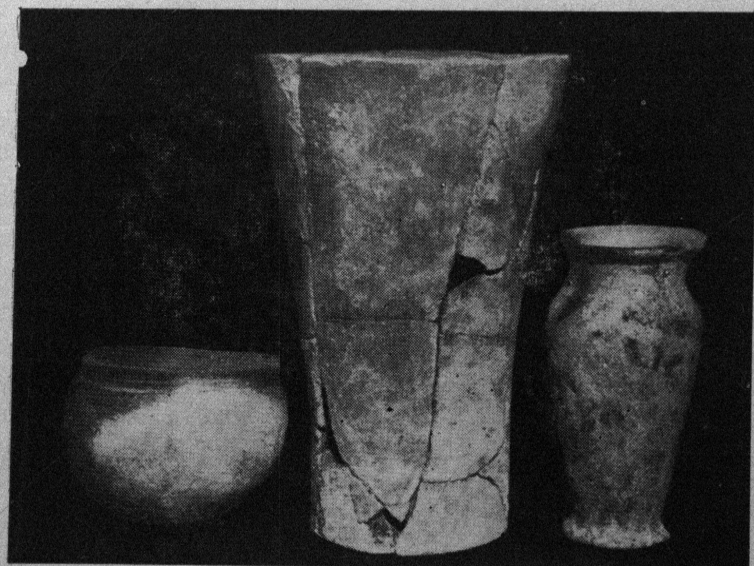
ব্যক্তি নাম

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	শেষ	গতস্ত	গতঃ স
১৬১	১২	binding	finding
১৮৪	২৩	১৭৭১	১৭৭০
২১০	১০	কর্ধমান	বর্ধমান
২৪৯	২৬	জের ৫৫ ৪½	বাতিল ধরতে হবে
৩০১	৪	১৫১১	১৫১০
৩০২	২৯	গৌরস্তনানন্দ	গৌরগুণানন্দ
৩১১	২	আবাপুর	আঝাপুর
৩৩২	২	পাদটীকা উহ্য	৬৬
৩৬৮	২২	ভট্টাচার্য	গোস্বামী
৩৬৮	২৯	পাটনীপাড়া	পাতিলপাড়া
৩৭৩	১৪	১৯৫৩	১৯৫৪
৩৮৪	২৮	পাটনীপাড়া	পাতিলপাড়া
৩৯৬	১১	জহিল	ডাহিন
৪৩৩	১৭	১৩২০	১৩২১

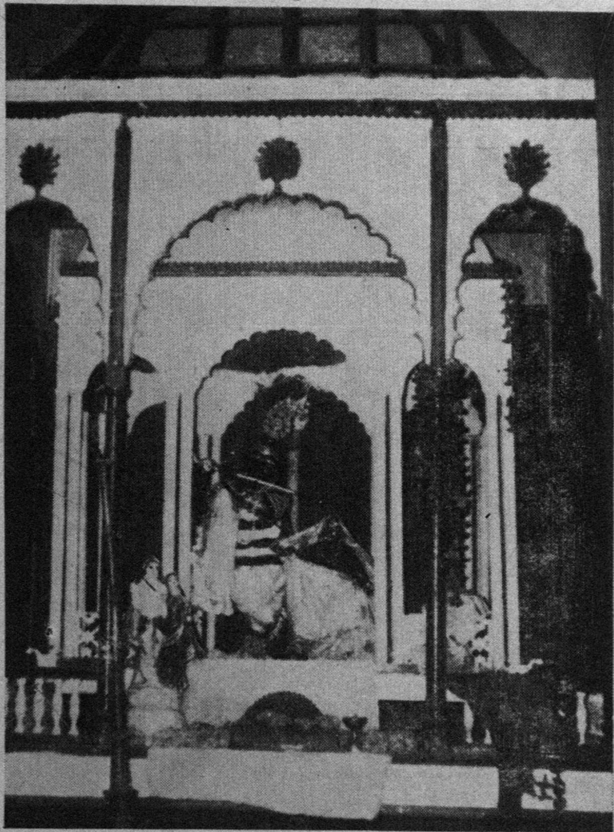


১। প্রত্ন-শিল্পকলার নিদর্শন ঃ পণ্ডুরাজারঢিবি



২। প্রত্নযুগের মৃৎপাত্র ঃ বাণেশ্বরডাঙ্গা

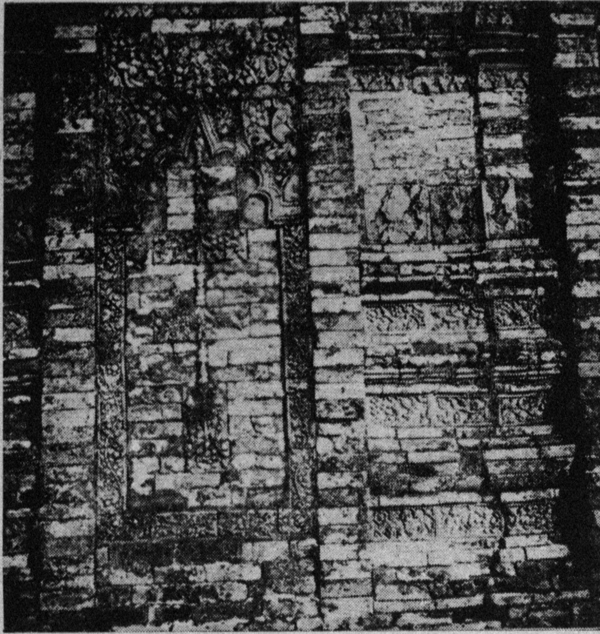
৩। রামগঞ্জ তাম্রশাসন



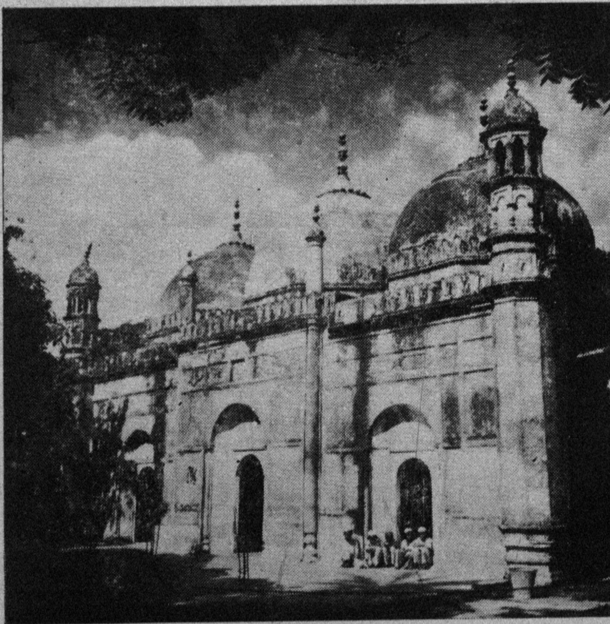
৪। গোপীনাথ বিগ্রহ : অগ্রদ্বীপ



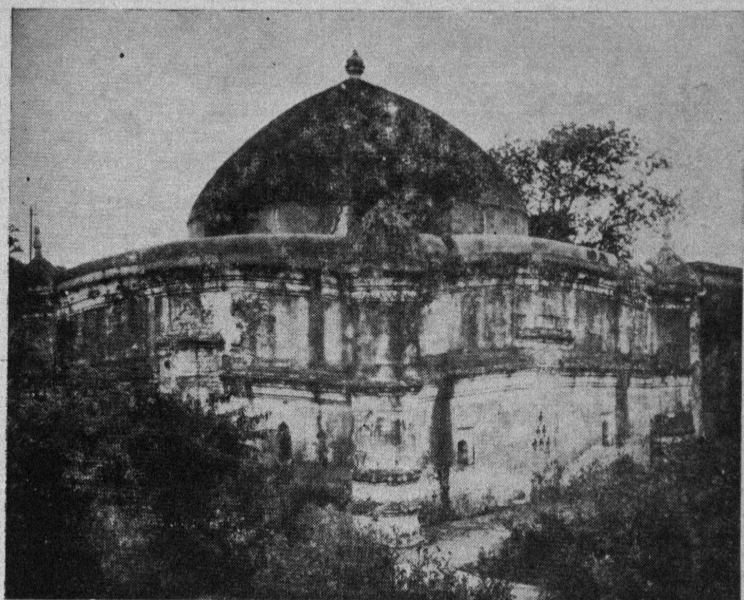
৫। বলরামের দারুবিগ্রহ : বোড়োবলরাম



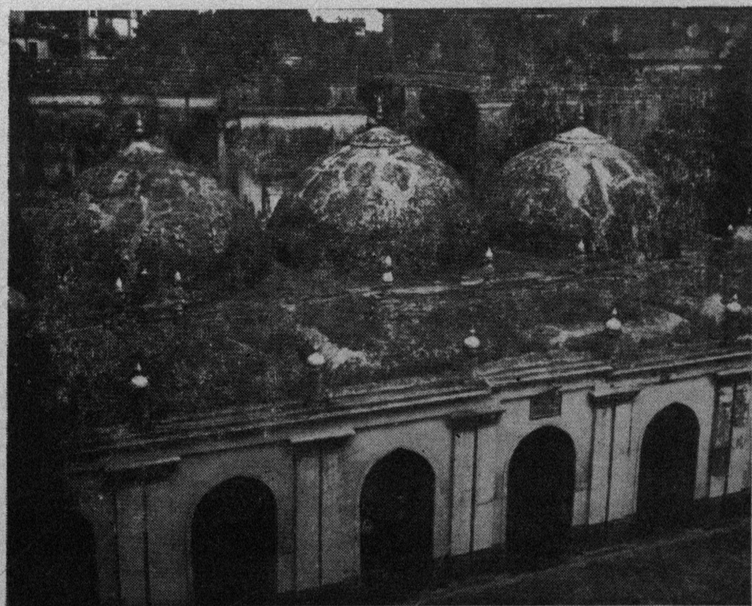
৬। হোসেনশাহী মসজিদের টেরাকোটা ভাস্কর্য ঃ কুলুট



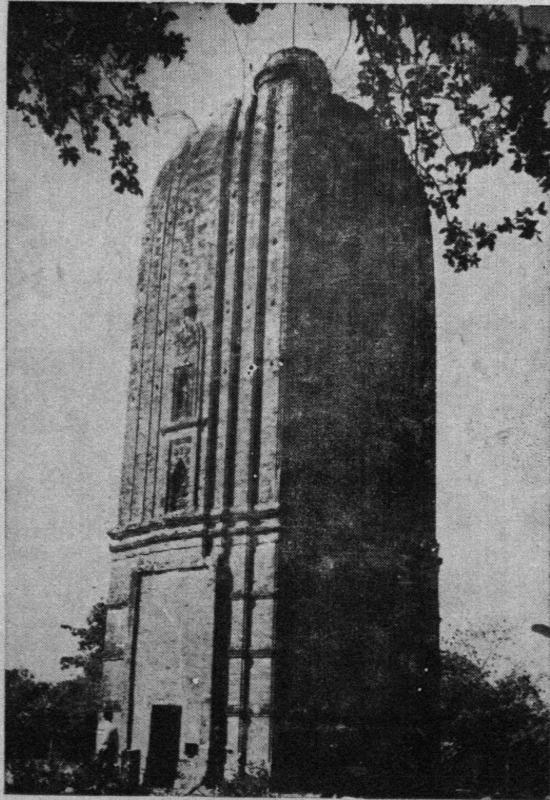
৭। মধ্যযুগের মসজিদ ঃ কুসুমগ্রাম



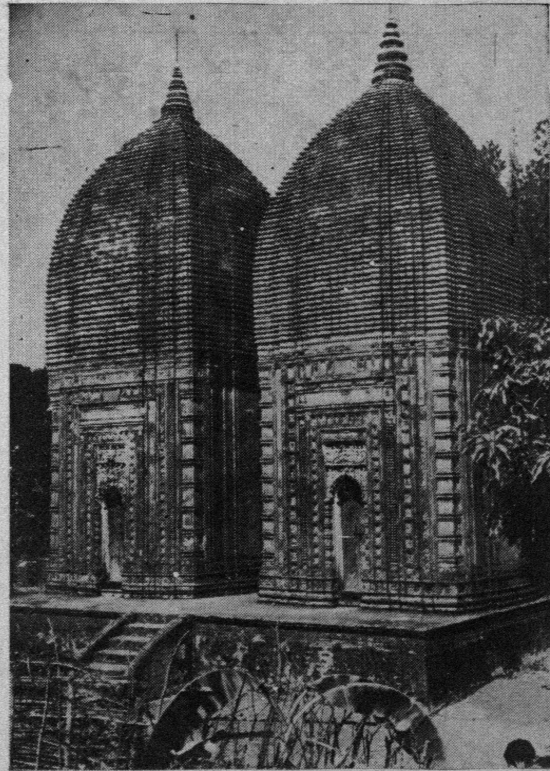
৮। পীরবহরাম সক্কার সমাধিক্ষেত্র : বর্ধমান শহর



৯। জুম্মা মসজিদ : বর্ধমান শহর



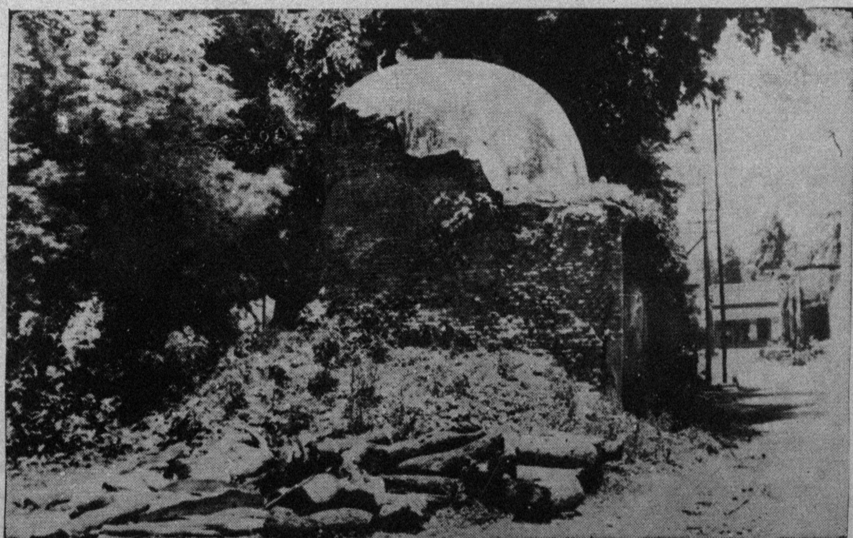
১০। ইছাইঘোষের দেউল ঃ গৌরাঙ্গপুর



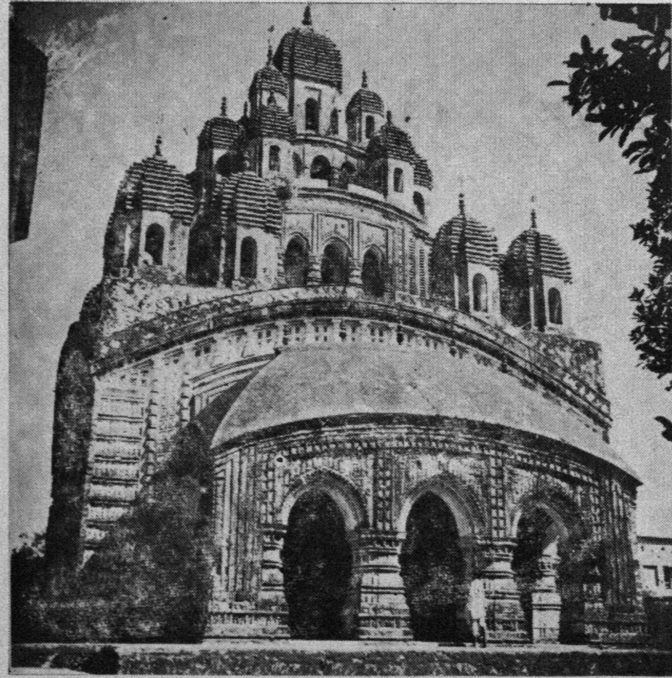
১১। জোড়াশিখর দেউল ঃ কালিকাপুর



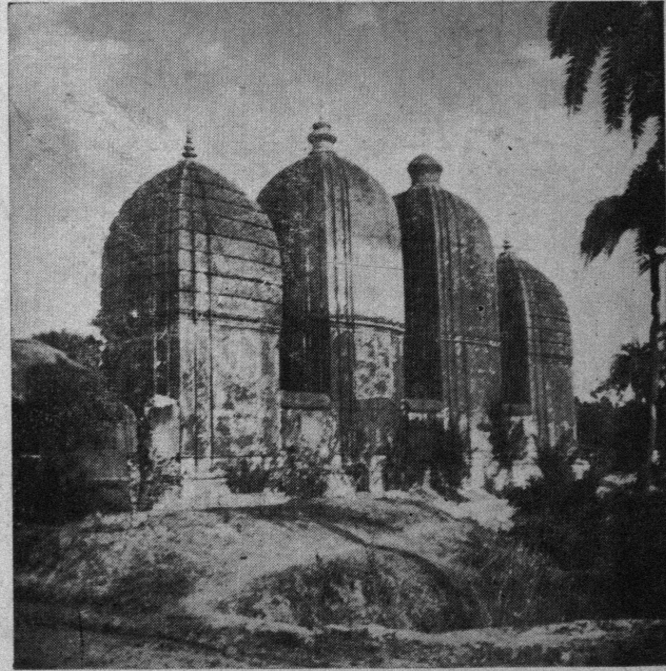
১২। কীর্তিচাঁদ-এর সমাজবাড়ী : দাঁইহাট



১৩। বদরশাহের মাজার : দাঁইহাট



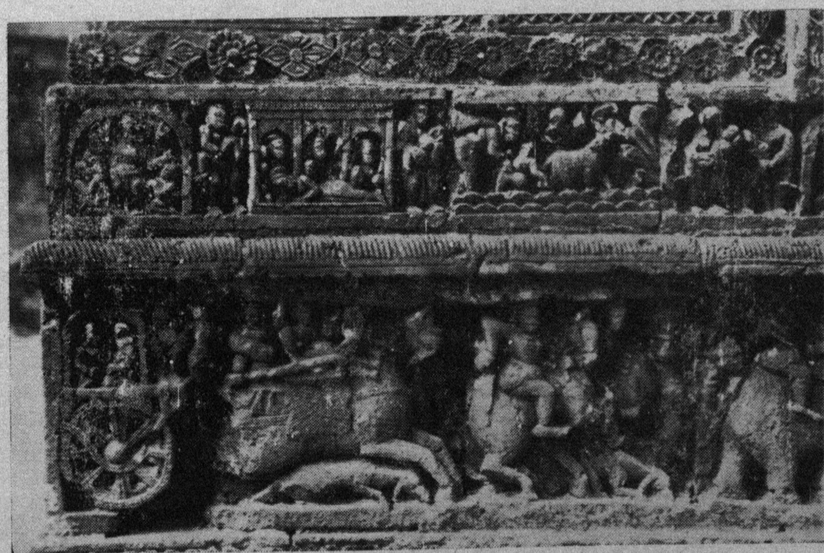
১৪। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির : কালনা



১৫। সারিবদ্ধ শিখরদেউল : বনকাটি-অযোধ্যা,



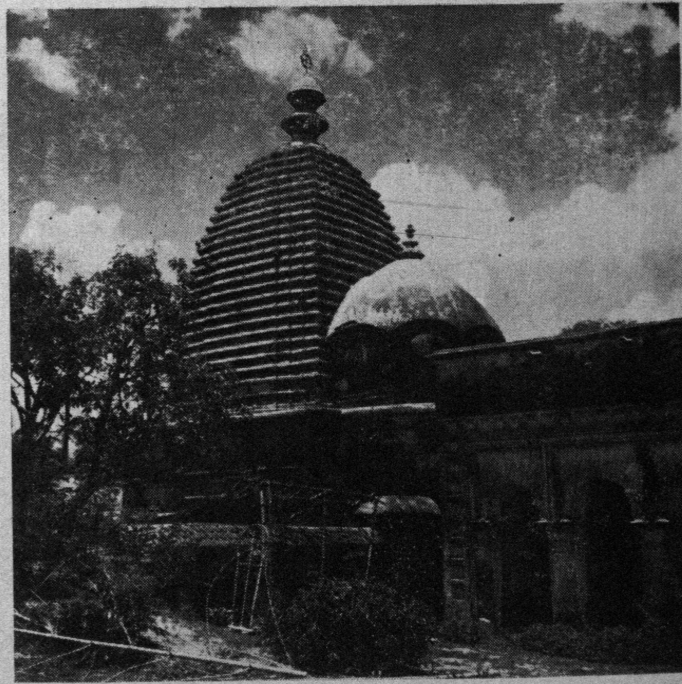
১৬। ১০৯ শিবমন্দির : কালনা



১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির গাত্রে টেরাকোটা ফলক : কালনা



১৮। একরত্ন মন্দির ঃ খণ্ডঘোষ



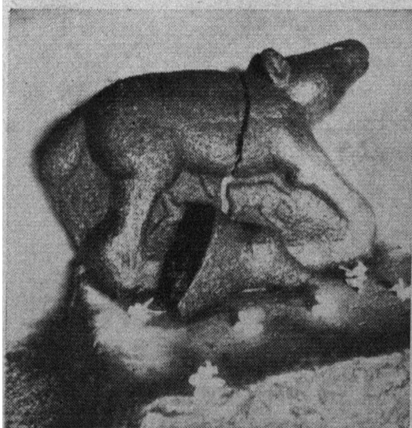
১৯। গোপাল মন্দির ঃ কুলিনগ্রাম



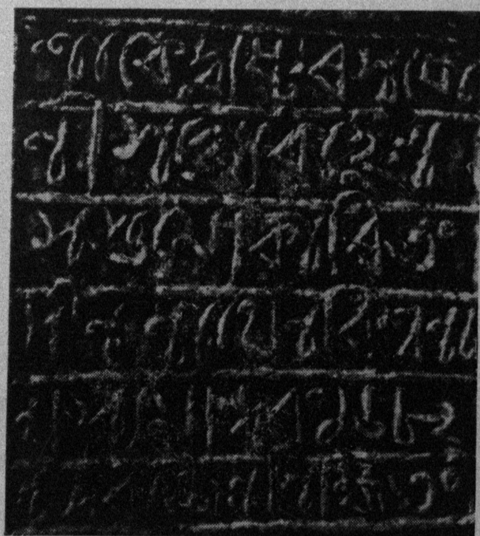
২০। পার্বতী মূর্তি ঃ দিগনগর



২১। চণ্ডী মূর্তি ঃ কাঞ্চননগর



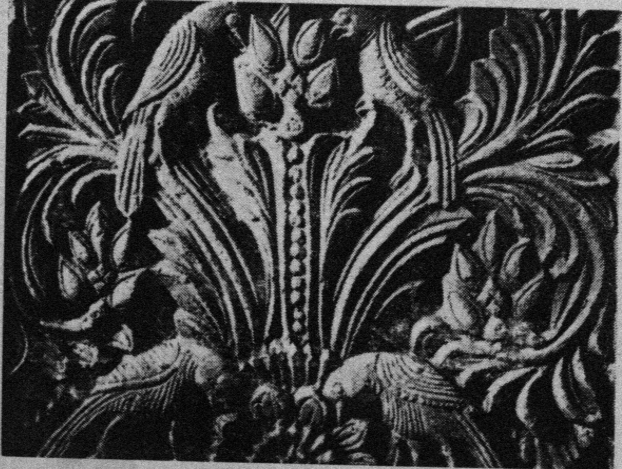
২২। শিবানী দেবীর মূর্তি ঃ কুলিনগ্রাম



২৩। মন্দিরলিপি ঃ সীতাহাটি



২৪। টেরাকোটা ফলক : আঝাপুর



২৫। টেরাকোটা ফলক : বৈদ্যপুর



২৬। টেরাকোটা ফলক : শ্রীধরপুর



২৭। টেরাকোটা ফলক : দেবীপুর